


৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। মাঘ, ১৩২৯।

নববর্ষে

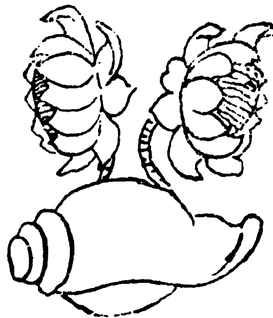
# আমার দেশ

দুইটী বছর গেল গো চলিয়া
আজি গো আমার দেশ
তৃতীয় বরষে করি পদার্পণ
ধরিছে মোহন বেশ!
আমাদের তরে দুইটী বছর
কতই যতন করে

কতই কাহিনী কতই কবিতা
শুনালে হৃদয় ভরে;
কত উপদেশ কত শত ছবি
কত শত সমাচার
উপহার দিলে আমাদের করে
প্রতিদান নাহি তার।

আবার শুনাতে স্বদেশের বাণী
আবার শুনাতে গান,
বসন্ত কাননে আবার তুলিতে
পাপিয়ার কল তান—
আসিছে আবার নবীন ভূষণে
তুষিতে মোদের মন
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে হৃদয়ে,
করিতেছে প্রাণ পণ।
আশীষ কর গো যেন চিরদিন
তোমারি সেবায় প্রাণ,
তোমারি পূজায় সঁপি মম দেহ
জীবন করি গো দান।
আমাদের তরে যেন চিরদিন
পার গো গাহিতে গান
সাধিতে কার্য্য জীবনের পথে
হও দ্রুত আগুয়ান।
কভু ও যেন গো জননী তোমার
না হেরি মলিন বেশ
ধন্য আমরা তোমারি সন্তান
ধন্য—আমার দেশ।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।






বিদেশে হিন্দুর অতীত গৌরব-কীর্ত্তি।

( যবদ্বীপের অন্তর্গত মেন্দুতে একটি মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি এতই বড় যে এর আশপাশ দিয়া মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল, মন্দির গড়িয়া পরে মূর্ত্তি স্থাপনা হয় নাই। )



# ষাঁড় ও যাত্রা সংবাদ।

( ১ )

আমার দেশের ছোট পাঠক পাঠিকারা এ গল্পটা শুনে যে তোমরা খুব এক পেট হাসবে তা ভেবে আমারি হাসি পাচ্ছে, তবে এটা ঠিক্ কথা, যে এটা মোটেই গল্প নয়, একেবারে সত্যিকার ঘটনা, এবারের পূজাতে আমাদের পাড়ার ন্যালা ছোঁড়ার হ্যাংলামীরই একটা ব্যাপার।

ন্যালার পরিচয় তোমাদের শুনিয়ে দিতে হচ্ছে, সে আমাদের পাড়ার বিষ্ণু চক্কোত্তীর ছোট ছেলে। ছোট বেলা থেকেই সে একজন মস্ত পেটুক্, নেমন্তন্ন যাবার তার ভারী সখ। যেখানে যার বাড়ীতে যে কোনো কার্য্য কলাপ উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন হ'ক আর না হ'ক কেন, তার সেখানে যাওয়া চাই, পাড়াতে কাজ

কর্ম্মের বাড়ীতে তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন যে বাদ যায় না এটা ঠিক্। কলকাতা সহরের সব বাড়িতে কিছু কাজ কর্ম্মে তার নেমন্তন্ন হয় না, হতে পারে ও না, সে কিন্তু লুচির গন্ধ পেলে সব বাড়িতেই ঢুকতে প্রস্তুত। ঢোকেও। বয়স তার বছর ষোল, মা সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্ক সে মোটেই রাখে না, ঘুড়ি ওড়ানো, গুলি খেলা, আর দরকার হলে লোকের বাড়ীর মড়া ফেল্‌তে এ সবেতে সে সর্ব্বদাই মজবুত, লোকের ফায়টা ফরমাসটাও সে খুব খেটে দিতে রাজী, কেবল তাকে এক পেট লুচি খাওয়াবার লোভ দেখাতে পারলেই হয়। একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একজনদের বাড়ী থেকে একখানা বই আনতে যাচ্ছি, রাস্তায় একজনদের বাড়ীর দুয়োরে খুব ভিড়, লোকজন ছুটোছুটি করেছে, দুয়োরের সামনে খুরী, গেলাস, পাতার স্তূপ দেখে অমনি সেখানে ন্যালা দাঁড়িয়ে গেল, আমি বল্‌লাম, কি রে ন্যালা দাঁড়িয়ে কেন? সে বললে, তুমি যাও সুরোদা আমি এখানে নেমন্তন্ন খেয়ে যাব।

আমি অবাক হয়ে গেলাম "সে কিরে? তোকে কি ওরা নেমন্তন্ন করেচে যে খাবি?" সে এক গাল হেসে বল্‌লে "সবাই বুঝি আমায় নেমন্তন্ন করে?"

আমি বল্‌লাম্ "বিনি নেমন্তন্নয় খেতে গিয়ে লুচি মণ্ডা তো খাবি না, খাবি গলাধাক্কা।" সে বল্‌লে "কখনো না সুরো দা, তুমি ঐ খানে দাঁড়িয়ে দেখ না, কি করে আমি নেমন্তন্ন খাই।"

অগত্যা আমি দাঁড়িয়ে পড়্‌লাম্। সে কাছের দোকানে গিয়ে ধাঁ করে আধ পয়সার বিড়ি আর আধ পয়সার ময়দা কিনে নিলে, তারপর দুটি কাণে দুটি বিড়ি গুঁজে কোত্থেকে একটু জল যোগাড় করে সেই ময়দা হাতে বেশ করে মাখতে লাগ্‌ল এমনি তার পোষাকের মধ্যে তো ন হাত একখানা আধ ময়লা ধুতি, আর গলায় মালার মতন পৈতে, জামা জোড়ার কোনো বালাই নেই,

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম "হাঁ রে ন্যালা, সঙ সাজবি না কি ?"

সে কিছু না বলে সেই ময়দা মাখা হাত নিয়ে এক দৌড়ে কাজের বাড়ীর সামনে যেখানে লোকের ভিড় জমজম করছিল আর ওপাশের কলে লোকজনেরা জল নিয়ে কলসী ভরছিল, সেখানে গিয়ে ব্যস্ত ভাবে বল্‌লে "শীগ্‌গীর সরো সব, আমার খোলা জ্বলে গেল। হাতটা ধুয়ে নিতে দাও।" বামুন ঠাকুরের খোলা জ্বলে যাবার ভয়ে তখনি ভিড় সরে গেল, তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ে কোথায় যে উধাও হ'লো, আমি আর তা ঠাওর করতে পারলাম না, পরের দিন তাঁকে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম, বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই সে যেখানে বামুনদের পাতা হচ্ছিল সেইখানে বসে পড়ে বেশ এক পেট খেয়ে নিয়ে ছিল, আর এই উপায়েই সব নেমন্তন্ন বাড়িতেই তার নাকি অবাধ গতি, এমন পেটুক রামের কথা তোমরা আর কখনো শুনেছ কি ?

( ২ )

ন্যালার এবারের পূজোর কাণ্ড বলি শোনো। কলকাতার পাথুরে ঘাটার দাঁদের বাড়ী পূজোয় ভারী ধুম হয়, প্রত্যেক বারেই তারা অষ্টমীর দিন রাত্রে সখের যাত্রা দেয়, আমরা পাড়ায় একটা যাত্রার আখড়া করেছিলাম, ধ্রুবের পালা যা অভিনয় হচ্ছিল তা খুব সুন্দর হয়েছিল। এটা শুধু আমার নিজের মুখের কথা নয়, যারা দেখেছে তারাই এক বাক্যে এই কথা স্বীকার ক'রে তাদের রসবোধের পরিচয় দিয়েছে। দাঁদের ছোটবাবুর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল, সে বল্‌লে এবার তাদের পূজো বাড়ীতে আমাদের এই ধ্রুবের পালা অভিনয় করাবে। বৌবাজারের

সখের দল প্রত্যেক বছর দাঁদের বাড়ী অভিনয় করে থাকে, তাই আমি বল্‌লাম যদি তারা ঝগড়া ঝাঁটী করে ? ছোটবাবু হেসে বল্‌লে, মরদ বাচ্ছা হয়ে ঝগড়াকে ভয় কর কেন হে ?" কাজেই আমি আর কিছু বল্‌লাম না, অষ্টমীর দিন যাত্রা হবে ঠিক হলো। সখের দলেরা তো কারু-বাড়ী অভিনয় করতে গেলে কিছু নেয় না, আমরা ও কিছু নেবোনা, কেবল ঘোড়া গাড়ী বাবদ, ৫০৲ আর সাজ পোষাকের ভাড়া পঁচিশ টাকা, রাত্তিরে একশ জনের লুচি মণ্ডার আয়োজন, পান, সিগারেট, সোডা ইত্যাদির যা খরচ, সেটা নেহাৎ অল্প নয়, তা তোমরা বুঝতেই পাচ্ছ, দাঁদদের মতন বড় মানুষরা তা গ্রাহ্যই করে না। অষ্টমীর দিন দল বল নিয়ে দাঁদের বাড়ী যাবার আয়োজন কচ্ছি, কোথেকে ছুটে এসে ন্যালা খবর দলে, "দাদা গো, বৌবাজারের দলরা ভারী চটেচে বলচে, আমাদের উপর টেক্কা দিয়ে যাত্রা গাইতে যাচ্ছে, যাক্‌ না, যাত্রার যদি গঙ্গাযাত্রা না করি তো আমরা শা—"আমি রেগে গিয়ে" বল্‌লাম "সব শা—কে দেখা আছে, বাজে বকিস্‌ না ন্যালা।"

ন্যালা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে "আমি সঙ্গে যাব দাদা, খাবার আয়োজন আছে তো ?"

আমি বল্‌লাম "তা আবার নেই ! ষোড়শ উপচারেই আছে, ওদের বাড়ীর ডাক্‌ সাইটে খাওয়া।"

যথা সময় যাত্রা নিয়ে আসরে নামা গেল। আসর যা সাজান হয়েছিল চমৎকার, চারিদিকে আলোয় আলোয় ঝক মক করচে, সেকেলে বেলোয়ারী ঝাড় গুলো থেকে সাত রকম রঙ ঠিক্‌রে পড়চে, সভা একেবারে লোকে লোকারণ্য। খান দুই গান হবার পর পালা সুরু হ'লো। রাজসভায় রাজা উত্তানপাদ ছোট রাণীর পরামর্শ শুনে ভ্যাড়াকান্ত বনে গিয়ে বড় রাণীকে বনবাসে যেতে বলচেন, রাণী

তা শুনে রাজার পায়ে ধরে রাজপুরীর এক পাশেই স্থান প্রার্থনা করছেন, আর রাণীর হয়ে জুড়ীরা গান ধরেচে—

"ও গো মহারাজ, রাখ মোর লাজ,
আমায় বনে দিলে, কি ক'বে সমাজ ?"

দুটি তরুণ বালক মধুর কণ্ঠে দু দিকে দাঁড়িয়ে জুড়ী গাইচে, আমি কনসার্টে বসে পাখেয়াজ বাজাতে বাজাতে গানের সঙ্গে গেয়ে যাচ্ছি, গানটা বেশ মজে উঠেছে, অতো বড় সভা নিস্তব্ধ হয়ে গান শুনচে, হঠাৎ শব্দ উঠলো "ষাঁড় ষাঁড়" ভীষণ রকম রসভঙ্গ, রাজা এক লম্ফে সিংহাসন ত্যাগ করে আসর হতে প্রস্থান করলে, রাণী ও ভূমিশয্যা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চোঁচা ছুট দিলে, সমস্ত লোক যে দিকে পারে ছুটতে লাগ্‌ল, আমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লাম "ষাঁড় কোথেকে এলো" ? ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে কে জবাব দিলে "কৈলাস থেকে এলো, ভগবতীকে নিয়ে যাবার জন্য মহাদেব রওনা করেচেন, প্রাণ নিয়ে পালাও দাদা"

শুনে এমনি রাগ হোলো—পাশে চেয়ে দেখি ন্যাল্যা, সে আমার হাত টিপে ইসারা করলে "এই বার।"

আমি বললাম "এইবার কি রে ?"

ন্যালা ডান দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে দিলে। দেখি কি, দু তিন ধামা লুচি, সন্দেশ রসগোল্লার হাঁড়ী এই সব বসান, পাতও পাতা হয়েচে, পরিবেশনকারীরা পরিবেশন করা ফেলে, যাত্রার গঙ্গাযাত্রা দেখতে ছুটেচে। নিশ্চয় বৌবাজারের দলের এই শয়তানী কাণ্ড, আচ্ছা ছোট লোক বটে তো ! ব্যাটারা রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে উঠেচে, এই সময় আবার ন্যালা ছোঁড়ার এক কাণ্ড, তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বল্‌লাম "আমায় তুই এমনি পেটুক পেয়েছিস্ হতভাগা শূয়োর" !

সে একটু ও পেছু না হয়ে বল্‌লে "আচ্ছা দাদা, যখন মসলা গুলো দু হাতে পকেটে ভরছিলে তখন বুঝি আমি দেখিনি ? দুনিয়ায় আমি একলাই পেটুক না ?"

রাগের সময়েও না হেসে থাকতে পারলাম না, সভায় এক বারকোস মসলা অর্থাৎ লবঙ্গ, ছোট এলাচ, বড় এলাচ, মৌরি কাবাবচিনি জয়িত্রী ইত্যাদি সাজিয়ে, কনসার্ট পার্টির সম্মুখে দেওয়া হয়েছিল, গান গাইতে গাইতে বা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গলা শুকিয়ে গেলে খাবার দরকার হয় বলে।

অনেকেই খাবার সঙ্গে সঙ্গে এক আধ মুঠো পকেটে রাখছিল, পাছে আমার ভাগ্যে শূন্য পড়ে, সেজন্যে আমিও দু চার মুঠো পকেটে ফেলি, ন্যালা তা লক্ষ্য করেচে আর কি—ন্যালাকে বললাম "পেটুক রাম তোমার যা খুসী নিয়ে যাও, আর নিয়ে পালাও, আমায় ডেকো না, আমি ও সবে নেই", ন্যালা এক গাল হেসে তখ্‌খুনি লুচির ধামা লক্ষ্য করে দৌড় দিলে। আমরা দলের কে কোন দিকে ছত্র ভঙ্গ হয়ে বাড়ী ফিরলাম। মন একবারেই দমে গেল, অথচ আমাদের এ বিপদে ন্যালার পেটুকতার এতটুকু ত্রুটি দেখা গেল না দেখে হাসিও রাখতে পারলাম না।

শ্রীসরসীবালা বসু।

---

# নূতন যাদুঘর।

তোমরা অনেকেই বোধ হয়, যাদুঘর দেখে থাকবে; না দেখে থাক ত গল্পও শুনে থাকবে বোধ হয়, সেখানে যত পুরাণ পাথর, টাকা, মরা মানুষ, মরা জন্তু, আরও যত সব আশ্চর্য্য জিনিষ রাখা আছে, কিন্তু এবার আমেরিকায় একটি যাদুঘর হবে যাতে এসব কিছুই থাকবে না; থাকবে যত লোকের গলার আওয়াজ! তোমরা বোধ হয় খুবই আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছ যে সে আবার কি? কিছুই শক্ত নয়, তোমরা নিশ্চয় কলের গান শুনেছ, যেমন দমদিয়ে চাকাপানা রেকর্ড খানাকে ঘুরিয়ে দিয়ে পিনটা লাগিয়ে দিলেই গানের আওয়াজ আসতে থাকে। ঐ গানগুলির মধ্যে ঐ গাইয়েদের গলায় ঠিক আওয়াজটি আমরা পাই। এখন ঐ রকম রেকর্ডে যদি গান কিম্বা যে কোন বক্তৃতা তোলা যায় ত যখনই দরকার হবে তখনই গাইয়ে, কিম্বা বক্তার গলার আওয়াজ পাওয়া যাবে। পৃথিবীর নানান্ দেশের লোকের আর নানা বড় বড় লোকের ঐ রকম বক্তৃতা রেকর্ডে তুলে সেই রেকর্ডগুলি ঐ যাদু ঘরে রাখা হবে। এমন জিনিষের রেকর্ড রাখা হবে যে প্রায় ১০০০০ হাজার বৎসর পর্য্যন্ত নষ্ট হবে না। কাজেই এর পর লোকে যাদুঘর দেখতে গিয়ে এখনকার লোকের বক্তৃতা শুনবে। তোমারও যদি কখন আমেরিকায় যাও ত সব দেশের বড় বড় লোকের গলার আওয়াজ শুনে আসবে! কি রকম ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন রকমের লোকের গলার আওয়াজ থাকবে তা এই শুনলেই বুঝতে পারবে যে আমাদের কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জার্ম্মনীর এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি হিণ্ডেনবার্গ এরই মধ্যে তাঁদের রেকর্ড তুলিয়েছেন। তোমরাও চেষ্টা কর এমনি বড় হ'তে যাতে তোমাদের গলার আওয়াজও যাদু ঘরে রেখে দেবে আর দশ হাজার বৎসর পরেও লোকে তা শুনবে।

শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র।

---

# 'আমার দেশের'—কবি

## ৺যতীন্দ্রনাথ পাল।

যতীন্দ্রনাথ নাই রে আজি
যতীন্দ্রনাথ নাই
কে শুনাবে ছড়ায় ছড়ায়
কবিতা আর ভাই!
কে শুনাবে ব্রতের কথা
গল্প রাশি রাশি
কাহার ছড়ায় পড়ব লুটি'
রাখ্‌তে নারি হাসি।
এমনি মিষ্টি এমনি মধু
ঢালবে কে রে আর
স্নেহ মাখা কোমল করে
গাঁথবে ফুল হার?
বানীর পদে এমন অর্ঘ্য
করবে কেরে দান
এমন কোমল মধুর সুরে,
গাইবে কে আর গান?

কাহার ছড়ায়, কাব্য রসে
উঠবে হাসির ঢেউ
"আমার দেশে"র শিশুর তরে
রচবে কি আর কেউ?
অকালে আজ যতীন্দ্রনাথ
স্বর্গে গেলেন চলে.
আমরা শোকে জর্জ্জরিত
ভাসি নয়ন জলে।
আজ যে তাঁহার তিরোধানে
পেলেম মনে ব্যথা.
চির জীবন থাকবে মনে
ভুলব না তাঁর কথা!
স্বর্গে থাকুন যতীন্দ্রনাথ
এইত মোর চাই
কভু যেন নাহি ভুলেন
আমরা যে তাঁর ভাই।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

---



মঞ্জুশ্রী—বুদ্ধের জ্ঞান মূর্ত্তি।

(খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৩৪৩ অব্দে পূর্ব্বযবদ্বীপে স্থাপিত বুদ্ধযুগের জ্ঞান-মূর্ত্তি। মূর্ত্তির হস্তে যে তরবারি রহিয়াছে, উহা অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালায়—সেখানকার লোকের এই ধারণা।)

# শিল্প-কলা।

## বিশ্বশিল্পী।

**চন্দ্রালোকে—** লর্ড লেটন।

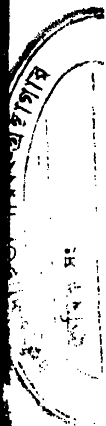
গ্রীষ্মের মধুর চন্দ্রালোকে মাথা রাখিয়া দুইটি মেয়ে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চাঁদের কিরণ তাহাদের অঙ্গের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মাথার কাছে মধুর স্বরে পাপিয়া গাহিতেছে—নিদ্রিতা মেয়ে দু'টির মনের মধ্যে এক স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি হইতেছে। লর্ড লেটনের অঙ্কিত চিত্রগুলির মধ্যে এইটিই সর্ব্বোত্তম।

---

## যীশুর ক্রুশ হইতে অবতারণ— রুবেন্স।

সেই বীভৎস হৃদয়বিদারক ঘটনা তোমাদের মনে আছে বোধ হয়। প্রভু যীশুখৃষ্টকে তাহারা ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল। নরঘাতক পশুরা অন্তর্হিত হইলে প্রভুর ভক্তগণ প্রভুকে ক্রুশ হইতে নামাইতেছে, সেই সময়কার দৃশ্যটি এই চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্তদের বুকে তখন একদিকে অনন্ত আশার আলোক প্রজ্বলিত অন্যদিকে আবার নিরাশার গাঢ় অন্ধকার। একবার মনে হইতেছে প্রভু আছেন, আবার মনে হইতেছে, নাই নাই প্রভু তাহাদের নাই। আবার মনে হইতেছে প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কত না বেদনা বাজিতেছে, সবাই তাই একেবারে একসঙ্গে মমতাভরা করুণাপূর্ণ হাতগুলি বাড়াইয়াছে, প্রভুকে ধরিয়া নামাইবে; চোখগুলি হইতে ব্যথা ও বেদনা যেন ক্ষরিয়া পড়িতেছে।

---

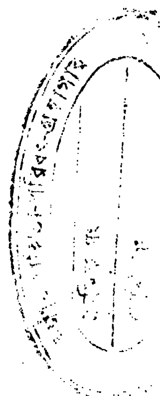


## মান ও অপমান—

স্যার এড্‌উইন ল্যাণ্ডসিয়ার।

এক একটি দুঃশীল ছেলে-পুলে দেখা যায় যারা প্রায়ই বড়দের সঙ্গে ঠোক্কর দিয়া চলিতে চায়। বড়রা যা করে তারাও তাই করিবে এই রকমের ইচ্ছাটা আর কি! ভদ্র, গম্ভীর এবং সম্মানীয় কুকুরটি জানালায় মুখ বাড়াইয়া দাঁড়াইতেই দুর্ব্বৃত্তটা আসিয়া অমনি পাশে বাহার দিয়া দাঁড়াইয়াছে।

স্যার এডুইনের আঁকা এই ছবিখানি প্রথমে কুকুর নাম দিয়া বাহির হইয়াছিল। তাহার পর নামটি পরিবর্ত্তন করিয়া '**গৌরব ও লজ্জা**' রাখা হয়—শেষের নামটিই ঠিক খাটিয়াছে, নয়?



## রাজা ও ভিক্ষুকবালা— সার এডওয়ার্ড বার্ণ জোনস্।

ছেলেমেয়েরা সেই কবিতাটি নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছে, সেই যে এক ভিক্ষুকবালা রাজা কযেচুয়ার সভায় আসিয়াছিল। সভাসদরা কেহ তাহার সুন্দর মুখের প্রশংসা করিল, কেহ তাহার নীল নয়নদুটির, কেহ তাহার অঙ্গ সৌষ্ঠবের সুখ্যাতি করিল, আর স্বয়ং রাজা বলিলেন—এই ভিক্ষুক বালিকা আমার রাণী হইবে। "The begger maid shall be my queen." ভিক্ষুক বালিকা এত সুখের কল্পনা করিতেও পারিতেছিল না। পারিবেই বা কোথা হইতে! কোথায় ভিখারিণী কোথায় রাজরাণী! শিল্পীর তুলিকায় তাহার মুখের ভাব কি সুচারুরূপেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আর রাজা, রাজা তখন সর্ব্বস্বই সেই ভিক্ষুক-বালিকার চরণে নিবেদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন; মাথার মুকুট নাই, রাজদর্প নাই, দীনভাবে বসিয়া, দীন করুণ নয়নে তাহাকেই দেখিতেছেন যে এই কয়মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সামান্য ভিক্ষার প্রার্থী হইয়া তাঁহার সভায় প্রবেশ করিয়াছিল।

———

মি লে,



চ স্ব ণ

চাষীরা শস্য কাটিয়া স্তূপাকারে গাদা করিয়া রাখিতেছে আর দরিদ্র রমণীগণ যে সকল ক্ষেত্র হইতে শস্য তুলিয়া লওয়া হইয়া গিয়াছে তাহাতেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া শস্য সঞ্চয় করিতেছে। এই যে ছবিখানিতে তিনটি মেয়ে শস্য খুঁটিয়া তুলিতেছে, উহাদের কাজই ঐ।





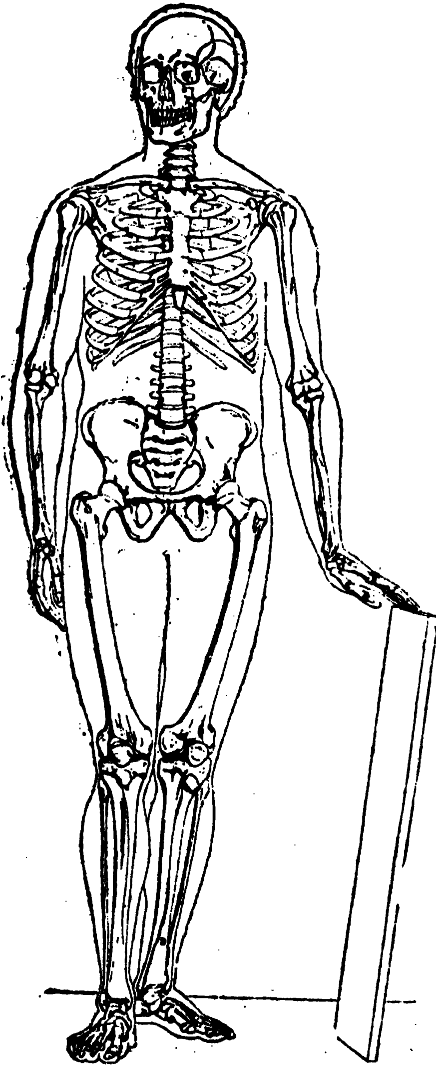
স্বপ্ন— ডিটেল।

সৈন্যের দল মাঠের মধ্যে তাহাদের অস্ত্রপাতি রাখিয়া রাত্রের মত শুইয়া ঘুমাইয়াছিল, হঠাৎ দেখিল যেন সামনে দিয়া অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত বহু সৈনিক, পদাতিক, অশ্বারোহী সব দল বাঁধিয়া, নিশান উড়াইয়া, বাজনা বাজাইয়া কুচ কাওয়াজ করিতে করিতে চলিয়াছে।

ডিটেল বিশ্ববিজয়ী ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের দুর্জ্জয় বাহিনীর সঙ্গে অনেকদিন ছিলেন, অনেকে মনে করেন চিত্রকর তাঁহার নিজ জীবনের সেই অভিজ্ঞান হইতেই এই হৃদয়গ্রাহী ছবিটি আঁকিয়াছেন।

---





মানবদেহের কাঠাম—হাড় দিয়া তৈয়ারী।

## মানবের দেহযন্ত্র।

পৃথিবীতে বিস্ময়ের বস্তু অনেক আছে। কিন্তু মানবদেহের মত এত বড় একটা বিস্ময়জনক যন্ত্র, অথচ এত আপনার জিনিষ আর একটীও খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যন্ত্রের নির্ম্মাণ-কৌশলের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, মানব-নির্ম্মিত সকল যন্ত্রই—তা সে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনই হউক বা আকাশগামী এরোপ্লেনই হউক—বিধাতার দান এই দেহ-যন্ত্রের নিকট একেবারে ছেলেখেলা বলিয়া মনে হয়। যেখানে যে জিনিষটীর দর-কার—অঙ্গগুলি যেখানে বিন্যস্ত হইলে—যে ভাবে, যে বস্তুদ্বারা নির্ম্মিত হইলে সমস্ত কার্য্য একেবারে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হইতে পারে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত এমন সুচারুরূপে মানবের দেহে বর্ত্তমান যে, জগতের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার—সমস্ত বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর শেষদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিলেও ইহার সমকক্ষ কোনও যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন এরূপ

দুরাশা কেহ করে না। মানবের এই দেহ যন্ত্রটীকে মানবের পক্ষে সর্ব্ব-প্রকারে উপযোগী হইতে হইলে ইহার প্রধানতঃ দুইটী গুণ থাকা আবশ্যক। প্রথম, ইহা স্বভাবতঃ জীবিত এবং কার্য্যক্ষম থাকিবে ;—এবং দ্বিতীয়তঃ, ইহা মানবের আত্মরক্ষার পক্ষে উপযোগী হইবে। মানবের বিস্ময়কর দেহ যন্ত্রটীর নির্ম্মাণে এ উভয় বন্দোবস্তই একেবারে নিখুঁত ভাবে বর্ত্তমান। সেই কথাই এখন তোমাদিগকে সংক্ষেপে বলিব।

মানব দেহের কাঠাম

প্রতিমা নির্ম্মাণ করিতে হইলে কারিকর যেমন প্রথমে কতকগুলি খড় একত্র বাঁধিয়া একটা কাঠাম তৈয়ার করিয়া লয় ;—এবং তাহার পর সেই কাঠামের উপর মাটী দিয়া, রং দিয়া যেমন তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলে ;—মানব দেহের নির্ম্মাণেও তেমনি দেখা যায় যে, অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ হাড় সাজাইয়া ইহার কাঠাম তৈয়ার হইয়াছে ;—এবং সেই কাঠামের উপর মাংসপেশী, শিরা, স্নায়ু, চর্ম্ম প্রভৃতি প্রলেপ পড়িয়া ইহা একটী বিচিত্র যন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

মানবদেহে সবশুদ্ধ ২০৭খানা হাড় আছে ;—মাথায় এবং মুখে আছে ২৩খানা ; হাতে পায়ে আছে ১২৬ খানা ; আর বাকি ৫৮ খানা আছে বুকে কোমরে ইত্যাদি সব জড়াইয়া। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে মানবদেহের এই কাঠামটুকু গড়িতে এতগুলি হাড়ের দরকার কি ? কিন্তু দরকার সত্যই আছে। গঙ্গার ঘাটে অথবা মেলায় দুই পয়সা দামের যে কাঠের পুতুল কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা দেখিতে অনেকটা মানুষের মত বটে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিলেও তাহার হাত, পা, মাথা ইত্যাদি নাড়ান যায় না ;—কারণ সে পুতুলের কাঠাম একখানি মাত্র কাঠ দিয়া তৈরী। আমাদের দেহযন্ত্রটী তো সেরূপ হইলে চলিবে না। তাই যাহাতে নড়াচড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

সঞ্চালন নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ইহার কাঠামটি অনেকগুলি টুকরা টুকরা হাড় সাজাইয়া তৈয়ার হইয়াছে। বাগানে বেড়া বাঁধিবার সময় যেমন ঝাঁকারীগুলিকে দড়ি দিয়া বাঁধা হয়, তেমনি মানব দেহের কাঠামের এই টুকরা টুকরা হাড়গুলি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয়, সেজন্য হাড়গুলিও অস্থিবন্ধ ( Ligament ) দ্বারা বদ্ধ হইয়া পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

অনেকগুলি টুকরা টুকরা হাড় হওয়ার আরও সুবিধা আছে। মনে কর, একটা জানালার শার্শি একখানা মাত্র প্রকাণ্ড কাচ দিয়া প্রস্তুত। এখন কোনও দুষ্ট ছেলে বাহির হইতে ঢিল ছুঁড়িয়া কাচটীর উপর মারিলে, একেবারে সমস্ত কাচটী ফাটিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে,—উহাকে সারাইবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। কিন্তু শার্শিটী যদি অনেকগুলি টুকরা টুকরা কাচ দিয়া তৈয়ার হয় তাহা হইলে সে ঢিল লাগিয়া মাত্র একখানি কাচই ফাটিবে;—এবং সমস্ত শার্শিটী একেবারে কাজের বাহির হইবে না— উহাকে সারানও তেমনি অল্পায়াসসাধ্য হইবে। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে মানবদেহের কাঠামটী টুকরা টুকরা হাড় দিয়া তৈয়ারী হওয়াতে আত্মরক্ষার পক্ষে কতটা উপযোগী হইয়াছে।

দুইটী কঠিন জিনিষ পরস্পর অবিরত ঘষা লাগিলে দুইটীরই ক্ষয় হইতে থাকে। কিন্তু দুই টুকরা চামড়া বা দুইখণ্ড রবারের পরস্পর ঘষা লাগিলে সেরূপ ক্ষয় হয় না। ইহার কারণ, রবার ও চামড়া বিশেষ কঠিন নয়—চাপ লাগিলে সে জায়গায় নুইয়া যায়।

উপাস্থি

তেমনি খুব কঠিন জিনিষের উপর খুব জোরে ঝাঁকানি লাগিলে সে জিনিষটা যত সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, সহজে নমনীয় কোনও জিনিষের উপর খুব জোরে ঝাঁকানি লাগিলে তাহার ক্ষতি তত সহজে হয় না। একটা কড়ির পুতুল হাত

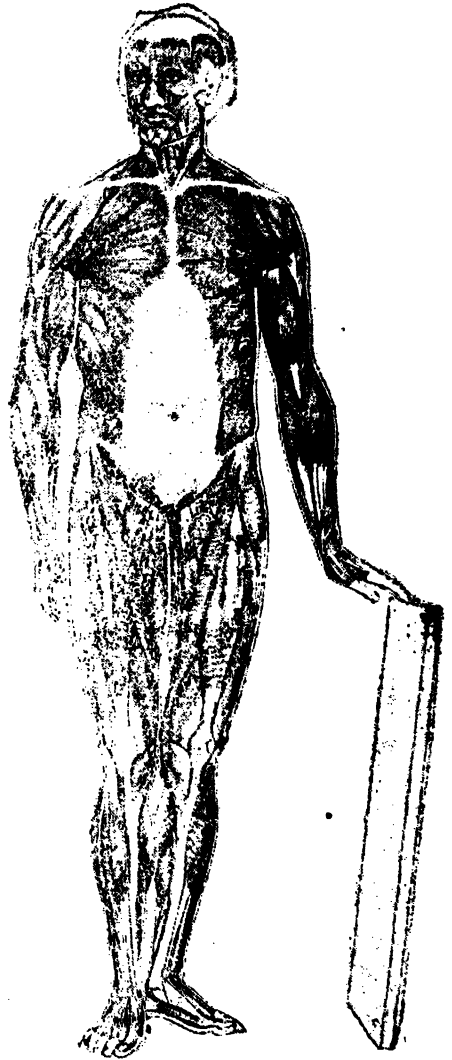
হইতে পড়িয়া গেলে তাহা তখনই ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু রবারের একটা পুতুল একশোবার পড়িয়া গেলেও সেটার কিছু হয় না। আমাদের মানবদেহের কাঠামটী যদি কেবল মাত্র কঠিন হাড়ের দ্বারাই প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে আমাদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না। অহর্নিশি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিচালনায় আমাদের শরীরের এই ২০৭ খানা হাড়ের মধ্যে যে কি সাংঘাতিক ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইয়া যাইত, এবং পরস্পর ঘর্ষণে হাড়গুলি যে কি ভাবে ক্ষয় প্রাপ্ত হইত, তাহা তোমরা বেশ বুঝিতেছ। সে দুর্দ্দশা হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য, ভগবান আমাদের দেহের কাঠামটার সবটাই অস্থিময় না করিয়া, ইহার স্থানে স্থানে খানিকটা করিয়া উপাস্থির ( Cartilage ) প্রলেপ লাগাইয়া দিয়াছেন। এই উপাস্থি দ্রব্যটী হাড়ের মত অত কঠিন নয়; পরন্তু কতকাংশে নমনীয়। ইহার ঠিক স্বরূপ বুঝিতে হইলে, একবার কাণে হাত দিয়া দেখ (দোহাই বাপু আমার উপর চটিও না)। কাণের মধ্যে যে ঈষৎ কঠিন জিনিষটী হাতে ঠেকিতেছে, তাহা হাড় নয়;—দেখিতেছ, উহা হাড়ের অপেক্ষা কত নরম, কত সহজে উহাকে নোয়ান যায়;—ইহা একপ্রকার উপাস্থি। যেখানেই দুইটা হাড় আসিয়া যুক্ত হইয়াছে,—সেই সংযোগস্থলে, গদার মত এই উপাস্থির একটা করিয়া পুরু প্রলেপ আছে।—মেরুদণ্ডের প্রত্যেকটী ছোট হাড় জোড়ার মধ্যে এই উপাস্থির গদী বর্ত্তমান। তাই সহস্রবার হস্ত পদাদি সঞ্চালন করিলেও ঘষণে ঘর্ষণে শরীরের হাড়গুলির ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই;—তাই শত ঝাঁকান লাগিলেও হাড়গুলির ঠোকাঠুকি হইবার ভয় নাই। ফুটবল খেলিবার মাঠে খেলোয়াড় যখন সজোরে “শুট্” করে, তখন এই উপাস্থি আছে বলিয়াই তাহার পায়ের হাড়গুলি কড়্ কড়্ করিয়া উঠে না;—বাজী রাখিয়া যখন কোনও ডান্‌পিটে ছেলে দোতলার ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়ে, তখন এই

উপাস্থি আছে বলিয়াই তাহার মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়গুলি ঝাঁকানি লাগিয়া মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায় না।

এইরূপে অস্থি, উপাস্থি ও অস্থিবন্ধের সংযোগে মানবদেহের যে কাঠাম তৈয়ারী হইয়াছে,

মাংসপেশী

তাহাকে প্রায় সর্ব্বপ্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে, দেহের মাংসপেশীগুলি। ধরিতে গেলে, মাংসপেশীগুলির প্রধান কার্য্য হইতেছে, শরীরের নানাস্থানের অস্থিগুলিকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করা। এই হিসাবে ইহা অনেকটা দড়ির কার্য্য করে। কিন্তু দড়ির সঙ্গে ইহার প্রভেদ যথেষ্ট; কারণ দড়ি ইহার ন্যায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় না। মাংসপেশীর প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা অতি অল্পায়াসে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়;—এবং এই ধর্ম্মের ফলেই ইহা শরীরের অস্থি সকল সঞ্চালনে এত কার্য্যকরী। মাংসপেশীর এই সঙ্কোচ ও প্রসারণ তোমরা অতি সহজেই প্রত্যক্ষ করিতে পার। ডাম্বেল ভাঁজার মত নিজের হাতখানি একবার মুড়িলেই দেখিতে পাইবে যে, হাতের



মানবদেহের অস্থিময় কাঠামকে প্রায় সর্ব্ব প্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে দেহের মাংসপেশীগুলি।

গুলিটী ফুলিয়া উঠিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লম্বায় ছোট হইয়া গেছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয় ;—হাতের ঐ স্থানে যে মাংসপেশী আছে তাহাই সঙ্কুচিত হইয়াছে ;—এবং সেই সঙ্কোচের ফলে, সেই মাংসপেশীটা লম্বায় যেমন ছোট হইয়া গিয়াছে পরিধিতে তেমনি বাড়িয়া গেছে।

মাংসপেশীর প্রধান কার্য্য অস্থি সঞ্চালন হইলেও, উহাই ইহার একমাত্র কার্য্য নয়। হৃৎপিণ্ড যে মাংসপেশীতে প্রস্তুত, পাক্‌যন্ত্র অথবা রক্তনালীতে যে মাংসপেশী আছে, তাহাদেরও প্রধান ধর্ম্ম—সঙ্কোচ এবং প্রসারন বটে, কিন্তু তাহাদের সহিত অস্থির কোনও সম্পর্ক নাই। সে কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। তাহার পূর্ব্বে মাংসপেশী কি প্রকারে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

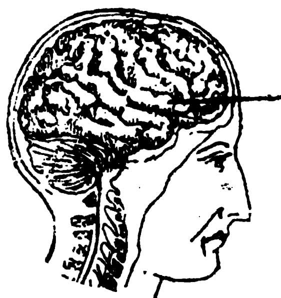
যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সবল সুস্থ রণাকাঙ্ক্ষী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকে ;—একটী মাত্র ইঙ্গিত, শুধু একটী মাত্র আদেশের অপেক্ষা—সেনাপতির একটি মাত্র মুখের কথায় তাহারা যাইয়া ভীষণ সমর তরঙ্গে ঝাঁপ দিবে।—কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ইঙ্গিত, সে আদেশ, সে বাক্য তাহাদের নিকট না পৌঁছিতেছে ; ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিরাট সৈন্যশ্রেণী একেবারে নিশ্চল ;—একটী তরবারিও কোষমুক্ত হইবে না—একটী হস্তও শত্রুর বিপক্ষে উত্তোলিত হইবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের এই অবস্থা আর মানবদেহে মাংসপেশীর অবস্থা ঠিক একরূপ। মানবদেহের প্রত্যেক স্থানই ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য মাংসপেশীতে আচ্ছাদিত—তাহার সকলগুলিই সর্ব্বদা সঙ্কুচন ও প্রসারণের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে—শুধু একটিমাত্র উত্তেজনার অপেক্ষা। কিন্তু সে উত্তেজনা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাংসপেশীতে পৌঁছিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাংসপেশী একেবারে নিথর—একটি স্পন্দনও তাহাতে দৃষ্ট হইবে না।

এ উত্তেজনা আসে কোথা হইতে ? মাংসপেশীর এ সেনাপতি কোথায় ?

ইহার উত্তর—মানবের মস্তিষ্ক। এই যে আমাদের এত সাধের মস্তক—ছেলেবেলায় পড়া বলিতে না পাড়িলে গুরুমহাশয় যেটাকে

মস্তিষ্ক

দুই হাতে নাড়া দিয়া তাহার মধ্যে ঘীলু আছে কি গোবর আছে সন্দেহ প্রকাশ করিতেন—সেই কঠোর অস্থিময় খুলির মধ্যে এক ধূসরবর্ণ ( Grey matter ) নরম পদার্থ আছে,—তাহাই আমাদের মস্তিষ্ক। ইহাকেই আমরা চলিত কথায় ঘীলু বলি। এবং ইহাই আমাদের মাংসপেশীর সেনাপতি। শুধু মাংসপেশীর কেন, মানবদেহের সমস্ত কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহের কেন্দ্র হইতেছে,—এই মস্তিষ্ক। অঙ্গ সঞ্চালন নিশ্বাস প্রশ্বাস, ঘর্ম্মত্যাগ, খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য রসোৎপাদন প্রভৃতি সমস্তই এই মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত উত্তেজনার দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। মাত্র কয়েকটী বাছা বাছা লোক লইয়া স্বষ্ট গবর্ণমেণ্ট যেমন সুবৃহৎ দেশ শাসন করেন, কতকগুলি স্নায়ুকোষের ( nerve cell) ) সমষ্টি মস্তিষ্ক তেমনি মানবদেহের সমস্ত কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে।




মস্তিষ্ক কোথায় থাকে দেখান হইল।

কিন্তু মস্তিষ্কে উদ্ভূত এই উত্তেজনা শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছিবার জন্য শরীরের প্রত্যেক অংশের সহিত মস্তিষ্কের একটি সংযোগ তো থাকা চাই।

স্নায়ু

শরীর মধ্যস্থ অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলিই শরীরের বিভিন্ন অংশের সহিত মস্তিষ্কের এই সংযোগ সাধন করিতেছে। ধরিতে গেলে, মানবদেহের এই স্নায়ুগুলি যেন মানবদেহের টেলিগ্রাফের তার। শিমলার পাহাড়ের উপর অথবা দিল্লীর রাজদরবারে বসিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট, যে মতলব আঁটিলেন, তাহা যেমন তাঁহারা টেলিগ্রাফের তারের মধ্য দিয়া সারা ভারতের অধস্তন রাজকর্ম্মচারীদের গোচর করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য নিয়ন্ত্রিত করেন ; তেমনি মানবের মস্তিষ্কে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাহা অমনি তাহার স্নায়ুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মানবদেহের প্রতি নিভৃত ক্ষুদ্র অংশটুকুতে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়, এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে।

( আগামীবারে সমাপ্য )



# সমানে-সমানে






মস্ত রাজা—যেমনি তাঁর প্রকাণ্ড রাজ্য তেমনি তাঁর অগাধ টাকা। ধনদৌলত হাতী ঘোড়া লোক লস্কর, রাজ্য তাঁর সদাই 'গম্‌গম' করে। কিন্তু তাহলে কি হবে! রাজার মনে শান্তি নেই—তাঁর অম্লশূলের ব্যায়রাম।

কত বদ্যি হাকিম, রকম রকম ওষুধ নিয়ে এল, গেল—রাজার ব্যায়রাম তবু আরাম হ'লোনা।

শেষে—একদিন, যখন রাজা পাত্র মিত্র নিয়ে সভা সাজিয়ে বসেছেন, সেই সময় এক সন্ন্যাসী রাজার সভায় এসে চুপিচুপি রাজার কাণে কাণে বল্লে-মহারাজ, আপনার অসুখ ভাল হ'য়ে যেতে পারে—যদি আপনি অন্য কোন মাছ না খেয়ে, ভাতের সঙ্গে রোজ একটী ক'রে মাত্র কুচো মাছ খান।" সন্ন্যাসী ত ওষুধ বলে দিয়ে চলে গেল। রাজাও সেদিনকার মতো সভাভঙ্গ ক'রে বাড়ী গেলেন।

বাড়ী গিয়ে আরদালিকে ডেকে চুপি চুপি বলে দিলেন "কাল থেকে তাঁর ভাতের সঙ্গে যেন অন্য কোন মাছ না দেওয়া হয়—শুধু একটী ক'রে কুচো-মাছ যেন তাঁর পাতে থাকে।"—আরদালি 'যো-হুকুম' বলে কুর্ণিশ ক'রে চলে যাচ্ছিল—কিন্তু রাজা আবার তাকে ডেকে বলে দিলেন "কিন্তু খবরদার! খুব

সাবধান—যেন একথা কেউ না টের পায়। তা'হলে মাথাটী আর ঘাড়ের ওপর থাকবে না বাপু, একথাটী যেন মনে থাকে।"

রাজার ভয়, কুচো মাচ খান রাজা, এ কথা শুন্‌লে রাজ্যের নিন্দে কুঁড়ে লোক যত সব নিন্দে করবে।

আরদালি সম্মতি জানিয়ে চোলে গেল।

তারপর দিন থেকেই রাজার একটী করে কুচোমাছের ব্যবস্থা হ'লো। রাজ্যের কেউ সে কথা টের পেলেনা।

আরদালি বেচারা মনে মনে ভারী অসন্তুষ্ট। সব রান্নার পরে—একটী কোরে কুচোমাছ রাঁধতে তার মোটেই ভাল লাগেনা। তাই জন্যে সে বাজার থেকে একখানা মাটির সরা কিনে এনে তাইতে কোরে সেই কুচোমাছটা ভেজে রান্নাঘরের এক কোণে ফেলে রাখে। রাজা খেতে বস্‌লে চুপি চুপি তাঁর পাতে দিয়ে আসে। এই রকম ভাবে আরদালির রান্না আর রাজার মাছ খাওয়া চল্‌ছিল।

সন্ন্যাসীর কথামত রাজার অসুখও অনেকটা সেরে এসেছিল। কিন্তু একদিন, হঠাৎ হয়েছে কি! কি একটা কাজে আরদালি বেচারা রান্নাঘর থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেছে—রাজার মাছের সরাখানি চাপা দিতে ভুলে গেছে। এমন সময় একটা বেড়ালের বাচ্ছা রান্নাঘরে ঢুকেছে, ঢুকেই সামনে কুচোমাছটীকে দেখে তার সদ্ব্যবহারে মন সংযোগ করে দিয়েছে। আরদালি ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড! মার! মার! মার! মার্‌তে মার্‌তে বেড়াল বাচ্চাকে ত' রান্নাঘর থেকে 'যমের ঘর' পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। এসে দেখে, হায়! হায়! অমন সরাখানি ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। কি আর হবে।

বাচ্ছাবেড়াল বলে মাছের সবটা অত শিগ্‌গীর খেতে পারেনি—মোটে মুড়োটী খেয়েছে, ল্যাজার দিক্‌টা প্রায় সবই আছে।

এত বেলায় বাজারে এখন যে আর মাছ পাওয়া যাবে না, আরদালি সেটা খুব ভাল রকমই জানত। যাইহোক কুচোমাছ রাজাকে যে কোন রকমেই হোক খাওয়াতে হবে নইলে ঘাড়ে মাথা থাকে কি না সন্দেহ।

বেচারী মহাভাবনায় পড়ে গেছে। যে খাম-খেয়ালী রাজা—এখুনি হয়ত সভা ভঙ্গ ক'রে এসে ভাত চাইবেন। আর ভাতে মাছ না পেলেই কি হুকুম করে বস্‌বেন—তারই বা ঠিক কি!—

যাই হোক খবরটা একটু জানিয়ে রাখতে পাল্লে—শাস্তিটা হয়ত একটু কম হ'তে পারে, বা নাও হ'তে পারে, মনে ক'রে আরদালি বেচারা চুপিচুপি শুক্‌নো মুখে রাজা যেখানে সভা সাজিয়ে বসেছেন সেইখানে এসে হাজির হ'লো।

জম্‌জম্ কচ্ছে সভা—কত লোকজন সেখানে বসে রয়েছে, দেখেই ত আরদালির উভয় সঙ্কট উপস্থিত। এত লোকের সামনেই বা সে কি ক'রে রাজার কুচোমাছের কথার উল্লেখ ক'রে—তা হ'লেইত মাথাটী থাকে না ধড়ে! না বল্লেও অবশ্য তাই-ই।

বেচারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে। এমন সময় রাজা একটু বিরক্ত হ'য়ে তার দিকে চেয়ে বল্লেন—"কি ব্যাপার আরদালি! এমন অসময়ে এখানে কেন?"

বেচারা ভাবছিল—"কি বলে, কি বলে"। এমন সময় তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আঁজ্ঞে—মহারাজ! কুচ্‌বিহার ত লুঠ্ গিয়া"—

সভাশুদ্ধ সবাই অবাক! সবাই ভাব্‌ছিল কি বুঝি একটা দুঃসম্বাদ এসে হাজির হয়েছে। তাই তারা একবার আরদালির মুখের দিকে আর একবার রাজার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছিল।

রাজা ভাবছিলেন—"তাইত! কুচ্‌বিহার ত তাঁর রাজ্য নয়—তবে কি কুচোমাছটী—কোন রকমে নষ্ট হয়ে গেছে—। আচ্ছা অন্য উপায়ে জিজ্ঞেস ক'রে দেখা যাক্"। তাই জিজ্ঞেস কল্লেন—"কোন্ লুঠা"?

"মহারাজ—বিল্লিকা বাদ্‌ছা—

সবাই মনে কল্লে দিল্লির মত 'বিল্লি'ও বুঝি একটা সহর আছে। আর সেই সহরের বাদসাই বুঝি কুচ্‌বিহার জয় করে নিলে। রাজা ঠিক বুঝ্‌লেন—'নিশ্চয়ই বেরালের বাচ্ছা'—। তিনি জানতেন তাঁর মাছ সরা ঢাকা থাকে—তাই জিজ্ঞেস্ কল্লেন—"সরামুদ্দিন্ কাঁহা গিয়া—?"

সবাই মনে কল্লে—"সরামুদ্দিন্ বুঝি সেনাপতি"। কিন্তু আরদালি বুঝলে রাজা সরার কথা জিজ্ঞেস কচ্ছেন, তাই বল্লে—"ওহি ভি যুধমে মর্‌গেল্।"

রাজা বুঝলেন, সরা ভেঙ্গে গেছে। অন্য সবাই বুঝলে—সরামুদ্দিন নামক সেনাপতি হত।

রাজা আবার জিজ্ঞেস্ কল্লেন—"তব্ আউর কোন্ হ্যায়—?"

সবাই মনে কল্লে—রাজা বুঝি জিজ্ঞেস কচ্ছেন সেনাপতি হবার উপযুক্ত আর কে আছে, কিন্তু আরদালি বুঝ্‌লে রাজা জিজ্ঞেস কচ্ছেন "আর কি মাছ আছে ?" তাই বল্লে—"ন্যাজামুদ্দিম্ হ্যায়—মহারাজ"।

সবাই মনে কল্লে নিজাম্‌উদ্দীন্‌ই বুঝি এবার সেনাপতি হবে। রাজা বুঝলেন, মাছের ন্যাজার দিক্‌টা আছে। তাই বল্লেন—"ব্যাস্ ! ওহিমে বহুৎ হোযাগা—"

আরদালি সেলাম ঠুকে হাঁপ ছেড়ে চলে গেল।

সভাসদেরা একটা ভারী যুদ্ধের কল্পনা ক'রে রাজাকে আর কিছু জিজ্ঞেস্ না ক'রে বিমর্ষ মুখে একে একে সভাভঙ্গ ক'রে চলে গেল। রাজাও বাড়ী এলেন। এসেই নিজের গলার মোতির হার খুলে আরদালির গলায় পরিয়ে দিয়ে বল্লেন—"এই তোমার বুদ্ধির পুরস্কার"।

আরদালিও রাজার পায়ের তলায় হাঁটুগেড়ে বসে বল্লে—"আপনার মত বুদ্ধিমান বিবেচক রাজার নফর বলে পরিচয় দিতেও গর্ব্ব হয়।—

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত।

# অদ্ভুত ঘোটক।






একদিন একটা লোক পিঠে এক বোঝা কাচ নিয়ে একটা নির্জ্জন পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গ্রীষ্মকাল; রোদে কাট্ ফাট্‌ছে—লোকটা ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েচে—প্রতি মুহূর্ত্তে ভারে নুয়ে নুয়ে পড়চে—তার সর্ব্ব শরীর দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরচে, হঠাৎ লোকটা আপনা আপনি বল্লে—"একটুকু ছায়া পেলে বসে' বাচি!"

আমরা অনেকদিনের কথা বলচি। তখনকার দিনে এদেশে পরীর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল।—পথে ঘাটে মাঠে—যেখানে সেখানে তারা ঘুরে বেড়াত। তারা সচরাচর—লোকের ভালই কর্‌ত—সময়ে সময়ে লোক বিশেষের মন্দ কবতেও ছাড়ত না। নূতন সভ্যতা আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েচে। যা হক, ঐ পাহাড়ের গুহায় এক পরী বাস করত। সে ঐ লোকটার কথা শুনে খানিক দূরে—রাস্তার ধারে একটা গাছের তলায় একটা উঁচু ঢিপি হয়ে পড়ে' রইল। পরী ইচ্ছা কর্‌লেই যখন যা' মনে কর্‌ত তাই হ'তে পার্‌ত। সে ক্ষমতা তাদের ছিল। লোকটা একটু এগিয়ে গিয়েই সেই ঢিপিটা দেখতে পেলো এবং খুব আনন্দিত হ'য়ে তার উপর থপ ক'রে ব'সে পড়ল।

কিন্তু একি ? তার যেমনি বসা, অমনি ঢিপি স'রে যাওয়া। বেচারিও উল্টে পড়ে গেল আর সে সঙ্গে তার কাচ গুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সেও একেবারে অবাক। সে ধারণার মধ্যেই আন্‌তে পার্‌ল না কেমন করে কি হয়ে গেল। কিন্তু উপায় কি ? সে তখন বিষণ্ণ মুখে বাড়ীর দিকে যেতে লাগল। খানিক দূর না যেতে যেতেই একজন লোকের সঙ্গে দেখা। আগন্তুক তাকে দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা করল "কি ভাই তোমার মুখটী অমন শুকিয়ে গেছে কেন, তোমার কি হয়েচে বল দেখি ?"

সে তখন তার দুঃখের কথা সমস্ত খুলে বল্ল। আগন্তুক শুনে বলল "আমিই সে পরী—ঐ পাহাড়ের গুহায় আমার বাস। আমিই ঢিপি হ'য়ে তোমার সঙ্গে একটুকু কৌতুক করেছিলাম। যা হ'ক এখন তুমি যদি একটা কাজ কর্‌তে পার তাহ'লে তোমার আর কোন দুঃখের কারণ থাক্‌বে না"।

তাতে লোকটা রাজী হলো।

পরী তখন বলতে লাগল "আমি ঘোড়া হই, আর তুমি আমাকে বাজারে বেচে এস—তুমি খুব বেশী দামে বেচতে পারবেখ'ন। টাকা নিয়েই একেবারে সটাং বাড়ী। বুঝলে ?"

চোখের পাতা না ফেলতে ফেলতে লোকটা দেখতে পেলো তার সাম্‌নে একটী সুন্দর ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। সে তখন সেটাকে বাজারে বেচতে নিয়ে গেল।

এখন এক বেণের ছেলে বাজারে ঘোড়া কিন্‌তে আসছিল। সে ঘোড়াটাকে দেখে তার খুব পছন্দ হয়ে গেল এবং অনেক টাকা দিয়ে সে তাকে কেনে নিল।

বেণের ছেলেত ঘোড়াকে বাড়ী নিয়ে এল। যে দেখল সেই ঘোড়ার খুব প্রশংসা কর্‌তে লাগল। তাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে রাখা হলো। খানিকক্ষণ পরে সহিস যখন তাকে দানা দিতে গেল তখন ঘোড়া মানুষের মতন কথা ক'য়ে

বল্‌তে লাগল—"আমি অমন দানা খাই না—আমি খাই মাছ মাংস ক্ষীর দই ছানা দুধ।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই না শুনে সহিস একেবারে অবাক। সে ত বাপের জন্মে অমন ঘোড়া কখনো দেখেনি! সে তখন ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে মুনিবকে সমস্ত কথা বল্‌ল। মুনিব ত আগে বিশ্বাস করতেই চায়নি, শেষে বল্‌ল "আচ্ছা চল্‌ দেখিগে"।

তখন তারা উভয়ে আস্তাবলে এসে দেখল—ঘোড়া নাই। একি? ঘোড়া গেল কোথা? মুনিব ভাবল—এ নিশ্চয়ই সহিস বেটার কার্‌সাজী। যা হ'ক অনেক অনুসন্ধানের ফলেও ঘোড়া আর পাওয়া গেল না।

জরিমানা ও হুকুমের দায়ে সহিস বেচারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো আর কি!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ।



# পায়ের কথা

দেশ ও জাতি হিসাবে মুখের চেহারাই সাধারণতঃ আলাদা হয়, গোটা কতক দেশের পায়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ গড়নের কথা বলি, শোন।

ফরাসীদের পা সরু ও লম্বা। স্পেনিসদের পা ছোট ও বক্র। আরবের পা যে উচ্চ ও বক্রাকার সে কথা প্রবাদের মত সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

কোরআন্ শরীফে লিখিত আছে যে, একজন খাঁটি আরবের পায়ের তলা দিয়ে একটি জলস্রোত আনায়াসে চলে যেতে পারে, তাতে তার পায়ে এতটুকু জল লাগবে না।

স্কচদের পা উঁচু ও পুরু, আইরীশদের পা পাঞ্জায় বড় ও চেপ্টা ও চতুষ্কোণ। ইংরেজদের পা খাট ও মাংস বহুল।

এথেন্স যখন সভ্যতায় তাব উচ্চতম স্থানে উঠেছিল সেই সময় গ্রাসদের পা ছিল পূর্ণ সৌষ্ঠব সম্পন্ন এবং মানুষের পা যেরূপ হলে তার সৌন্দর্য্য বাড়ে, ঠিক সেই আদবের পা গ্রীকদের সৌন্দর্য্য বাড়িয়েছিল।

সুইচ, নরওয়েজিয়ান ও জার্ম্মাণদের পা সব চাইতে দীর্ঘতম। আমেরিকানদের সব চাইতে খাট। রাশিয়ানদের পায়ের গোড়ালি উঁচু আর তাতারদের গোড়ালিও একই প্রকার।

---

# "আমার দেশ" সেবা-ভাণ্ডার।

আমরা যখন এই সেবা-ভাণ্ডারটি খুলিয়াছিলাম তখন আশা করিয়াছিলাম যে আমার দেশের কোমলহৃদয় সুকুমারমতি বালক ও বালিকা পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক গ্রাহিকার নিকট হইতে বিশেষরূপে অনুমোদন পাইব। প্রথম প্রথম আমাদের আশা বিফল হয় নাই, বেশ সাফল্যই লাভ করিতে দেখা গিয়াছিল। অর্দ্ধ বঙ্গের অধিবাসী, দুঃস্থ, ভাগ্য-প্রপীড়িত গৃহহারা অভাগাদের জন্য "আমার দেশে"র তরুণ বয়স্কদের কোমল প্রাণগুলি কাঁদিয়া উঠিবে, তাহারা সাধ্যমত অর্থ সাহায্য পাঠাইয়া অভাগাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের কথঞ্চিত সাহায্যও করিতে পারিবে, এই ছিল আমাদের আশা। ভরসা করিয়াছিলাম, দু এক মাসের মধ্যেই অন্ততঃ একশটি টাকাও "আমার দেশের" পাঠক-পাঠিকা গ্রাহক-গ্রাহিকার নামে আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব। একশ টাকা অতি ক্ষুদ্র দান বটে কিন্তু এই রকম ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দানের সমষ্টি ত ক্ষুদ্র হইবে না। তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর বঙ্গের বন্যা পীড়িতদিগের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে তুলনায় আমাদের একশ টাকা ত অতি সামান্য। কিন্তু কথা ত তা নয়। কথা এই যে, এই সূত্রে "আমার দেশের" প্রিয় বালক-বালকাগণ যে দেশ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, দেশবাসীর দুর্দ্দিনে যে তাঁহাদের করুণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছে—ইহাই আচার্য্যদেব প্রফুল্লচন্দ্র জানিতে পারিতেন; প্রফুল্লচন্দ্রের প্রমুখাত তোমাদের কথা কত মহাপ্রাণ দেশসেবকের মুখে মুখে ফিরিত—তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা জানি, তোমরা আরও নানাপ্রকারে বন্যাপ্রপীড়িতদিগের সাহায্য করিয়াছ, তোমাদের পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন হয় ত অনেক দান, করিয়াছেন—

কিন্তু "আমার দেশের" প্রতিও তোমার ত একটা কর্ত্তব্য আছে। তোমরা ত পিতামাতার সাহায্য না লইয়াও সাহায্য করিতে পার। তোমরা ত আরও কিছু কিছু খরচ কর, তোমার ত দু' একটা বাজে খরচ-ও আছে, তাহা কমাইয়া কি দেশের কাজে ব্যয় করিতে পার না? তোমার হয়ত একটু অসুবিধা, একটু কষ্ট হইবে কিন্তু ভাবিয়া দেখ তোমার সেই ক্ষুদ্র কষ্টটুকুর বিনিময়ে সেই অভাগারা কতখানি সুখ পাইবে! হয়ত পাঁচটি নিরন্ন ব্যক্তি অন্ন পাইবে, হয়ত বস্ত্রহীন কোন অভাগা লজ্জা নিবারণ করিতে পারিবে! কোনটা বড় ভাই? তোমার ক্ষুদ্র কষ্ট, না ইহাদের অনন্ত আনন্দ—বল ত বোন্—কোনটি তুমি চাও?

তোমাদের আশায় রহিলাম। আজ পর্য্যন্ত......টাকা হইয়াছে, বাকী টাকাটা পাইতে বিলম্ব হইবে না, এই ভরসা।

উত্তর বঙ্গের বন্যা প্রপীড়িত দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ "আমার দেশ সেবা ভাণ্ডারে" নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতে আরও পাইব, আশা আছে।

পূর্ব্বের প্রাপ্ত :—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কুমারী সুষুমা নাগ | ২৲ |
| ২। | শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র | ৫৲ |
| ৩। | শ্রীমান অর্ণবকুমার বসু | ১৲ |
| ৪। | কুমারী মীনা সেন | ২৲ |
| ৫। | কুমারী কল্যাণকলিকা দত্ত (বক্সু) পাটনা | ১৲ |
| ৬। | কুমারী আশামুকুল দত্ত (গ্রাহিকা) পাটনা | ১৲ |

পরপৃষ্ঠা দেখ ··· ১২৲

জের ... ১২৲

৭। কুমারী মুকুলরাণী দাস ( গ্রাহিকা ) ১৲
মজঃফরপুর।

৮। শ্রীমান বিভূতি ভূষণ মিত্র ( গ্রাহক ) ২৲
বর্দ্ধমান

৯। শ্রীমান স্বকুমার মিত্র—যশোহর ( গ্রাহক ) ১৲

১০। শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার ( গ্রাহক ) ১৲
রাজনগর

১১। কুমারি আভারাণী মজুমদার ( গ্রাহিকা ) ১৲

১২। কুমারি বেলারাণী বস্থ ( বন্ধু ) ১৲

১৩। শ্রীমান কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥০

১৪। শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী ( গ্রাহিকা ) ৫৲

১৫। শ্রীমান স্বকুমার মিত্র ( গ্রাহক ) ৪৲
( বেনারস সিটি )

এই মাসে প্রাপ্ত :—

১। কুমারী হিমাংশুবালা দে ( গ্রাহিকা ) ১৲
„ স্বধাংশুবালা দে ( বন্ধু ) ১৲
„ শীতাংশুবালা দে ( বন্ধু ) ১৲
শ্রীমান্ স্বশীলচন্দ্র দে ( বন্ধু ) ১৲
„ স্বধীরচন্দ্র দে ( „ ) ১৲
( মীরাট ক্যান্টন্‌মেণ্ট )

২। শ্রীসীতালাল ( গ্রাহক ) ৫৲
বিষণপুর, ( সীতামারি )

৩। শ্রীমতী শশিবালা সরকার ২৲
( গ্রাহিকা ) গম্ভীরা, মালদহ

মোট ৪০৸৶

# শোনা গল্প।

এডিসনের নাম শুনেছ ? যিনি ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার করেছিলেন। একটি গল্প শোন। একবার একটা মহিলা-দালাল এডিসনের আফিসে একসেট বই বিক্রী করতে ঢুকেছে। সে অবশ্য জান্‌ত না যে এই লোকটি ফোনোগ্রাফের আবিষ্কর্ত্তা। মহিলাটি বইখানির খুব সুখ্যাতি করে, এমনি মস্ত বড় বড় বক্তৃতা করতে লাগলেন যে এডিসন সাহেব বইটি না নিয়ে আর পারলেন না। সহি টহি করে, এডিসন জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা তুমি যে এই এতক্ষণ ধরে এত বড় বক্তৃতা দিলে, অত তোমরা পারো কি করে বল ত ? মহিলাটি হেসে বল্লে—ও মশাই, ফোনোগ্রাফ জানেন ত, তারই সাহায্যে আমাদের আফিসে এই সব বুলি মুখস্থ করিয়ে দেয় !——মেয়েটি একটু হেসে বেরিয়ে গেল, এডিসনও একটু হাসলেন, ভাবটা, ফনোগ্রাফ আর জানি না ?

* * * *

আর্ল উইণ্টারটন যিনি আমাদের ভারত সচিব গো (Secretary of State) নিজের সম্বন্ধেই একটি গল্প বলেছেন। সে'টি হচ্ছে এই, Earl of Winterton হবার আগে তাঁর খেতাব ছিল Lord Turnour। এই নামেই তিনি হাউসে খুব গণ্ডগোল করতেন, অর্থাৎ খুব বক্তৃতা আদি দিতেন, কাজ করতেন। তার পর তাঁর পিতার মৃত্যুর পর যখন তিনি Earl হলেন তখন একদিন এক ভোজের সভায় আর এক ব্যক্তি তাঁকে বল্‌লে, দেখ, তোমায় আমি চেন চেন করছি কিন্তু ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনে। তোমার নামটি কি বল ত ? "Earl of Winterton

আমার নাম।" শুনে লোকটা বল্‌লে—ভাল! আমি ভেবেছিলুম সেই গাধা Lord Turnourটা! তা নয় ত—বাঁচা গেল!

* * * *

Lord Inchcape যিনি কলকাতায় এলেন, ভারত গবর্ণমেণ্টের খরচ কমানো তদন্ত কমিটীর সভাপতি হয়ে। Lord Inchcape কলকাতার ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা,—তাঁরই সম্বন্ধে একটি গল্প বলি শোন। ইঞ্চকেপ জাহাজে ক'রে আস্‌ছেন। একটা হ্যালাক্ষেপা নাবিক গোছের লোক একদিন তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে ম'শায়ের কি করা হয়?

এখন ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি আফিসটি হ'চ্ছে জাহাজের আফিস, নাম হচ্ছে Peninsular and Oriental Navigation Co, লোক বলে P & O. Co. সাদা কথায় পি-এন্ ও কোম্পানী। ইঞ্চকেপও সেই মতই বল্‌লেন—আমি পি, এন্, ও কোম্পানীর চেয়ারম্যান!

লোকটা বল্‌লে—তাহলে নিশ্চয়ই আপনি খুব ভালো পিয়ানো বাজাতে পারেন! বেশ—বেশ!

তার ধারণা পি-এন্-ও কোম্পানীর চেয়ারম্যান, কাজেই উত্তম বাদক।



# পাদ্রী মহাশয়ের পক্ষাঘাত।

কোন জ্যোতিষী একবার এক পাদ্রী মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিল, বৃদ্ধ বয়সে পাদ্রী মহাশয়ের পক্ষাঘাত হইবে। পাদ্রী মহাশয় দিন রাত সন্ত্রস্থ থাকেন—কখন্ কি হয়, কখন্ কি হয়! বৃদ্ধ হইয়াছেন, সদাই ভয়ে ভয়ে থাকেন।

একদিন এক মহা ভোজসভা বসিয়াছে, পাদ্রী মহাশয় দেশের সম্ভ্রান্ত নর-নারীর সহিত আহারে বসিয়াছেন। হঠাৎ পাদ্রী মহাশয়ের মনে হইল, আমি ত বসিয়া বসিয়া খাইয়া চলিয়াছি, ওদিকে ত মন দিই নাই, এ সময়ে যদি কিছু হইয়া যায়—যেমন মনে পড়া, অমনি পাদ্রী মহাশয় বাম হস্তটি টেবিলের নীচে চালান করিয়া ক্রমাগত চিমটি কাটিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ চিমটি কাটিয়াও যখন পায়ে কোন অনুভূতিই পাইলেন না, তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—হইয়াছে, হইয়াছে! যাহা ভয় করিতেছিলাম, তাহাই হইল!

তখনও আহারাদি চলিতেছিল, পাদ্রী মহাশয়কে এমন ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিতে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেলেন, বলিলেন—কি মহাশয়, কি হইল? কি হইল?

পাদ্রী মহাশয় দুঃখের সহিত বলিতে লাগিলেন—মহাশয়! আমার পায়ে পক্ষাঘাত হইল! আধ ঘণ্টা ধরিয়া চিমটি কাটিলাম তা একটু টেরও পাওয়া গেল না। হায় হায়, যা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। পা'টা সব অসাড় হইয়া গিয়াছে, চিমটি কাটিতেছি কিন্তু টের পাইতেছি না।

পাদ্রী মহাশয়ের পার্শ্বে একটি ভদ্র ঘরের মহিলা বসিয়াছিলেন, তিনিই বলিয়া উঠিলেন—দোহাই মহাশয়, আপনি আমার পায়েই চিমটি কাটিয়াছেন। আপনি টের পান আর নাই পান, আমি খুব টের পাইয়াছি।

---

# জানাজানি।

এখন হইতে প্রতিমাসে নিয়মিত এই বিভাগটি "আমার দেশে" বাহির হইবে। আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ যে সকল প্রশ্ন করিবেন, এই বিভাগে তাহা ছাপা হইবে এবং যাঁহারা উত্তর দিবেন, তাঁহাদের নাম সহ উত্তর ও মুদ্রিত হইবে। তিন মাসের মধ্যে যদি কোন প্রশ্নের উত্তর গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগের নিকট হইতে না পাওয়া যায় তবে আমরাই তাহার উত্তর দিয়া দিব।

আশা করি "জানাজানি" বিভাগটি তোমাদের অনেক কাজে লাগিবে; তোমরা অনেক জিনিষ জানাইবে ও জানিতে পারিবে।

**প্রশ্ন ঃ**

১। আনারস কি এ দেশের ফল ?

২। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে বেশী আম্র উৎপন্ন হয় ? তাহাদের নাম কি ?

৩। পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতির পরমায়ু সবচেয়ে বেশী, এবং কত বেশী ?

৪। বাংলা দেশে বাংলা খবরের কাগজের আবির্ভাব কোন্ সালে এবং কাহার দ্বারা হয় ?

৫। "বেদের" কোন নির্দ্দিষ্ট লেখক আছে কি ? যদি থাকে তাহার নাম কি ?

৬। বাংলা দেশে বাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত—কি কি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এবং কি কি নূতন হইয়াছে ?

শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

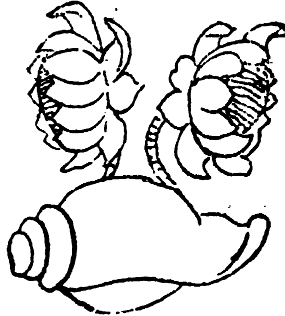
## সৎক্ষেত্রের গুণ।

( সংস্কৃত )

সুক্ষেত্রে রোপিত বীজে
লভে বহু শস্য ফল
কৃষক বর্ব্বর
শস্য, ক্ষেত্র গুণায়ত্ত,
বপ্তার গুণের পরে
করে না নির্ভর।

শ্রীকালিদাস রায়।

---



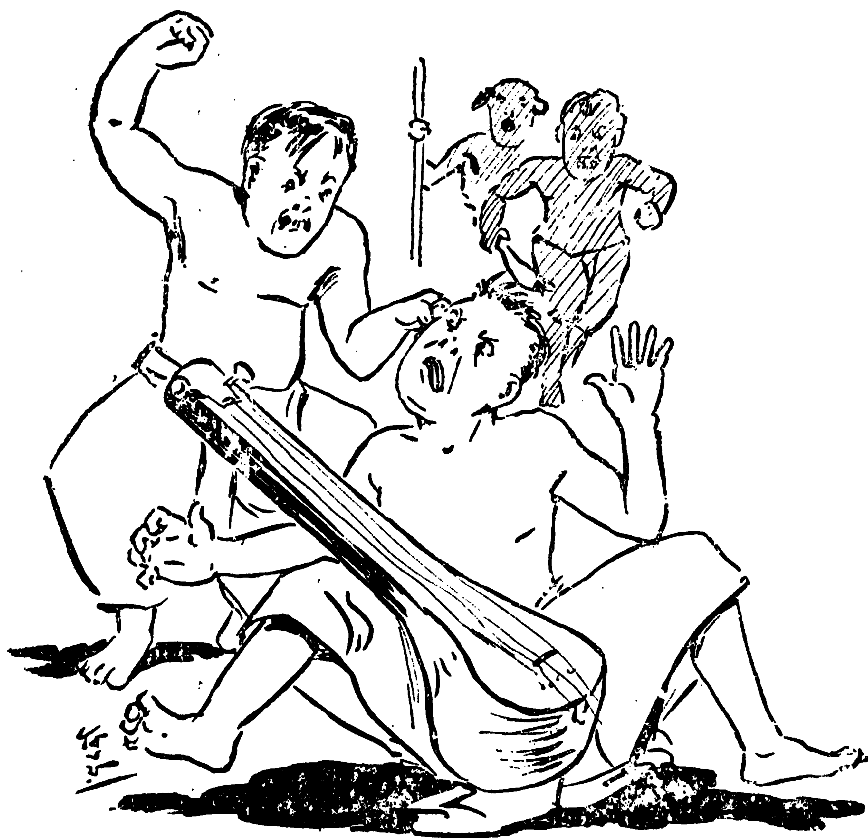


# সা ————

জোতো সিঙ্গীর গান শেখবার ভারি সখ।   ছাদের ওপর বসে সিঙ্গী সিংহ গর্জ্জন করছে।



পাড়ার লোক অতিষ্ঠ, জোতো সিঙ্গীর সে খেয়ালও নেই।  এমনি রে রে করছে, আশে-পাশের বাড়ীর ঘুমন্ত ছেলে-পিলে আঁতকে উঠছে।



খুব তন্ময় হ'য়ে গাঁ গাঁ করছে, পাড়ার লোক এসে যা করলে—ঐ দেখ! গা বেরিয়ে গেল!

# নির্ব্বাচন

রাজা এবে বৃদ্ধ অতি, হয়েছে মন্থর গতি,
বাহুতে নাহি আর শকতি।
নয়নে সে জ্যাতি নাই, দশনের সে পাঁতি নাই,
কুন্তলের শণে পরিণতি।
জীবনের খেলা কবে, সহসা সমাপ্ত হবে,
দুখে রাজা ভাবে মনে মনে।
কে বসিবে মোর স্থানে, আলো করি সিংহাসনে,
যা'ব যবে শমন-সদনে?
পুরু জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁ'র, তা'র বড় অহঙ্কার,
চলচিত্ত তা'য় দুরমতি।
তুরু মধ্যম তনয়, হিয়া তা'র লোভময়,
ভাবনা-ব্যাকুল নরপতি।
কনিষ্ঠেরে বাসি ভাল, নির্ব্বাচন হ'ল কাল,
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কাশীপতি।
কা'কে রেখে কা'কে দেই, ভাবিয়া না পাই খেই,
স্থির নাহি হয় মম মতি।
ডাকালেন মন্ত্রিগণে, পাত্রমিত্র সভাজনে,
শাসনে যাঁরা তাঁর সহায়।
ডাকালেন পুত্রগণে, সম্বোধিয়া মন্ত্রীজনে,
ধীরে ধীরে কন নররায়—

“হের মোর পুত্রগণে, স্থিত তব সন্নিধানে,
শ্রেষ্ঠ যাচি কর নির্ব্বাচন।
সেই কাশীরাজ হবে, মুদিব নয়ন যবে,
শুন পাত্র অমাত্য ব্রাহ্মণ।”
“দেহ অনুমতি জ্ঞানী, একে একে ডাকি আনি,
সম্ভাষি তব তনয়গণে।
অলঙ্কতে সিংহাসন, শ্রেষ্ঠ হবে কোন জন,
পারিব কহিতে লয় মনে।”
নীরবিল মন্ত্রিগণ, সম্মতি দিল রাজন্,
এল আগে প্রথম নন্দন।
স্বভাবে রুক্ষ যেমন, উচ্ছৃঙ্খল সে তেমন,
গোঁয়ার গোবিন্দ আজীবন।
বুড়া এক মন্ত্রীবর, মৌন ভাঙি, কহে দড়,
“কহ যুবরাজ, কহ শুনি,
পক্ষীরূপ হে ধরিতে, যদি গো তুমি পারিতে,
কোন্ পাখী হতে তুমি, গুণী?”
“ইচ্ছিতাম হতে বাজ”, উত্তরিল যুবরাজ,
“তাড়িব মারিব সারাদিন।
অন্তরীক্ষে হব আমি, সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী,
শিকার হবে যত উড্ডীন।”
এল তুরু তার পর, সুধালেন মন্ত্রীবর,
“কোন্ পাখী বাঞ্ছ হতে তুমি?”

ঈগল হব ত আমি, নহে আর কোন পাখী,
রবে সবে মম পদ চুমি ?
কার ঘাড়ে দুটো মাথা, ঠেলিবে সে মোর কথা,
সবাকার রাজা হব আমি।
রবি ভারি ঊর্দ্ধে আছে, উড়ে যাব ওরি কাছে,
দিনমান শাসিব—সে আমি।”
এল তবে হেলে দুলে, রাজার সে ছোট ছেলে,
ঐ কথা তারে হল সুধান।
কহিল সে অল্প হাসি, “ঘুঘু হতে ভালবাসি,
কে এমন নিষ্পাপে ডুবান ?
গলাটী মিষ্ট যেমন, শান্ত স্বভাব তেমন,
যেথা যাবে হর্ষ বহে আনে।
কাহারও মন্দে নাই, সবে ভালবাসে তাই,
ঐ পাখী হওয়া মোর সানে।”
তবে মন্ত্রিগণ আসি, কহে রাজারে সম্ভাষি,
“বাছি, দেব, তৃতীয় তনয়।
রাজা হবার যোগ্য এ, শ্রেষ্ঠ সবাকার চেয়ে,
হারু—রাজোচিত গুণময়।
দয়া মায়া ভালবাসা, প্রজা নৃপে করে আশা,
সে সব বর্ত্তমান ইহায়।
প্রজারে দলিবে না সে, শাসি পুত্র নির্ব্বিশেষে,
তব নাম রাখিবে বজায়।”

শ্রীধানি লঙ্কা।

# খবরাখবর

প্রদর্শনী। কলিকাতা ভবানীপুর পোড়া বাজারের মাঠে নিখিল ভারত প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কত ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্প সম্ভার, কত রকম বেরকমের জিনিষ সেখানে জড় করা হইয়াছিল। কত আশ্চর্য্য জিনিষ আসিয়াছিল, কত দোকান-পাট বসিয়াছিল, কত বায়স্কোপ-সার্কাসের আয়োজন হইয়াছিল। কত লোক যে দেখিতে আসিত তাহার ঠিক নাই। কত ছেলে-মেয়ে বাপ-মা বা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মেলা দেখিতে আসিয়া নাগরদোলায় চড়িয়া দোল খাইয়া, কত জিনিষ কিনিয়া হাসিমুখে ফিরিতেছিল। হঠাৎ গত ২রা জানুয়ারী মঙ্গলবার বিকালে কি-রকমে আগুণ ধরিয়া অর্দ্ধেকের উপর প্রদর্শনী পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ যে পুড়িয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই। দমকল আসিল, কত চেষ্টা হইল কিন্তু অগ্নিদেব অল্পক্ষণের মধ্যেই আপন কর্ম্ম শেষ করিয়া দিলেন।

---

শিংওলা মনুষ্য। আফ্রিকা দেশ হইতে একটি শিংওলা মনুষ্য আনিয়া প্রদর্শনীর মধ্যে একটা তাঁবু খাটাইয়া তন্মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। লোকে তাঁবুর দ্বারে ১৲টি টাকা দর্শনী দিয়া শিংওলা মনুষ্যটিকে দেখিয়া আসিত। গরু ভেড়া, ছাগল, হরিণেরই শিং বাহির হয়—মানুষের শিং একটা অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ বটে। শুনিতেছি প্রদর্শনী আবার খুলিতেছে। এবার যদি তোমরা সুবিধা পাও শিংওলা এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিয়া আসিও।

---

ফরাসী দেশের পিয়ারী সিমন ডিউলাক নামে একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ফরাসী-দেশে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়া নব্বই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

এই টাকা তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগ হইতে যে সুদ আসিবে তিনটি বিভিন্ন কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

১। ধর্ম্ম মন্দির নির্ম্মাণ।

২। বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন সন্তানদের আশ্রয় দান।

৩। অবসরপ্রাপ্ত পুলিস, চৌকীদার, সৈনিকদের ভাতা-প্রদান।

প্রতি অংশে যে ত্রিশ লক্ষ টাকা আছে তাহার সুদ হইতে ৬ হাজার টাকা প্রতি বৎসর আসলে পরিগণিত হইবে।

এমনি করিয়া এই টাকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপই দাতার আদেশ ছিল।

কতদিন যে এইরূপে টাকা বাড়িয়া চলিবে সে সম্বন্ধে দাতা কিছু বলিয়া যান নাই। কাজেই সুদের সুদ, তস্য সুদ, তস্য তস্য সুদ অমনি করিয়াই বাড়িয়া চলিয়াছে। ১০ হাজার বৎসর যদি এমন ভাবে চলে তবে টাকাটা কি প্রকাণ্ড অঙ্কেই না আসিয়া দাঁড়াইবে।

---

ট্রাম বন্ধ। যাহারা সহরে আছ তাহারা ত ট্রাম ধর্ম্মঘটের খবর জান: যাহারা বাহিরে বাস কর তাহারা এই ট্রামধর্ম্মঘটের বিবরণ কাগজে পাঠ করিয়া বিশেষ কিছু অনুভব করিতে পারিবে না। তবে সহরের ছেলেমেয়েরা কতকটা কষ্ট বুঝিতে পারিবে। আমাদের দেশের মাঝামাঝি অবস্থার লোকের ট্রাম গাড়ীই ছিল, জুড়ী, ফিটন, মোটরকার—যা বল তাই। আমাদেরও এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে এক পা চলিতে আমরা বাড়ী হইতে কয়েক পা গিয়া মোড়ে ট্রাম ধরিয়া ছ বা সাত পয়সা খরচ করিয়া গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম। এমনই অভ্যাসের ফল, বিনা ট্রামে আমরা এক পা চলিতে পারিতাম না। এখন

এই ক'দিন সহরের সব দিকের ট্রাম বন্ধ হইয়া গিয়াছে, লোকের দুঃখের, দুর্দ্দশার আর সীমা নাই। আফিসের কেরাণী, আদালতের উকিল, স্কুল কলেজের মাষ্টার —সবাইয়ের মুখ শুষ্ক, প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ট্রাম বন্ধ হওয়াবধি সহরে মাল-বহা মোটর লরীগুলি লোক লইয়া যাতায়াত করিতেছে বটে কিন্তু সে গরুর গাড়ীতে গুড়ের নাগরী বোঝাইয়েরই সামিল। ঝাঁকানিতে প্রাণ যায়, উঠিবার নামিবার কষ্ট। কেরোসিন কাঠের বাস্কে বসিয়া কোনগতিকে প্রাণের দায়ে যাতায়াত!

———

নববর্ষ। "আমার দেশের" নববর্ষও বটে, ইংরাজী বৎসরেরও নববর্ষ বটে। এই নববর্ষের নবীন দিনে আমরা তোমাদের মঙ্গলকামনা করিতেছি। তোমরা উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ কর, তোমাদের পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের শ্রীবৃদ্ধি হোক, ভগবানের কাছে আমাদের এই কামনা। তোমরা মহৎ আছ, আরও মহৎ হও; তোমরা সুন্দর আছ, আরও সুন্দর হও; তোমাদের প্রাণ সুন্দর হোক, তোমাদের মন সুন্দর হোক্—আমাদের এই আশীর্ব্বাদ!

———

একখানি নূতন বহি। ছেলেমেয়েদের গল্প উপন্যাস লিখিয়া যিনি প্রভূত যশস্বী হইয়াছেন, বঙ্গদেশখ্যাত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী রচিত একখানি নূতন গল্পের বহি "পঞ্চুলাল" আমাদের নিকট আসিয়াছে। প্রিয়ম্বদা দেবীর লেখার নূতন করিয়া পরিচয় ত তোমাদের দিতে হইবে না। বাঙ্গালা দেশের ছেলে-মেয়েদের কাছে তাঁর লেখা বড়ই প্রিয়। এই বহিখানি তোমরা পড়িয়া যে সুখীই হইবে, আমরা নিঃসন্দেহে সে কথা বলিতে পারি। বহিখানির মূল্য বার আনা মাত্র।

———

# পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর

১। পত্রখানি এই :—

বীরভূম
১ কার্ত্তিক ১৩২৯

প্রিয় "অনিলচন্দ্র",

তোমার পত্র পাইয়াছি। "রাম" বাবু "ভরতপুরে" গিয়াছেন, শুনিলাম বিদ্রোহিরা তাঁহাকে তথাকার দুর্গে "আটক" করিয়া রাখিয়াছে। এই সংবাদে চিন্তিত আছি। তুমি "বড়দিনের" ছুটিতে বাড়ী আসিবে, তখন তোমাকে নিয়া আমি "রাম" বাবুকে দেখিতে যাইব। গতকল্য "গৌরীশঙ্কর" বাবু আমাদের এখানে আসিয়াছেন; তিনি শীঘ্রই "মানভূমে" রওনা হইবেন তথায় "খনিতে" তাঁহার একটি চাকুরী হইয়াছে। তোমার "মঙ্গল" লিখিবে, আমরা ভাল আছি। ইতি

তোমার "শ্যাম"।

২। চরণ। ৩। সিমলা।

৪। এ ধাঁধাটির কোন উত্তর নাই, এ শুধুই ধাঁধা, শুধুই রহস্য। চক্কোত্তি ঠাকুর ১২খানা ঘরে ১৩ জনকে আর রাখবেন কেমন করে বল? আর তিনি কিছু বিশ্বকর্ম্মাও নন যে ফুস্ মন্তরে একটা ঘর করে ফেলবেন! তবে কথার ভুজুং দিয়ে লোক ক'টিকে স্থান দিয়ে তিনি কিছু রোজগার করে নিলেন—এই আর কি!

৫। Portsmouth,

যে সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঁচটি ধাঁধারই উত্তর দিয়াছেন, তাঁহাদের নাম :—

কুমারী অন্নপূর্ণা সেন, ইতিনা; চিত্তরঞ্জন সিংহ, উয়ারী; অজিতকুমার সিংহ রায়; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, উয়ারী; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; লালমোহন গাঙ্গুলী, পাটনা; চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুরিয়া; কালীপদ দে, সিরাজগঞ্জ; চন্দ্রপ্রভা কুণ্ডু, সুনামগঞ্জ; কুমার জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ময়নাগড় রাজবাটী; সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ঘোড়ামারা; উষা মিত্র, কলিকাতা; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা;

গৌরহরি ভট্টাচার্য্য ও ফণিভূষণ ভট্টাচার্য্য, ভাটপাড়া; মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়, টিটাগড়; হীরেন্দ্রনাথ বসু; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; কুমারী মলিনাবিকাশ মণ্ডল, রেঙ্গুন; প্রমীলাবালা রায়, পুরী।

যাঁহারা পাচটির কম ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

কুমারী প্রভাদেবী, জামালগঞ্জ; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা; গগনেন্দ্রবিকাশ ভট্টাচার্য্য, কাণপুর; জ্ঞানশরণ রায়, পাবনা; কুমারী মীনারাণী সেন, বিহার; কুমারী হিমাংশুবালা সুধাংশুবালা ও শীতাংবালা দে, মারাট; শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; বিজয়কুমার মিত্র, কলিকাতা; আভারাণী মজুমদার, কলিকাতা।

---

## নূতন ধাঁধা

১। [নিম্নলিখিত ধাঁধার প্রথম তিনটী লাইনের প্রতি লাইন হইতে তিন অক্ষরে একটি করিয়া কথা বাহির হইবে—এই কথাগুলি এমনভাবে সাজাইতে হইবে যে পাশাপাশি পড়িলে যেমন, উপরে নীচে পড়িলেও তেমনি হইবে]

প্রথমে মাতৃরূপে সর্ব্ব গৃহে বাস
দ্বিতীয়ে সুগন্ধ পুষ্প, শুঁকিলে সুবাস
তৃতীয়ে মানুষের ইচ্ছা সর্ব্ব করে গ্রাস
কি শব্দ হইবে তাহা করহ প্রকাশ।

শ্রীমতী প্রমীলাবালা রায়।

২। আননে দেখিতে পাবে, না পাবে মুখেতে,
মেয়েতে পাবনা কিন্তু পাবে গো নারীতে,
রসালে দেখিতে পাবে না, পাবে আমেতে
জলেতে পাবে না কিন্তু পাবে সলিলেতে।

কুমারী অন্নপূর্ণা সেন।

৩।

```
* * * ) * * * * * * * * ( * ৭ * *
        * * * *
        -----------
            * * *
            * * *
            -----------
            * * * *
              * * *
              -----------
              * * * *
              * * * *
              -----------
```

যেখানে যেখানে তারাচিহ্ন আছে ঐখানে ঐখানে এক একটি রাশি আছে। আর বুঝতেই পারছ যে এটি একটি ভাগ। কেবল ভাগফলের দ্বিতীয় রাশিটি দেওয়া আছে ৭। এখন সব রাশিগুলি বার করতে হবে। এটা যত শক্ত মনে হয় ততটা নয়। চেষ্টা করলেই পারবে। এই যেমন দ্বিতীয় বারে তিনটি রাশি নেমেছে আর তার মধ্যে ভাজক ৭ যায় আর ৭ দিয়ে গুণ করলেও তিনটি রাশিই হয়, কাজেই ভাজকের প্রথম রাশিটি ১ হবেই। এই রকম করে হিসাব করলেই হবে। অবশ্য তোমরা না পারলে আমাকে ত বলে দিতেই হইবে।

শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র।

৪। এক গোয়ালার ৯টি গাই ছিল। সে গরুগুলির গায়ে নম্বর এঁটে দিয়েছিল। যে গরুর যত নম্বর সে তত সের দুধ দিত। এক গোয়ালার ৩ জন গাহেক ছিল। প্রত্যেককে রোজ ১৫ সের দুধ যোগান দিতে হত। এইবার গরুগুলিকে এমন ভাবে সাজাও যে যেদিক থেকেই যোগ করা যাক্ না কেন সব দিকেই ১৫ হবে।

কুমারী মীনারাণী সেন।



নেপোলিয়ান

Printed at the Krishna Printing Works,
*101, Shambazar Street, Calcutta.*

# আমার দেশ

য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

ফাল্গুন, ১৩২৯

## দোল।

মন্দিরে রাধাগোবিন্দজীর
আজি উৎসব, লাগিয়াছে ভিড়,
দোল পূর্ণিমা, পুলক নিবিড়
উঠে কীর্ত্তন গান ;
দোল মঞ্চেতে উঠিবেন হরি
কণক ভূষণ নব বেশ পরি'
রাইকিশোরীরে লয়ে সাথে করি
দুলিবেন ভগবান।

নানা আভরণ ভূষিত ঠাকুরে
প্রধান পূজারী করিবেন ক্রোড়ে,
পাচক যুবক বুঝি ভুল করে
কোলেতে তুলেছে আজ
প্রধান পূজারী করি মুখ ভার
চাহি তার পানে বলে বার বার,
নামাও ঠাকুর ! এত বড় বাড় !
নাই ঘৃণা, নাহি লাজ

পাচক কহিল ক্ষমা আমি চাই
রাধাগোবিন্দে প্রভেদ ত নাই
এবারের মত নামাবোনা ভাই,
আমিও ত ভোগ রাঁধি।
পূজারী কহিল রাধুনী বামুন
নামাও ঠাকুর শেষে হবি খুন,
শুনিয়া যুবক বাণী নিদারুণ
ঠাকুরে নামালো কাঁদি।
দর্পহারীরে বুকে লয়ে হায়,
দর্পী পূজারী দর্পেতে যায়,
পাচক যুবক ফ্যালফ্যালে চায়
ঠাকুরুণ লয়ে বুকে।
পূজারীর হায় বড় যে আদর
সোণা জরি দেওয়া রেশমী চাদর,
প্রদীপের শিক্ষা ধরবি ত ধর
আচলে ফুঁপির মুখে—

গর্ব্বে পূজারী যাইছে চলিয়া
সহসা চাদর উঠিল জ্বলিয়া,
ভয়েতে ভুলিয়া, বাপ্‌রে বলিয়া—
ঠাকুরে ফেলিল ছুড়ি।
পাচক যুবক দৌড়িয়া আসি
লুফিয়া ঠাকুরে কোলে ধরে হাসি,
ঝাঁপায়ে দয়াল যেন ভালবাসি
বসিল সে কোল জুড়ি।
রাধাগোবিন্দ দুই কোলে তায়,
অপার মাধুরী, করুণা অপার,
নাচে ব্রাহ্মণ ঝরে আঁখিধার
তারি বুকে আজি দোল,
নাচে ব্রাহ্মণ দোল দোল, দোল
নাচে সব লোক উঠে কল্লোল,
শুধু হরি বোল, হরি হরি বোল
আর নাহি কোনো গোল!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

# ভীম সাহা

দীন দরিদ্র রাণা প্রতাপের মন্ত্রী ভীম সাহাও দরিদ্র। রাণা মুষ্টিমেয় সৈন্য স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া মেবারের বন হইতে বনান্তরে, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে বিতাড়িত হইয়া ফিরিতেছেন, অর্থ নাই, সম্পৎ নাই, সময়ে আহারও নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাপেক্ষা স্মরণীয় দৃশ্য আর নাই। একদিকে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের অধীশ্বর ভারত বিজয়ী সম্রাট আকবর—আর তাঁহার বিপক্ষে হৃতরাজ্য ক্ষুদ্র মেবারের অধিপতি রাণা প্রতাপ সিংহ! সম্রাট আকবরের ভারত-বিজয় সম্পূর্ণ হয় নাই, ছলে বলে কৌশলে মেবারের রাণাকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইতিহাসে আছে, একসময়ে সম্রাট মেবার জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু মেবার তখন জনশূন্য, মেবার বলিতে একখণ্ড জমিই তাঁহার অধীনে আসিয়াছিল। মেবারের রাণা প্রতাপ তখন বিঠুরের জঙ্গলে, মেবারের অধিবাসীরাও তাহাদের দরিদ্র রাণার সঙ্গে সেই জঙ্গলে, কাজেই মেবারের রাজ্য তখন বিঠুরের সুরক্ষিত অরণ্যে!

সম্রাট আকবর অনেকবার সৈন্য পাঠাইয়া বিঠুর আক্রমণ করিয়াছিলেন. সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত সম্রাট সৈন্য বিঠুরের জঙ্গল ছাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু রাণাকে পরাজিত বা বন্দী করিতে পারিল না। রাণা তাঁহার সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই বার বার মোগলকে পরাজিত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মোগলের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে মোগল সম্রাট অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। করিবারই কথা! আকবর হইলেন সমগ্র ভারতের অধীশ্বর; অসীম প্রতাপ, অপরিমেয় সৈন্য বল, অসংখ্য ধনরত্ন—তাঁহারই সৈন্যদলকে বার

বার পরাজিত করে কিনা এক দীন, দরিদ্র, হৃত সর্ব্বস্ব পার্ব্বত্য প্রতাপ সিংহ! সম্রাটের রোষ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যেখানে যত সৈন্য ছিল, যত সেনাপতি, যত কামান, যত তাঁবু ছিল সম্রাট সমস্ত দিল্লীতে একত্রিত করিলেন। অন্য সমস্ত প্রদেশ তখন শান্ত, সুশাসিত, সম্রাট সমস্ত সৈন্য তুলিয়া আনিয়া বিঠুরের দিকে প্রেরণ করিলেন।

সংবাদ রাণা প্রতাপের কাছেও পৌঁছিল। একখণ্ড শিলায় বসিয়া, সামান্য কয়েকজন সামন্তের সঙ্গে রাণা রাজকার্য্য করিতেছিলেন। সকলেরই গৈরিক বসন, কটিবদ্ধ কোষে তরবারি ও বামহস্তে ভল্ল, ললাটে রক্তচন্দনের রেখা। দূত আসিয়া সংবাদ দিল।

রাণা প্রতাপ সমস্ত শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। চিন্তা নিজের জন্য নহে, নিজে ত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, নিজের আবার কিসের চিন্তা—চিন্তা, মেবারের তরে! চিন্তা জন্মভূমি, মাতৃভূমি, পুণ্যভূমি মেবারের তরে! মেবার পরপদ-দলিত হইবে—রাণা প্রতাপের সেই চিন্তা! মেবারের অধিবাসীদের জন্য চিন্তা—তাহারা যে তাঁহার সঙ্গেই মেবার ছাড়িয়া এই জঙ্গলে আসিয়া বাস করিতেছে। রাণা বুঝিলেন এবার রক্ষা নাই। মোগল সৈন্যের বন্যায় সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। যুদ্ধ করাও সম্ভব নয়, সৈন্য নাই; নূতন সৈন্য সংগ্রহেরও উপায় নাই, যেহেতু রাজকোষ শূন্য! মেবারবাসিদের প্রাণ রক্ষার্থই রাণা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষে বলিলেন—সামন্তগণ! এবার আমি ধরা দিব। আকবর আমাকে ধরিতেই তাঁহার ভারতবর্ষের সমস্ত সৈন্য বিঠুরে পাঠাইতেছেন, আমি ধরা দিলে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, মেবারের অধিবাসীরা অকারণ মরিবে না। সম্রাট আমাকে চান, আমাকে

পাইলে তিনি নিরস্ত হইবেন। সামন্তগণ, আমি স্থির করিয়াছি; এবার ধরা দিয়া, মেবারবাসীদের রক্ষা করিব।

সামন্তগণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রাণা প্রতাপ—রাণা প্রতাপ ধরা দিবেন! হিমালয় ভাঙ্গিয়া পড়িবে? সমুদ্র বারিশূন্য হইবে? ইহা কাহার বিশ্বাস হয়? কিন্তু উপায় যে নাই, তাঁহারাও বুঝিতেছিলেন।

রাণার বৃদ্ধ মন্ত্রী ভীম সাহা বলিলেন—না রাণা, যুদ্ধ করিয়া মরিব, ধরা দিতে পারিব না।

রাণা বলিলেন—যুদ্ধ আর কি লইয়া করিব মন্ত্রি! সৈন্য নাই, রাজকোষে অর্থ নাই। আর যুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রীর মন সায় দিল না। আকবরের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা মানিয়া লইলে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়—ভীমসাহা রাণাকে সে কথা বলিলেন। আকবর যদি ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধ করিতেন কথা ছিল না, কিন্তু তিনি এই এতটুকু একটি জনপদের বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত ভারতীয় সৈন্য চালনা করিয়াছেন ইহা কি অত্যাচার নয়? রাণা, আমরা অধর্ম্ম সহিব না, মরিব—তবু ধর্ম্ম রক্ষা করিব।

রাণা বলিলেন—মন্ত্রী, আমি সব বুঝি কিন্তু মরিবার জন্য যে আয়োজন দরকার আমাদের যে সে সাধ্যটুকুও নাই। এখন যুদ্ধ করিতে গেলেই দরিদ্র অসহায় মেবারবাসীরা পুত্র-কন্যা লইয়া মরিবে। আমার সৈন্য থাকিত, অর্থ থাকিত, আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতাম—কিন্তু তুমি আমার এ অরণ্যরাজ্যেরও মন্ত্রী, রাজকোষ যে কপর্দ্দকশূন্য তাহা ত তোমার অজানা নাই!

তখন ভীমসাহা রাণাকে বলিলেন—রাণা, আমার সাত পুরুষ মেবারের মন্ত্রীত্ব করিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা সমস্তই ভূগর্ভে প্রোথিত আছে,

সেই অর্থ মেবারের রাজকোষে গ্রহণ করুন। নূতন সৈন্যদল গঠন করুন, মেবারের স্বাধীনতা, হিন্দুর হিন্দুত্ব রক্ষা করুন। মেবারকে বিধর্ম্মীর পদানত করিবেন না।

রাণা বৃদ্ধের কথায় প্রথমটা বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। ভীম সাহার সঙ্গে ভূগর্ভে রক্ষিত স্বর্ণের পরিমাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। দশ পণেরো বছর মেবারে স্বাধীনতা রক্ষা করা চলিতে পারে বটে। কিন্তু বৃদ্ধের আত্মীয়স্বনজকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ লইতে রাণা সম্মত হইলেন না।

এ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন—রাণা, মেবারের চেয়ে স্বজন আমার কে? ধর্ম্মের চেয়ে বড় আত্মীয়ই বা কে? আর মেবার স্বাধীন থাকিলে অন্য ধনরত্নের প্রয়োজনই বা কি? রাণা, দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য বৃদ্ধের সমস্ত অর্থ আপনি লউন। মেবার থাক, মা বাঁচিয়া থাকুন—রাণা, মেবারের জন্য ধর্ম্মের জন্য এ অর্থ আপনি গ্রহণ করুন।

রাণা আর অসম্মত হইতে পারিলেন না।

আজও মেবারের চারণ কবিরা মেবারের পথে ঘাটে ভীমসাহার কীর্ত্তি গাহিয়া বেড়ায়।

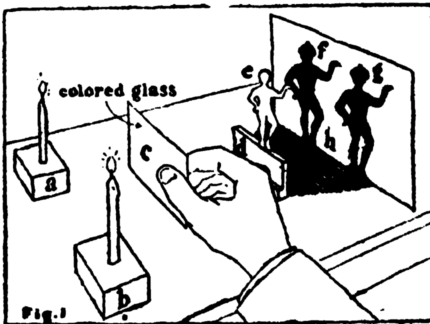
শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

---

# মজার খেলা।

দুখানা রঙীন কাচ, একটা লাল একটা নীল, দুটো কাঠের চৌকা, দুটো মোমবাতি, বড় সড় ও একটু মোটা গোছের একখানা সাদা কাগজ ও খানিকটা পিজবোর্ড, বা কার্ড বোর্ড এই গুলো নিয়ে কেমন এক মজার খেলা হয় দেখ—

কাঠের চৌকা দুটোর উপর বাতি দুটো বসিয়ে দাও। পিজবোর্ড কেটে একটা ছোট্ট মানুষের মূর্ত্তি তৈরী করে নাও। একটু আটা দিয়ে এঁটে, মূর্ত্তিটা একখানা বইএর উপর বসিয়ে রাখ। ইহার পেছনে সাদা কাগজখানা খাড়া করে টাঙিয়ে দাও, আর সামনে বাতি দুটোকে লাইন করে, ফাঁক ফাঁক করে বসিয়ে দাও।




a, b কাঠের চৌকার উপর বাতি।

c রঙিন কাচ।

d কেতাব।

e মানুষের ছবি।

f ও g একটা ছবির দুটো ছায়া-ছবি।

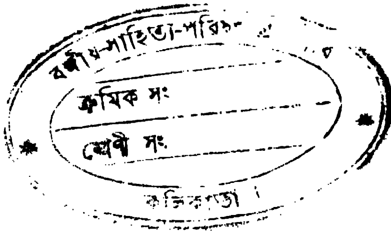
h সাদা কাগজ।

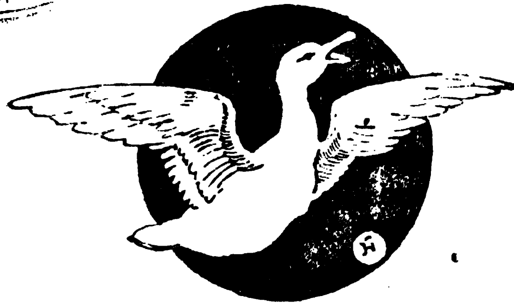
বাতি দুটো জ্বেলে দিয়ে, তোমার হাতের কাছে যে বাতিটা সেইটার সামনে লাল কাচখানাকে ধর; অম্নি দেখবে, সব পেছনের সেই সাদা কাগজ-খানার উপরে দুটো মানুষের ছবির ছায়া পড়েছে,—একটা লাল একটা সবুজ।

নীল কাচটা এইবারে ধর, দেখবে একটা নীল ও একটা কমলা লেবুর রঙের ছবি পড়েছে।

পিজবোর্ড থেকে কেটে কেটে, জন্তু জানোয়ার, নৌকা, জাহাজ, বাড়ী, ঘর, দোর, বাসন-কোষণ যা হোক কিছু তৈরী করে, উপরকার মতন করে, পরখ কর; দেখবে ফি বারেই, একটা ছবি থেকে সাদা কাগজখানার উপরে দুটো দুরঙা ছবির ছায়া পড়েছে। বাতি দুটোকে ইতস্ততঃ নাড়াচাড়া করলে, সঙ্গে সঙ্গে ছবিগুলোও জীবন্তের মত নড়বে চড়বে। এই খেলা দেখাবার সময়, ঘরে অন্য কোন আলো না থাকে যেন। তোমরা নিজে নিজে একবার করে দেখ, খুব আমোদ পাবে।

শ্রীধানি লঙ্কা।



# সোনার ফুল।

## ( জাপানী উপকথা )

সেন্দাই সহর আছে উত্তর প্রদেশে,
সামূরাই যোদ্ধা সব যথা'হতে আসে।

সেই সেন্দাই সহরে হাস্নুমা বলে একজন বড়লোক থাকৃত; বড় ভাল লোক আর অতিথি পরায়ণ ছিল সে। একদিন তার একটি মেয়ে হল,—এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখে নি। হাস্নুমা তার নাম রাখাল হাস্নুকো অর্থাৎ ছোট ফুল।

ঠিক সেই দিন হাস্নুমার বন্ধু সাইতোর একটি ছেলে হল। পথে দুজনের দেখা হতে হাস্নুমা বল্‌ল, ' আমার এক রূপের ডালি মেয়ে হয়েছে।' সাইতো বল্‌ল, 'আমার এক সুন্দর ছেলে হয়েছে।' তাই শুনে হাস্নুমা উত্তর কর্‌ল, ভাই দুজনেরই যখন একসঙ্গে এমন সৌভাগ্য হয়েছে, এস এমন একটা কাজ করি যাতে আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এদের দুজনে বিয়ে এখন থেকেই ঠিক করে রাখি।

সাইতো খুব খুসী হয়ে মত দিল। তারপর হাস্নুমা মেয়ের ভাতের দিন সাইতোকে নেমন্তন্ন করে পাঠল। সাইতো এসে বল্‌ল ' ভাই আজকের দিনে তোমার মেয়েকে একটি উপহার দেব। এজিনিষটি আমার মায়ের দেওয়া। তোমার মেয়ে হাস্নুকোর সঙ্গে আমার ছেলে কোনোজোর যে বিয়ে হবে, তার যৌতুকটা আগে থেকে দিয়ে রাখলুম। বড় হলে এটি তোমার মেয়ের মাথার চুলে পরিয়ে দিও।" এই বলে হাস্নুমার হাতে একটি সুন্দর কাজকরা সোনার ফুল দিল।

কিছুদিন পরেই জমিদারের সঙ্গে সাইতোর ঝগড়া হয়; তার ফলে সাইতোকে সপরিবারে সেন্দাই সহর ছেড়ে যেতে হল।

দিন যায় জলের মত। দেখতে দেখতে ষোল বছর কেটে গেল। সেন্দাই সহরে হাস্নুকোর সৌন্দর্য্যের কথা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা বলতে লাগল, এমন সুন্দরী মেয়ের জুড়ি মেলা ভার। যদিও সত্য কথা বলতে গেলে হাস্নুকোর ছোট বোন ওকিসান প্রায় তার দিদির মতই সুন্দরী হয়ে উঠছিল। হাস্নুকোকে বিয়ে করবার জন্যে কত দেশ বিদেশ থেকে সুন্দর সুন্দর ছেলে আসতে লাগল,—হাস্নুনুমাকে কত সাধা সাধি করতে লাগল, কিন্তু হাস্নুনুমার শরীরে সামুরাই রক্ত ছিল কিনা, তাই সে সাইতোকে যে কথা দিয়ে ছিল, তা ভাঙ্গতে চাইলে না। হাস্নুকোও বাপের উপযুক্ত মেয়ে,—সে বলল 'চিরকুমারী থাকব, তবুও কোনোজা ছাড়া কাউকে বিয়ে করব না।

সাইতো কিম্বা কোনোজোর কিন্তু খবর আর পাওয়া যায় না। সকলে শেষে ভাবল, বোধ হয় তারা মরে গেছে। হাস্নুকো ভেবে ভেবে, রাতে ফোটা হাস্নুহানার মত সূর্য্যের আলোতে ঝরে পড়ল। বাপমার শোকের সীমা নেই। যখন হাস্নুকোর সুন্দর শরীর খানি চেরী কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরতে গেল, তখন তার মা কাঁদতে কাঁদতে এসে মেয়ের মাথায় গুঁজে দিয়ে বলল,—মাণিক আমার, আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তোমার আদরের সোনার ফুলটিও সঙ্গে করে নিয়ে যাও। কোনোজোর বাপের দেওয়া ফুল, এজন্মে তোমাদের সুখী করতে পারল না, পর জন্মে যেন পারে।

এই কথা বলবার সময় হাস্নুকোর মা ভেবেছিল যে কোনোজো মরে গেছে; কিন্তু হাস্নুকো মারা যাবার ঠিক দুমাস পরেই কোনোজো হাস্নুনুমার দরজায় এসে দাঁড়াল। তার সবল সুন্দর চেহারা দেখে হাস্নুনুমা

প্রথমে তার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোনোজো মাথা নুইয়ে বল্‌ল, আমি কোনোজো—সাইতোর ছেলে।

কপাল চাপড়ে হাসুনুমা বল্‌ল,—দুঃখের কথা আর কি বলব! তোমার আশায় আশায় থেকে দুমাস আগে আমার মেয়ে হাসুকো আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেছে। তুমি যদি দুমাস আগে আস্‌তে তাহ'লে তাকে বাঁচাতে পারা যেত। তোমরা ত কোন খবরই আমাদের দাও নি! তোমার বাপের খবর কি, তোমার মায়ের খবর কি বল?

চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে কোনোজা বল্‌ল—'বাবার কথা রাখ্‌তে আমি এসেছি আপনার মেয়েকে বিয়ে কর্‌বার জন্য। কিন্তু সে আশা তো শূন্যে মিশিয়ে গেল। আর বাবা মার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? এখান থেকে জমিদার বাবাকে যখন তাড়িয়ে দিল, তখন প্রথমে আমরা গেলুম ইয়েদো। তারপর সেখান থেকে ইয়েজো দ্বীপে চলে গেলুম। সেখানে বাবা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়্‌লেন—দুরবস্থার আমাদের আর সীমা রহিল না। কষ্ট সহ্য কর্‌তে না পেরে বাবা মারা গেলেন, মাও তারপর বেশী দিন বাঁচ্‌লেন না। সেই থেকে আমি আজ একবছর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি যাতে টাকাকড়ি রোজগার করে আপনার মেয়ে হাসুকোকে বিয়ে করতে পারি।

বুড়ো হাসুনুমা কোনোজোর কথা শুনে বড়ই দুঃখিত হয়ে বল্‌ল,—'কোনোজো বড় কষ্ট পেয়েছ তোমরা। যাক্ যা' হ'বার তা' হয়ে গেছে। তুমি যখন তোমার বাবার কথা রাখবার জন্যে এতদূর এসেছ, তখন আমি আর তোমাকে ছাড়্‌ছি না। এখন যাও, হাসুকোর কবরের ওপর একটা ধূপ পুড়িয়ে এস, তাতে তার আত্মার তৃপ্তি হবে সে তোমার আশায় থেকে থেকেই শুকিয়ে গিয়েছিল।'

কোনোজো 'বাৎসুদানে' (পারিবারিক গোরস্থানে) ঢুকে হাসুকোর কবরের সামনে মাথা নোয়াল; যদিও সে কখনো হাসুকোকে দেখেনি তবুও কেমন একটা দুঃখ তার মনের ভেতর জেগে উঠল। তার চোখ থেকে দু ফোটা জল সেই শ্বেত পাথরের ওপর পড়ল। কোনোজো একটি ধূপ সেখানে জ্বেলে দিয়ে, আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল। হাসুনুমা তারই অপেক্ষায় ছিল; দুহাত দিয়ে কোনোজোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, 'আজ থেকে তুমি আমার ছেলের মত থাক্‌বে। আমার বাগানের কোণে ঐ ছোট বাড়ীখানা তোমাকে দিলুম।

কোনোজো হাসুনুমার দান মাথা পেতে নিয়ে সেই ফুলের বাগান ঘেরা ছোট্ট বাড়ীতে থাক্‌তে লাগল। একদিন সন্ধ্যা হয় হয়—সূর্য্য অস্ত যাবার পর পশ্চিম আকাশ সাকুরা ফুলের মত লাল হয়ে গেছে, এমন সময়ে সে বাগানের দরজাটির কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসুনুমার স্ত্রী আর তার ছোট মেয়ে ওকিসান সেদিন মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল; দূরে দুখানা পাল্কী আস্‌ছে; সে একপাশে সরে দাঁড়াল। প্রথম পাল্কিতে হাসুনুমার স্ত্রী ছিল; আর দ্বিতীয় খানিতে ওকিসান ছিল। ওকিসানের পাল্কীখানা যখন কোনোজোর সাম্‌নে দিয়ে চলে গেল, তখন মাটীতে ঠুন্‌ করে কি একটা জিনিষ পড়ে যাওয়ার শব্দ হল। কোনোজো হেঁট হয়ে জিনিষটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখল সেটা আর কিছুই নয়—একটা সোনার ফুল। কোনোজো যদিও তার বাপের কাছে শুনেছিল, হাসুকোকে সোনার ফুল যৌতুক দেওয়ার কথা, তবুও তার ধারণাই হয়নি যে এইটে সেই সোনার ফুল। ফুলটি নিয়ে কোনোজো ঘরে ফিরে গেল—ভাবল কাল সকালে ওকিসানকে ফেরত দিলেই হবে।

রাত্রি নিঝুম। পাশের পুকুরের জলে চাঁদের সাদা আলো পড়ে গলানো

রূপোর মত টল্‌টল্ করছিল,—এমন সময়ে কোনোজোর বাড়ীর দরজার ঠুক্‌ঠুক্ করে কে শব্দ করল। কোনোজো বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আলো জ্বেলে হেঁকে বল্‌ল—কে? কোন উত্তর নেই—আবার ঠুক্ ঠুক্ ঠুক। কোনোজো দরজা খুলে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল;— দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, জ্যোছনামাখা পরমা সুন্দরী ওকিসান! আশ্চর্য্যের প্রথমভাব কেটে গেলে, কোনোজো বল্‌ল,— 'ওকিসান্—তুমি! এমন সময়—এখানে?'

কালো চোখদুটি নামিয়ে নিয়ে, হাতের নোখ খুঁট্‌তে খুঁট্‌তে ওকিসান বল্‌ল,—'আমি তোমায় ভালবাসি। আজ সন্ধ্যাবেলায় যে সোণার ফুল ফেলে দিয়েছিলুম, সেটা কেবল তোমার কাছে আসবার ছলে।'

কোনোজো অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল—চেয়ে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল; সে ও ওকিসান্‌কে ভালবেসে ফেল্‌ল।

একদিন কোনোজো বল্‌ল,—'দেখ ওকিসান, চল আমরা দুজনে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করিগে। তোমার বাবা আমাদের কথা শুন্‌লে অনর্থ কর্‌বেন।' ওকিসান মত দিল। তখন এক অন্ধকার রাতে দুজনে চুপি চুপি অন্য এক সহরে পালিয়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ'মাস কেটে গেল। ওকিসান একদিন আদর করে কোনোজোকে বল্‌ল,—'এইবার বাবার কাছে ফিরে যাই চল।'

কোনোজো ভয় পেয়ে বল্‌ল,—কিন্তু এতদিন পরে আমাদের দেখে তিনি যে ভয়ানক রেগে যাবেন! ওকিসান হেসে বল্‌ল, 'সে ভয় নেই, আমি তার ব্যবস্থা করব।'

দুজনে সেন্দাই সহরে আবার ফিরে এল। বাগানের দরজার কাছে এসে

ওকিসান বল্‌ল—তুমি আগে যাও, পরে আমি যাচ্ছি; কিছু ভয় করো না। 'আর এই সোণার ফুলটি বাবাকে দিও।'

বাড়ীর ভেতরে ঢুক্‌তে কোনোজার পা কাঁপছিল। হাস্নুমার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই সে কোনোজাকে জড়িয়ে ধরে বল্‌ল, 'কোথায় ছিলে এতদিন? না বলে কয়ে হঠাৎ এমন কেন চলে গেলে?—আমার স্নেহের অভাব দেখেছিলে কোনখানে কোনোজো?'

হাস্নুমার এই অভ্যর্থনায়, কোনোজার মুখে কথা সরল না। সে কোথায় ভেবেছিল একটা প্রলয় ব্যাপার হবে, আর একি? হাঁটু গেড়ে বসে কোনোজো বল্‌ল,—'আমি আমার অন্যায় কাজের জন্যে ক্ষমা চাইতে এসেছি।'

চোখদুটো বিস্ফারিত করে, হাস্নুমা বল্‌ল—'ক্ষমা কিসের'?

কোনোজো তখন সোণার ফুল কুড়িয়ে পাওয়া থেকে সব ঘটনা খুলে বল্‌ল। হাস্নুমা গম্ভীর হয়ে বল্‌ল,—'দেখ ছোক্‌রা, আমার মত বুড়ো লোকের সঙ্গে তামাসা করো না। ওকিসান আজ ছ'মাস শয্যাগত, কথা বলে না—নড়ে না—কেবল প্রাণ আছে মাত্র। তার সম্বন্ধে এরকম কথা বলো না।

কোনোজো বিনয়ের সঙ্গে বল্‌ল,—'আমি তামাসা করি নি—সত্যি বল্‌ছি আপনি বাইরে কাউকে পাঠিয়ে দিন, সেখানে ওকিসান দাঁড়িয়ে আছে।

একজন চাকর বাইরে গিয়ে দেখে এল, কেউ কোথাও নেই। কোনোজো তখন সোণার ফুলটি হাস্নুমার হাতে দিয়ে বল্‌ল,—'এইটি ওকিসান আপনাকে দিতে বলেছে; তা হলেই বুঝ্‌তে পারবেন যে আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি না।'

সোণার ফুল দেখে হাস্নুমার স্ত্রী চীৎকার করে বলে উঠ্‌ল,—'ও ফুল তুমি কোথায় পেলে? ও যে আমি হাস্নুকোর সোণার দেহের সঙ্গে নিজের হাতে দিয়ে দিয়েছি।

এই কথা শুনে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেল ; আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল তখন, যখন দেখ্‌ল ওকিসান্ সেই ঘরে এসে দাঁড়াল।

হাস্নুমা দাঁড়িয়ে উঠে বলল—'একি ব্যাপার ওকি ? তুমি আজ ছ'মাস শয্যাগত ছিলে এখন উঠে এলে কি করে ?'

ওকিসান উত্তর কর্‌ল—'আমি ওকিসান নই—আমি তোমার বড় মেয়ে হাস্নুকো। কোনোজোর সঙ্গে বিয়ের আগেই আমায় পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে বড় সাধ ছিল যে কোনোজোর সঙ্গে বিয়ে হয়। তাই আমার আত্মা ওকিসানের রূপ ধরে এতদিন কোনোজোর কাছে ছিল, আর ওকিসানের শরীর নির্জ্জীব হয়ে পড়েছিল। এখন আমার সাধ মিঠেছে, আমি চললুম। কিন্তু যাবার আগে তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যেন কোনোজোর সঙ্গে ওকিসানের বিয়ে হয়। তাহ'লে আমার আত্মার তৃপ্তি হবে।

হাস্নুমা কোনোজোর দিকে চেয়ে বলল,—তোমার কথাই সত্যি। হাস্নুকো তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও—কোনোজোর সঙ্গে আমরা ওকিসানের বিয়ে দেব—তোমার আত্মার তৃপ্তি হোক্।

এই কথা বলবা মাত্র ওকিসান অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান হবার পর তার আর অসুখের কোনও চিহ্ন রইল না।

তারপর ?

তারপর—কোনোজোর সঙ্গে খুব ধুমধাম করে ওকিসানের বিয়ে হল।—আর হাস্নুমা সেই সোণার ফুলটি সিয়োগমা দেবের মন্দিরে দিয়ে এল।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

---

# পাখীর বাসা।

সাধারণতঃ সহরের ছেলেমেয়েরা বাড়ীর কার্ণিসে ও ঘরের নর্দ্দামার ফাঁকে ছাড়া পাখীর বাসা দেখিতে পায় না, কিন্তু সহরের বাহিরে যাহাদের বাস, অথবা যাহারা মাঝে মাঝে পল্লী অঞ্চলে গিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় গাছের কোঠরে, ডাল-পালার মধ্যে, নদীর পাড়ে পাখীর বাসা দেখিয়াছে। তাল গাছের পাতায় "বাবুই" পাখীরা ছোট একটি-একটি থলির মত কেমন বাসা ঝুলাইয়া দেয় তাহা যে পল্লীগ্রামে গিয়াছে, সেই দেখিয়াছে। নদীর পাড়ে পাড়ে ছোট ছোট গর্ত্ত কাটিয়া গান-সালিক কেমন তার বাসাটি করিয়া লয়, ইহাও যে তাহার নজরে না পড়িয়াছে তা নয়।

রকম রকম পাখী রকম রকম বাসা বাঁধিয়া ডিম পাড়ে, ডিম ফুটাইয়া বাচ্ছাগুলিকে "মানুষ" করিয়া তুলে—এই জন্যই তাহারা এমন ভাবে বাসা বাঁধিতে চায় যাহাতে শত্রুরা কোনও অনিষ্ট না সাধিতে পারে। আর শত্রু ও ত তাদের এক আধটি নয়, কত রকম রকমের শত্রু যে আছে—তার আর ঠিকই নাই।

প্রথমতঃ পাখীর শত্রু আবার পাখীই আছে। বাজ পাখীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। বাজ পাখী দুনিয়ার সব পাখীর শত্রু; ইহাদের আবার বাচ্ছা পাখীর নাম শুনিলে নোলায় জল গড়াইয়া থাকে।

তারপর, সাপ আছে। সাপের পক্ষে এমন স্বাদু আহার ত নাই-ই।

আবার কুকুর, বেড়াল, ভোঁদড়, শেয়াল— এ সবও দুষমন।

এ ছাড়া—আর এক জাতীয় ভীষণ শত্রু পাখীদের আছে। তাহাদেরও নজর ঐ বাচ্ছা পাখীদের উপরই বেশী। অন্য সব দুষমনকে পার আছে,

ইহাদের আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইহারা আর সব জীব জন্তুর চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ইহাদের পার নাই। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ কোন জীব আবার এত শক্তিমান, এত বুদ্ধিমান যে পাখীরা ইহাদের কিছুতেই পারিয়া উঠে না? তাহ'লে কথাটা বলিয়াই দিই? সে তোমরাই ত গো! পাখীর বাচ্ছার সখ তোমাদের ত কম নয় গো! বাচ্ছা একটি ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া ছাতু খাওয়াইতে তোমাদেরই কি কম আগ্রহ—এ্যাঁ!

তোমাদের আগ্রহ, বাজ পাখী, সর্প, ভোঁদড়, শেয়ালের ক্ষুধা মিটাইতে গেলে ত পাখীর বংশ নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে—পাখীবা ত সত্য সত্যই আর তাহা হইতে দিতে পারে না। কাজেই তাহারা যাহাতে আপন-আপন শাবকগুলি রক্ষা করিয়া চলিতে পারে—তাহার চেষ্টা না করিয়া তাহারা পারে না। শুধু বাচ্ছাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখাই তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, আপন সন্তান সন্ততির উপর মায়াও ত বড় কম নয়। প্রাণ ধরিয়া কোন্ জীব জানোয়ার সেগুলি নষ্ট হইতে দিতে পারে বল?

তাহাদের সন্তান-সন্ততিগুলিকে রক্ষা করিবার, যতদিন না তাহারা মানুষ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিবার ভার পিতা-মাতার। পাখীর পিতা মাতা ত পাখীই। তাহাদের ত আর মানুষের মত ঘর বাড়ীও নাই, আর অস্ত্র শস্ত্রও নাই, কাজেই তাহাদের দ্বারা যেটুকু আর যতটুকু সম্ভব সেটুকু তাহারা করিতেছে। "সেটুকু" বলিতে ইহাদের আর কিছুই নাই, ঐ বাসাটুকুই ভরসা, সেখানেই যা কিছু কৃতিত্ব উহাদের। সেটিকে সুরাক্ষিত করিতে পারিলেই উহারা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

কেমন ভাবে ও কি করিয়া তাহারা বাসাটিকে সুরক্ষিত করিয়া থাকে, তাহারই গোটা কত নমুনা তোমাদের দিতেছি।

একরকম নেজ-ঝোলা পাখী আছে যাহারা কেবলমাত্র পালক দিয়া গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাসাটি ঝুলাইয়া দেয়।

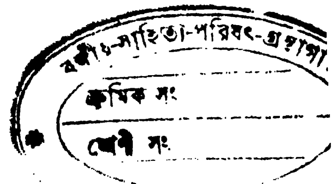


দেখিলে মনে হইবে যেন পাতাই শুকাইয়া আছে

আর একরকম পাখী আছে, তাহাদের নাম দরজী পাখী। তাহারা বাসাটি কেমন ঝুলায় দেখ। ডালে ঘাসের রসি দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে।

কাঠ-ঠোকরা পাখীর নাম তোমরা জান। কাঠ-ঠোকরা খটা-খট্ করিয়া গাছের গুঁড়ি ফুটা করিয়া বাসা করিয়াছে দেখ! ইহাদের বাসা একেবারেই

কাঠ ঠোক্‌রা।




নিরাপদ নহে। গাছে উঠিতে পারিলেই হইল। শেয়াল, কাঠ্‌বেড়াল্লী ইহাদের বড় হত্যা করে। তাই বলিয়া তোমরা যেন ফোঁকরে হাত পুরিতে যাইও না, অনেক সময় ফোঁকরে বাচ্ছার লোভে লোভে সর্প মহাশয় আত্মগোপন করিয়া থাকেন—মানুষের গন্ধ পাইলেই—ফোঁ-ও-স্‌!

দীর্ঘচঞ্চু পাখীর বাসাও ঐ ধরণের। ঐ দেখ না পাখীটা তাহার বাসার উপরেই বসিয়া আছে।



দীর্ঘ চঞ্চু।

আর একরকমের ইয়ুরোপীয় পাখী আছে, হুপো পাখী তাহার নাম। কি সুন্দর বাসা করিয়াছে দেখ।



হুপোর কি সুন্দর বাসাটি।

আবার এক-রকমের জল হাঁস আছে তাহারা ডিম ফুটাইয়াই বাচ্ছাকে পিঠে

করিয়া জলে নামে। মাঝে মাঝে ডুব দেয় আবার ভাসে। বাচ্ছা:ক সাঁতার শিক্ষা দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।



বাচ্ছা মানুষ করিতেছে।

আর এক রকমের পাখী আছে তাহারা পায়ের ফাঁকে করিয়া বাচ্ছাকে লইয়া উড়িয়া বেড়ায়। আমার মনে হয়, ইহাদের দেশে অনেক স্কুল পালানো ছেলে আছে, বাসায় বাচ্ছা রাখিয়া বাহির হইলেই বাসা শূন্য দেখিবার সম্ভাবনা তাই অমন করিয়া লইয়া বেড়ায়—কি বল?



এদের বাসা শূন্যেই।

সন্তান-সন্ততির মঙ্গলের চেষ্টা সবাই করে, পাখারাও যে না করিবে তা নয়। মানুষের সঙ্গে কেবল পার্থক্য এই, মানুষ ঘরবাড়ী করিয়া, সংসার সাজাইয়া ছেলেপুলে নাতিপুতি লইয়া থাকে, ইহারা বাচ্ছাদের বড় করিয়াই ছাড়িয়া দেয়—আর কোন সম্পর্ক রাখে না। এই পার্থক্য না থাকিলে আর মানুষ কি মানুষ থাকিত, তাহারাও একটা দ্বিপদ পশু পক্ষীর মতই হইয়া যাইত।

---

# পরের ভাবনা।

বিলাতের কোনও নগরের একজন ভদ্রলোক একদিন রেলের গাড়ীতে কোথাও যাইতেছিলেন। ভদ্রলোকটী গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর জানালার কবাট খুলিয়া বসিলেন, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোক জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া নানা স্থানের দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়ী এক ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল, গার্ডসাহেব নামিয়া ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, গাড়ী হইতে ভদ্রলোক ইহা দেখিতে লাগিলেন, যাত্রিরা নামিতে উঠিতে লাগিল,এদিকে গার্ডসাহেব ষ্টেশনমাষ্টারের সহিত আলাপ করিতে করিতে ষ্টেশনের একটী কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় ভদ্রলোকটী তাঁহার গাড়ীর অন্য একজন যাত্রীর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। ক্রমে গাড়ী ছাড়িবার সময় হইল, ষ্টেশনে ঘণ্টা বাজিল, গাড়ী ছাড়িয়া দিল। গাড়ী কিছুদূর আসিতে না আসিতেই সেই ভদ্রলোকটী লাফাইয়া উঠিয়া গাড়ীর শিকল ধরিয়া টানিলেন, গাড়ী তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। কোন গাড়ীতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া গার্ডসাহেব আসিয়া ঠিক সেই গাড়ীতে উপস্থিত হইলেন এবং শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অনাবশ্যক শিকল ধরিয়া টানিলে জরিমানা হয় ইহা বলিয়া গার্ড কে গাড়ী থামাইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন। ভদ্রলোকটী তাড়াতাড়ি উত্তর করিলেন 'মহাশয় আমি শিকল টানিয়া গাড়ী থামাইয়াছি। কারণ আমি দেখিয়াছিলাম গত স্টেশনে আপনি নামিয়া ষ্টেশনের কুঠরীতে প্রবেশ করিলেন, তাহার কতক্ষণ পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল, আমি মনে করিলাম আপনি বুঝি বা গাড়ীতে উঠিতে পারেন নাই, তাই গাড়ী থামাইয়াছি। আপনি কখন গাড়ীতে উঠিয়াছেন তাহা আমি দেখি নাই। আপনার জন্য আমার বড় ভাবনা হইয়াছিল যে গার্ড না থাকিলে কে গাড়ি দেখিবে।' গার্ড হাসিয়া চলিয়া গেলেন, গাড়ী পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।



স্কুলে

Printed at the Krishna Printing Works,
*101, Shambazar Street, Calcutta*








# লোভের উৎপত্তি

[ কাউণ্ট টলস্টয় ]

দুই বোন—বড় বোন্ থাকে সহরে—গাড়ীঘোড়া, লোক লস্কর, আমোদ প্রমোদ লইয়া, আর ছোট বোন থাকে পাঁড়াগায়ে—ধান ভানে, রাঁধে বাড়ে, আর ছেলে পুলে মানুষ করে।

কতদিন পরে সহরের বোন আসিয়াছে পাড়াগেঁয়ে বোনের বাড়ী। এ কথা সে কথা, কত কথার পর তাহাদের সুখ দুঃখের কথা উঠিল। বড় বোন বলিল,

"ভাই, আমাদের কত সুখ, রোজ থিয়েটার বায়স্কোপ গান বাজনা—অষ্টপ্রহর, একটু সময় পাই না। আর কাজের কথা ভাই, আমাদের ত নড়িয়া পর্য্যন্ত বসিতে হয় না। দিব্যি আরামে আছি—গায়ে একটু আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে না।"

ছোট বোন উত্তর করিল,

"আমরা ও-সব হুজুক কোথায় পাব দিদি? তবে কি জান, ও সব সুখ সম্পদের মূল্য কি? আজ আছে কাল নাই। আমরা দিদি পাড়াগেঁয়ে লোক আমাদের টাকা পয়সাও যেমন কম অভাবও তেমনি অল্প। আমাদের সুখ, দুঃখ, ভরসা সব ঐ জমি। ঐ জমির দিকে চাহিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। এক একবার কি ভাবি জান দিদি? ভাবি, আমরা ভালই আছি, নিজেদের খামার জমি আছে, মোটা ভাত কাপড়ের জন্য ত আর পরের দ্বারস্থ হইতে হয় না—এ আমাদের সুখ।"

পাঁড়াগেঁয়ে বোনের স্বামী প্যাখম ছিল পাশে বসিয়া সে বলিয়া উঠিল,

"হ্যাঁ সে কথা খুবই সত্য, আছি বেশ, তবে খামারের জমি আমাদের বড়ই কম। যদি আরও কিছু জমি পাই তবে কি আর কারো তোয়াক্কা রাখি?—কারো তোয়াক্কা রাখি না—স্বয়ং শয়তানেরও না।"

আলোর পিছনে ছিল শয়তান বসিয়া, সে শুনিয়া একটু হাসিল, ভাবিল,

চমৎকার! তোমাকে লইয়াই এখন খেলা যাউক। জমি তোমাকে আমি দিব—বিস্তর, কিন্তু তাহার পর হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

---

( ২ )

## ভূস্বামী

সেই দেশে একজন মহিলা জমিদার ছিল—তাহার অনেক জমি। মেয়ে মানুষ, নিজে সব দেখিয়া শুনিয়া উঠিতে পারিত না, তাই তাহার জমি দেখা

শুনার ভার দিয়াছিল সে একজন অবসর প্রাপ্ত সৈনিকের উপর। সৈনিকের মেজাজ—সে আশেপাশের চাষাদের উপর ভারী অত্যাচার করিত। প্যাখমরাও সেই সৈনিকের অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

হঠাৎ একদিন চাষারা খবর পাইল সেই মহিলা জমিদারটি তাহার সমস্ত জমি সৈনিকের নিকট বিক্রয় করিবে। তাহারা প্রমাদ গণিল। এখন উপায়? গ্রামের যত সব চাষা তখন দলবদ্ধ হইয়া জমিদার গিন্নীর নিকট যাইয়া দরবার করিল, বলিল,

"আমরা সব চাষারা মিলিয়া আপনার জমি বেশী দরে কিনিয়া লইব, আপনি ঐ সৈনিককে ও জমি দিবেন না, দিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।"

জমিদার গিন্নী সম্মত হইল। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তাহারা স্থির করিল, যে যতটা পারে জমি কিনিবে। প্যাখমের খামার জমি ছিল কম, হাতে নগদ পয়সা ছিল তার চাইতেও অল্প, কিন্তু জমির উপর লোভটা ছিল তাহার ষোল আনার উপর আঠার আনা।

জমির লোভে প্যাখমের দিন রাত্রি ঘুম হয় না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে শেষে স্থির করিল, তাহার গাইবলদ, বাসন, কাপড় প্রভৃতি কিছু কিছু বিক্রয় করিয়া সে টাকার যোগাড় করিবে। প্রায় একশ বিঘা জমি তাহার চাইই— অনেক চিন্তার পর সে স্থির করিল। অর্দ্ধেক টাকার তাহার জোগাড় ছিল। বাকি অর্দ্ধেক ধার করিবে। জমি কিনিবার সময় তাহার লোভ আরও খানিকটা বাড়িয়া গেল। সে প্রায় ১৫০ বিঘা জমি কিনিল।

সে বৎসর জমিতে আশাতীত ফসল হইল। এক বৎসরেই প্যাখম তাহার কর্জ্জা টাকা শোধ করিয়া দিল।

প্যাখমের মত সুখী আজ কে—সে এখন একজন স্বাধীন ভূস্বামী।

যখনই সে তাহার খামার জমির দিকে চাহিত তখনই তাহার দুনয়ন ভরিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িত। এই জমিতেই ত সে পূর্ব্বে দিন-মজুর ভাবে কত খাটিয়াছে। সে দিন আর এ-দিন !! সেও জমি আর এও জমি !!!

---

( ৩ )

## মায়া মরীচিকা

মানুষ ভাবে একরূপ, আর হয় অন্যরূপ। প্যাগম ভাবিয়াছিল জমি কিনিলেই তাহার সুখের অবধি থাকিবে না। গ্রামে প্রতিবেশীদের নিকট তাহার প্রতিষ্ঠা বাড়িবে, ফলে কিন্তু দাঁড়াইল অন্যরূপ। প্যাখমের জমি ছিল কিছু বেশী, তাই যখন তখন প্রতিবেশীদের গরু, ছাগল তাহার জমিতে চরিয়া বেড়াইত। এই লইয়া প্রতিবেশীদের সহিত তাহার বচসা আরম্ভ হয়। এই বচসা হইতে বিবাদ, ক্রমে বিবাদ লইয়া মামলা মকর্দ্দমা হয়। ফলে প্রতিবেশীদের সহিত তাহার মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। মামলা মোকর্দ্দমায় কতদিন যায়, প্যাখমের মনে আর সে সুখ নাই—চারিদিকেই অশান্তি।

এই সময়ে একদিন এক আগন্তুকের সহিত তাহার দেখা। কোন এক দূর দেশ হইতে সে আসিয়াছে। সে দেশে বিস্তর জমি এবং চাষ করিবার লোক নাই, তাই সে দেশের জমিদার দূরদেশ হইতে লোক আনিয়া জমি বিলি করিতেছে। প্রত্যেক লোক মাথা পিছু প্রায় একশ বিঘা জমি পাইবে, তাহাছাড়া সামান্য কিছু সেলামি দিলেই আরও অনেক জমি বন্দোবস্ত করিয়া

লওয়া যায়। আর সে কি উর্ব্বরা জমি, কি সুন্দর ফসল! এদেশের আর সে দেশের জমিতে আকাশ পাতাল তফাৎ।

প্যাখমের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাই ত! এমনই যদি সুন্দর সে দেশ হয় তবে কি কাজ আর এ ঝগড়া ঝাটির মধ্যে থাকিয়া। শেষে সে স্থির করিল, একবার দেশটা সে দেখিয়া আসিবে।

একদিন ষ্টিমার করিয়া সে দেশ দেখিয়া আসিল। যেমনটি আগন্তুক আসিয়া বলিয়াছিল ঠিক তেমনটিই সে দেশ। প্যাখম আর কালবিলম্ব না করিয়া জমিজমা যাহা ছিল সব বিক্রয় করিয়া কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিল, তাহার পর সপরিবারে দেশ ছাড়িয়া গেল বিদেশের মায়া মরীচিকায় লুব্ধ হইয়া।

---

( ৪ )

## আরও চাই

নূতন যায়গায় প্যাখম অনেক জমি পাইল, অনেক জমি কিনিল, কিন্তু তথাপি তাহার লোভের নিবৃত্তি নাই। নিজের খামার জমি ছাড়া সে অন্যের জমি এক সনা বন্দোবস্ত লইয়া তাহাতে আশাতীত ফসল পাইল। কিন্তু তাহাতেও তাহার লোভ কমিল না। তখন তাহার মনে হইল পরের জমি বছর-বন্দোবস্ত লইলে লোকসান অনেক, সবটা নিজের হইলেই ভাল হয়। ক্রমেই তাহার অবস্থা ভাল হইতেছিল, সুবিধাও জুটিয়া যাইতেছিল তেমনি, ভাগ্য তাহার প্রতি

প্রসন্ন কিনা—সে শুনিল খুব সুবিধা দরে একজন বিস্তর জমি বেচিবে ; তাহার লোভের অন্ত নাই—তৎক্ষণাৎ সে স্থির করিল সেই জমি সে কিনিবে।

একদিন প্যাখম বসিয়া আছে এই সময়ে এক পথিকের সঙ্গে দেখা। এ কথা সে কথার পর তাহাদের আলাপ বেশ জমিয়া গেল। তখন পথিক তাহার পরিচয় দেয়। বহু দূর দেশ হইতে সে আসিতেছে। সে দেশে নাম মাত্র খরচে বিস্তর জমি পাওয়া যায়। সে দেশের লোকেদের প্রকৃতি ভারী সরল, কিছু খাবার পরিবার জিনিষ উপহার দিলেই যত খুসি জমি পাওয়া যায়। আগন্তুক একখানি দলিল দেখাইল, কয়েক টাকার জিনিস কিনিয়া সে সেই দেশী লোকদিগকে উপহার দিয়াছিল, আর তাহার বিনিময়ে প্রায় ৫০ হাজার বিঘা জমি তাহাকে তাহারা লেখা পড়া করিয়া দিয়াছে। নদীর উপর জমি, অপর্য্যাপ্ত ফসল—যেন সোণার ক্ষেত। এমন বোকাও পৃথিবীতে জন্মায়।

প্যাখমের লোভ আবার বাড়িয়া উঠিল। প্যাখম ভাবিল, তবে এখানে আর জমি কিনিয়া কি লাভ? সেই আগন্তুকদের দেশেই যাইতে হইবে—সেখানে আমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না।

---

( ৫ )

## আশাতীত

প্যাখম অচিন দেশের উদ্দেশে রওনা হইল, সঙ্গে লইল উপহার দিবার জন্য নানা প্রকার সুন্দর সামগ্রী। সাতদিন পরে সে নূতন দেশে যাইয়া পঁহুছিল।

যাইয়া দেখিল সে দেশের লোকেরা ভারি সরল ও অতিথি ভক্ত। প্যাখমের নিকট হইতে নানা প্রকার দ্রব্যাদি উপগার পাইয়া তাহাদের মুখে হাসি আর ধরে না। একজন বলিল, আপনার জিনিস পাইয়া আমরা ভারি সন্তুস্ট হইয়াছি, কি চাই আপনার বলুন, আমাদের থাকে ত তাহা নিশ্চয়ই আমাকে দিব।

প্যাখম উত্তর করিল, "আপনাদের বিস্তর ভাল জমি পড়িয়া আছে, আমার জমি তেমন নাই, আমাকে যদি জমি দেন ত ... ..."

তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,

"নিশ্চয়ই—সামাণ্য কিছু মূল্য দিলেই, আপনি এইসব জমি পাইবেন। কোন জমি আপনার চাই বলুন"

প্যাখম ভাবিল লেখাপড়াটা পাকা করিয়া লওয়া দরকার, তাই বলিল "দলিল লেখা পড়াটা কোথায় বসিয়া হইবে?"

তাহাদের দলপতি হাসিয়া উঠিল, বলিল, "দলিলের কিছু আবশ্যক নাই, আমাদের কথাই দলিল, তবে দরকার মনে করিলে সহরে যাইয়া লেখাপড়া করিয়া লইতে পারেন।"

প্যাখম সন্তুস্ট হইল বলিল, "কত জমি আমি পাইব?"

"এক দিনের জমি আপনার—বাছিয়া লউন আপনি।"

"সে কি রকম?"

"সূর্য্যোদয়ের পর হইতে দিনের মধ্যে, যতটা জমি আপনি হাঁটিয়া আসিবেন ততটা জমিই আপনার। যদি সূর্য্যাস্তের মধ্যেই আবার এই স্থানে ফিরিয়া না আসিতে পারেন তবে জমির নির্দ্ধারিত মূল্য আমরা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইব।

প্যাখম ত রাজি হইয়াই আছে। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই যাত্রা করা হইবে স্থির হইল।

( ৬ )

## শয়তান

সমস্ত রাত্রি প্যাখম কত কি আকাশ কুসুম ভাবিয়াছে, একবারের জন্যও চোখ বুজে নাই। ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল—শেষ রাত্রে তন্দ্রার ঘোরে সে এক বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিল।

দূরে সে দেখিল সেই দেশের লোকেদের দলপতি যেন এক অট্টহাসি হাসিতেছে। হাসিতে হাসিতে তাহার পেটে খিল ধরিবার উপক্রম হইয়াছে, কারণ জানিবার জন্য সে নিকটে যাইতেই দেখিল—সে ত দলপতি নয়, সে সেই আগন্তুক যে তাহাকে এই দেশের সংবাদ দিয়াছিল, আরও নিকট যাইতে দেখা গেল এ সে আগন্তুকও নয়, এ সেই প্রথম পথিক যাহার কথায় সে প্রথম দেশের মায়া কাটায়। শেষ খুব ভাল করিয়া দেখিতে দেখা গেল সে ওসব কিছুই নয়, সে শয়তান—পুরাণের সেই শয়তান ; তাহার মুখে সেই শয়তানের অট্টহাসি। ও কিসের দিকে চাহিয়া সে হাসিতেছে ? সম্মুখে কে একজন উপুড় হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, পরিধানে জামা জুতা নাই, সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন, মুখে এক বিন্দুও রক্ত নাই—ফ্যাকাসে অসাড়। কে সে ? নিকটে চোখ আনিতেই দেখে—সে যে তাহারই অসাড় দেহ। স্বপ্ন দেখিয়াই সে ধড়ফড়িয়া উঠিয়া বসিল। ভোর হইতে আর বড় বিলম্ব নাই, সে তখন ব্যস্ত হইয়া পড়িল, যাত্রার উদ্যোগ করিবার জন্য।

———

( ৭ )

## লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

ভোর না হইতেই প্যাখম যাইয়া দলপতির সঙ্গে দেখা করিল। দলপতি বলিল, "হ্যাঁ সব প্রস্তুত আছে, এই স্থানে আমি বসিয়া রহিলাম। সম্মুখে যত জমি দেখিতেছেন সব আমাদের, ইহার মধ্য হইতে যে জমি আপনার ভাল মনে হইবে তাহাই আপনি নির্দ্দেশ করিয়া আসুন, তাহাই আপনার হইবে। আর আপনার টাকা এইখানে আপনার অনুচরের নিকট রহিল। সূর্য্যাস্তের মধ্যে এইস্থানে ফিরিয়া আসিলে আপনার নির্দ্দিষ্ট সমস্ত জমিই আপনার হইবে, আর ফিরিয়া না আসিতে পারিলে আপনার ঐ টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।

প্যাখম আর বৃথা কালব্যয় না করিয়া তখনি গন্তব্য পথে চলিল।

জমির লোভ বড় লোভ। যেখানেই ভাল জমি দেখে সেইখানেই দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাপাইতে হাপাইতে প্যাখম যায়। বেলা যত বাড়িয়া যাইতে লাগিল প্যাখমের গতি ততই দ্রুত হইতে লাগিল। রৌদ্রের তাপ তখন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করিয়া প্যাখম পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। দূরে এখনও কত উর্ব্বরা জমি পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু প্যাখমের পা যে আর চলে না, সর্ব্বশরীর ক্লান্তি ও অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। খাবার তাহার সঙ্গেই ছিল, কিছু খাইয়া সুস্থ হইয়া প্যাখম আবার দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। যেদিকেই ভাল জমি দেখে সেইদিকেই প্যাখম ছুটিয়া যায়, আবার দূরে আরও ভাল জমি দেখে—আবার সেইদিকে ছোটে।

এমনি করিয়া বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। কিন্তু প্যাখমের লোভের আর অন্ত নাই। আবার কোথায় সে ভাল জমি দেখিয়াছে অমনি সেই দিকে ছুটিল। সূর্য্য তখন ডুবিয়া আসিয়াছে—সূর্য্যাস্তের আর বড় দেরী নাই। এখনই তাহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে—না হইলে তাহার সব শ্রম, সব আশা ভরসা পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু ঐ দূরের ক্ষেতখানিতে কি সুন্দর ফসল হইয়াছে, এমন উর্ব্বরা জমি ত সে জীবনে কখনও দেখে নাই। বৃথাই সে এতক্ষণ পরিশ্রম করিয়াছে, ও জমি তাহার চাই-ই। আর সময় নাই, সূর্য্য প্রায় অস্তগত, ক্লান্ত অবসন্ন দেহ প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছে, কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছিল না, কিন্তু জমির আশা জীবনের আশাকে চাপাইয়া উঠিল—জীবন হাতে লইয়া সে কোন প্রকার ঐ ক্ষেতে পঁহুছিল।

কাটা গাছে, পাথরের কুচিতে তাহার গা পা সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এদিকে আর সময়ও নাই, সূর্য্য প্রায় ডুবিয়া গেল। প্যাখম তখন অনন্যোপায় হইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহার ক্ষত দিয়া রক্তস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে তখন তাহার দৃষ্টি ছিল না। হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে দৌড়িতে লাগিল। নিশ্বাস আর তাহার বহে না—জামা জুতা সে সব ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—উর্দ্ধশ্বাসে সে দৌড়িতে লাগিল—কিন্তু পা যে আর চলে না। জোরে নিশ্বাস বহিতেছিল, কামারের হাপোরর মত বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল। একবার ভাবিল আর যাইয়া কাজ নাই, কিন্তু তখনই জমির লোভ জীবন্ত হইয়া অতৃপ্ত সুখের মোহে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল—সে-সঙ্কল্প সে পরিত্যাগ করিল। পা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, তথাপি তাহার চেষ্টার ত্রুটী ছিল না। কিন্তু আর যে সূর্য্যকে দেখা যায় না—তবে কি তাহার সব শ্রম, সব আশা পণ্ড হইয়া যাইবে? দূরে দলপতিকে দেখা যাইতেছিল,



প্রাণপণে টলিতে টলিতে কোনক্রমে সে দলপতির নিকটে যাইয়া পঁহুছিল * * *
পড়িতে পড়িতেও সে হাত বাড়াইয়া দিল ।

সেখানে হয়ত সূর্য্য এখনও ডুবে নাই—এখনও হয়ত ভরসা আছে। একবার সে শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিল—প্রাণপণে টলিতে টলিতে কোনক্রমে সে দলপতির নিকট যাইয়া পঁহুছিল—তাহার অবসন্ন শিথিল দেহ দলপতির পদতলে লুটাইয়া পড়িল। পড়িতে পড়িতেও সে হাত বাড়াইয়া দিল, কিন্তু দলপতির নির্দ্ধারিত স্থানটিতে সে তখনও পঁহুছে নাই। জীবনের অবসান মূহূর্ত্তে এই চিন্তাই তাহার বড় হইয়া উঠিল।

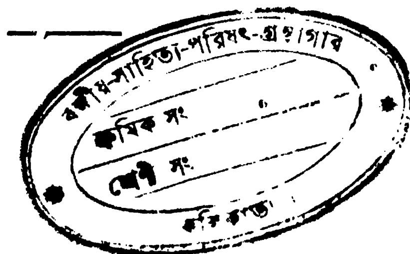
দলপতি হো হো করিয়া অট্ট হাসিল, "জমির লোভ—অনেক জমি পাইয়াছ পান্থ !"

প্যাখমের অনুচর সসব্যস্তে তাহার প্রভুর দেহ উঠাইল—কিন্তু সে দেহে আর প্রাণ ছিল না।

দলপতি তখনও বীভৎস হাসি হাসিতেছিল—সম্মুখে প্যাখমের আড়ষ্ট মৃত দেহ।

ধীরে ধীরে সে উঠিল, সম্মুখে একখানি কুঠার দেখাইয়া অনুচরকে বলিল, "দাও কবর"

অত জমির কিছুই আবশ্যক হইল না—মাত্র সাড়ে তিন হাত জমি—তাহাতেই তাহার শেষ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।



# "আমার দেশ" সেবা-ভাণ্ডার

তোমরা এণ্ড্রুজ সাহেবের নাম শুনিয়াছ। ইনি একজন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাপ্রাণ পুরুষ। এই দেশকে তিনি আপনার করিয়া নিয়াছেন, এই দেশের অধিবাসীও তাঁহার আপন হইয়া গিয়াছে, এ দেশের তরে তাঁর প্রাণ কাঁদে, এদেশবাসীর দুঃখের কথা শুনিলে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। সম্প্রতি এণ্ডরুজ সাহেব উত্তরবঙ্গের বন্যাভাসা দেশগুলির বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছেন, এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলুম, যেখানে তিন দিন ধরে কেউ অন্নজল পায়নি, অনাহারে কাটিয়েছে, মৃতকল্প হয়ে আছে। এই সব মরণাপন্ন লোকগুলিকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে টাকা চাই, এখনো লাখে লাখে টাকা জোগাড় কর্‌তে হবে, নইলে এরা বাঁচবে না, অনাহারে মারা পড়বে!" অবস্থা এখনও কত ভীষণ ভাবিয়া দেখ একবার! সেই ত কবে বন্যা হইয়া গিয়াছে, বন্যার সে জল কবে কোথায় নামিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু যে দাগ—যে দুঃখ সে রাখিয়া গিয়াছে, এতদিন পরেও সে দাগ মুছিল না, সে দুঃখের অবসান হইল না!

কিছুই যে হয় নাই, তা নয়, হইয়াছে! এই যে সাড়ে তিন চারলক্ষ টাকা উঠিল, এই যে দেব-কল্প আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অধীনে হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবক বন্যাপীড়িত অঞ্চলে গিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া, আপন আপন ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সেই সব অভাগাদের আহার দিলেন, বস্ত্র দিলেন, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই করিয়া দিলেন—হইয়াছে! তবে সম্পূর্ণ হয় নাই।

কেন যে সম্পূর্ণ হয় নাই তাহার কারণও বেশ সুস্পষ্ট রহিয়াছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইলে মানুষকে বড় অল্প বেগ পাইতে হয় না;

এই বন্যা নিমিষে অর্দ্ধবঙ্গের উপর দিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল, ভাসাইয়া, ভাঙ্গিয়া উচ্চ নীচ সমভূমি করিয়া দিয়া গেল—মানুষকে তাহারই বিপক্ষে দাঁড়াইতে হইবে। প্রকৃতি ধ্বংসলীলা খেলিয়া গিয়াছেন, নর্ত্তনের তালে তালে শস্য গিয়াছে, ঘর গিয়াছে, ঘরে যে অন্ন ছিল বস্ত্র ছিল তাহাও গিয়াছে, গৃহপালিত জীব গিয়াছে,—প্রকৃতি সব লইয়া গিয়াছেন—তাঁর অবশ্য খুব বেশী সময় লাগে নাই, বেশী কষ্টও হয় নাই, আপনার বেগে আপন হুঙ্কারে হু হু শব্দে আসিয়াছেন, সামনে যাহা দেখিয়াছেন, সাথে লইয়া গিয়াছেন—আর মানুষ! মানুষকে আবার সেই সব গড়িয়া লইতে হইবে। তাহাকে উদরে অন্ন দিতে হইবে, কটিতে বস্ত্র দিতে হইবে, আর মাথা গুঁজিবার ঠাঁইও গড়িতে হইবে অথচ তাহার কিছুই নাই। কোথায় পাইবে সে অন্ন? শেষ কণাটিও ত প্রকৃতি তাঁর সাথে লইয়া গিয়াছেন! কোথায় তার বস্ত্র? কৌপিনটুকুও ত বন্যাস্রোত তাহার তরে রাখিয়া যায় নাই! কেমন করিয়া সে মাথা গুজিবার ঠাঁই করিবে? পয়সা চাই! পয়সা সে কোথায় পাইবে?

তাই ত সারা ভারতের লোক তাহাদের সাহায্য করিতে ছুটিয়াছে! তাই ত আচার্য্য-দেব প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার অধীনস্থ স্বেচ্ছাসেবকগণ আজও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আজও অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, আজও অন্ন ও বস্ত্রের জন্য দেশবাসীর কাছে পুনঃ পুনঃ আবেদন পাঠাইতেছেন। দেশবাসী প্রথম হইতেই সে ডাকে সাড়া দিয়াছে, আশা হয় শেষ পর্য্যন্ত অমনিই সাড়া দিবে!

"আমার দেশের" সেবা-ভাণ্ডারে আজ ৫০॥০ টাকা উঠিয়াছে। টাকাটা বেশী নয় নিশ্চয় কিন্তু এ গর্ব্ব ত আমরা করিতে পারি যে এই টাকা দিয়াছে তাহারাই, যাহারা সম্পূর্ণই পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনের মুখাপেক্ষী; দিয়াছে তাহারাই যাহাদের স্বতন্ত্র সম্পত্তি বা আয় কিছু নাই, হয়ত বা দিয়াছে

তাহারাই যাহাদের এই পয়সা দিতে নিজেদের কয়দিন টিফিন খাওয়া হয় নাই, কি, কোন একটা সখের জিনিষ কেনা হয় নাই। একি অল্প গর্ব্বের বস্তু!

আমরা ১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট সেই দিন পর্য্যন্ত প্রাপ্ত "আমার দেশ" সেবাভাণ্ডারের টাকা দিয়া আসিব। তোমরা যে এই দেব কল্প মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৫ই ফাল্গুনের পরে যে টাকা আসিবে তাহাও আবার জমাইয়া পরে দিব।

একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। আমাদের একটি গ্রাহিকা শ্রীমতী (কুমারী) বেলা ঘোষ—একখানি পত্র লিখিয়া আমাদের জানাইয়াছেন, তিনি স্কুলের সহপাঠিদের নিকট হইতে আরও চাঁদা তুলিয়া পাঠাইবেন। তাঁরা কয় ভাই বোন মিলিয়া দশ টাকা পাঠাইয়াছেন, আরও চেষ্টা করিতেছেন; অতি সাধু প্রস্তাব। অনেকেই ত স্কুল কলেজে পড়েন, সেখানে ছেলে মেয়েদের মধ্যে চেষ্টা করিলে আরও কিছু টাকা উঠিবে বলিয়াই আমাদের মনে হয়; দেশবাসীর এই দুঃখ বিমোচনে সকলেই যে কিছু কিছু দিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কুমারী বেলার তিন বছরের বোনটির কথাও এখানে বলা দরকার মনে করি। দিদিরা সব টাকা পাঠাইবেন আয়োজন করিতেছেন, সে কোথা থেকে একটি টাকা আনিয়া দেয়। তার দিদি হাসিয়া বলেন, এক টাকা নেব না! তিন বছরের মেয়ে মিনা কাঁদিয়া বলে, তারা খাবার খাবে যে! তখন আর তার দিদি টাকাটি'না নিয়ে পারেন নি।

---

# চাঁদার তালিকা ঃ

পূর্ব্বের প্রাপ্ত ঃ—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কুমারী সুষমা নাগ | ২৲ |
| ২। | শ্রীমান বিজয়কুমার মিত্র | ৫৲ |
| ৩। | শ্রীমান অর্ণবকুমার বসু | ১৲ |
| ৪। | কুমারী মীনা সেন | ২৲ |
| ৫। | কুমারী কল্যাণকলিকা দত্ত ( বন্ধু ) পাটনা | ১৲ |
| ৬। | কুমারী আশামুকুল দত্ত ( গ্রাহিকা ) পাটনা | ১৲ |
| ৭। | কুমারী মুকুলরাণী দাস ( গ্রাহিকা ) মজঃফরপুর। | ১৲ |
| ৮। | শ্রীমান বিভূতি ভূষণ মিত্র ( গ্রাহক ) বর্দ্ধমান | ২৲ |
| ৯। | শ্রীমান সুকুমার মিত্র—যশোহর ( গ্রাহক ) | ১৲ |
| ১০। | শ্রীমান জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার (গ্রাহক) রাজনগর | ১৲ |
| ১১। | কুমারি আভারাণী মজুমদার ( গ্রাহিকা ) | ১৲ |
| ১২। | কুমারি বেলারাণী বসু ( বন্ধু ) | ১৲ |
| ১৩। | শ্রীমান কামাখ্যাচরণ চট্টোপাধ্যায় | ॥০ |
| ১৪। | শ্রীমতী বিজলীপ্রভা দেবী ( গ্রাহিকা ) | ৫৲ |

| | | |
|---|---|---|
| ১৫। | শ্রীমান সুকুমার মিত্র ( গ্রাহক ) ( বেনারস সিটি ) | ৪৲ |
| ১৬। | কুমারী হিমাংশুবালা দে ( গ্রাহিকা ) | ১৲ |
| ১৭। | „ সুধাংশুবালা দে ( বন্ধু ) | ১৲ |
| ১৮। | „ শীতাংশুবালা দে ( বন্ধু ) | ১৲ |
| ১৯। | শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র দে ( বন্ধু ) | ১৲ |
| ২০। | „ সুধীরচন্দ্র দে ( „ ) ( মীরাট ক্যান্টনমেণ্ট ) | ১৲ |
| ২১। | শ্রীসীতালাল ( গ্রাহক ) বিষণপুর, ( সীতামারি ) | ৫৲ |
| ২২। | শ্রীমতী শশিবালা সরকার ( গ্রাহিকা ) গম্ভীরা, মালদহ | ২৲ |
| | | ৪০৷৷০ |

এই মাসে প্রাপ্ত :—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | কুমারী মিনা ঘোষ ( বন্ধু ) | ১৲ |
| ২। | শ্রীমান সুকুমার ঘোষ ( ঐ ) | ৷৷০ |
| ৩। | কুমারী মলিনা ঘোষ ( ঐ ) | ৷৷০ |
| ৪। | " সুপ্রভা ঘোষ ( ঐ ) | ৩৲ |
| ৫। | „ বেলা ঘোষ ( গ্রাহিকা ) চুঁচুড়া | ৫৲ |
| | মোট | ৫০৷৷০ |

# খবরাখবর।

আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহর আর ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে তফাৎ এমন কিছু বেশী নয়। মোটে ৩২০০ মাইল অর্থাৎ ষোল শ ক্রোশ। এই ষোল শ ক্রোশের দূরত্বের ওপর বিনাতারে টেলিফোঁর কথাবার্ত্তা চলে গেছে। এই ১৬ই জানুয়ারী তারিখে আমেরিকা টেলিফোঁ ও টেলিগ্রাফ কোম্পানীর সহকারী সভাপতি মিঃ কার্টি মহাশয় লণ্ডনের ছ'জন লোকের সঙ্গে দিব্যি কথা কয়েছেন। মারকনি সাহেব যিনি বিনি তারে খবরাখবর পাঠানোর প্রধান আবিষ্কারক তিনিও মিঃ কার্টির সঙ্গে ঐ দিন বিনি তারের টেলিফোঁতে কথাবার্ত্তা কয়েছেন আর বলেছেন—ভারি চমৎকার হয়েছে। তিনি আশা করেন যে শীঘ্রই এই বিনিতারে খবরাখবরের বন্দোবস্তটা স্থায়ীরূপে দেখা দেবে।

*　　　　*　　　　*

সব দেশের সব জাতিরই একটা করে' নিজের ভাষা আছে দেখা যায়। আমরা বাঙ্গালী. বাঙ্গালা আমাদের ভাষা। যদি ধরা যায় যে বাঙ্গালী জাতটা যতদিনের পুরাতন বাঙ্গালাভাষা ত ততদিনের নয় তবে বাঙ্গালা আমাদের নিজস্ব ভাষা হল কি করে? তার উত্তর হচ্ছে বাঙ্গালা না হয় নাই হল, ভারতবর্ষের ভাষাই আমাদের ভাষা, যেহেতু ভারতবর্ষ আমাদের দেশ এবং আমরা এত কোটি লোক সবাই ভারতবাসী। ইংরেজের ভাষা ইংরেজী, জার্ম্মানদের ভাষা জার্ম্মাণ. ফরাসাদের ভাষা ফরাসী—এমনি ধারা! এমন একটা জাত আছে যাদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। পরের নিয়েই তারা চালিয়ে দিচ্ছে। জার্ম্মাণ, ফরাসী ও ইতালিয়ান এই তিন ভাষাই সুইস্‌দের মাতৃভাষা বলে পরিগণিত। চারভাগের

তিনভাগ অধিবাসী জার্ম্মাণ ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়, কাজ কর্ম্ম করে, বাকী যে একভাগ—তার কতক ফরাসী কতক ইতালিয়ান ভাষা বেছে নিয়েছে।

* * *

তোমরা যেন তাই বলে ভেবো না যে এত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভাষী বলে সুইস্‌দের মধ্যে মনের কিছুমাত্র গরমিল আছে। আমাদের এইদিকের বাঙ্গালায় যারা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এসে একটু টেনে টেনে কথা বলে তাদের যেমন আমরা "বাঙ্গাল" বলে উপহাস করি, তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করতে চাই না, সুইজারল্যাণ্ডেও বুঝি তেমনি! না গো মহাশয়, তা নয়। সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মনের মধ্যে কোন গরমিল নেই আর এদের দেশভক্তির তুলনা করাও অসম্ভব। পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে দেশভক্ত বলে সবাই এদের শ্রদ্ধা করে থাকে। আমার বক্তব্য এই যে, ভাষা ভিন্ন হলেও জাতি ভিন্ন হয় না।

* * *

ছেলেদের অভিধান। ফ্রেডরিক কুদার্ট একজন আমেরিকার হাস্যরসিক আইন ব্যবসায়ী। ইনি ছেলেপুলে বড্ড ভালবাসতেন। তাঁর লাইব্রেরীর বহুমূল্যবান গ্রন্থরাজির মধ্যে একখানি "শিশু-অভিধান" পাওয়া গিয়েছিল। "শিশু-অভিধান" খানি কি রকম আমরা নিচে তার একটু নমুনা দিচ্ছি দেখ:—

Dust—Mud with the juice squeezed of it!

ধূলা—কর্দ্দম যাহার মধ্য হইতে জল শুষিয়া গিয়াছে।

Snoring—Letting off sleep

নাক ডাকা—নিদ্রায় হাঁফ ছাড়া।

Apples—The bubbles that apple trees blow.

আপেল—আপেল গাছ যে সব বুদ্বুদ ছড়ায়।

Fan—A thing to brush the warm off with

পাখা—গরম তাড়াইবার একরকম জিনিষ।

Ice— Water that went to sleep in cold

বরফ—যে জল ঠাণ্ডায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বোধ হয় কুদাট সাহেব আরও অনেক এই রকম কথা আর তার মানে লিখেছিলেন; আমরা কিন্তু তার খোঁজ পাইনে। তবে আমরা নিজেরাই তাঁর পন্থা অনুসরণ করে' কতকগুলা কথা তৈরী করে দিচ্ছি। তোমরাও অবসর সময়ে চেষ্টা করে দেখতে পার।

ভাত—চাল জলে সিদ্ধ হইলে যে অবস্থা পায়।

হাসি—যাহা পেটে খিল ধরাইয়া দেয়, দাঁতগুলিকে বিকশিত করিয়া ফেলে।

মধু—মৌমাছি যাহা সঞ্চয় করে এবং আমরা যাহা লুণ্ঠন করিয়া থাকি।

চোর—যে দরকারের সময় জিনিষ খুঁজিয়া লইয়া যায়, অবশ্য বলে না এই কারণে, যে জিনিষের মালিক হয় সে সময়ে নিদ্রিত অথবা অন্যমনস্ক থাকে—তাকে বিরক্ত করাটা অভদ্রতা এই ভাবিয়া। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

* * *

বৃহত্তম জলাধার। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জলাশয় হচ্ছে—ধোবারের পুষ্করিণীটি। এটি রাজপুতানার অন্তর্গত উদয়পুরের দশক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। অবশ্য হ্রদগুলি এর চেয়ে অনেক বড় বটে, কিন্তু সে সব ত আর মানুষের কাটা নয়, প্রকৃতি তাদের অমনি করে কেটেই দিয়েছে। এ'টি মানুষের তৈরী এই যা।

* * *

ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নাম তোমরা শুনেছ বোধ হয়। আমাদের দেশে যেমন ইম্পীরিয়েল ব্যাঙ্ক, বিলেতের তেমনি সব চেয়ে বড় ব্যাঙ্ক হচ্ছে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড এর মূল ধন কত টাকা জান? চমকো না যেন, আস্তে আস্তে বেশ গুণে গুণে পড়ে ফেল। আর পড়েই একবার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বল—সাবাস্! টাকাটা হচ্ছে ২১৮২৯৫০০০৲

* * *

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঋতুর আবির্ভাব হয়ে থাকে। ইংলণ্ডে শীতকাল হচ্ছে নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী; আমেরিকায় ডিসেম্বর, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী হচ্ছে ভীষণ শীত।

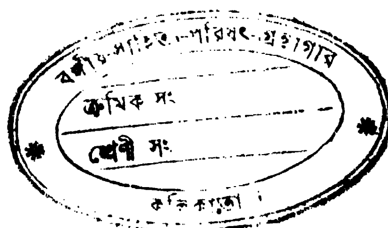
* * *

গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যাণ্ডে গত যুদ্ধের সময় ৪,৯৭০,৯০২ লোককে সৈনিকদলে ভর্ত্তি করা হয়েছিল।

* * *

নিউইয়র্কে সবচেয়ে যে বাড়ীটা উঁচু (আকাশস্পর্শী) সেটির নাম হচ্ছে উলওয়ার্থ বিল্ডিং ৭৯২ ফিট উঁচু। গড়তে ৩৫০০০০০০৲টাকা খরচ হয়েছিল।

* * *



পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ঘণ্টা একটি আছে, জাপানের ওসাকার একটি মন্দিরে। এর উচ্চতা ২৪ ফিট আর ওজনটি বেশী নয়, এই ৫৪০০ মণ। শব্দটা কেন যে আমরা এখান থেকে শুন্‌তে পাই না, তাই ভাবি।

* * *

কেঁচোদের চোখ নেই কিন্তু এরা দেখতে ঠিক পায়। কি করে বল ত? গায়ের চামড়ার ভেতর দিয়ে আলো যায় এদের, তাইতেই এরা দেখতে পায়।

* * *

তোতলামি সারাবার তিনটি উপায় ঃ—(১) একলা ঘরে খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়বে। (২) কথা আরম্ভ করবার আগে খুব জোরে একটি নিঃশ্বাস টেনে নেবে আর যখন বুঝবে গোলমালের যোগাড় হয়েছে—তখন তো তো গোঁ গোঁ পোঁ পোঁ না করে একদম থেমে যাবে, আবার নিঃশ্বাস টেনে সুরু করবে। (৩) যে কথাটা আটকাবে বলে মনে কর, সে কথাটা বলবার আগে খুব জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিবে। যদি কেউ তোতলা থাক, একবার পরখ করে দেখো, আমার এই অনুরোধ। কষ্ট ত নেই-ই আর খরচাও নেই, বন্ধুর উপদেশ, দেখই না একবার।

* * *

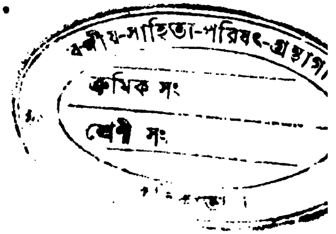
খবর পেলুম জাপানে ৩০০,০০০ রিক্‌-স গাড়ী ছিল, ২২শ বছর আগে, এখন ১০০,০০০ ঠেকেছে। বাকীটা ভারতে এল কি-না খোঁজ নেওয়া দরকার।

* * *

আগ্নেয়গিরির ধূলা বাতাসে ভর করে' ৫০০ মাইল পর্য্যন্ত ছুটে যায়। ভাগ্যে আমাদের আড়াই শো ক্রোশের মধ্যে কোন আগ্নেয়গিরি নেই—তাহলে কি বিপদই না হত।

* * *

ঘণ্টায় ১৪৮ মাইল—সম্প্রতি বিলাতে একটা 'নূতন ধরণের ব্যোমজান আবিষ্কৃত হয়েছে। ইহা প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে ১৪৮ মাইল চলতে পারে। জগতে অন্য কেহই এযাবত এমন চমকপ্রদ আবিষ্কার করতে পারে নাই। এ ব্যোমযান খানায় একত্রে ১১ জন যাত্রী বসবার সুব্যবস্থা আছে।




# মানবের দেহযন্ত্র।

[ গত মাসের ২০ পৃষ্ঠার পর ]

শুধু তাই নয় ;—গবর্ণমেণ্টের রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য সমস্ত দেশটার সমস্ত খবর যেমন তাঁহাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা দরকার,—এবং

ইন্দ্রিয়।

সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য যেমন সারা দেশময়, বিশেষতঃ সীমান্তপ্রদেশে, গবর্ণমেণ্টের অনেক গোয়েন্দার আড্ডা আছে, আমাদের শরীরের কার্য্যও তেমনি সুশৃঙ্খলে চালাইবার জন্য আমাদের শরীরের প্রত্যেক অংশের প্রত্যেক খুঁটিনাটি খবর আমাদের মস্তিষ্কের নিকট পৌঁছান দরকার,—এবং সে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য মানবদেহের প্রতি স্থানেই তেমনি অসংখ্য গোয়েন্দার আড্ডা আছে। এই গোয়েন্দার আড্ডাগুলিই মানবদেহের ইন্দ্রিয়। ইহার মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ ও নাসা—এই তিনটী প্রধান গোয়েন্দার আড্ডা।—ইহা ছাড়া অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোয়েন্দার আড্ডা—স্পর্শনেন্দ্রিয়, স্বাদেন্দ্রিয় ইত্যাদি বিস্তৃতভাবে সারা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান। এই সমস্ত গোয়েন্দা বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া স্নায়ুর মারফৎ মস্তিষ্কে প্রেরণ করে,—আর সেই জন্যই মশাটী কামড়াইলেও যেমন মস্তিষ্ক তাহা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারে,—পেটে ক্ষুধা লাগিলেও তেমনি সে সংবাদটী মস্তিষ্কে পৌঁছিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। কত যে বিচার করিয়া এই গোয়েন্দার আড্ডাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা শরীরের নানাস্থানে ইহাদের অবস্থিতি স্থানটুকু লক্ষ্য করিলেই বুঝা

যায়। ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, যে, মানুষের প্রধান তিনটী ইন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা, যদি মুণ্ডে অবস্থিত না হইয়া পায়ের গোড়ালীর কাছে থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে পদে পদে কিরূপ অসুবিধায় পড়িতে হইত ?—মানুষের আত্মরক্ষার পক্ষে তাহারা কতটা অনুপযোগী হইত ? যুদ্ধক্ষেত্রে চারিপাশের শত্রুসেনার গতিবিধি ও অবস্থান জানিবার জন্য সেনাদলের গোয়েন্দারা খুব উঁচু গাছের ডগায় আরোহণ করে,—আজকালকার উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে, এরোপ্লেনে চড়িয়াও গোয়েন্দারা সংবাদ সংগ্রহ করে ;—ইহার কারণ, উঁচু জায়গা হইতে চারিপাশের অবস্থার কথা জানা যত সহজ, নীচু স্থান হইতে তাহার শতাংশের এক অংশও নয়। মানবদেহটীকেও তেমনি সর্ব্বাংশে আত্মরক্ষার উপযোগী করিবার জন্যই যেন স্রষ্টা ইহার প্রধান গোয়েন্দার আড্ডাকয়টীর স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শরীরের সর্ব্বোচ্চ অংশে—মুখমণ্ডলে।

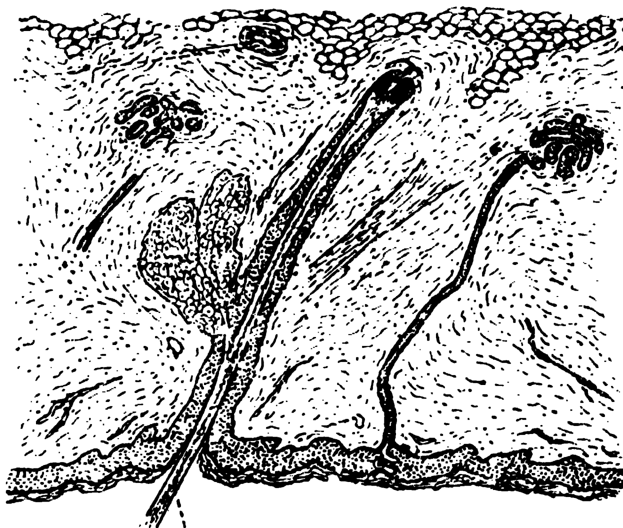
অস্থি, উপাস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা তোমাদিগকে বলিলাম,—মানবদেহটীকে কার্য্যপযোগী করিবার জন্য এ গুলি যে অপরিহার্য্য তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু এই অভিনব দেহ যন্ত্রটীর প্রত্যেকটী অংশ যাহাতে জীবিত ও কার্য্যক্ষম থাকিতে পারে, সেজন্য ইহার তো খোরাক আবশ্যক! প্রকৃতির নিয়মে প্রতি-মুহূর্ত্তেই সকল জিনিষের ক্ষয় হইতেছে—মেরামত না করিলে, আজ যে বাড়ী তুমি নির্ম্মাণ করিলে, কয়েক বৎসর পরে তাহার আর সে চেহারা দেখিবে না ;—শুধু বাড়ী কেন,—কল কারখানা, জাহাজ নৌকা প্রভৃতি, যে জিনিষই হউক না কেন মেরামত না করিলে কিছুই আর পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্যোপযোগী থাকে না। মানবের অভিনব দেহযন্ত্রটীর সম্বন্ধেও প্রকৃতির এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ব্যবহারে এবং অব্যবহারে এই প্রকারে মানবদেহের প্রতিনিয়ত যে ক্ষয় সাধিত

রক্ত ও রক্তনালী।

হইতেছে, শুধু যে তাহারই পূরণ একান্ত আবশ্যক তাহা নহে। কল চালাইতে হইলে, শুধু কলের জীর্ণ সংস্কারই যেমন পর্য্যাপ্ত নয়,—কল চালাইবার শক্তির জন্য যেমন কয়লাও পুড়াইতে হয় ;—তেমনি আমাদের দেহযন্ত্রটীর নিকট হইতেও কাজ আদায় করিতে হইলে শুধু ইহার ক্ষয়পুরণ করিলেই চলিবে না ;—ইহার প্রতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশটীতে পর্য্যন্ত শক্তি যোগাইতে হইবে। কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, দেহ যন্ত্রটীর এই জীর্ণ সংস্কারের মাল মশলা এবং এই শক্তি উৎপাদনের উপযোগী খোরাক ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশে পৌঁছিবে কি প্রকারে? প্রতি মাংসপেশী, প্রতি অস্থিখণ্ড, প্রতি স্নায়ুর অভ্যন্তরে যে ক্ষয় হইতেছে, সেখানে পৌঁছান তো সহজ ব্যাপার নয় ;—তাহার পথই বা কোথায়?

এই উদ্দেশ্যেই—এই অভাব পূরণের জন্যই রক্ত ও রক্তনালীর সৃষ্টি। যেমন করিয়া এই বিপুল কলিকাতা সহরের প্রতি পাড়ায় পাড়ায়, প্রতি গৃহে গৃহে কলের জল সরবরাহ হয়, ঠিক তেমনি করিয়াই মানবদেহের প্রতি নিভৃত অংশে অস্থি, উপাস্থি, মাংসপেশী, মস্তিষ্ক, স্নায়ু ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি ক্ষুদ্রতম অংশে পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালিত হয়। টালার জলপূর্ণ ট্যাঙ্ক গুলি হইতে যেমন প্রথমে এক বিরাট জলবাহী নল বাহির হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত সরু নলে বিভক্ত হইয়া সহরের বড় বড় রাস্তাগুলি ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে,—তার পর বড় রাস্তার এই এক একটা নল হইতে অসংখ্য সূক্ষ্মতর নল বাহির হইয়া দুই পাশের ছোট ছোট রাস্তায় প্রবেশ করিয়াছে ;—এবং এইভাবে যেমন পরিশেষে প্রত্যেক গলির নল হইতে এক একটী সরু সরু নল প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার কলগুলির মুখ পর্য্যন্ত জল আগাইয়া দিতেছে মানবদেহের রক্ত প্রবাহও তেমনি প্রথমে এক স্থূল রক্ত নালীতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর রক্ত নালীর মধ্য দিয়া গিয়া অবশেষে অসংখ্য

এত সূক্ষ্ম রক্তনালীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে সে সকল রক্তনালী কেবল মাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দেখা যায়, এই সূক্ষ্মতম রক্তনালী গুলিকে কৈশিক রক্তনালী (Capillary blood) বলে ; আর তদপেক্ষা স্থূলতর রক্তনালীগুলিকে ধমনী বলে ( arteries & arterioles )। সরবতে যেমন মিষ্ট ইত্যাদি গোলা থাকে, এই সকল ধমনী ও কৈশিক রক্তনালীর মধ্যস্থিত রক্তেও তেমনি শরীরযন্ত্রের জীর্ণসংস্কারের উপযোগী মালমশলা এবং শক্তি উৎপাদনের উপযোগী খোরাক গোলা থাকে। তবেই বুঝিলে রক্ত মানুষের পক্ষে কিরূপ অপরিহার্য্য



রক্ত যে শুধুই এই দুই কার্য্য করে, তাহা নহে—রক্তের আরও অনেক উপকারিতা আছে। তাহার মধ্যে প্রধান দুইটী। প্রথম, রক্তই মানবদেহের আবর্জ্জনা বহিয়া লইয়া পয়ঃপ্রণালীর কার্য্য করে, দ্বিতীয়, রক্ত শরীরের শত্রুদের

সহিত যুদ্ধ করে। সে সব কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটা বিষয় দেখা যাউক। আচ্ছা, ধমনীর মধ্য দিয়া যে রক্ত কৈশিক রক্তনালীগুলির মধ্যে প্রবাহিত হইয়া আসিল ;—সে রক্তের সবটাই তো আর দেহ যন্ত্রের প্রয়োজনে খরচ হইল না।—তবে বাকিটা কোথায় গেল ?—এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে সহরের জল সরবরাহের অবস্থাটা আর একবার বিবেচনা করা যাউক। যত জল কল হইতে আইসে তাহার কিয়দংশ আমরা খাইয়া ফেলি —কিয়দংশ বা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় ;—কিন্তু অধিকাংশ জলই নর্দ্দামা বাহিয়া রাস্তার নীচের ড্রেণ বাহিয়া অবশেষে গঙ্গায় যাইয়া পড়ে। এই ড্রেণের পাইপ গুলি রাস্তার নীচে দিয়া যাইবার সময়, যে সব জলের নল বাড়ীর দিকে আসিয়াছে, তাহাদেরই পাশ দিয়া গিয়াছে। এই ভাবে নর্দ্দামার জল গঙ্গায় পড়ে, —আবার গঙ্গা হইতে সেই জল পাম্প করিয়া তুলিয়া—পরিস্কার করা হয়, তাহার পর সেই জল আবার টালার ট্যাঙ্কে ভরা হয়—আবার তাহা নল বাহিয়া বাড়ীতে বাড়ীতে আসে। মানবদেহের রক্তের সম্বন্ধেও ঠিক একই ব্যবস্থা। কৈশিক রক্তনালীর মধ্য দিয়া যে রক্ত শরীরের ক্ষুদ্রতম অংশগুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার কিয়দংশ শরীরের প্রয়োজনে লাগিল, কিন্তু অধিকাংশ রক্তই পুনরায় আর একদফা রক্তনালী দিয়া চলিয়া যায়। এই নূতন দফা রক্তনালীকে শিরা বলে। এই শিরাগুলিও প্রথমতঃ সংখ্যায় যেমন অসংখ্য পরিধিতে তেমনি সরু ;—কিন্তু ধমনী গুলির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে ক্রমে ক্রমে ইহারা সংখ্যায় যেমন এক দিকে কমিতে থাকে পরিধিতে তেমনি বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে একটি অতিস্থূল শিরায় পরিণত হইয়া হৃৎপিণ্ডে আসিয়া শেষ হয়। এই হৃৎপিণ্ড জিনিষটী যে কি, তাহা কি তোমরা জান? মোটা মুটী ধরিতে গেলে, হৃৎপিণ্ড হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত একজোড়া পাম্প। যেমন একই দেয়ালের

হৃৎপিণ্ড। দুইদিকে দুইখানি ঘর থাকিতে পারে অথচ তাহাদের মধ্যে কোনও সংযোগ নাও থাকিতে পারে হৃৎপিণ্ডের দুইটী পাম্পও তেমনি একই দেওয়ালের দুই পাশে অবস্থিত; কিন্তু পাম্প দুইটির মধ্যে কোনও সংযোগ নাই। একটী পাম্প ডান দিকে অবস্থিত, অপরটী বাঁদিকে। শিরা দিয়া যে রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা এই ডান দিকের পাম্পে আসিয়া পড়ে,—বাঁদিকে যায় না।

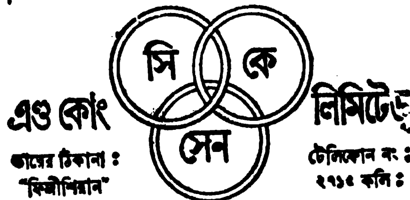
পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিরা দিয়া যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহা ধমনীর রক্ত বা কৈশিক রক্তনালীর রক্ত হইতে কিছু বিভিন্ন ধরণের। কেন না, কৈশিক রক্তনালী হইতে রক্ত শিরায় আসিবার পূর্ব্বে যেমন দেহযন্ত্রের প্রয়োজনীয় অনেক দ্রব্য ইহা হইতে বাদ পড়িয়াছে, তেমনি শরীরের অনেক আবর্জ্জনা আবার ইহার সহিত মিশিয়াছে। শিরার প্রবাহিত রক্তে যে যে জিনিষ বাদ পড়িল তাহার মধ্যে অক্সিজেন নামক গ্যাস একটী প্রধান;—আর আবর্জ্জনা যাহা আসিয়া মিলিল, তাহা প্রধানতঃ কার্ব্বন ডাইওক্সাইড নামক আর একপ্রকার গ্যাস। এই অক্সিজেন গ্যাস শরীরের পক্ষে এত প্রয়োজনীয় যে, ইহার বিহনে মানুষ তিন মিনিটও বাঁচিয়া থাকিতে পারে না;—আর এই কার্ব্বন ডাইওক্সাইড গ্যাস অতি অল্প মাত্রায় শরীরের পক্ষে উপকারী বটে, কিন্তু সামান্য একটু মাত্রাধিক্য হইলেই ইহা শরীরের মহা অনিষ্ট করে। কাজেই দেখা যাইতেছে, শিরায় প্রবাহিত রক্ত শরীরের পক্ষে মোটেই উপকারী নয়। নর্দ্দামার জল যেমন সংশোধিত না হইলে আর কোনও কাজে লাগে না, শিরায় প্রবাহিত রক্তও তেমনি শোধিত না হইলে শরীরের কোনও কাজে লাগে না। শিরার এই রক্তশোধনের কারখানা হইতেছে ফুস্‌ফুস্। শিরা বাহিয়া অক্সিজন-হীন এবং কার্ব্বন-ডাইওক্সাইড-পূর্ণ রক্ত যেই হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকের পাম্পে আসিয়া



# ইস্, বাবা কি দুষ্টু!—

কী ভীষণ দুষ্টু বল' দেখি, আমার জন্য 'জবাকুসুম' এনে বলেছেন কি না আনি নি! আমি বুঝি তোমার দুষ্টুমি ধর্তে পারি নি, না? 'জবাকুসুম' তেল মেখে নাইতে হী—:—:—: আমার যে কী ভাল লাগে বলতে পারি না!

তোমাদের বলা রইল, যদি তোমাদের বাবা 'জবাকুসুম' তেল না এনে দেন, আমাদের চিঠিতে লিখো—নইলে ভাল হবে না কিন্তু—




২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পড়ে, অমনি হৃৎপিণ্ড উহা পাম্প করিয়া সেই রক্ত কতকগুলি রক্তনালীর মধ্য দিয়া ফুস্‌ফুসে চালান করে। ফুস্‌ফুসে আসিয়া এই রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে নূতন অক্সিজেন গ্যাস বোঝাই করিয়া লয়, এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বোঝা ফুস্‌ফুসের ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। এইরূপে শোধিত রক্ত ফুস্‌ফুস্ হইতে বাহির হইয়া অন্য কতকগুলি রক্তনালীর মধ্য দিয়া একেবারে হৃৎপিণ্ডের বামদিকের পাম্পে গিয়া হাজির হয়। এই শোধিত রক্ত শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই হৃৎপিণ্ডের বামদিকের পাম্পটী তখন সবেগে পাম্প করিয়া এই শোধিত রক্ত শরীরের প্রধান ধমনীতে নিক্ষেপ করে; এবং তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে সে রক্ত শরীরের সকল ধমনীতে এবং পরিশেষে সকল কৈশিক রক্তনালীতে প্রবাহিত হয়। এইরূপে একই রক্ত শোধিত অবস্থায় ধমনী এবং কৈশিক রক্তনালী দিয়া এবং অশোধিত অবস্থায় শিরার মধ্য দিয়া অহর্নিশি চক্রাকারে প্রবাহিত হইতেছে। হৃৎপিণ্ড মানবের যে এত উপকারী, তাহার কারণ শুধু যে, অবিশ্রাম পাম্প করিয়া হৃৎপিণ্ড এই রক্তের প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছে। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে হৃৎপিণ্ড মাংসপেশী-দ্বারা গঠিত। এই মাংসপেশীর প্রধান কর্ম্মই হইতেছে সঙ্কুচিত প্রসারিত হওয়া—এই ধর্ম্মের বলেই হৃৎপিণ্ডের পাম্পের কার্য্য অক্লান্তভাবে চলিতেছে। যদি কোনও কারণে হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়—তবে রক্ত চলাচলও সেই মুহূর্ত্তে বন্ধ হইয়া যাইবে, কৈশিক রক্তনালীতে যে রক্ত আছে, সে রক্ত কয়েক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই অক্সিজেন-হীন এবং কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড পূর্ণ হইয়া দূষিত হইবে, কিন্তু সে দূষিত রক্ত শিরায় সঞ্চালিত হইয়া তৎস্থানে শোধিত রক্ত আসিতে পারিবে না;—সুতরাং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য। ব্যয়াম ও অঙ্গ সঞ্চালনে রক্ত নালীর উপর মাংসপেশীর চাপ পড়িয়া রক্ত চলাচল বাড়িয়া যায়—সেই জন্যই ব্যায়াম স্বাস্থ্যের পক্ষে এত উপকারী।

একটু আগে ফুস্‌ফুসের কথা তোমাদিগের নিকট উল্লেখ করিয়াছি।

ফুস্‌ফুস্

শিরার মধ্যস্থিত দূষিত রক্ত শোধন করিবার জন্যই যে এই কারখানার সৃষ্টি তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি কিন্তু এই রক্তশুদ্ধি কি প্রকারে সম্পন্ন হয় তাহার সম্বন্ধে কিছুই তোমাদিগকে বলা হয় নাই। মানবদেহে বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের দুইধারে দুইটী ফুস্‌ফুস্ আছে। ইহার প্রত্যেকটীকে বায়ুপূর্ণ এক একটি থলি বলা চলে। প্রত্যেকটী ফুস্‌ফুস্ হইতে একটী নল বাহির হইয়া আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে এবং এইরূপে শ্বাসনালীর ( trachea ) সৃষ্টি করিয়াছে ; গলার ঠিক সামনে হাত দিলেই চামড়ার নীচেই যে মোটা নলটী হাতে ঠেকে উহাই শ্বাসনালী। এই শ্বাসনালী--মুখে আসিয়া শেষ হইয়াছে ; এবং এইরূপে বাহিরের বায়ু মণ্ডলের সহিত ফুস্‌ফুসের ভিতরের বায়ুর সংযোগ সাধন করিতেছে। তোমরা জান বোধ হয় যে আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ এই বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেন-গ্যাস প্রচুর পরিমাণে আছে ;—আর তাহার তুলনায় কার্ব্বন ডাইওক্‌সাইড গ্যাস অতি অল্প পরিমাণে আছে। এখন, প্রত্যেকবার নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ু একবার করিয়া বাহিরের নির্ম্মল বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতেছে ;— এবং এই মিশ্রণের ফলে ফুস্‌ফুসের মধ্যেও অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেশী এবং কার্ব্বনডাইওক্সাইডের পরিমাণ খুব কম থাকে। সুতরাং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশ হইতে যে অক্সিজেন হীন ও কার্ব্বনডাইওক্সাইডপূর্ণ রক্ত ফুস্‌ফুসে পাঠান হয়, সে রক্ত ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থিত বায়ু হইতে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেনও যেমন আত্মসাৎ করিতে পারে, ফুস্‌ফুসের নিকট কার্ব্বন ডাইওক্সাইডের বোঝাও তেমনি অনেকটা পরিমাণে হাল্কা করিতে পারে। এইরূপে দূষিত রক্ত শোধিত হয়, কিন্তু ফুস্‌ফুস্‌ মধ্যস্থ বায়ু কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে অনতিবিলম্বেই কিন্তু ফুস্‌ফুসের বায়ু চারিপাশের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইতে পাইয়া আবার বিশুদ্ধ হয়। এইবার বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, কেন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন মানুষের পক্ষে এত আবশ্যক।

[ এবারেও শেষ হইল না, আসচে মাসে হইবে ]

# চিত্র পরিচয়

নেপোলিয়ান। ("১৮১৪")  মেসোনিয়ার। (১৮১৫—১৮৯১)

ছবিখানি দেখিয়াই তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে সৈন্যদলের পুরোভাগে দিগ্বিজয়ী ফরাসীসম্রাট নেপোলিয়ান অশ্বারোহণে চলিয়াছেন। ছবিখানির নাম হইয়াছে— "১৮১৪" অর্থাৎ ইহা সেই সময়ের ছবি যে সময়ে নেপোলিয়ান—ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৮১৩ সালের রুশযুদ্ধে নেপোলিয়ানের সৈন্যের প্রায় অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত দুর্ব্বল জানিয়া ইংলণ্ড প্রুসিয়া প্রভৃতি শক্তিপুঞ্জ একযোগে তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। নেপোলিয়ানের সৈন্যবল অল্প, শক্তিও পূর্ব্বের চেয়ে কম, তা হইলে কি হয়! সে বীর দর্প তাঁহার পূর্ব্বের মতই ছিল, সে তেজও সমভাবেই বর্ত্তমান ছিল—সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়াই নেপোলিয়ান ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মুখে সেই দীপ্তি, হৃদয় পূর্ব্বের মত উৎসাহ লইয়া সম্রাট চলিয়াছেন। চিত্রকর মেসোনিয়ার নেপোলিয়ানের ছবি আঁকিয়া অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন এবং যে কাজে মানুষ আনন্দ পায় সে কাজ সে অতি যত্নে, অতি আদরে সাগ্রহে করিয়া থাকে আর সেইজন্যই সে কাজে তার কোন খুঁত থাকে না। মেসোনিয়ারের এই ছবিখানি একেবারে নিখুঁত হইয়াছে, এতটুকু ভুলচুকও নাই। সম্রাট হইতে সেই শেষের অশ্বারোহিটির পর্য্যন্ত পোষাকে আষাকে চলনে ভঙ্গিমায় কোন ত্রুটী নাই।

কেমন করিয়া এ রকম জীবন্ত ছবি হইতে পারে সে এক কথা বটে! এই ছবিখানির সম্বন্ধে গুটিকত কথা তোমাদের বলি, শোন।

পাছে কোথায় ভুলচুক থাকিয়া যায় মেসোনিয়ার করিতেন কি, একটা কোট গায়ে দিয়া প্রকাণ্ড এক আর্শির সমান কাঠের অশ্বপৃষ্ঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেন। লক্ষ্য করিতেন জামার কোথায় কোথায় খাঁজ পড়ে, কোন্‌খানে কেমন আলো খেলে, এই সব! দেখিয়া শুনিয়া আঁকিতেন বলিয়াই ছবি নির্দ্দোষ হইয়া দেখা দিয়াছে। এমন কি সম্রাট যে সসৈন্যে

বরফাবৃত পথের উপর দিয়া যাইতেছেন, ঘোড়ার খুরের আঘাতে আঘাতে বরফে কেমন দাগ পড়িয়া যায়, মেসোনিয়ার কোন এক বরফাবৃত পথের উপর ঘোড়দৌড় করাইয়া দেখিয়া লইয়াছিলেন। ফলে ছবিখানি যেন সম্রাট ও সম্রাট-বাহিনীর অবিকল ফোটোগ্রাফ হইয়াছে। মেসোনিয়ার এই কৃতিত্ব দেখাইয়া নেপোলিয়ানের অন্যান্য চিত্রকরগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ছবিখানি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত চচার্ড ৪৮০,০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন। সেখান হইতে প্যারী শহরে "লোভর" চিত্রশালায় আনীত হইয়াছে এখন সেই খানেই চিত্রটি রক্ষিত আছে।

স্কুলে : থমাস্ ওয়েবষ্টার, আর-এ।

(১৮০০—১৮৮৬)

এই ছবিখানির পরিচয় দিব কি হাসিতে হাসিতে আমার পেটের নাড়ী ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছে। না, আমি পারিলাম না, তোমরাই দিয়া দাও। আর আমার যতদূর মনে হইতেছে তাহাতে আমার চেয়ে তোমরাই ভাল করিয়া ইহার পরিচয় দিতে পারিবে।

ছবি-টিতে চিত্রকর কি ফুটাইতে চাহিয়াছেন, ছেলেগুলির মনের ভাব চিত্রে যাহা ফুটিয়াছে—তাহা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝিতে পারিতেছ। তোমার বাম দিক হইতে এক একটি ছেলের ভাব ও মোট ছবিতে পরিস্ফুট ভাবটি চিত্র পরিচয়ের মত করিয়া লিখিয়া পাঠাইও। আমরা সবগুলি পড়িয়া দেখিব, যে-টি সব চেয়ে ভাল হইবে সেইটি লেখক বা লেখিকার নাম সহ চৈত্রমাসের "আমার দেশে" ছাপিব।

গদ্যে বা পদ্যে—যাহার যেমন ইচ্ছা, লিখিতে পার। আর ফাগুণ মাসের **১৫ই তারিখের** মধ্যে সব লেখা আমাদের হস্তগত হওয়া চাই।

---

# জানাজানি।

১। কেউ আমাকে বলে দিতে পারেন যদি আমি বড় খুসী হব, যে কেন সরস্বতী পূজার দিন আমাদের সবাইকে নিরামিষ খেতে হয়? বেশীর ভাগ দেবী পূজাতেই আমরা মাছ-মাংস খেতে পাই, সরস্বতীর বেলায় অন্যথা কেন?

২। সরস্বতী পূজোর সময় বাসন্তী রঙের কাপড় পরার একটা ধুম ছেলে মহলে পড়ে যায় কেন—আমি জানি না; যিনি জানেন, আমাকে যদি দয়া করে' জানিয়ে দেন, ভালো হয়। —শ্রীমায়া দেবী, চন্দননগর।

৩। এদেশে কাগজের ব্যবহার প্রচলন কাহারা প্রথম করেছেন? কখন হইতেই বা প্রচলিত হয়েছে? —মোঃ নসের আলি সিকদার।

৪। আমরা স্বপ্ন দেখি কেন?

৫। ভবভূতি কে, তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল?

শ্রীঅজিতকুমার সিংহরায়।

গত মাসের ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর :—

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে "সমাচার দর্পণ" নামে প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। মার্সম্যান সাহেব ছিলেন, সম্পাদক। তিনি বাংলা জানিতেন। এই কাগজটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে—শুনিতে পাই।

শ্রীবিজনপ্রভা দেবী, কলিকাতা।

গত মাসের ৩য় প্রশ্নের উত্তর :—

"বেদের কোন একটি নির্দ্দিষ্ট লেখক নাই। বৈদিক যুগে অনেক আর্য্য, ঋষি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া দেবতার স্তব করিতেন, সেই সকলই বেদ নামে কথিত।" —মোঃ নসের আলি সিকদার, ধাইদা।

# ধাঁধা ও উত্তর।

আমরা কয়েকমাস যাবৎ দেখিতেছি গ্রাহক-গ্রাহিকারা ধাঁধার উত্তর পাঠাইতে প্রায়ই দেরী করিয়া ফেলেন। আমার দেশ" বাহির হইয়া যাইবার পরেও আমরা অনেক চিঠিপত্র পাই কিন্তু তখন আর কোন উপায় থাকে না। এই সব গ্রাহক-গ্রাহিকা আবার কাগজে নাম না দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, অনেকে আবার অভিযোগপূর্ণ পত্রাদিও পাঠান। তাঁহাদের জন্য বলিতে হইতেছে যে, ঠিক মাসের ১৫ইর মধ্যে ধাঁধার উত্তর আমাদের হস্তগত না হইলে নাম প্রকাশিত হইবার উপায় থাকে না। গ্রাহক-গ্রাহিকারা এদিকে একটু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।—সম্পাদক।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর।

১। অবলা
বকুল
লালসা

২। আনারস [এই ধাঁধাটিতে ছাপার একটি ভুল ছিল, একটি কমার মাত্র, গ্রাহক গ্রাহিকারা তাহা ধরিয়াছেন]

৩। ৯৭৮৯—ইহার ভাগফল।

৪।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২ | ৭ | ৬ | ১৫ |
| ৯ | ৫ | ১ | ১৫ |
| ৪ | ৩ | ৮ | ১৫ |
| ১৫ | ১৫ | ১৫ | |

উপরিউক্ত চারিটি উত্তরই যাঁহাদের ঠিক হইয়াছে ঃ—

কুমারী হেমলতা বিশ্বাস, হাতিকান্দা, মদনমোহন দত্ত সালিখা, হেরম্বনাথ সিকদার হাওড়া; বীণাপাণি সেঠ, আজিমগঞ্জ; মুন্সী মোতাবদ্দিন, রূকুশপুর; সচিন্দ্রনাথ বারিক, কলিকাতা; সুবিমলচন্দ্র রায়, কলিকাতা; মায়াময়ী মজুমদার কলিকাতা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; শোভারাণী দাস, ঢাকা; মীনারাণী সেন গুপ্ত; মোঃ নসের আলি সিকদার, দাইদা; সুধীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী; মণীন্দ্রচন্দ্র লাহা কলিকাতা; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত, কলিকাতা; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; পুষ্পময়ী মজুমদার কলিকাতা; শিশিরকুমার বসু, সালিখা, হিরণচন্দ্র দাস, ঢাকা; জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, হুগলী, সুব্রত দাস, রমনা, ঢাকা; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; হিমাংশু সেন, ঢাকা; বিকাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ময়মনসিং; লীলাবতী দাস, রেঙ্গুন।

যাঁহারা তিনটি ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের নাম ঃ—

কুমারী পুষ্পলতা সেন, শ্রীহট্ট, বিকাশচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা; আর্য্যকুমার গুপ্ত, কলিকাতা; প্রভাতকুমার গুপ্ত, কলিকাতা; অজিত কুমার সিংহ রায়, মান্দড়া, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য, বেলপুকুর; শচীন্দ্র কুমার বসাক, কলিকাতা; হরেন্দ্রনাথ বসাক, কলিকাতা; সুবিমল ভট্টাচার্য্য চুঁচুড়া; কল্যাণময়ী দাস, বেলডাঙ্গা; বিজয়কুমার রায়, সৈয়দপুর। রাজা জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ময়ণাগড় রাজবাটী; প্রশান্তকুমার মজুমদার কলিকাতা।

## নূতন ধাঁধা।

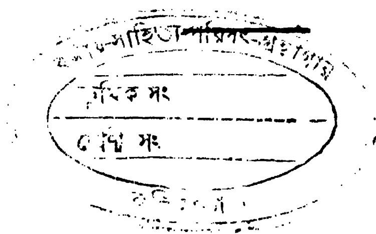
১। উৎপল বল্লে যে তার দাদার বয়স তার বয়সের রাশি উল্টে দিলেই পাওয়া যাবে। আর তাদের বয়সের তফাৎ তাদের বয়সের সমষ্টির পাঁচ ভাগ। এখন বল দেখি উৎপলের বয়স কত? তোমরা মনে করবে যে এত একটি অঙ্ক। যদি তোমাদের কোন বীজগণিত জানা লোক থাকেন, তাঁকে দিলে

তিনি অঙ্ক কষে বলবেন যে এ অসম্ভব। কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করলেই বেরুবে। তার আগেই বলে রাখছি যে বয়স পূর্ণ সংখ্যায় হ'বে। শ্রীশুভেন্দু কুমার মিত্র।

২। শরীর মধ্যেতে আমি থাকি অনুক্ষণ,
আমাবিনা মানুষের বিকল জীবন,
প্রথম দ্বিতীয়ে আমি হই রসময়,
ইক্ষুর মধ্যেতে মোরে পাইবে নিশ্চয়,
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে হই বহু মূল্যবান,
বল দেখি শিশুগণ কিবা মোর নাম।—রাজা জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র

৩। দুই অক্ষরে নাম মোর চিহ্ন সবে কয়
উল্টাইলে ভীম দেয় মোর পরিচয়,
বল সব শিশুগণ কি আমার নাম
দেখিব তোমরা ভাই কত বুদ্ধিমান—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪। বাংলাতে চারি অক্ষর বিশিষ্ট এমন একটী কথা বল যাহার শেষ তিন অক্ষরের উচ্চারণ ইংরাজীতে লিখিলে সেই চারি অক্ষরের বাংলা কথাটীরই ইংরাজী প্রতিশব্দ হইবে। শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র লাহা।



কলিকাতা ৮।২ কাশী ঘোষের লেনস্থিত বিদ্যোদয় প্রেস হইতে শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমার দেশ



ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ( দ্বিতীয় বার )




৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা। চৈত্র, ১৩২৯।

## ছ'মাস দিন ও ছ'মাস রাতের দেশ।

উত্তর মেরু প্রদেশে সমস্ত গ্রীষ্মকালের ছয় মাস ধরিয়া এক দিন! সর্ব্বদাই মাথার উপরে সূর্য্যদেবের অবস্থিতি। আবার শীতকালে ছয় মাস ব্যাপিয়া এক রাত্রি। তখন সূর্য্যদেব ভুলিয়াও উঁকি-মারেন না। এখানে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম দিক নাই। যেদিকে তাকাইবে সেইদিক্‌ই দক্ষিণ দিক্‌। দক্ষিণ দিক্‌ ভিন্ন অন্য কোনও দিক্‌ এখানে নাই। এখানে জলও নাই, স্থলও নাই; সর্ব্বত্রই জমাট-বাঁধা বরফ। এখানে মানুষের বাস নাই। মানুষ এখানে বাস করিতেও পারে না। এই অদ্ভুত দেশ দেখিবার জন্য কৌতূহল জন্মে সকলেরই। কিন্তু এখানে যাইবার শক্তি, সাহস, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অতি অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিচিত্র জগতে এমন লোক যে একেবারেই নাই তাহা নহে।

এই বৈচিত্র্যময় জগতে লোকচরিত্রও অতি বিচিত্র, তাই আজ তিন শত বৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া অনেক লোক সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রাণ হাতে করিয়া মেরু প্রদেশ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছে। যশোলাভের চেষ্টায় কত শত লোক এই উদ্যমে প্রাণপাত করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই উদ্যমে যাঁহারা সফলতা লাভ করিয়াছেন এমন দুইজন লোকের পর্য্যটনের ইতিহাস এই প্রবন্ধে বলিব।

নরওয়ে দেশের রাজ ধানী ক্রিশ্চিয়ানা সহরের নিকট ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রিজ্যোফ্ নানসেন জন্মগ্রহণ করেন। একুশ বৎসর বয়সে ক্রিশ্চিয়ানা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপণা সমাপ্তিরপর ইনি একখানি পাল-তোলা নৌকা লইয়া স্পীট্জ্ বর্গেন ও গ্রীনলণ্ড সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই তাঁহার উত্তর মহাসমুদ্রের প্রথম অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতা হইতেই তাঁহার মনে বরফ জমা উত্তর মহাসমুদ্রের বিবরণ সংগ্রহ করিবার প্রবল স্পৃহা জাগরূক হয়। অদম্য উৎসাহ ও অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় লইয়া ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি বরফ সমুদ্রে যাত্রার উদ্যোগ করিতে থাকিলেন। নান্‌সেনের অসমসাহসিক কর্ম্মে সহায় ও সঙ্গী হইলেন তিন জন নরওয়ে বাসী ও দুইজন লাপলণ্ড বাসী কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ। এই ছয় জনে মিলিয়া প্রচুর খাদ্যাদি ও নানাবিধ যন্ত্র পাতি, পাঁচটা হাত গাড়ীতে বাঁধিয়া লইয়া ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে গ্রীন্‌লণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। একখানি দীনেমার জাহাজে চড়িয়া তাঁহারা আইস্-লণ্ড দ্বীপে উপনীত হইলেন। সেখান হইতে জাহাজের কাপ্তেন তাঁহাদিগকে যতদূর সম্ভব গ্রীনলণ্ডের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে অঙ্গীকার করিলেন। তার পর গ্রীনলণ্ড সমুদ্রে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া জাহাজ হইতে তাঁহাদের বিদায়সূচক তোপধ্বনি গগণ বিদীর্ণ করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে

নির্জনতার ছায়া অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের সমস্ত চিত্তকে ক্ষণতরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ক্ষণকাল মধ্যে সেই নির্জন প্রদেশের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অদম্য উৎসাহে তাঁহাদের কার্য্যারম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে তুষার স্তূপের মধ্য দিয়া সঙ্কীর্ণ জল পথে তাঁহারা নৌকা বাহিয়া অদৃষ্ট পূর্ব্ব অনিশ্চিত দেশের অভিমুখে চলিতে লাগিলেন, আর যেখানে যেখানে জলভাগের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ নৌকা অচল হইয়া পড়িতে লাগিল সেই সকল স্থানে লাঠি ও কুড়াল দিয়া বরফ কাটিয়া নৌকা চালাইবার পথ করিয়া লইতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে প্রতিকূল বায়ু ও জল স্রোতের প্রভাবে তাঁহাদের নৌকা ভাঙ্গিয়া যাইবার মত হইতে লাগিল। এইরূপ বিপদের সময়ে তাঁহারা জল হইতে নৌকা তুলিয়া বরফের স্তূপের উপর রাখিতেন এবং নৌকা ও হাতগাড়ী বহুকষ্টে টানিয়া বরফের উপর দিয়া পথ চলিতেন। বহুক্ষণ এইরূপ ভাবে চলিয়া তবে পুনরায় নৌকা চালাইবার উপযোগী জল পথ পাওয়া যাইত। স্থল পথে তাঁহাদের যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইবে তাহার একটা পূর্ব্বাভাস তাঁহারা এইখানে প্রথম দিনেই পাইলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে সেই বরফ জমা সমুদ্রের উপর তাঁবু খাটাইয়া তাহার মধ্যে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহাদের শুইবার জন্য এক একখানি থলে ছিল। সেই থলের মধ্যে ঢুকিয়া বক্‌লস্ দিয়া থলে বাঁধিয়া তাহাদের মধ্যে তাঁহারা শুইয়া থাকিতেন। এইরূপে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ২৮শে জুলাই তারিখে গ্রীণলণ্ডের উপকূলবর্ত্তি একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এই দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে তাঁহারা একখানি গ্রীণলণ্ড-বাসী এস্কিমোদিগের গ্রাম পাইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে ইহাদের আকার প্রকারে কোনওরূপ শত্রুতার ভাব ছিল না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহারা কি

বলিল তাহার একবর্ণও ইঁহাদের বোধগম্য হইল না। যে দুর্গন্ধ কাঁচা চামড়ার তাঁবুতে ইহারা বাস করে, তাহারা ভিতরে ইঁহারা প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

গ্রীণলণ্ডের মধ্যভাগ সমস্তটাই তুষার মণ্ডিত। দেশটা যেন একখানা বিরাট বিশাল বরফের ময়দান। যেদিকে তাকাইবে সব সাদা,—একঘেয়ে সাদা। সেই সাদা বরফ আবার ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে সরিয়া যাইতেছে। জমাট-বাঁধা বরফের উপর বসিয়া থাকিলেও তুমি ধীরে ধীরে বরফে ভাসিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িবে। স্থানে স্থানে বরফের পাহাড় ধীরে ধীরে সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এইসকল পাহাড় স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া দক্ষিণ দিকে আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের বহুদূর গিয়া সেখানকার গরম জলে ক্রমে ক্রমে গলিয়া যায়, এবং সময়ে সময়ে বড় বড় জাহাজের বিঘ্ন উৎপাদন করে। এই-সকল বরফের পাহাড় আকারে এত বড় যে মস্ত বড় একখানা জাহাজও একটা বরফ পাহাড়ের নিকট সামান্য একটা খেলনার মত দেখায়। এই-রকম একটা বরফ পাহাড়ের সম্মুখে পড়িয়াও এই পর্য্যটকগণ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের আশ্রয়ে প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন। এই দ্বীপটার আশ্রয় না পাইলে ইঁহাদের নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া যাইত এবং ইঁহাদের কোনও সন্ধানই পাওয়া যাইত না।

১০ই আগষ্ট তারিখে নান্‌সেন গ্রীণলণ্ডে পদার্পণ করেন এবং স্থলে উপনীত হইয়া সুবিধা জনক রাস্তার সন্ধানেই তাঁহাদের সমস্ত দিনটা কাটিয়া যায়। এই দিনটা তাঁহাদের পক্ষে বিষম কষ্টদায়ক হইয়াছিল। হাঁটিয়া পথ চলা সর্ব্বত্রই বিপত্তিজনক, কারণ কাদায় পড়িলে যেমন পা ডুবিয়া যায় স্থানে স্থানে সেইরূপ তাঁহাদের পা পদে পদে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বরফের মধ্যে আবার স্থানে স্থানে চোরাগর্ত্ত। তাহাতে পড়িলে আর কাহারও নিস্তার নাই। স্থানে স্থানে গর্ত্তের উপর দিয়া শক্ত বরফের সাঁকো, সেই সাঁকোর উপর দিয়া অতি

কষ্টে হামাগুড়ি দিয়া তাঁহাদের আসবাব পত্র লইয়া চলিতে হইত। এইরূপ নানা কষ্ট সহ্য করিয়া পরদিন প্রাতে ৫টার সময় তাঁহারা নিরাপদ স্থান পাইয়া গ্রীণলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলে তাঁবু খাটাইলেন। এই স্থানে একটী গর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের নৌকা গুলি লুকাইয়া রাখিয়া ১৫ই আগষ্ট তারিখে তাঁহারা হাতগাড়ী টানিয়া পদব্রজে চলিবার ব্যবস্থা করিলেন। পথের মধ্যে বরফের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় এক একটা বড় কাছি দিয়া গাড়ী বাঁধিয়া সেই কাছি নিজেদের কোমরে বাঁধিলেন। রাত্রিকালে বরফ অপেক্ষাকৃত শক্ত হয় বলিয়া তাঁহারা দিবাভাগে বিশ্রাম ও রাত্রিযোগে পথ পর্য্যটনের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

২রা সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রীণলণ্ডের মধ্যভাগে উচ্চভূমিতে উপনীত হইয়া তাঁহারা 'ইস্কী' সহযোগে বরফের উপর পা পিছলাইয়া চলিবার সুযোগ পাইলেন। এই ইস্কী' জিনিষটা ৮ ফুট লম্বা ও তিন-চারি ইঞ্চি চওড়া দুখানা কাঠের পাটা। এই পাটা দুখানার উপর দুই পা রাখিয়া দুই হাতে দুই লাঠি ঠেলিলে ইস্কী দুখানা বরফের উপর পিছালাইয়া পিছালাইয়া চলে। সুদক্ষ ইস্কী-চালক না হইলে মালপত্র বা গাড়ী লইয়া ইস্কী বাহিয়া পথ চলা অসম্ভব বলিলেই চলে। নানসেন ও তাঁহার পাঁচ জন সঙ্গী খুব দক্ষ ইস্কীচালক ছিলেন বলিয়া ১৯ দিনে ২৪০ মাইল ( অর্থাৎ প্রতিদিন ১২॥ মাইল ) পথ অতিক্রম করিলেন। গ্রীণলণ্ডের মধ্যে এই ঊনিশ দিনের পথ তাঁহাদের পক্ষে নিতান্তই বৈচিত্র্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতি দিনই প্রাতে উঠিয়া বরফের উপর ইস্কী বাহিয়া গাড়ী টানিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করা মধ্য পথে একবার আহারের জন্য বিশ্রাম এবং সন্ধ্যার পর তাঁবুর কোণে আহার করিয়া চামড়ার থলের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া নিদ্রা তাঁহাদের বড়ই অসহ্য হইয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালের



নান্‌সেন গ্রীণলণ্ড পার হইতেছেন।

ঝড় বাতাসের মধ্যে তাঁবু খাটান কাজটাও বড় কঠিন হইয়া পড়িত। এক এক-দিন কুজ্ঝটিকা এত ঘন হইত যে দুই-হাত তফাতের কোনও জিনিস চেনা যাইত না এবং ঝড়ের বেগ এত প্রবল হইত যে মানুষের পক্ষে সোজা হইয়া দাঁড়ান অসম্ভব হইত।

এই শীত-প্রধান স্থানে তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল তৃষ্ণায়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জল পাইবার কোনও উপায় এখানে ছিল না, কারণ জল-মাত্রই এখান কার শীতের প্রভাবে বরফে পরিণত হয়। তাই একটা বোতলের মধ্যে বরফ ভরিয়া সেই বোতল ইঁহারা পেটের তলে ঢাকিয়া রাখিতেন শরীরের উত্তাপে বোতলের বরফ গলিয়া যে সামান্য পরিমাণ জল হইত তাহাতেই তাঁহাদের সারাদিনের ভয়ঙ্কর পরিশ্রম জনিত তৃষ্ণা নিবারণ হইত না।

এইরূপে গ্রীণলণ্ডের মধ্য দিয়া অর্দ্ধপথ অতিবাহিত হইলে নান্‌সেন আবার পাল দিয়া নৌকা চালান সুরু করিলেন। ইহাতে তাঁহাদের ইস্কী-টানা একঘেয়ে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল এবং পরিশ্রম কমিয়া যাওয়ায় প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি পাইলেন। কিন্তু গ্রীণলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে গোড্‌থাব্‌ নামক স্থানে আসিয়া দেখিলেন যে আর অগ্রসর হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এখানে বরফের প্রকৃতি অতি বিচিত্র এবং সর্ব্বত্রই ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা। তাই এই ভীষণ পথের অভিজ্ঞতা লইয়া তাঁহারা অতি কষ্টে পূর্ব্ব পথ ধরিয়া প্রাণ লইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

## পুনর্যাত্রা।

অকৃতকার্য্য হইয়া নান্‌সেন দেশে ফিরিলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। প্রথমবারের সমুদ্র যাত্রায় সমুদ্র স্রোতের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে

সাইবিরিয়ার উত্তরস্থিত মহা সমুদ্রের কোনও অংশ হইতে উত্তর মেরু ও ফ্রান্স জোসেফলণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তরাভিমুখে একটী স্রোত আছে। কোনও উপায়ে একখানি সুদৃঢ় জাহাজ লইয়া লিয়াখোব দ্বীপের উত্তরস্থিত তুষার সমুদ্রে পৌঁছিতে পারিলে সেখান হইতে স্রোতের টানে বরফের উপর দিয়া ধীরে ধীরে জাহাজ উত্তর মেরুর নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইবে। অবশ্য এই অভিযানে যে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে হয় ত বরফের আঘাতে অতি শক্ত জাহাজও চূর-মার হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাঁহার মনে এমন একটা আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে তিনি যেন এই পথে সিদ্ধিলাভের প্রবল সম্ভাবনা দেখিতেছিলেন।

সাধারণের চাঁদা ও নরওয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে পাঁচবৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে 'ফ্রাম' নামক একখানি সুদৃঢ় জাহাজ নানসেনের নির্দ্দেশক্রমে নির্ম্মিত হইল। বহুবিধ সংরক্ষিত খাদ্য, একটী ছাপাখানা, একটী বৈদ্যুতিক আলোক ও অসংখ্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে জাহাজ পূর্ণ করিয়া তের জন সবল ও ও সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ সঙ্গীর সহিত ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ জুন তারিখে নান্‌সেন দ্বিতীয় বার মেরু যাত্রা করিলেন। নরওয়ের সর্ব্বোত্তর বন্দর বার্দো হইতে দেশের সম্পর্ক কাটাইয়া 'ফ্রাম' জাহাজ ২৪ শে জুলাই তারিখে উত্তর পূর্ব্বে যাত্রা করিল। এবারে পোষাকের বিষয়ে একটা নূতনত্ব হইল; পুরু পশমী পোশাকের উপর খুব খাপি সূতী কাপড়ের পোষাক বাহ্যাবরণ রূপে ব্যবহৃত হইল। মেরু প্রদেশের অত্যুগ্র শীত হইতে আত্ম রক্ষার জন্য নান্‌সেন এই উপায় অবলম্বন করিলেন। সূতী কাপড় ভেদ করিয়া হাওয়া বা বরফ প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং ভিতরের পশমী পোষাকে শরীর গরম থাকিবে। সাইবিরিয়া হইতে ২৪টী এস্কিমো কুকুর আনান হইয়াছিল, তাহাদিগকেও

জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইল। নান্‌সেন মনে করিয়াছিলেন যে যদি জাহাজ আশানুরূপ অগ্রসর হইতে না পারে তাহা হইলে এই কুকুর গুলিকে সঙ্গে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া মেরু পর্য্যন্ত গমন করিবেন। কুকুর গুলির লম্বা মুখ, বরফের ন্যায় সাদা বড় বড় লোম এবং তীক্ষ্ণ ও উচ্চ কর্ণ ছিল। দুই-একটী লাল বা ধূসর বর্ণের কুকুর ও ছিল। এই কুকুর গুলি বড় উগ্র স্বভাবের ছিল এবং প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিত। অভিযান কালে অনেক গুলিই পরস্পরের মধ্যে মারামারি করিয়া মরিয়াছিল। এই কুকুর গুলিকে লইয়া ছোট গাড়ী টানাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, বিশেষ ফল হয় নাই। অবশেষে বেতের ব্যবহার দ্বারা কোনও রকমে কয়েকটীকে বশ করা হইয়াছিল।

কারা সমুদ্রের উপকূলে নান্‌সেন কতকগুলি বল্গাহরিণ সংগ্রহ করেন। কিন্তু এই হরিণ গুলি এত ভীরু যে তাহাদের পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া লইতে হয়। ২১ টী হরিণ পাইয়া তাঁদের ভবিষ্যতের খাদ্যের সংগ্রহ কিছু বাড়িল।

১০ ই সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ চেলুস্কিন্ অন্তরীপে উপনীত হইলে তাঁহারা সেদিন উৎসবে কাটাইলেন। ফল মূল ও নানাবিধ খাদ্য বিতরণে ও সঙ্গীত উৎসবে দিন কাটিল। কিন্তু যেখানে উৎসব সেখানেই বিপদ্। নৌকা লইয়া নান্‌সেন ও তাঁহার দুইজন সঙ্গী বাহিরে গিয়া জলহস্তীর আক্রমণ হইতে কোনও রূপে প্রাণ বাঁচাইয়া জাহাজে ফিরিলেন। কয়েক দিনের জন্য সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। সমুদ্রের জলে একখানা নৌকা বাহির করিলেই বড় বড় দাঁত লইয়া জলহস্তীর প্রকাণ্ড মাথা জলের উপর দেখা যাইত। সে চেহারা দেখিলে ভয় না পায় এমন লোক অতি অল্প। অনেক কষ্টে দুইটী জলহস্তী মারা হইল। পরে আর জলহস্তী দেখা গেল না। তাহারা ভয় পাইয়া লুকাইয়া পড়িল।

ক্রমেই পরিষ্কার জল ফুরাইয়া বরফের সমুদ্র আসিতে লাগিল এবং ২৫ শে সেপ্টেম্বর তারিখে জাহাজ খানা বরফের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া গেল। এই ভাবে নান্‌সেনের অভিযানের প্রথমার্দ্ধ সমাপ্ত হইল। এখন চিন্তা হইল এই যে নান্‌সেনের অনুমান অনুসারে সমুদ্রের স্রোতে বরফের সহিত জাহাজ চলে কি না। এখানে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ সমুদ্রস্রোত আরম্ভ না হইলে আর জাহাজ চলিবে না। সহিষ্ণু ভাবে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিতান্তই কষ্টকর বলিয়া সেখানে জাহাজের সমস্ত জিনিস পত্র নামাইয়া কারখানা স্থাপন করা হইল। এই সকল সাময়িক কারখানায় নানাবিধ লোহার জিনিস প্রস্তুত করা, জুতা তৈরীকরা, পাইল-মেরামত, দড়ি তৈয়ার করা প্রভৃতি অনেক প্রকারের কাজ চলিতে লাগিল। কুকুর গুলিকে ছাড়িয়া দিবা মাত্র তাহারা পরস্পরের মধ্য রক্তারক্তি আরম্ভ করিল। অক্টোবরের প্রথম ভাগেই জাহাজের উপর বরফের চাপ অনুভূত হইল। নান্‌সেন বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কারণ জাহাজ খানি যদি এই চাপ সহ্য করিতে না পারে তবে তাঁহার দ্বিতীয় বারের অভিযানও ব্যর্থ হইবে। সমস্ত জাহাজখানি তুলিয়া বরফের উপর রাখা হইল, কিন্তু জাহাজ পুনরায় আপনার ভারে ডুবিয়া পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হইল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল জাহাজের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। নান্‌সেন আশ্বস্ত হইলেন।

তখন নান্‌সেন সকলকে হাতগাড়ী টানিয়া কেমন করিয়া বরফের উপর পথ চলিতে হয় তাহা শিখাইতে লাগিলেন। কারণ কিছুকাল পরেই জাহাজ ছাড়িয়া হাঁটিয়া চলিতে হইবে, আর জাহাজ অচল হইলেও সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কুকুর গুলিকে গাড়ী টানা শিখান কঠিন হইল, তাহারা কিছুতেই বশ মানিল না। ফলে মানুষ সমেত গাড়ীগুলি ঘন ঘন উল্‌টাইয়া যাইতে লাগিল, আর সকলে মিলিয়া আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে লাগিল।

যাহাই হউক দিনগুলি এই প্রকারের নানা কার্য্যের মধ্যে সুখে কাটিতে লাগিল।

২রা নবেম্বর তারিখে উত্তর দিক হইতে অতি মনোরম আলোক আসিতে লাগিল। এত সুন্দর আলোক তাঁহারা পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। জীবনে তাঁহারা এ আলোকের দৃশ্য ভুলিতে পারেন নাই। আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে আলোক রশ্মি ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, বরফের মাঠের উপর স্বর্ণের জ্যোতি ঝলসিয়া উঠিল। সমস্ত আকাশ ভরিয়া যেন নানা বর্ণের আলোক পতাকা বিকীর্ণ হইল। ঘন ঘন তাহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। উদয় কালে যে আলোকের বর্ণ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায়, মুহূর্ত্ত পরে তাহাই স্বর্ণ বর্ণ হইয়া পড়িল, আবার মুহূর্ত্ত পরে তাহাই বেগুনে ও রৌপ্যবর্ণে পরিণত হইল। সারা আকাশ জুড়িয়া যেন রঙ-বেরঙের আলোকের খেলা লাগিল। কখনওবা আকাশটা গোলাপী রঙ ধারণ করিতেছে, আবার ক্ষণ পরেই আকাশের বর্ণ হইল নীলাভাব সবুজ। সকলে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আলোকের খেলা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বিস্ময়ের মধ্যেই এই অপূর্ব্ব আলোকের খেলা কোথায় চলিয়া গেল!

এ পর্য্যন্ত কোনও জানোয়ার দেখা যায় নাই। হঠাৎ একটা ভালুক দেখা গেল। ভালুকটা তাহাদের গন্ধে জাহাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনটী কুকুর লইয়া পলাইয়া যায়। বন্দুকের আওয়াজ করিতেই ভালুকটা ফিরিয়া জাহাজের একজন লোককে আক্রমণ করে, কিন্তু অবশেষে তাহাকে মারিয়া ফেলা হয়। পরদিন প্রাতে অন্বেষণ করিয়া দুইটী কুকুরের অর্দ্ধ ভুক্ত দেহ ও একটী কুকুর সজীব অবস্থায় পাওয়া যায়। ভালুক ধরিবার জন্য বরফের উপর একটী ফাঁদ পাতা হয়; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। একটা ভালুক ফাঁদের নিকট আসিয়াছিল বটে, কিন্তু সন্দিগ্ধ চিত্তে ফাঁদের গন্ধ শুঁকিয়া পলাইয়া যায়।

১৮৯৪ সালের জানুয়ারির শেষ ভাগে আর একবার জাহাজের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে তাহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই। বরফের প্রবল চাপে তাহার একখানা তক্তাও ভাঙ্গে নাই। জাহাজের ভিতর হইতে পরীক্ষা করিয়াই জানা গেল যে ধীরে ধীরে জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সমুদ্রের স্রোত আরম্ভ হইয়াছে। নান্‌সেনের অনুমান সফল হইয়াছে। উত্তরদিকেই জাহাজ চলিতে লাগিল, তবে কোনও কোনও দিন পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকেও চলিল। ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে জাহাজ ৮০° উত্তর অক্ষরেখা পার হইয়া গেল।

তিন সপ্তাহ পরে নান্‌সেন বরফে চলিবার জুতা পায়ে দিয়া এবং বরফে চলিবার গাড়ী লইয়া চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন ভয়ঙ্কর তুষারপাত ও ঝড় হইয়া গেল। হাওয়ায় উড়িয়া বরফ আসিয়া স্তূপাকার হইয়া জমিতে লাগিল। এবং সেই বরফের গাদার মধ্যে মানুষ সমেত গাড়ী আটকাইয়া গেল। অনেক কষ্টে গাড়ী ও মানুষ উদ্ধার করা হইল। গ্রীষ্মের (১৮৯৪) প্রারম্ভে বরফ গলিতে লাগিল। বরফের ময়দানের উপর দিয়া বরফ-গলা জলের অসংখ্য নদী চতুর্দ্দিকে বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই সকল নদী কিছু দূর গিয়া একটা বরফ-ভাঙ্গা গর্ত্তের ভিতর দিয়া বরফ-মধ্যস্থ সমুদ্রে পড়িতেছে। এই সময়ে নানাবিধ জীবজন্তুর সাড়া পাওয়া গেল। নানাবিধ পক্ষী বরফের উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। বহু পক্ষী মারিয়া তাঁহারা তাঁহাদের খাদ্যের সরবরাহ বাড়াইয়া লইতে লাগিলেন। পুনরায় শীতের প্রারম্ভে অনেক প্রকারের ভালুক দেখা যাইতে লাগিল। কুকুর লাগাইয়া দিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু ভালুক দেখিয়া এস্কিমো কুকুর অগ্রসর হয় না। মস্ত বড় একটা ভালুকী ও তাহার দুই বাচ্চাকে গুলি করিয়া মারা হইল। সেই ভালুকের মাংস পোড়াইয়া সেদিনের আহার হইল। ৩১শে অক্টোবর তারিখে

নান্‌সেন ৮২° উত্তর অক্ষরেখা অতিক্রম করিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের উৎসব ও বিরাট ভোজ হইল। ১৮৯৪ সালের শেষাশেষী তাঁহারা ৮৩° উত্তর অক্ষরেখা অতিক্রম করিলেন এবং ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই 'ফ্রাম' জাহাজের একটী বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে বরফ জমিয়া বড় বড় বরফের প্রাচীর হইয়া পড়িল। জাহাজের উপর বরফের চাপ এত বেশী হইল যে নান্‌সেন পর্য্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে জাহাজের এক পার্শ্ব প্রায় বরফে ঢাকা পড়িয়াছে তখন জাহাজ ছাড়িয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। খাদ্য সামগ্রী, বস্ত্র, পোড়াইবার কাষ্ঠ, তৈল প্রভৃতি যেসকল জিনিষ জাহাজে ছিল তাহা জাহাজ হইতে নামাইয়া বরফের ময়দানের উপর স্তূপাকারে সজ্জিত হইতে লাগিল এবং কুকুর গুলিকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। জাহাজ কিন্তু নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিল, এবারও ভাঙ্গিল না, বিপদ ক্রমে ক্রমে কাটিয়া গেল।

২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নান্‌সেন ও জোহান্‌সেন জাহাজ ছাড়িয়া চলিলেন। কিন্তু দুইবার তাঁহাদিগকে ফিরিতে হইল; একবার জিনিস পত্র কমাইবার জন্য আর একবার ঘটনা চক্রে তাঁহারা জাহাজে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। ১৪ই মার্চ্চ তারিখে তাঁহারা সত্য সত্যই জাহাজ ছাড়িয়া যাত্রা করিলেন। ভিতরে দুইখানি পশমী কামিজ পরিয়া তাহার উপর উটের লোমের কোট ও তাহার উপর মোটা গেঞ্জি দিয়া তাঁহাদের এবারের পরিচ্ছদ রচনা হইল। পায়ে পশমী মোজা, তাহার উপর হাফ পেণ্ট ও তাহার উপর ঢিলে পাজামা এবং পায়ে ফিন্‌লণ্ডের তৈয়ারী চামড়ার জুতা পরিয়া তাহার উপর বিন্দু বিন্দু বরফ পাতে হইতে আত্মরক্ষার জন্য সূতী কেম্বিসের মোটা আল্‌খাল্লা বা 'ওভার-অল' চাপাইয়া লইলেন। হাতে থাকিল বাঘের



জাহাজ ছাড়িয়া যাত্রা করিলেন।

চামড়ার দস্তানা এবং মাথায় সূতী কাপড় দিয়া ঢাকা ফেল্‌ট্ হ্যাট্। সঙ্গে পাতলা তাঁবু ও রাঁধিবার ষ্টোভ লইলেন। কিন্তু এই ভাবে বরফের উপর বন্ধুর পথে কুকুর গাড়ীতে চলা তাঁদের পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল। সুতরাং ৮৬° ১০′ উত্তর অক্ষরেখায় উপনীত হইয়া নান্‌সেন গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। একাল পর্য্যন্ত কেহ এত উত্তরে যাইতে পারেন নাই।

১৮৯৫ সালের ১০ই এপ্রেল তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ফিরিবার পথে বেশী কষ্ট হইল না বটে, কিন্তু অত্যন্ত খাদ্যাভাব হইল। কুকুর গুলির খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইল। নান্‌সেন একটা ঘুমন্ত 'সীল' মাছকে গুলি করিয়া মারিলেন। তার পর ভালুক মারিয়া তাহার মাংসেই ইঁহারা ক্ষুধা নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভালুকও আর পাওয়া যায় না অবশেষে গাড়ীর কুকুরগুলি একে একে মারিয়া তাহারই মাংসে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। দুইজনে পথে চলিতে চলিতে দুই দিন বিপন্ন হইয়াছিলেন। একদিন একটা ভালুকের আক্রমণে নান্‌সেন অতি কষ্টে প্রাণ পাইয়াছিলেন আর একদিন একটা প্রকাণ্ড জলহস্তী তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিয়াছিল। উভয় প্রাণীই নিহত হইয়াছিল। জাহাজ হইতে যে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা আগামী শীতকালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় একদিন দেখিলেন সবগুলিই পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে সুতরাং পেটের চিন্তাই মহাচিন্তা হইল। অর্দ্ধাশন ও অনশনে তাঁহাদের শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল।

প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহারা 'কায়াক্' নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র নৌকায় চড়িয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। দুই জনের দুই খানি 'কায়াক্' ছিল। এই কায়াকে সমস্ত মাল পত্র বোঝাই করিয়া বরফের উপর দিয়া বাঁশ ঠেলিয়া

তাঁহারা পথ চলিতেছিলেন। একদিন এই কায়াক্ লইয়া এক বিপদ্ উপস্থিত হয়। কাছি দিয়া কায়াক দুইটী বাঁধিয়া রাখিয়া তাঁহারা যখন অন্য কার্য্য করিতেছেন, এমন সময় কাছি ছিঁড়িয়া এক খানি কায়াক্ বরফ জলের স্রোতে ভাসিয়া যায়। জোহান্‌সেন ইহা দেখিবা মাত্র জলে লাফাইয়া পড়েন। কিন্তু ভারী পোষাক লইয়া জলে সাঁতরাইয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু 'কায়াক্' গেলে তাঁহাদের উভয়ের জীবন রক্ষাই অসম্ভব হইবে ভাবিয়া জোহান্‌সেন প্রাণ পণ করিয়া যাইয়া 'কায়াক্' ধরিলেন। বরফ জলে ভিজিয়া তাঁহার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িল।

এই সময়ে তাঁরা শীতকাল যাপন করিবার জন্য বরফের উপর এক খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। পাথরের দেওয়াল করিয়া তাহার উপরে জলহস্তী, ভল্লুক, সীল প্রভৃতি জানোয়ারের চামড়া দিয়া চাল হইল। জলহস্তীর হাড় দিয়া কোদালি, খন্তা প্রভৃতির কাজ হইল। এই কন্-কনে শীত ফাঁকা জায়গায় পরিশ্রম করিতেও তাঁহাদের খুব কষ্ট হইল। এই গৃহ তাঁহাদের তাঁবু অপেক্ষা অনেকটা আরামদায়ক হইল। মাটীর নীচে ৩ ফুট ও মাটীর উপরে ৩ ফুট দেওয়ালের পরিমাণ হইল। সমস্ত শীত কাল এই গৃহে কাটাইয়া অনাহারে ও শীতে তাঁহাদের চেহারা অতি ভয়ানক হইয়া পড়িল। ১৮৯৬ সালের বসন্ত কালে আবার অনেক ভালুক পাওয়া গেল। এই ভালুকের কাঁচা মাংসই তাঁহাদের খাদ্য হইল। ভলুকের চামড়া দিয়া জুতা ও পোষাক মেরামত করিয়া লইয়া ১৯শে মে তারিখে তাঁহারা পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করিলেন। অনেক কষ্টের পর তাঁহারা ফ্রান্স্ জোসেফলণ্ডে মনুষ্যের ও মনুষ্য পালিত কুকুরের সাড়া পাইলেন। শীত কালে জেকসন্ এই স্থান পরিদর্শন করিতে আসিয়া এখন পর্য্যন্ত এইখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি নান্‌সেন

ও জোহান্‌সেনের অত্যন্ত সমাদর করিলেন। তিনবৎসর পরে নান্‌সেন ও জোহান্‌সেন ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া স্নান করিলেন। জেকসনকে দেশে লইয়া যাইবার জন্য যে জাহাজ আসিল সেই জাহাজ চড়িয়া নান্‌সেন ও জোহানসেন ১৩ই আগষ্ট তারিখে বার্দোবন্দরে পৌঁছিলেন। 'ফ্রাম' নামক জাহাজও ঠিক এই তারিখে বরফ ভাঙ্গিয়া সমুদ্রের স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া বার্দো পৌঁছিল।

## পেয়ারীর অভিযান।

এত পরিশ্রম করিয়া নান্‌সেনের ন্যায় অধ্যবসায়ী ব্যক্তিও উত্তর মেরুতে পদার্পণ করিতে পারেন নাই, কাছাকাছি গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। নান্‌সেনের পূর্ব্বে অসংখ্য পর্য্যটক চারিশত বৎসর ধরিয়া উত্তরমেরু আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। নান্‌সেনের প্রত্যবর্ত্তনের ১২ বৎসর পরে 'পেয়ারী' নামক একজন আমেরিকাবাসী ১৯০৯ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে উত্তর মেরুতে পদার্পণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তিনি বেকিন উপসাগর ও গ্রীণলণ্ডের উত্তর সমুদ্র দিয়া অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিবাদে যাত্রা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে নানা সাময়িক পত্রে পেআরির অভিযানের বিজয় বার্ত্তা বিঘোষিত হইয়াছিল। *

শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

---

* Ker and Cleaver's Heroes of Exploration হইতে।

# কালির মাছ ধরা।

[ স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ পাল রচিত শেষ ছড়াটি তোমাদের আজ উপহার দিলাম।
ভাই সব, আর পারিব না :
সম্পাদক। ]

( ১ )

কালি নামে একটী মেয়ে,
টুক্ টুকে রং ফরসা ;
মাছ ধরতে চল্‌লো বিলে,
সেদিন ভারি বর্ষা।

( ২ )

ঘুরুনি নিয়ে চললো কালি,
পাতবে বিলের মাঝে
এক কাঁড়ি মাছ পড়্‌বে তাতে,
তুল্‌বে যখন সাঁঝে।

( ৩ )

টিপ্ টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ে;
ঢুক্‌ছে বিলে জল ;
উজিয়ে এসে তার মুখেতে,
নাচ্চে মাছের দল।

( ৪ )

নামলো কালি বিলের মাঝে,
চললো জল ঠেলে ;
পাত্‌বে ঘুরুনি সুবিধা মত,
নালার মুখ পেলে।

( ৫ )

কোথায় তার এক হাটু জল,
কোথায় কোমর ডোবে
ভ্রূক্ষেপ নাই চল্‌ছে কলি,
মাছ ধরবার লোভে।

( ৬ )

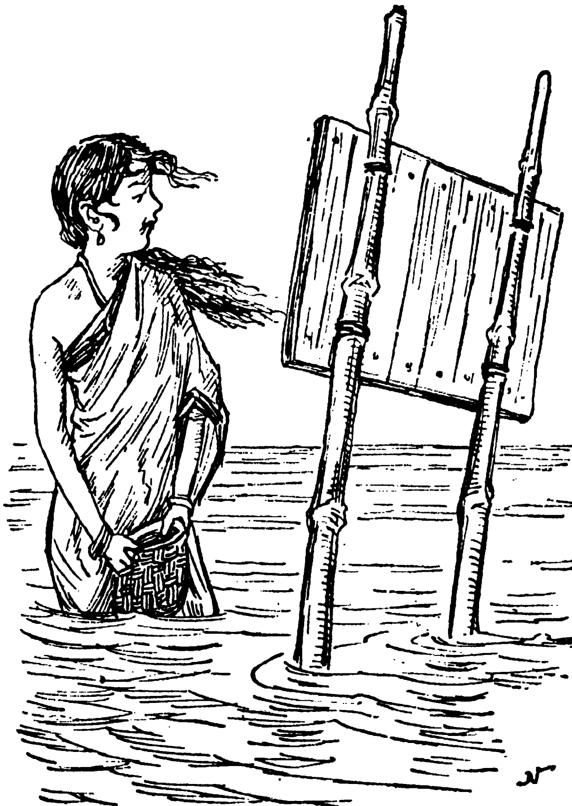
চারদিকেতে কেবল জল,
ডাক্‌ছে কোলা বেং,
ধীরে ধীরে এগোয় কালি,
সাম্‌লে ফেলে ঠ্যাং।

( ৭ )

এই ভাবেতে এগোয় কালি,
ঘুর্‌নি ঘাড় তার ;
পায়না খুঁজে পছন্দমত,
স্থান টুকু সে আর ।

( ৮ )

হঠাৎ কালি সাম্‌নে চেয়ে,
দেখে বাঁশের গায় ;
বড় বড় অক্ষরেতে
লেখা আছে তায় ।—



হঠাৎ কালি সামনে চেয়ে দেখে বাঁশের গায়,

( ৯ )
"সাবধান এগিয়ো নাকো,
স্থানটী বিপদ ময় ,
বাঁশটির ঠিক অপর দিকেই,
ডালু ডোবা হয়।"

( ১০ )
ভাব্‌লে কালি মনে মনে,
একটু গেলেই পূবে ;
তাইলেই তো একেবারে,
গিয়েছিলেম ডুবে।

( ১১ )
ভাগ্যে আমি পড়তে জানি,
তাইতো রক্ষে প্রাণ ,
নইলে পরে কি হতো তা,
জানেন ভগবান।

( ১২ )
পড়তে যারা জানে নাকো,
তারা হেথায় এলে ;
ম'র্‌তো ডুবে একেবারে,
বাঁশের পারে গেলে।

( ১৩ )
ফিরলো কালি বাড়ীর দিকে,
ঝম্ ঝমা ঝম্ বর্ষা ;
মাছ ধরতে সেদিন কালির,
হ'লোনা আর ভর্সা।

( ১৪ )
লেখাপড়া শিখা উচিত,
সবার জেনো ভবে ,
নইলে পরে পদে পদে
বিপদ ভারি হবে।

( ১৫ )
লেখা পড়া করা শিশু,
জেনো সবার সার ;
বড় হ'লে বুঝবে তখন
মূল্য কত তার ।

# ফুলের কথা।

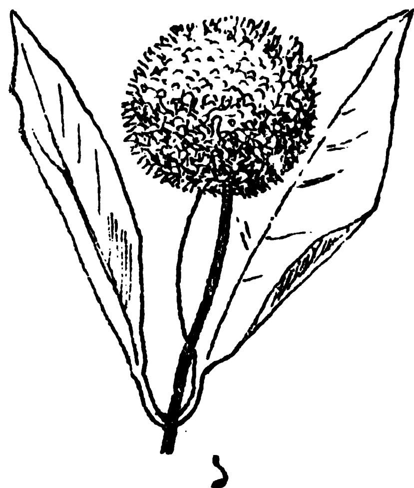
এই পৃথিবীতে অনেক জিনিষই সুন্দর; ফুল, পাখী ও প্রজাপতি কত সুন্দর সুন্দর বর্ণের হয় তাহা বোধ হয় তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। সন্ধ্যা ও ঊষার আকাশে কত রঙের মেঘ দেখা যায়, হীরা, মুক্তা, প্রভৃতি রত্ন সকল, তুষারের উপর আলোর খেলা, এমন কি কত রঙের কীট, পতঙ্গের রূপের কথা তোমরা নিশ্চয় শুনিয়াছ। কিন্তু ফুলই রূপে ও সুগন্ধে ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান।

ফুল কত রকমের হয়—আবার কেহ প্রাতে কেহ দুপুরে কেহ সন্ধ্যায় ও কেহ নিশীথে ফুটে, কেহ বা কেবল গ্রীষ্মে, কেহ বর্ষায়, হেমন্ত বা শীতে ফুটিয়া থাকে—আর বসন্ত ত ফুলেরই ঋতু তখনও ফুলের শেষ নাই।

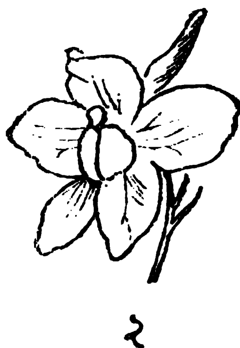
কোনও ফুলের গন্ধ মধুর, কাহারও তীব্র কাহারও বা দুর্গন্ধ আবার কাহারও বা কোনও গন্ধই নাই!

প্রায় সকল দিনের ফুলেরই উজ্জ্বল বর্ণ আছে ও অধিকাংশ গন্ধহীন—আর রাত্রির ফুল সাদা রঙের ও সুগন্ধযুক্ত। সবুজ রঙের ফুল খুব কম হয়—কাল ফুল হয় না। ঘোর বেগুনী ও লাল ফুলকে আমরা কাল দেখি।

ফুলের আকারও কত বিভিন্ন রকমের হয়; কল্মী জাতীয় ফুল কল্‌কের মত, কদম ফুল একটী বলের মত গোল, শিম বা কড়াই ফুল প্রজাপতির মত, কোন ফুল মানুষের ঠোঁটের মত, কেহ ঘণ্টার মত ইত্যাদি নানাপ্রকারের হয়।



১



২



৩



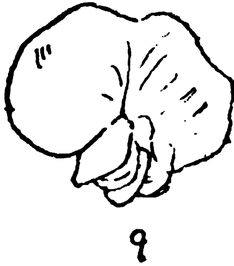
৪



৫



৬


৭


৮


৯

অর্কিড্ ফুলের বিভিন্ন আকারের তুলনা নাই, কেহ মানুষের মুখের মত, কেহ ময়ূরের মত, কেহ ছোট পাখীর মত—কত বলিব। আবার এই সব ফুলের দাম শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

আবার কোন কোন ফুল দেখিতে বৃহৎ ৫।৬ ফুট্ লম্বা, কেহ বা এত ছোট যে খালি চক্ষে দেখাই যায় না।

মরু ভূমিতে, যেখানে প্রায় একবারও বৃষ্টি হয় না, সেখানেও মন্‌সা জাতীয় ফুল ফুটিয়া থাকে। আবার মেরুপ্রদেশে—যেখানে চির, তুষারে আবৃত—সেখানেও মাঝে মাঝে ফুলের সন্ধান পাওয়া যায়। নদীর জলে,খালে,বিলে কোথাও ফুলের অভাব নাই। কেবল সমুদ্রের লোনা জলে ফুলের খোঁজ পাওয়া যায় না—এইখানেই ফুলের প্রভুত্ব দেখা যায় না। অন্য সর্ব্বত্র ফুলের অপ্রতিহত প্রভাব।

ফুলের জন্ম মানুষের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই হইয়াছে। কিন্তু ফুলের উন্নতি মানবের সহিত দেখা দিয়াছে—যদিও তাহাতে আদৌ মানুষের কোন হাত ছিল না। এখন অবশ্য অনেক উন্নতি করিয়াছে। ফুলের গন্ধের পরই কীটের সন্ধান পাওয়া যায়, ও দেখা যায় যে কীটের জন্য কুসুমের ও কুসুমের জন্য কীটের অনেক উপকার হইয়াছে—এ কথা পরে বলিব। শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

# উদ্যোগ।

শ্রীরায় এ নামে
সারা নবগ্রামে,
সাধুজিকে কে না জানে ?
বিভূ-কাজ নিয়ে,
নিরত বলিয়ে,
লোকে তাঁরে বড় মানে।
শ্রমখিন হয়ে,
এক দিন ভুঁয়ে,
পড়েছে ঘুমায়ে যেই,
অমনি স্বপন
করে দরশন
কে যেন সুধাল এই—
"সাধু-কর্ম্ম-কার
উদ্যোগ তোমার
মিতি সখা কত তার ?
তৌলিলে পাল্লায়,
বলহে আমায়,
হবে সে কত গো ভার ?"

সাধুবর কহে,
"হাতে দাঁড়ি রহে,
তৌলিয়া হের না সার !"
পেয়ে অনুমতি
সে সৌম্য মূরতি
মাপিল উদ্যোগ তার,—
হেন তবে কয়,
"শুন মহাশয়,
তোমার উদ্যোগ ভার,—
সের এক শত,
হলে ন্যায্য হত,
হেরি কিন্তু আধা তার।
রসায়ন দিয়ে
পৃথক করিয়ে
হেরিব কি সার আছে ?"
"হানি কিবা তায়,"
কহিল শ্রীরায়,
মূরতি লাগিল কাজে।

"মাঝে পঞ্চাশের
পাকা পাঁচ সের,
গোঁড়ামি নেহারি ভাই।
দর্প অহঙ্কার
আত্মশ্লাঘা আর,
একুশ সের যে পাই।
লোক প্রশংসার
আকাঙ্ক্ষা আবার
সাড়ে সাত সের ভারি ;
লালসা অর্থের—
হেরি ছয় সের
লোক ভয় হেরি চারি।
তোষামোদ স্থানে
তিন সের আনে ;
সাড়ে ছেচল্লিশ হ'ল ;
ইহার মাঝার
নাহি মোটে সার,
সব ছার, হে সরল।
প্রভু সেবা আণ,
দুই সের, বাস্,
নরহিতৈষণা দেড়।
ইহাই তোমার—
উদ্যোগের সার,
মোটে সাড়ে তিন সের।"
স্বপন টুটিল,
ঘুমও ভাঙ্গিল,
বসিয়া সে হাঁটু গাড়ি,
কহে জুড়ি কর,
"অখিল ঈশ্বর,
অপরাধী আমি ভারী।
ঘুচাও জঞ্জাল,
প্রভু হে দয়াল,
অসার যা কর ক্ষয় ;
উদ্যোগ সাধনা
যেন ষোল আনা
তব কাজে হয় ব্যয়।"

শ্রীধানি লঙ্কা।

---

# মানবের দেহযন্ত্র।

## (শেষ)

বায়ু যদি বিশুদ্ধ না হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে না থাকে বা কার্ব্বণ ডাইওক্সাইডের পরিমাণ খুব কম না হয়,—তাহা হইলে ফুস্‌ফুসের মধ্যস্থিত বায়ুও অনতি বিলম্বে দূষিত হইয়া পড়িবে,—ফলে রক্ত শুদ্ধ হইতে না পারায় মৃত্যু অনিবার্য্য। এই জন্যই রাত্রে শয়নকালে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১০ ফুট লম্বা ১০ ফুট চওড়া ১০ ফুট উর্দ্ধ একটা ঘরে যতটা হাওয়া ধরে একজন মানুষের পক্ষে প্রতি ঘণ্টায় অন্ততঃ ততখানি করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন।

**শ্বেত কণিকা ও লোহিত কণিকা।**

রক্তের প্রয়োজনীয়তা, প্রবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু রক্ত সম্বন্ধে বলিবার কথা এখনও ঢের বাকী আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সব কথা বলিবার স্থান নাই। তবে গোটা কতক মোটা কথা, যাহা সকলেরই জানা উচিত, তাহাই বলিয়া রক্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রক্তে শরীরের খোরাক গোলা থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও রক্তে আরও এমন কতকগুলি জিনিষথাকে যাহাকে খোরাক কোনও মতে বলা চলে না;—অথচ শরীরের পক্ষে তাহা একটুও কম প্রয়োজনীয় নয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া এক বিন্দু রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, রক্তের তরল ভাগের মধ্যে অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র কণিকাবৎ পদার্থ অবিমিশ্রিত অবস্থায়



শ্বেত ও লোহিত কণিকা।

পড়িয়া রহিয়াছে। আরও মনোযোগ সহকারে দেখিলে দেখা যায় যে, এই কণিকা গুলির মধ্যে আবার দুই রকম কণিকা আছে—এক রকম ঈষৎ লোহিতাভ বা হরিদ্রাভ,— আকারটা মোটরকারের চাকার মতন ;—রক্তে ইহাদের সংখ্যাই খুব বেশী, ইহাদিগকে লোহিত কণিকা বলে— আর এক রকম অপেক্ষাকৃত বড় এবং সাদা— ইহাদের কোনও বিশেষ আকৃতি নাই— ছোট ছোট পোকার ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে, সংখ্যায়ও ইহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম—এই গুলিকে শ্বেত কণিকা বলে। শুধু চোখে ইহাদের কাহাকেও দেখা যায় না। ইহারা যে কত ছোট এবং সংখ্যায় কত

অধিক তাহা বুঝাইবার জন্য শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এক বিন্দু (এক কিউবিক মিলিমিটার) রক্তে শুধু লোহিত কণিকাই ৫০ লক্ষ আছে। এই দুই জাতীয় রক্তকণিকাই শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, রক্তই শরীরের প্রত্যেক অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে; কিন্তু রক্তের কোন্ অংশ যে এ কার্য্য করে তাহা তোমাদিগকে বলিবার অবকাশ পাই নাই;—রক্তের মধ্যস্থিত লোহিত কণিকাগুলিই প্রধানতঃ এই কার্য্য করে। শ্বেত কণিকাদের কার্য্য কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এক কথায় উহাদিগকে শরীরের সৈনিক বলা চলে। শরীরের মধ্যে যখনই কোনও অনিষ্টকর জীবাণু প্রবেশ করে তখনই এই শ্বেত কণিকাগুলি, তাহাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এইরূপে বায়ুমণ্ডলস্থ কোটী কোটী জীবাণুর মধ্যে থাকিয়াও আমরা আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু যদি অনিষ্টকর জীবাণুগুলি সংখ্যায় এত অধিক হয় যে, রক্তের মধ্যস্থিত শ্বেতকণিকাগুলি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে হারিয়া যায়, তবে শ্বেত কণিকাগুলিই মারা পড়ে—এবং মানুষ রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পাক-যন্ত্র।

রক্তের কণিকাদের কথা তোমাদিগকে বলিলাম;—কিন্তু একটা কথা এখনও তোমাদিগকে বলা হয় নাই। রক্তের মধ্যে শরীরের উপযোগী খোরাক সব থাকে, একথা বারবার বলিয়াছি—কিন্তু রক্তের মধ্যে এ খোরাক আসে কোথা হইতে? রক্ত ত আর কল্পতরু নয় যে, অফুরান্ত খাদ্যের ভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছে! অবশ্যই রক্তের মধ্যে এ খোরাকের সংস্থান হয়—আমরা যে ভাত ডাল ইত্যাদি খাই তাহা হইতেই। সে কথা তোমাদিগকে না বলিলেও চলে। কিন্তু ভাত, ডাল বা মাছ ঘির সার অংশ রক্তের মধ্যে পৌঁছায় কি প্রকারে, সে কথাটা জানা দরকার। মোটামুটী

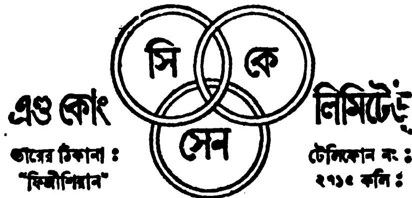


# খোস হয়েছে বুঝি, সারছে না, না ?

দেখো ভাই, মলম টলম লাগালে খোস পাঁচড়া একটু একটু সেরে যায় সত্যি কিন্তু একেবারে কখনই সারে না। 'সুরবল্লী কষায়' খেলে অসুখ ভেতর থেকে সেরে যায়, আর হয় না—খেতেও বিস্বাদ না।

: : সুরবল্লী কষায় : :

: এক শিশি ১৷৷০ টাকা :




২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

তোমরা সকলে জান যে, আমরা মুখ দিয়া যে সকল খাদ্য খাই, তাহা পেটের মধ্যে গিয়া হজম হয়—তাহার পর তাহার মধ্যে যেটুকু সার পদার্থ থাকে তাহা রক্তের সহিত মিশে, আর অনাবশ্যক অংশ মলদ্বার দিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই মোটা কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। কিন্তু এই ব্যাপারটাই আর একটু পরিষ্কার করিয়া বোঝা দরকার। প্রথমে "হজম" কথাটার মানে কি? হজমের মানেই হচ্ছে এই যে, আমরা যে সব ভাত ডাল ইত্যাদি খাই সেগুলো সেই অবস্থায় রক্তে মিশে যাবার উপযুক্ত নয়,—তাই সেগুলোকে ভেঙ্গে চুরে, ছোট করে' গুলে, এমন অবস্থায় এনে ফেলা হয় যখন সেগুলো সহজেই রক্তনালীর মধ্যে ঢুকতে পারে এবং তা দিয়ে শরীরের প্রয়োজনীয় সব উপাদান যোগান যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবদেহের যে অঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলোকে পাকযন্ত্র বলা চলে। বোঝাবার সুবিধার জন্য এই পাকযন্ত্রকে কতকগুলি ভাগে ভাগ করা চলে। মুখ এবং গলনালী ( oesophagus ) ব্যতীত, পাকযন্ত্রের আর সকল অংশগুলিই পেটের ( abdomen ) মধ্যে স্থাপিত।

মুখ

পাকযন্ত্রের প্রথম অংশ মুখ। এইখানেই প্রথম খাদ্য প্রবেশ করে, এবং লালার সহিত মিশ্রিত হয়;—এই মিশ্রণ ভাল হইলে হজমের অনেকটা সুবিধা হয়। কিন্তু খাদ্যকে লালামিশ্রিত করার চেয়েও অনেক বেশী প্রয়োজনীয় একটী কার্য্য মুখের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আমি খাদ্য চর্ব্বণের কথা পাকস্থলীতে বলিতেছি। খাদ্য হজমের পক্ষে চর্ব্বণ একেবারে অত্যাবশ্যক, কারণ খাদ্যের বড় বড় শক্ত শক্ত ডেলাগুলি চর্ব্বণ দ্বারা গুঁড়া না হইলে, হজমী রস তাহার মধ্যে ঢুকিবেই বা কি প্রকারে, আর তাহা হজমই বা করিবে কি প্রকারে? এই চর্ব্বণ কার্য্য সুশৃঙ্খলে যাহাতে সাধিত হয়, সেই

উদ্দেশ্যে ভগবান মানুষের মুখের মধ্যে জাঁতার পাথরের মত দুইপাটী করিয়া সুদৃঢ় দাঁতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাঁতকে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া না রাখিলে দাঁতগুলি অকেজো হইয়া পড়ে, এবং নানা অনর্থের সৃষ্টি করে।

মুখ হইতে খাদ্যের ডেলা গলনালী বহিয়া একেবারে পাকস্থলীতেই গিয়া পড়ে।

পাকস্থলী।

এই পাকস্থলীতে খাদ্য অনেকক্ষণ থাকে। জিভ দিয়া যেমন লালা নিঃসৃত হয়, পাকস্থলীর গা দিয়াও তেমনি এক প্রকার হজমী রস নিঃসৃত হয়। হজমী রসের সাহায্যে পাকস্থলী খাদ্য ধীরে ধীরে হজম হইতে থাকে। কিন্তু পাকস্থলীতে হজমের কার্য্য একেবারে শেষ অবধি অগ্রসর হয় না—কারণ পাকস্থলীর হজমী রসের তত তেজ নাই। আধা-আধি হজম হইলে সেই অর্দ্ধ জীর্ণ খাদ্য অল্প অল্প করিয়া পাকযন্ত্রের পরবর্ত্তী অংশ অন্ত্রে (Intestine) আসিয়া পৌঁছে। অন্ত্রকে আমরা চলিত কথায় নাড়ীভুঁড়ী বলি। তোমরা সবাই জান এই নাড়ীভুঁড়ী কত লম্বা। মানুষের নাড়ীভুঁড়ি প্রায় ২৭ ফুট লম্বা। এত লম্বা নাড়ীভুঁড়ির প্রয়োজনীয়তা কি তাহা পরে বলিব। এই অন্ত্রের প্রথম অংশে পরিপাক ক্রিয়া খুব জোর দিয়াই সম্পন্ন হয়। নানা রকম তীব্র হজমী রস এইখানে আসিয়া অর্দ্ধ জীর্ণ খাদ্যের সহিত মিশে। একরূপ হজমী রস আসে, এই অন্ত্রেরই গা হইতে;—আর এক দফা আসে (Pancreas) প্যাণক্রিয়াস্ নামক একটী হজমী রসের কারখানা হইতে;—আর এক দফা আসে লিভার বা যকৃৎ হইতে। লিভার হইতে যে রস আসে তাহাই হইল পিত্ত (bile)। এই লিভারের কথা তোমরা পরে আরও শুনিবে। প্যাণক্রিয়াস্ হইতে যে হজমী রস আসে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। এই সকল তীব্র হজমী রস অল্প সময়ের মধ্যেই অর্দ্ধ জীর্ণ খাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু এত করিয়াও আমরা যাহা খাই, তাহার সব জিনিষ হজম হয় না—সেগুলি

পরে মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু খাদ্যের যে অংশ হজম হইল, সে গুলির দশা কি হয়? সেগুলি তখন অন্ত্রের গায়ে যে সকল কৈশিক রক্তনালী থাকে, তাহার মধ্য দিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করে, জীর্ণ খাদ্যের এইভাবে কৈশিক রক্তনালীতে প্রবেশ বড় শীঘ্র সমাধা হয় না—ইহাতে বেশ একটু সময় লাগে। ততক্ষণে জীর্ণ খাদ্যও যাহাতে আবার মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া না যাইতে পারে তাহার একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। ঠিক এই কারণেই ভগবান অন্ত্রটীকে অত লম্বা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, এত লম্বা অন্ত্রের মধ্য দিয়া যাইতে যত সময় লাগিবে তাহার মধ্যে জীর্ণ খাদ্যের সবটুকুই কৈশিক রক্তনালীতে প্রবেশ করিবার সময় পাইবে। অন্ত্রের শেষ ৪ ফুট অংশ অপেক্ষাকৃত মোটা—সেই জন্য এই অংশটীকে বৃহদন্ত্র বলে। এই বৃহদন্ত্র মল নালীতে ( rectum & nauls ) আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই মল নালী যেখানে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার নাম মলদ্বার। খাদ্যের অজীর্ণ অংশ এই বৃহদন্ত্রে আসিয়া জমে। এই বৃহদন্ত্রে অনেক জীবাণুদের আড্ডা;—সেই সকল জীবাণুরা এই অজীর্ণ খাদ্যের কতকাংশ জীর্ণ করে,— এবং তাহা যাইয়া রক্তের সঙ্গে মেশে;—কিন্তু অধিকাংশ ভাগই মলে পরিণত হইয়া মলনালীতে আসিয়া জমে। এইখান হইতে সুবিধামত মলদ্বার দিয়া এই মল নিষ্কাশিত করা হয়।

লিভার।

লিভারের কথা আগে একবার উল্লেখ করিয়াছি। এই লিভার হইল মানবদেহের সর্ব্বপ্রধান্ ফ্যাক্টরী বাকারখানা। শরীরের প্রয়োজনীয় কত ভাঙ্গা গড়ার কার্য্য যে এখানে হইতেছে, তাহা হিসাব করা দায়। জীর্ণ খাদ্য যে অন্ত্রের কৈশিক রক্তনালী দিয়া রক্তস্রোতে আসিয়া পড়ে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি, কিন্তু তখনই উহা সারা শরীরে সঞ্চালিত হইতে

পায় না। অন্য কোথাও যাইবার আগে সেগুলিকে একবার লিভারের মধ্যে ঢুকিতে হয়। মানবের আত্মরক্ষার পক্ষে এ ব্যবস্থা যে কতটা উপযোগী তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যাহা কিছু খাই, তাহার মধ্যে বিষ থাকিতে পারে, আরও কত কি থাকিতে পারে। মুখে দিলে তো তাহা অবশেষে জীর্ণ হইয়া রক্তে ঢুকিবে—কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যদি শরীরের সর্ব্বত্রই বিনা বাধায় ঢুকিতে পায়, তবে তো মানুষের বাঁচাই দায় হইবে। শুধু তাই নয় ;—হুড় হুড় করিয়া সমস্ত জীর্ণ খাদ্য ত অন্ত্রের রক্তনালীতে প্রবেশ করিল ;—কিন্তু সে সমস্তই তো আর তখনই শরীরের প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক নয়। তাহার অধিকাংশই ভবিষ্যতে ক্রমে ক্রমে দরকারে লাগিবে ;—তবে অনর্থক সমস্ত জীর্ণ খাদ্যের বোঝা রক্তের ঘাড়ে চাপাইয়া রক্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া লাভ কি? জীর্ণ খাদ্যের মধ্যে আবার এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা সেই অবস্থায় শরীরের কোনই কাজে লাগে না,—অথচ তাহাই একটু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ওলট পালট করিয়া কতকগুলি নূতন জিনিষ গড়িয়া লইলে তাহা শরীরের কাজে লাগিতে পারে। এই সব কারণের জন্য, যাহাই কেন অন্ত্রের মধ্য দিয়া রক্তস্রোতে প্রবেশ করুক না, তাহাকেই আবলম্বে লিভারের মধ্যে আটকান হয়। লিভারের প্রকাণ্ড কারখানায় পড়িয়া, তাহাদের মধ্যে বিষের অংশ ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, অথবা শরীরের পক্ষে নির্দ্দোষ কোনও বস্তুতে পরিণত হয়। যে সব বস্তু শরীরের কোনও কাজে লাগে না, যত দূর সম্ভব, লিভার সে গুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহা হইতে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় নূতন জিনিষ গড়িয়া দেয়। আর যে সকল জিনিষ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিন্তু তখনই অনাবশ্যক, সেগুলিকে লিভার জমা করিয়া রাখে এবং প্রয়োজন মত সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া লিভার হইতে

নিঃসৃত রস ( পিত্ত ) হজমেরও সাহায্য করে। অতএব বুঝিতেছ, শরীরের পক্ষে, স্বাস্থ্যের পক্ষে লিভার কিরূপ প্রয়োজনীয়।

আবর্জ্জনা নিষ্কাষণ

রক্তে কি প্রকারে খাদ্যাংশ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার আবশ্যক মত পৌঁছে তাহা তোমাদিগকে বলিলাম ;—কিন্তু শরীরের আবর্জ্জনা কি প্রকারে নিষ্কাষণ করা হয়, তাহা বিশদভাবে বলা হয় নাই। ফুসফুসের কথা প্রসঙ্গে তোমাদের আমি বলিয়াছি, কি প্রকারে শরীরের একটী প্রধান আবর্জ্জনা—কার্ব্বণ ডাইওক্সাইড গ্যাস—শরীর হইতে বাহির করা হয়। কিন্তু কার্ব্বণ ডাইওক্সাইডই তো শরীরের একমাত্র আবর্জ্জনা নয়। শরীরের একদফা আবর্জ্জনার জন্ম শরীরের ক্ষয়ের দরুণ;—আর একদফা আবর্জ্জনা হইতেছে,লিভারের কারখানায় শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় যে সকল বস্তু পড়িয়া থাকে সেইগুলি। এই দুই দফা আবর্জ্জনাই শেষে রক্তের সহিত আসিয়া মেশে। এই আবর্জ্জনা নিষ্কাষণের জন্য শরীরের মধ্যে দুই সেট কারখানা আছে—এক সেটের নাম কিড্‌নি বা মূত্রযন্ত্র ;—আর এক সেটকে ঘর্ম্মযন্ত্র ( Sweat glands ) বলা হয়।

কিড্‌নি

কিড্‌নির মধ্য দিয়া যখন রক্ত চলে, তখন কিড্‌নি নানা উপায়ে সেই রক্ত হইতে আবর্জ্জনাগুলি আলাদা করিয়া লইয়া মূত্রের সৃষ্টি করে। মানবদেহে ঐরূপ একজোড়া কিড্‌নি আছে। এই একজোড়া কিড্‌নি দ্বারা সৃষ্ট মূত্র, একজোড়া নল বাহিয়া মূত্রাশয়ে ( Bladder ) আসিয়া জমা হয়। মূত্রাশয় প্রধানতঃ মাংসপেশী দ্বারা গঠিত একটী ব্যাগ বিশেষ। এই মূত্রাশয় হইতে একটী মূত্রনালী ( urethra ) বাহির পর্য্যন্ত গিয়াছে। যখন মূত্রাশয় সঙ্কুচিত হয়, তখন মূত্রনালী দিয়া মূত্র নিষ্কাষিত হয়।

ঘর্ম্মযন্ত্র মানব শরীরে একরূপ অসংখ্য বলিলেই চলে। শরীরের চামড়ার

ঘর্ম্ম যন্ত্র

ঠিক নীচেই, প্রত্যেক স্থানেই ইহা বর্ত্তমান। কিড্‌নির ন্যায় ইহাও রক্ত হইতে অনেক আবর্জ্জনা আলাদা করিয়া লইয়া ঘর্ম্মের আকারে বাহির করিয়া দেয়।

মানবদেহের অত্যাবশ্যক সকল যন্ত্রের কথাই কিছু কিছু বলিলেন। শুধু



প্লীহা

প্লীহা

প্লীহা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। প্লীহার উপকারিতাও বড় বেশী নয়;—অন্ততঃ মানুষ এখনও ইহার খুব বেশী প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তবে রক্তের লোহিত কণিকাগুলির ধ্বংশের সহিত প্লীহার সম্পর্ক আছে।

**চর্ম্ম**

এইরূপে মানবের যে অভিনব দেহযন্ত্রটী নির্ম্মিত হইয়াছে—তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে চর্ম্ম। এই আচ্ছাদনীর উপকারও বড় কম নয়। ইহা একদিকে যেমন, অভ্যন্তরস্থ নরম বস্তু সকলকে আচ্ছাদিত করিয়া রক্ষা করিতেছে;—অন্যদিকে তেমনি শীতের সময় সঙ্কুচন দ্বারা এবং গ্রীষ্মের সময় প্রসারণ দ্বারা সারা বৎসর ধরিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিতে সাহায্য করিতেছে। তোমরা জান, আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮ ডিগ্রী (ফ্যারেনাইট্)। এই উত্তাপের বেশী কম হইলে শরীর যন্ত্র একটু একটু করিয়া নষ্ট হইয়া যায়,—তাই সারা বৎসর ধরিয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষা একেবারে একান্ত আবশ্যক। চর্ম্মের সঙ্কোচ ও প্রসারণ এবং বিশেষভাবে ঘর্ম্মত্যাগ এই উত্তাপ রক্ষার প্রধান উপায়।



# কতগুলো কথা।

## কুম্ভকর্ণ।

তোমরা কেউ হিসেব করে আমাকে বলে দিতে পার—কে সবার চেয়ে বেশী ঘুম ঘুমিয়েছ? আমার মনে হয় না একাদিক্রমে আটদশ ঘণ্টার বেশী কেউ ঘুমিয়েছ! সম্প্রতি একটী মেয়ের খবর পাওয়া গেছে সে একাদিক্রমে ৩২ বছর ঘুমিয়েছে। কারোলিন কারলসড্যাতর একটি তেরো বছরের মেয়ে। সুইডেন দেশের একটী পাড়াগাঁয়ে ছিল তার বাড়ী। হঠাৎ একদিন স্কুলে তেরো বছরের ঐ মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে। মাষ্টার মশাইরা অনেক চেষ্টা করেও যখন তার ঘুম ভাঙ্গাতে পারলেন না, তখন তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। সেখানেও তার ঘুম ভাঙ্গল না। ৩২ বছরের পর তার ঘুম ভেঙ্গেছে। তোমার আমার রাত্রিশেষে যেমন সহজ ও সুস্থ ভাবে ঘুম ভাঙ্গে তারও তেমনি ভাবে ভেঙ্গেছে। ১৩ বছরের একটি রোগা সোগা মেয়ে ঘুমিয়েছিল জেগে দেখ্‌লে, তার ৪৫ বছর বয়স হয়ে গেছে। গালের মাংস ঝর ঝর, দাঁতের গোড়ারও জোর নেই অর্থাৎ আর দিন কতক পরেই বুড়ী হতে হবে। তবে একটা আশ্চর্য্য এই যে ৩২ বছর আগে স্কুলে যে পড়তে পড়তে তার ঘুম এসেছিল পড়া শেষ হয় নি এ কথা তার মনে ছিল। জেগে উঠে আবার মেয়েটি সেই স্কুলে পড়তে গেছে।

## কাশি।

কাশি আমারও হয়, সম্ভবতঃ তোমাদেরও হয়। আমার ত মাঝে মাঝে এমন কাশি হয় যে মাথাটাথা ব্যথা হয়ে যায়। অথচ কুড়েমি করে

অষুধ বিষুধও খাওয়াও হয় না। একজন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে বলেছেন যে তিনটী ডিম বা দুই গ্লাস দুধ খাইলে যতটা পুষ্টি হয়, ঘণ্টায় চারবার কাশিলে ১০ ঘণ্টায় সেই পরিমাণ শক্তি কমে যায়। সাধারণতঃ শ্বাস প্রশ্বাসে ফুসফুস হইতে যে বায়ু নির্গত হয় তাহার বেগ সেকেণ্ডে চার ফুট কিন্তু ঘন ঘন কাশির সময় ঐ বায়ু সেকেণ্ডে তিনশত ফুট বেগে বাহির হইতে থাকে। কাশিতে যতটা ক্ষয় শরীরের হয় ততটা পুষ্টিকর খাদ্য আমাদের প্রায় জোটে না। এই জন্যই যারা বেশী কাশে, তারা তত রোগা। আমাকে দিয়েই দেয় না। তাই বল্‌ছি তোমরা একটু একটু কাশি হলেই ডাক্তার-বদ্যির স্মরণ নিও। বুঝলে হে ?

## সম্রাটের চৈতন্য।

একজন প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লিঝ। ইনি একবার রাসিয়ার সম্রাট ঝারকে খানিক ভদ্রতা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। গল্পটা আমি যেমন শুনেছি তেমনি তোমাদের বল্‌ছি শোন।

একবার রাসিয়ার সম্রাট ভবনে তিনি সম্রাট ও সম্রাট পরিবারের সামনে তাঁর অদ্ভুত যন্ত্র বিদ্যার পরিচয় দিচ্ছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে লিঝ্ চেয়ে দেখেন, সম্রাট তাঁর পাশের লোকটির সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। দেখেই যন্ত্রী তাঁর যন্ত্র পাতি ফেলে চুপ করে গেলেন। অভিনেতাকে চুপ করতে দেখে সম্রাট কথা বলা বন্ধ করে যন্ত্রীর দিকে চেয়ে বাদ্য আরম্ভ করতে অনুরোধ করিলেন।

লিঝ যন্ত্র রেখে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়ে উঠে বিনীত কণ্ঠে বল্‌লেন—সম্রাট, রীতি এই যে রাজা যখন কথা কইবেন তখন অন্য সকলে নীরব হবে।

রাজা অপ্রস্তুত হয়ে, গেলেন, বুঝলেন, অন্যায় তিনিই করেছেন। কথা বলা তাঁর উচিত হয় নি।

তোমরা হয়ত কখনো না কখনো কোনো গানের কি বাজনার কি কোন সভায় উপস্থিত হও, সাবধান! জেনো, সভায় বসে কারু সঙ্গে ফুসফাস করা কি গল্প করা অভদ্রতা।

## রাজার বই।

ধর একজন রাজা একখানি বই লিখেছেন, কোন প্রকাশককে ছাপাতেও দিয়েছেন, প্রকাশক সেখানা ছাপবে না ফেরত দেবে! নিশ্চয়ই তোমরা বল্‌বে যে বইখানির গুণ বুঝে তার পর বিচার হবে। ধর বই ভাল হয় নি, কিন্তু রাজার লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব কি? নিশ্চয়ই না।

একবার এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল। পর্ত্তুগেলের রাজা লুই পঁচিশ বৎসর ধরে সেকসপীয়ারের গ্রন্থরাজি তর্জমা করে লণ্ডনের এক প্রকাশকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, সেগুলি প্রকাশ করতে। প্রকাশকগণ সসম্ভ্রমে বইগুলি নিলেন বটে কিন্তু ছাপতে সাহস কর্‌লেন না, ক্ষতি হয় যদি-ই! রাজা অন্য প্রকাশকের কাছে পাঠালেন, তাঁরাও কিছুদিন ধরে ভাবতেই লাগলেন, বই আর বেরুল না। রাজা শেষে মহা বিরক্ত জ্বালাতন হয়ে সব বইগুলি লিসবনে ফিরিয়ে নিয়ে এক পর্ত্তুগীস্ প্রকাশককে দিয়ে বার করালেন—কিন্তু সমস্ত নিজের খরচে। তাঁর দেশের তাঁরই রাজ্যের একজন প্রজা প্রকাশক সে ছাপল—কিন্তু খরচ সে করল না, কর্‌তে হল রাজাকে।

সাহিত্যের ব্যবসা এমনি জিনিষ।

## আমাদের পা।

আমাদের পায়ের মাপ বাড়ছে বা কমছে এই নিয়েও অনেকে মাথা ঘামাচ্ছেন। কিছুদিন আগেও আমরা শুনেছিলাম, আমাদের শ্রীচরণ গুলি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি একজন ইতালিয়ান শিল্পী ভাস্কর, ও দেহ

বৈজ্ঞানিক কিন্তু ঠিক উল্‌টো কথা বল্‌ছেন। এর মতে আমাদের পা—বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের চরণকমলগুলি দিনকের দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগেকার হাড়,আর মামী প্রভৃতির পায়ের মাপ থেকে দেখা যাচ্ছে যে তখন পায়ের মাপ ১২ ইঞ্চি ছিল এখন দাঁড়িয়েছে ১০॥ ইঞ্চি—অর্থাৎ ১॥ ইঞ্চি কমে গেছে।

সর্ব্বনেশে কথা যে গো! শেষ কালে পা গুলো থাক্‌বে ত? না হাঁটু দিয়েই হাঁট্‌তে হবে?

---

## চিত্র পরিচয়

**My Second Sermon.** **ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ** (দ্বিতীয়বার)

স্যার জে, ঈ, মিলে, ব্যারনেট, পি-আর-এ

ছবিখানির নামটি যেমন অদ্ভুত, বিষয়টিও তার চেয়ে অল্প অদ্ভুত নয়। মেয়েটি গীর্জ্জায় ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে শুনিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে।

মিলে তাঁহার কন্যাকে আদর্শ করিয়া ছবি আঁকিতেন। My first Sermon নামে এই চিত্রকরের আর একখানি চিত্র ছিল, সেখানি আঁকিয়া মিলে নিজেই এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে চিত্র শেষ করিবার কিছু দিন পরেই তিনি উত্তর দেশে যাইবার কালে ছবিখানির একটি তৈল-প্রতিকৃতি আঁকিয়া লইয়াছিলেন। আঁকিয়াছিলেন তাও আবার দু'দিনে। সে দু'দিনে তিনি স্নানাহার পর্য্যন্ত করিতে উঠেন নাই। তিনি তাঁর মাকেই একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, মা, এত আনন্দে আর এত শীঘ্র কোন কাজ আমি জীবনে কোনদিন করি নাই।

এই ছবিখানি দেখিয়া ক্যাণ্টারবারির আর্কবিশপ বলিয়াছিলেন, যাঁহারা (যে সকল ধর্ম্মযাজক) লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়া লোকের ধর্ম্মজ্ঞান জাগাইতে চান, তাঁহাদের এ চিত্র দেখিয়া জ্ঞান হওয়া উচিত।

# ভগবানের তিনটি দান।

## পেটালোগিয়া দেশের গল্প—পুরানো কালের প্রবাদ

ভগবান মানুষকে প্রথম এমনই করে সৃষ্টি করেছিলেন যে তাকে কোন কাজই করতে হ'তনা, অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য ভাবতে হ'ত না। প্রত্যেকে ঠিক একশ বছর বাঁচ্‌ত, আর কারু কখন কোন রোগ ছিল না।

এমনই দিন যায়, একদিন ভগবানের ইচ্ছা হ'ল দেখবেন মানুষ কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে। তিনি দেখলেন নিজের সৌভাগ্যে সুখী হওয়া দূরে থাকুক, মানুষ নিয়তই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করে জীবনটাকে অভিশাপে পরিণত করেছে।

ভগবান বুঝলেন, পরস্পরের সহিত মেলামেশা না করে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপনের ফলেই এইরূপ ঘটেছে। তাই তিনি ব্যবস্থা করলেন এখন থেকে মানুষকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পরিশ্রম করতে হবে—থাকবার জন্য তাকে বাড়ীঘর তৈয়ের করতে হবে, অন্ন সংস্থানের জন্য তাকে জমি চাষ করতে হবে ও গরু বাছুর পুষতে হবে। ভগবান ভাবলেন, এইবার মানুষ মিলেমিশে কাজ করতে শিখবে। বন থেকে গাছ কেটে আনা, ঘর তৈয়ের করা, যন্ত্রপাতি তৈয়ের করা, জমি চাষ করা, কাপড় বোনা—একা কেউ আর এতগুলো কাজ করতে পারবে না। তাকে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হতেই হবে।

কিছুদিন যায়, আবার একদিন ভগবান চেয়ে দেখলেন মানুষ কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে। এবার তিনি দেখলেন মানুষ তার অবস্থা আরও শোচনীয় করে তুলেছে। তারা অবশ্য মিলেমিশেই কাজ করছে, কারণ অপরের উপর একেবারেই নির্ভর না করে এখন আর বেঁচে থাকার জো'টি নাই—কিন্তু সবাই

একযোগে কাজ করছে না। মানুষ নিজের ভিতর কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করেছে, তাদের প্রত্যেকে অপরের কাজে ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে, ও নিজের কাজগুলি অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। ফলে পরস্পরে ঈর্ষাদ্বেষ লেগেই আছে।

এবার ভগবান বিধান করলেন, এখন হ'তে আর মানুষের মরবার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স থাকবে না, যে কোন বয়সে, যে কোন মুহূর্ত্তে তার মৃত্যু হ'তে পারবে। ভগবান ভাবলেন, মানুষ যখন বুঝবে যে কোন মুহূর্ত্তে জীবনের শেষ হতে পারে, তখন আর তার পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে ছুদিনের জীবনের শান্তি নষ্ট করবে না।

কিন্তু ফল দাঁড়াল অন্যরূপ। মানুষের ভিতর যারা অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী তারা এই ব্যবস্থার সুযোগ পেয়ে দুর্ব্বলের প্রতি যথেচ্ছা অত্যাচার আরম্ভ করল, যারা তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাদেরই তারা মেরে ফেলে দেয়, আর বাকীগুলিকে দিয়ে তারা তাদের কাজ করিয়ে নেয়। ফলে একদল লোক সম্পূর্ণ অলসভাবে দিন কাটাতে আরম্ভ করল, আর অপরের অদৃষ্টে শুধুই গতর ভাঙ্গা খাটুনি—কারু প্রতি কারু শ্রদ্ধা নাই, মমতা নাই।

ব্যাপার দেখে ভগবান মানুষের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি করলেন। তিনি ভাবলেন, মানুষকে ব্যাধির অধীন করলে যে স্বাস্থ্যবান সে নিশ্চয় রোগীর শুশ্রূষা করবে, কারণ স্বতঃই তার মনে হবে যে সে নিজেও ঠিক তেমনই রুগ্ন হতে পারে।

কিন্তু ব্যাধি সৃষ্টির ফলে মানুষের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। যারা প্রবল তারা স্বয়ং রোগীর শুশ্রূষা করা দূরে থাকুক, যারা দুর্ব্বল এবং যাদের দিয়েই তারা আপনাদের কাজ করিয়ে নিত, তাদেরই উপর তারা

আপনাদের রোগের পরিচর্য্যার ভার ন্যস্ত করল, ফলে সেই সকল লোক কর্ম্মভারে এমনই নুয়ে পড়লে যে রুগ্ন ও ব্যথিত স্ত্রীপুত্র কন্যাদের দিকে ফিরে চাইবারও তাদের অবসর রইল না। তা'ছাড়া কতকগুলি রোগ আবার সংক্রামক বলে গন্য হল, সেই সকল রোগে কেউ আক্রান্ত হলে নিতান্ত আপনার জনও তাকে ত্যাগ করতে আরম্ভ করল।

ভগবান ভাবলেন, এত করেও যখন মানুষকে বুঝাতে পারলেম না কিসে সে প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারে, তখন দৈন্যের ভিতর দিয়াই ধীরে ধীরে সুখের সন্ধান করুক।

তারপর কতদিন যায়—মানুষ ঠিক তেমনই চলেছে, পরস্পরে ঈর্ষা দ্বেষ। শেষে তারা কেউ কেউ বুঝতে পারলে ভগবান যে মানুষের পক্ষে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেছেন তার অর্থ এ নয় যে একদল লোক আপনারা অলস থেকে অপরকে রাতদিন খাটিয়ে নেবে, পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা প্রকৃত পক্ষে মানুষের ভিতর ঐক্যের সৃষ্টি করে তাদের অন্তরে একটা অননুভূত আনন্দ এনে দেবে। তারা বুঝলে মৃত্যুর দূত যখন শিয়রে দাঁড়ায়ে তখন পরস্পরকে ঈর্ষা করে ক্ষণিক দিনের জীবনকে তিক্ত না করে ভালবেসে তাকে উপভোগ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। আরও বুঝলে ভগবান ব্যাধির সৃষ্টি করে মানুষের ভিতর বিভাগের আয়োজন করেন নাই, ব্যাধি সুধু মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছে যে সে কত দুর্ব্বল, কত অসহায়, পরস্পরের ভালবাসা ও সহানুভূতি তার পক্ষে কত প্রয়োজন।

কে জানে কতদিনে, কতযুগে পৃথিবীর সকল মানুষ ভগবানের এই করুণার দানের মর্ম্ম বুঝবে?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ গুপ্ত।

( Tolstoiএর Labour death and disease অবলম্বনে )

# "আমার দেশ" সেবা ভাণ্ডার

আমরা গতবারে বলিয়াছিলাম, ফাল্গুন মাসেই সেবাভাণ্ডারের প্রাপ্ত অর্থ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে দিয়া আসিব। আচার্য্য দেব সম্প্রতি গুজরাট বোম্বাই অঞ্চলে দেশের কাজে গিয়াছেন, তাই টাকাটা জমা দেওয়া হয় নাই। চৈত্র মাসের মধ্যেই আমার দেশের বন্ধুদের দেওয়া টাকাগুলি তাঁহাকে দিয়া আসিব।

ইতিমধ্যে আমরা আরও কিছু টাকা পাইয়াছি, আশা করি আরও পাইব। এই প্রসঙ্গে কুমারী বেলা ঘোষকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইতেছি। গত মাসের কাগজে তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তিনি তাহার সহপাঠিনী ও বন্ধুমহলে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা বলিয়াছিলাম, এই মাসে তাঁহার সংগৃহীত অর্থের প্রথম দফা আমাদের হস্তগত হইল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি বেলার জীবন আরও সুন্দর হোক্, মহান্ হোক্, পবিত্র হোক্। আমাদের অন্যান্য গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা ও বন্ধুদেরও ধন্যবাদ জানাইতেছি। জগদীশ্বর তাঁহাদের মঙ্গল করুন, কায়মনে এই কামনা করিতেছি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| পূর্ব্বের প্রাপ্ত— | ৫০৷৷০ | জের | ৬৭৲ |
| এই মাসে প্রাপ্ত ঃ— | | শ্রীমতী বীনাপাণি দেবী | |
| কুমারী বেলার সংগৃহীত— | | (শ্রীরামপুর রাজবাটী) | ১০৲ |
| শ্রীমতী প্রতিভা দেবী | ৫৲ | শ্রীমান কিরণকুমার সাহা | ১৲ |
| শ্রীমান শান্ত বাবু | ২৲ | শ্রীমতী স্নেহলতা সাহা | ১৲ |
| শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী | ১৲ | (সিরাজগঞ্জ) | |
| " প্রতিভা চট্টোপাধ্যায় | ২৲ | শ্রীমান বলাইকৃষ্ণ গোল | ১৲ |
| শ্রীমান দিলু বাবু | ২৲ | (হুগলী) | |
| স্কুল হইতে সংগৃহীত | ৪৷৷০ | শ্রীমান ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী | ৷৷০ |
| | | " নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী | ৷৷০ |
| | ৬৭৲ | " সাহিত্যসাধনা "পরিচালকগণ মাঃ | |
| | | নসেরআলি সিকদার | ৷৷০ |
| | | | মোট ৮১৷৷০ |

# গত মাসের চিত্রপরিচয়

## ( স্কুলে )

প্রথম বালক বই খুলে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছে বাড়ীর খেলার সঙ্গীগুলির কথা। বাড়ী থাক্‌লে সে এতক্ষণ ছোট্ট মিনি বেরালটাকে নিয়ে কত খেলা কর্‌তে পার্‌ত, তাই ভাব্‌ছে। সুতরাং তা'র মনটা বই ত ছেড়েছেই, আর সঙ্গে সঙ্গে স্কুল ছেড়ে বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বালক পড়া করে স্কুলে আসে নাই তা'ই মনে বড় ভয় হয়েছে। যারা পড়া বল্‌তে পারছে না, সে তা'দের অবস্থা স্বচক্ষে দেখ্‌ছে আর তার প্রাণটা শুকিয়ে যাচ্ছে। সেইজন্য কখন তার পড়া বল্‌বার পালা আস্‌বে এই ভয়ে সে মাষ্টারের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

তৃতীয় বালক পড়ছিল না বলে মার খেয়েছে। চোখের জলে সে বইয়ের অক্ষরই দেখ্‌তে পাচ্ছে না। সে কেবল ভাব্‌ছে কাল থেকে আর স্কুলে আস্‌বে না।

চতুর্থ বালক মাষ্টারকে বই আড়াল দিয়া পঞ্চম বালকের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌ছে যে ছুটীটা একবার হ'লেই হয়। স্কুলে আস্‌বার আগে তারা এক জায়গায় পাখীর ছানার সন্ধান করে এসেছে। ছুটী হ'লেই সেখানে গিয়ে পাখীর ছানা পাড়্‌বে। সুতরাং তা'দের মন বই ছেড়ে যে পাখীর ছানার পাশে উড়ে গেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ষষ্ঠ বালকটীর চিত্র সবচেয়ে সুন্দর ভাবে ফুটেছে। দুষ্টামি করার ফলে তা'র মাথায় 'গাধার টুপি' পরিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর নিজের এক কান্ নিজে ধরে তা'কে পেছনের বেঞ্চিতে গিয়ে বস্‌তে হয়েছে। অভিমান আর দুঃখে তা'র চোখ ফেটে জল আস্‌ছে। আর সকলের মুখের দিকে তাকাচ্ছে যে কেউ তা'র দিকে চেয়ে হাস্‌ছে কি না। তার মনটা যে বইয়ের দিকে মোটেই নাই, তা'র অবস্থা দেখে বুঝা যায়।

সপ্তম বালকের মুখের ভাব দেখ্‌লেই বুঝা যায় সে মনে মনে কি একটা স্থির কর্‌ছে।

পাড়ায় এক বাগানে লিচু পেকেছে, ছুটীর পর গিয়ে সেই লিচু চুরি কর্‌তে হবে। কিন্তু চুরি করাটা ত সহজে হ'বে না কারণ বাগানে যে মালি থাকে, তা'ই কেমন করে সেই মালির চোখে ধুলি দিয়ে লিচু চুরি কর্‌বে তা'ই স্থির কর্‌ছে। সুতরাং বইয়ের দিকে তা'র মন যাবে কিরূপে?

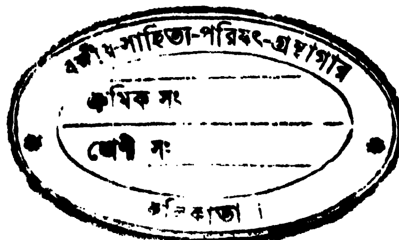
অষ্টম বালক মহা ভাবনায় পড়ে গেছে যে সকলেরই জ্বর হয় মাষ্টারের হয় না কেন। মাষ্টারের কি অসুখ নাই? তা'র ঐ চিন্তার রেখাটা সুন্দর ভাবে তা'র মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সমস্ত ছবিটীতে চিত্রকর বেশ সুন্দর একটা ভাব পরিস্ফুট করে তুলেছেন, তিনি বেশ দক্ষতার সহিত দেখিয়েছেন যে বালকগণের 'প্রাথমিক শিক্ষা স্কুলে হলে তাহা দ্বারা কোন সুফল ফলে না। যে চঞ্চলমতি বালকগণের সমস্ত দিনও খেলা করে আশ মিটে না, তাহাদিগকে কি এমনিভাবে স্কুলরূপ 'কয়েদখানায়' আটক করে রেখে তা'দের স্বাস্থ্য ও মন দুইই ভেঙ্গে দেওয়া উচিত? এতে কি তাদের কোন উপকার হবে? উপকার ত কিছুই নয় বরং অপকারই বেশী। চিত্রকর বোধ হয় ঐ ভাব সাধারণের মনে জাগিয়ে তুল্‌বার জন্য নিপুণ হস্তে চিত্রখানি অঙ্কিত করেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হ'ক।

(শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীমতী মীনারাণী সেন আর দুটী বিবরণ দিয়াছিলেন। সম্পাদক)

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে।

---



# জানা-জানি

ফাল্গুণ মাসের ( ১ ) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

লক্ষ্মী সরস্বতী মাছ খান না, তাই লোকেও নিরামিষ খায়।

—সুধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়।

( ১ ) অনেক স্থানে নিরামিষ খাওয়ার চলন নাই। যথা, বিক্রমপুর।—এখানে জোড়া ইলিস খেতে হয়। মোঃ ন, আঃশিকদার।

( ২ ) সরস্বতী পূজা শ্রীপঞ্চমীতে হয়, শ্রীপঞ্চমীর নাম, বসন্ত পঞ্চমী, সেই জন্য বাসন্তী রঙের কাপড় পরে।—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, শ্রীরামপুর রাজবাটী।

মাঘ মাসের ( ২য় ) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ভারতবর্ষের বাঙ্গলা ও বিহার প্রদেশেই বেশী আম্র উৎপন্ন হয়—শ্রীসন্তোষ কুমার গুপ্ত, জেমসেদপুর।

ফাল্গুণ মাসের ( ৪ ) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

স্বপ্ন দেখবার সঠিক কারণ এখনও নির্ণিত হয় নাই। অনেকে বলেন, দিনের চিন্তাই নিদ্রাঘোরে স্বপ্ন হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে কখনও কখনও অন্যরূপও হয়।—দীনেশচন্দ্র গুপ্ত।

ফাল্গুণের ( ৩ ) প্রশ্নের প্রত্তর ঃ—

আমরা "জয় গোপাল বাবুর রচনা পদ্ধতি"তে দেখিতে পাই এদেশে কবে কাগজ প্রচলিত হয় তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে চীনদেশে খৃঃ প্রথম শতাব্দীতে কাগজ প্রথম চলে, সেখান হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, অনুমান হয়।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত।

ফাল্গুণ মাসের (৫) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

ভবভূতি সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি। দক্ষিণা পথের বিদর্ভ (বেরার) প্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোপালের পৌত্র ও পবিত্র কীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র ইহার মাতার নাম—কর্ণী।—অমরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

মাঘ মাসের (৩) প্রশ্নের উত্তর ঃ—

আইস্ল্যাণ্ডের লোক সব চেয়ে বেশী বাঁচে।

মাঘ মাসের (৬)এর উত্তর ঃ—

ভারতে পূর্ব্বে লেস্‌কাপড়, তাঁত, চরকা- সুতা, ঢাকাই কাপড় প্রভৃতি অনেক রকম শিল্প ছিল। —কুমারী অন্নপূর্ণা সেন।

## নূতন প্রশ্ন।

(১) আমরা যখন রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়াই, তখন আমাদের ছায়া অনেক লম্বা হয় কেন? —শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(২) বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রথম কবিতা কে রচিয়াছিলেন? কবিতার কি নামই বা ছিল?

(৩) কাশীর অপর নাম—বারাণসী, কেন? —শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী।

(৪) কেউ আমাকে যদি বলে দিতে পারেন যদি আমি বড় খুসী হব, যে কেন আকাশ থেকে নক্ষত্র ছুটে এবং ঐ নক্ষত্র ছুটিয়া কোথায় পড়ে—মাটিতে না আকাশে? শ্রীকিরণ কুমার সাহা।

শ্রীমান কালীকৃষ্ণ! ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের নাম মহাভারত খুলিলেই দেখিতে পাইবে। মহামুনি পিতার ও মাতার নামও মহাভারতে আছে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—আসচে মাসে অনেকগুলি নূতন ধাঁধা থাকিবে।

# ফাগুন মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) 6. 9. (২) রসনা, (৩) দাগ, (৪) দেওয়াল (Wall)

নিম্নলিখিত গ্রাহক-গ্রাহিকারা চারটি ধাঁধারই উত্তর দিয়াছেন :—

কুমারী বীনাপাণি রায়, দীনহাটা; বিনয়েন্দ্র নারায়ণ সিংহ, ভাগলপুর; ধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী; গণেশচন্দ্র দাশ, কীর্ত্তিপাশা; হিরণ্ময়ী সেন, নোয়াখালি; চন্দ্রপ্রভা কুণ্ডু, সুনামগঞ্জ; আনওয়ারউল হক্, ঢাকা; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা; মায়াময়ী মজুমদার, কলিকাতা; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; সত্যেন্দ্রনাথ বসু, রসা; কালীচরণ গণ, চ্যাচরা; সচীন্দ্রনাথ বারিক, কলিকাতা; প্রিয়ম্বদা সেন, মণিরামপুর; ভরতচন্দ্র দাশ, হাতিকান্দা; সরোজকুমারী দেবী, মধুপুর; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; চিন্ময় সেন, ঝাউতলা; নৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী উয়ারী, ঢাকা; কুমারী মুকুলরাণী দাশ; ধীরেন্দ্রকিশোর ও নরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী; অনিলকুমার বসু, চুঁচুড়া; নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, শিবসাগর; পার্ব্বতীচরণ লাহা, অনন্তচরণ লাহা, কলিকাতা; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; পুষ্পময়ী মজুমদার, কলিকাতা ও সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা।

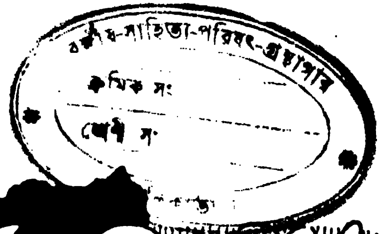
---

যাঁহারা চারিটির কম ও একটির বেশী ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন :—

কুমারী পরিমলবালা বসু; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরুলিয়া; গোবিন্দপ্রসাদ হালদার, পিঙ্গরাহাট; সত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পাটনা; জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ বাহুবলীন্দ্র, ময়ণাগর রাজবাটী; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী; বৈদ্যবাটী বালক সমিতীর সভ্য, শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়; ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; কিরণকুমার সাহা, সিরাজগঞ্জ; কুমারী শান্তিলতা হালদার, কলিকাতা; আর্য্যকুমার গুপ্ত, কলিকাতা; প্রভাতকুমার গুপ্ত, কলিকাতা; কুমারী মীনরাণী সেন, বিহার; নির্ম্মলকুমার ধর, বসিরহাট; শম্ভুচরণ সেন, পাটনা, শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; জিতেন্দ্রনারায়ণ রায়, পাটনা; হরিচরণ শেঠ, কলিকাতা; বীণা দেবী, মহিয়ারা; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা; অজিতকুমার সিংহ রায়, মান্দড়া।

---






# আমার দেশ

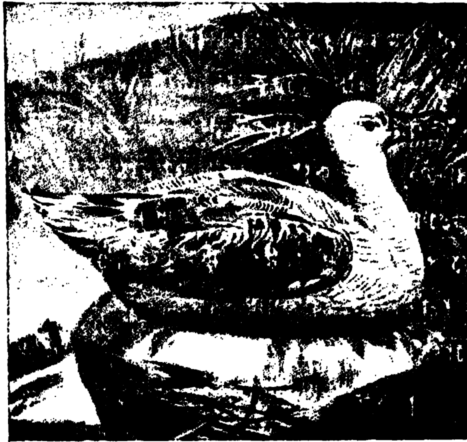
৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। বৈশাখ, ১৩৩০।

## সমুদ্রের পাখী

ডাঙ্গার জীবজন্তুর বিষয় ত সর্ব্বদাই তোমরা শুনিতে পাও ; এবারে তোমাদিগকে কয়েকটী সমুদ্রের পাখীর কথা বলিব। মাঝে মাঝে এমন দু'চারিটী পশুপক্ষীর কথা আমরা শুনিতে পাই যে বাস্তবিকই তা'দের চলাফেরা, মতিগতি, ঘরকন্না ইত্যাদি বিষয়ে বেশ একটু জানিবার আছে। সমুদ্র-যাত্রী, মেরু যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেরই নানা রকম পাখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে ; সমুদ্রের আশে-পাশে, তুষারস্তূপের নিকটে ও জলের উপর এ সব পাখী চরিয়া বেড়ায়। এক-একটা পাখীর বাসা-নির্ম্মাণ ও গতিবিধি লক্ষ্য করিলে অবাক হইতে হয়। চালচলন ও সভ্যতা হিসাবে সবচেয়ে পেঙ্গুইন্ পাখীই প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত ; যাঁহারা পেঙ্গুইন্ দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে ঠিক্ যেন মানুষের মত—মানুষের মত সোজা হইয়া সাম্নের দিকে পা ফেলিয়া চলে। পোষাক পরিচ্ছদও বেশ সুন্দর—ফুরফুরে শাদা পালকের উপর কাল "চোগার" ন্যায় দুইটী ডানা ; পায়ের আকার হাঁসের

পায়ের পাতার মত। পেঙ্গুইনদের ঘরকন্না আহার বিহার দেখিতে বড়ই মজার ; তা' ছাড়া দলাদলি ও নীড় রচনা করিবার সময় পেঙ্গুইন মহলে যে কিরূপ হুলুস্থুল পড়িয়া যায় তা' না দেখিলে বুঝান কঠিন। তারা ভারি ভদ্র—তাই মারামারি করিবার সময়ও ঠোকর দেয় না, ডানার ঝাপ্টায় শত্রুকে জব্দ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাঁটিবার সময় মানুষের নকল করিতে গেলেও ইহাদের নিতান্ত বিশ্রী দেখায়। দুঃখের বিষয় পাখী হইয়াও এরা উড়িতে পারে না—ফলে দিন দিন এদের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছ। তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে যে অক্ নামে এক শ্রেণীর পাখী পৃথিবী থেকে প্রায় লোপ পাইয়াছে। উত্তর আমেরিকায় আইস্ল্যাণ্ড দ্বীপে অক্ পাখীর আড্ডা ছিল ; সেখানে তিমি-শিকারীরা দলে দলে যাইয়া নিরীহ বেচারাদের একেবারে নির্ম্মূল করিয়া দিয়া আসিয়াছে। এক একটী অকের ডিমের দাম শুনিলে তোমরা মাথায় হাত দিবে।

সমুদ্রে যতপ্রকার পাখী বিচরণ করে তন্মধ্যে "রাজা" বল্‌তে গেলে 'আলবেট্রস্'-কেই বলা উচিত। সমুদ্রের উপর মুক্ত-আকাশে গা ভাসাইয়া পাখীটী যখন উড়িতে থাকে, তখন বড়ই সুন্দর দেখায় ; উরো আলবেট্রস্ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে বাস্তবিকই ইহা দেখিলে নয়ন ও মনের তৃপ্তি হয়। তাই কেহ কেহ ইহাকে wanderer বলিয়া থাকেন। এদের স্বভাব এমন যে সমুদ্রে কোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হইলে খাবার লোভে শত শত মাইল পর্য্যন্ত তার পিছনে পিছনে ছুটে। অনেক সময় জাহাজের সঙ্গে পাল্লা ধরিয়া তীরের মত ছুটিতে থাকে ও আহারের সন্ধান পাইলেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাহাজের উপর বসিতে চায়। ডাঙ্গায় চলাফেরার সময় এগুলি পেঙ্গুইনের মত বিশ্রী ঢং করিয়া চলে। এদের পাখা এত বড় (বিস্তার করিলে ১৫।২০ফুট লম্বা হয়) যে মাটীর উপর হইতে উড়িতে অসুবিধা বোধ করে—তাই সচরাচর পাহাড়ের চূড়া হইতে আলবেট্রস্ উড়িতে দেখা যায়।

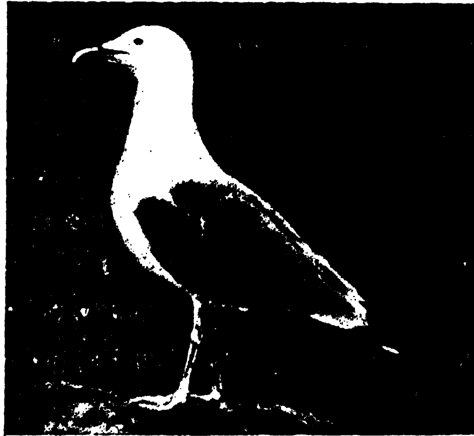


আলবেট্রস্ ডিমে তা দিতেছে।

বাসার উপর যখন এরা ডিমে তা দেয়, তখন ঠিক্ রাজহাঁসের মত দেখায়। পেঙ্গুইনের মত এরা কলহবিবাদে ব্যস্ত থাকে না—ক্ষুধা লাগিলেই আপন মনে সমুদ্রে চলিয়া যায়। আহারেরও ভাল মন্দ বিচার নাই; ছোট মাছ হইতে সুরু করিয়া শিল, তিমি, ডল্‌ফিন ও অন্যান্য জানোয়ারের পচা মাংসও খাইয়া থাকে। জাহাজ হইতে কোন জিনিষ ফেলিয়া দিবামাত্র আলবেট্রস্ উদরসাৎ করে।

আর এক রকমের পাখী আছে যারা উভচর; সমুদ্রের ছোট ছোট মাছ খাইয়া তাদের জিহ্বার স্বাদ মিটে না, তাই আশেপাশের খোলা জায়গায় পোকা-মাকড়ের উদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। এদের নাম 'গাল্' পাখী। কৃষকেরা জমি চাষ করিবার সময় এক মজার দৃশ্য দেখা যায়—ঝাঁকে ঝাঁকে গাল্ পাখী লাঙ্গলের পিছনে পিছনে উড়িয়া কীট পতঙ্গ ধরিয়া খায়। আবার কোন গাল্ আমাদের দেশের

দোয়েলের ন্যায় বস্তিতেও চলিয়া যায়। গাল্ পাখী নানা রকমের—কারো মাথা কাল, কারো পিঠ কালো এবং কেউ বা একেবারে ছোট্ট। বিলাতের টেমস্ নদীর ধারে প্রায় বারমাসই দলে দলে গাল্ পাখী চড়িয়া বেড়ায় এবং শরৎ ও বসন্তকালে খোলা মাঠের উপর খাবার তল্লাসে চলিয়া আসে। বড় ( black-backed) গাল্ পাখীর খাওয়া দাওয়া, চাল চলন অন্য ধরণের ; চেহারা দেখিলেই মনে হয় যে এগুলি ভয়ানক ধূর্ত্ত ও বদ্‌মেজাজী—সর্ব্বদাই পরের অনিষ্ট চিন্তা করে। সুবিধা পাইলেই নিরীহ ছোট পক্ষীর ঘাড় মট্‌কাইয়া জলযোগ করে, সময় সময় মেষ ও হরিণশিশু ধরিয়া চক্ষু উঠাইয়া ফেলে এবং নিষ্ঠুর আমোদে লিপ্ত হইয়া বেচারার দফা নিকেস করে। তাই এদের দেখিলে ছোট পাখী-মহলে ভয়ানক চেঁচামেচির সূত্রপাত হয়।



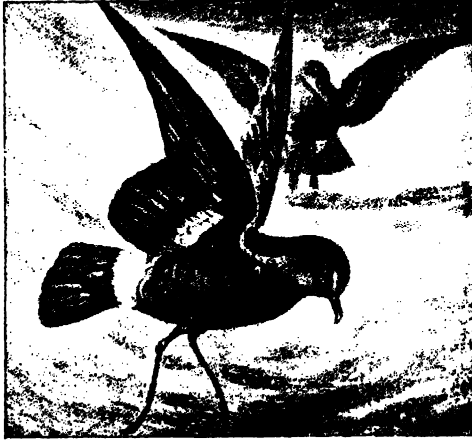
বদমেজাজী গাল কি মতলব আঁটিতেছে।

এদেরই মত অসভ্য হ'ল ফ্রিগেট্ পাখী ( সিন্ধু-ঈগল ) । তা'রা সন্ধ্যার আগে নিবিড় অরণ্যের মাঝে শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া থাকে এবং রাত্রিতে 'টার্ণ' প্রভৃতি ছোট পাখীরা শিকার করিয়া ফিরিবার সময় তা'দের ঘাড়ে চড়াও হ'য়ে ভাগ আদায় করে। অন্য পাখীরা ত একেবারে অপ্রস্তুত। বান ডাকিলে আকাশে অনেক ফ্রিগেট উড়িতে দেখা যায়। তাদের ডানায় এত জোর যে বড় বড় মাছ—এমন কি মেষশাবক প্রভৃতিও—নখে আট্‌কাইয়া স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়িয়া যায় ও শত্রুর সঙ্গে লড়াই করিয়া হঠাইয়া দেয়। বাস্তবিক সিন্ধু-ঈগলকেই সকলে রাজার মত মানিয়া চলে, পাছে বা কাহারও উপর চটিয়া দফা নিকেশ করিয়া দেয়! সব-বাই সন্ত্রস্ত থাকে।

'কিট্টিওয়াক্' বলিয়া ছোট একরকমের গাল্ আছে। সমুদ্রের নিকটে গেলে "বউ কথা কও" পাখীর স্বরের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া 'কিট্টিওয়াক' 'কিট্টিওয়াক্' শব্দ চারিদিকে শোনা যায়। কিন্তু সমুদ্রের পাখীর আওয়াজ সাধারণতই তীব্র—ডাঙ্গার দোয়েল, শ্যামার সুললিত কাকলীর মত ইহা শ্রোতার মন হরণ করিতে পারে না। সচরাচর এগুলি জলাজায়গায় খড়-কুটার বাসা তৈরী করিয়া ঘরকন্না করে; কিন্তু কিট্টিওয়াক্ তাহার জাতভাইদের গরিবানা মোটেই পছন্দ করে না, উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাথরের কুচির উপর চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে।

'পিট্রেল' বলিয়া আর এক শ্রেণীর পাখী পেঙ্গুইনের ন্যায় মেরুপ্রদেশে বাস করে। সাধারণতঃ ছোট পিট্রেল (stormy petrel) গুলিকেই সমুদ্রে ডুবাডুবি করিতে দেখা যায়। সমুদ্রে যখন ভয়ঙ্কর ঢেউ উঠে ও প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে তখন এদের সদর্পগতি ও পুচ্ছলীলার বাহার দেখে কে! দলে দলে পিট্রেল ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় উড়িতে থাকে ও সুযোগ পাইলেই তীক্ষ্ণ চঞ্চুর

সদ্ব্যবহার করে। এটা হ'ল তাদের সবচেয়ে মজলিসের সময়—পিট্রেল দেখিলেই নাবিকেরা মনে করে বাণ ডাকিবার সময় নিকটবর্ত্তী।



তুফানের সময় পেট্রেলের শিকার।

পেঙ্গুইনের ন্যায় এদের পায়ের পাতাও চওড়া—তাই ইচ্ছামত সাঁতার কাটিয়াও ইহারা আহার করিতে পারে। একরকমের পিট্রেল আছে যারা আমাদের দেশের পাণকৌড়ির ন্যায় ডুবাডুবি করিয়া শিকার যোগায়—কখনও ডুবিতেছে, উঠিতেছে; ভাসিতেছে; আবার হয়ত দল বাঁধিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিমান পথে চলিয়া যাইতেছে। আলিপুরের জীবনিবাসে যাইয়া পাণকৌড়ির গৃহস্থালী ইত্যাদি ব্যাপার দেখিলেই পিট্রেল সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করিতে পারিবে। কিন্তু অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে সবচেয়ে আমাদের কৃষ্ণচূড় ডুবুরিই (The great Crested Grebe) ওস্তাদ্। বিল, ডোবাগাদিতে গেলে এদের বাহাদুরি দেখা যায়। বড় পিট্রেলের কাছে পেঙ্গুইনের ন্যায় ক্ষীণজীবিরা বড় ঘেসে না; এদের

মতিগতি বেশ জানা আছে। এরা এত বদমেজাজী যে নিকটে লোকজন দেখিলে থুক্ করে গায়ে কুলকুচি ছুড়িয়া মারে। ছানাগুলিও এ কাজে বেশ অভ্যস্ত। চুরি বিদ্যায় পিট্রেল বেশ পারদর্শী; সুযোগ পাইলেই পেঙ্গুইনের বাসা হইতে ডিম চুরি করিয়া জলযোগ করে। পেঙ্গুইনের ছানা বড় হইয়া যখন একটু আধটু হাঁটীতে শিখে তখন তাদের ঘাড় মট্‌কাইয়া পাড়াপড়শী মিলিয়া ভোজ লাগায়। এসব নানা কারণে বেচারা পেঙ্গুইনদের এক তিল সোয়াস্তি নাই।

বড় পিট্‌রেলগুলি মেরুর জমাট শীতের মধ্যে পাথরের কুচি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে নীড়-রচনা করে। সময় সময় তুষার পড়িয়া এদের বাসার উপর পাত্‌লা ছাউনি হ'য়ে থাকে এবং গা ঝাড়া দিয়া পিট্‌রেল বাসা হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সেণ্ডউইস্ দ্বীপে ও ক্যানেডায় এদের আসল আড্ডা। আজকাল বিলাতে নানা রকমের পিট্‌রোল আমদানী হইয়াছে।

পেঙ্গুইনের মত 'গিলিমট্' (guillemot) বলিয়া এক শ্রেণীর পাখীকে সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়—দেখিলে মনে হয় ঠিক যেন পেঙ্গুইন-মহল।

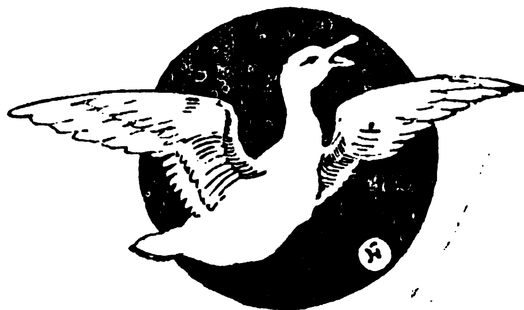


ঠিক যেন পেঙ্গুইন মহল।

তবে পেঙ্গুইন বা অকের মত এরা উড়া ভুলিয়া যায় নাই। আরও নানা রকমের পাখী সমুদ্রে বিচরণ করে, 'প্যাকিন্' 'ট্রাণ্ড' 'গনেট' 'পি'—আরও কত কি !

তোমরা হয়ত বলিবে যে সমুদ্রের পাখীর মধ্যে একটাও কি অদ্ভুত নমুনার নাই ?—তা আজকাল বড় দেখা যায় না। সে কালের অনেক পাখীর নাকি বড় বড় দাঁত ও ছিল ; এ সব পাখীর হাড় আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে। শুনিতে পাই একটার নাম "হেস্পাবর্ণিস্" ( পশ্চিমের পাখী ) ; চেহারা প্রায় পেঙ্গুইনের মত ; তাদের ন্যায় উড়িতে পারিত না বলিয়া পৃথিবী হ'তে একেবারে লোপ পাইয়াছে। জার্ম্মেনীতে ও অদ্ভুত নমুনার পাখীর হাড় ও পালক পাওয়া গিয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে "সোলেন্হফেনের পাখী" বলিয়া থাকে। এরূপ বিদ্‌ঘুটে নমুনার দু' একটা পাখীর খবর পাইলে তোমাদের নিকট হাজির করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ.



# বিজন-বাসী।

[ অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে একটি নির্জ্জন দ্বীপ ; সেই জনমানবশূন্য দ্বীপে একজন ভগ্ন জাহাজের যাত্রী বহু বৎসর ধরিয়া বাস করে। এই কবিতাটিতে তাহার মনের কথা লিপিবদ্ধ হইল। ]

( ১ )

দৃষ্টি-পথে পড়্‌ছে যাহা সবার রাজা আমি
নাইক কেহ ক্ষুণ্ণ করে আমার অধিকার,
এই দ্বীপেরি কেন্দ্র হ'তে আ-সমুদ্র স্বামী
আমার পদে পক্ষী পশু করে নমস্কার।

( ২ )

নির্জ্জনতা! তোমার মুখে সেই মাধুরী কই
যাহার মোহ মুগ্ধ করে কবির দুটি আঁখি ?
মানুষ-ভরা দেশের শত বিপদ বরি লই
ভয়ঙ্করএ রাজ্য হ'তে পাইগো যদি ছুটি।

( ৩ )

কপাল দোষে আইনু শেষে এমন দেশে হায়
মানুষ যেথা দেয়নি সাড়া সৃষ্টি হ'তে যার ;
নির্জ্জনে এ একাই বুঝি জীবন কেটে যায়,
শুন্‌ব নর-কণ্ঠ-বীণা ভাগ্যে নাহি আর।

( ৪ )

এই দ্বীপেরি শ্যামল বনে জন্তু যারা চরে
দেখ্‌ছে তারা মূর্ত্তি মম অভয় উদাসীন ;
অচিন্‌ তবু পোষার মত অঙ্গ ঘেঁসে ঘোরে,
তাই দেখে যে চিত্ত মম আতঙ্কেতে লীন।

( ৫ )

কোথায় নর সমাজ মম, সঙ্গী হৃদয়ের,
কোথায় মম প্রেমের সাথী, বিধির মহাদান ?
পেতাম্‌ যদি পাখীর পাখা, হাওয়ায় উড়ে ফের
যেতাম্‌ পাশে কর্ত্তে পুন সেই অমিয়া পান।

( ৬ )

এই যে মম গভীর দুখ জীবন-মরুভূর
ধর্ম্মাচারে সত্য পথে কাট্‌ত মোহ তার,
নিতাম্‌ আমি প্রবীন পাশে দীক্ষা সুমধুর
যৌবনেরে দিতাম আমি আনন্দেরি ভার।

( ৭ )

শব্দবহ ঝঞ্ঝা ওরে, খেল্‌না মোরে করি'
আন্‌লি যদি এই সুদূরে সিন্ধু কিনারায়,
সেই দেশেরি বার্ত্তা-মধু আন্ রে তবে হরি'
জীবন্তে আর দেখ্‌ব না যার বদন খানি হায়!

( ৮ )

চরণ ধরি, বল্ না মোরে বল্ না একবার
আমার যারা বন্ধু ছিল স্মরণ করে আজ
ভুলে ও মরি স্বপ্নে কভু নামটি অভাগার?
একটি আজো বন্ধু আছে বন্ধুগণ মাঝ?

( ৯ )

মনের গতি চপল অতি; তাহার গতি সনে
প্রবল ঝড় আলোর শর পিছায় তুলনায়;
দেশের কথা ভাব্‌তে সেথা যাই যে আমি ক্ষণে,
কিন্তু পলে হেথার স্মৃতি ডুবায় নিরাশায়!

( ১০ )

ওই যে এল সন্ধ্যা নামি, কুলায় ফেরে পাখী,
গুহায় পশে পশুর দল, আরাম-অপেক্ষায়;
হেথা ও যদি সবাই মিলে শান্তিরে লয় ডাকি,
আমিই একা বিষাদ ভরে লুট্‌ব কেন হায়?

( ১০ )

ওই যে মম কুটীর খানি আপন হাতে গড়া,
ডাক্‌ছে ওযে হাত্‌টি নেড়ে আমায় ইসারায়;
যাই গো আমি উহার বুকে সকল দুখ হরা,
নিদ্রা দিবে চিন্তা হরি' শান্তি অভাগায়।

( ১১ )

শান্তি?—আহা! বিধির দয়া কোথায় বল নাই
ভাব্‌তে হিয়া উথ্‌লে ওঠে, অশ্রু ঝরে চোখে;
করুণার কি মধুর স্বাদ দুঃখ মাঝে পাই,
ভাগ্য নিয়ে তুষ্ট রহি, নাই ক জ্বালা শোক।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

---

# বাঁদরের মাছি মারা।

এক মালির একটা পোষা বাঁদর ছিল। সকালবেলা মালি বাঁদরটাকে একটা গাছের ডালে বেঁধে দিয়ে বাগানের কাজে লেগে যেত; দুপুরে নিজের ঘরে ফিরে আসবার সময় বাঁদরটাকে এনে জানালার গরাদের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিতো। বিকালে মালি আবার বাগানের কাজে না যাওয়া পর্য্যন্ত বাঁদরটা সেই খানেই থাকতো, বিকালে কাজ সেরে ফিরবার সময় বাঁদরটাকে এনে মালি আবার ঘরে রেখে দিত। এই রকম করে তারা দু'টিতে যে যার সঙ্গী হয়ে, সেই নিরিবিলি জায়গায় সুখেই দিন কাটাচ্ছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর মালি রোজ দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিত। বাঁদরটা তখন সেই জানালায় বসে, বাগানে যে পাখীগুলো এসে ফলটল খেতো তাদের দাঁত খিচিয়ে ধমক দিতো, কি ঘোঁক ঘোঁক করে উঠতো। একদিন হয়েছে কি—মালি দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেমন করে যেন বাঁদরের শিকলটা একটু ঢিলে হ'য়ে গিয়েছিলা, সে টানা-হেঁচড়া করে সেই শিকলের ফাঁসের ভেতর থেকে নিজের বাকি গাটাকে গলিয়ে এনে, বড় খুসি হয়ে মালির পাশে চুপটী করে শুয়ে পড়লো। কিন্তু বাঁদর যে ছট্‌ফটে জানোয়ার, সে কতক্ষণ আর চুপ করে থাকবে বল, একটু পরেই উঠে বসলো। বসে তার চোখ পড়লো মালির নাকের উপর একটা মাছি বসে রয়েছে; সে মাছিটাকে তাড়িয়ে দিলে। উড়ে এসে মাছিটা ফের নাকে বসলো,—বাঁদরটা দাঁত খিঁচিয়ে আবার তাড়ালে। আবার মাছিটা এসে নাকে বসলো, সে ঘোঁক্ ঘোঁক্ করে দাঁত খিঁচিয়ে দিলে। বেয়াদব মাছিটা আবার উড়ে এসে ফের মালির নাকের ডগায় বসলো,—বাঁদরটা এবার ভয়ানক চটে গিয়েছিল; অমনি ঘ্যাক্ করে মাছিসুদ্ধ

মালির নাকে এক কামড়। হাঁউ মাঁউ করে মালি চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো। বাঁদরের মুখের ভেতর সেই মোটা বড় মাছিটা তখন ভোঁ ভোঁ করে নড়ছিল, মাছিটা পাছে পালায়, বাঁদরটা আরো জোরে নাকটা কামড়ে পড়ে রইল; মালি প্রাণের দায়ে এদিকে তাকে ধরে টানাটানি করছে; কামড় আর টান এই দু'য়ের মাঝে পড়ে নাকটা গেলো ছিঁড়ে। ছেঁড়া নাক মুখে নিয়ে বাঁদরটাকে সেখানে জাঁকিয়ে বসতে দেখে মালি রাগের চোটে তাকে দু'চার ঘা কসিয়ে দিতেই, সে গিয়ে একেবারে গাছের মাথায় বসে বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো;—মালি বেচারা উড়িষ্যার লোক;—সে নাকের জ্বালায় বাঁদরটাকে গাল দিতে লাগলো,—সড়া মক্কড় মো নাকটাকু একাথানে ছিণ্ডি নেই যাইছি, ইলো যা মালো, ইলো বাপ্পালো।

শ্রীবীণাপানি দেবী।





আদর

# ব্রহ্মদেশের কথা।

আমাদের ভারতবর্ষের সংলগ্ন আর একটি দেশ আছে, সে দেশের নাম ব্রহ্মদেশ। ব্রহ্মদেশের নাম তোমরা সকলেই জান, ইংরেজীতে সে দেশের নাম 'বার্ম্মা'। তোমরা রূপকথায় কি এমন কোন দেশের পরিচয় পাও নাই, যে দেশের গাছে গাছে মুক্তা ফলে, নদীর জলে সোণা জ্বলে? তেমন দেশ যদি কোথাও থাকে, সে এই ব্রহ্মদেশ। এক সময়ে এ দেশের নদীর জল হইতে প্রচুর পরিমাণে সোণা পাওয়া যাইত। এজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা এ দেশের নাম দিয়াছিলেন 'সুবর্ণভূমি' বা সোণার দেশ।

বড় বেশীদিন হয় নাই এইত সেদিন ব্রহ্মদেশ ইংরেজ রাজার অধীন হইয়াছে। বর্ম্মণরা অনেক দিন স্বাধীন ছিলেন, ব্রহ্মদেশের লোকেরা অধিকাংশই বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম্ম সে দেশে প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে সে দেশের রীতি, নীতি ধর্ম্ম ও সমাজ কেমন ছিল, সে সব বর্ম্মণদের অতি প্রাচীন ইতিহাস "মহারাজা ওয়েঙ্গি" নামক পুঁথি হইতে জানা যায়।

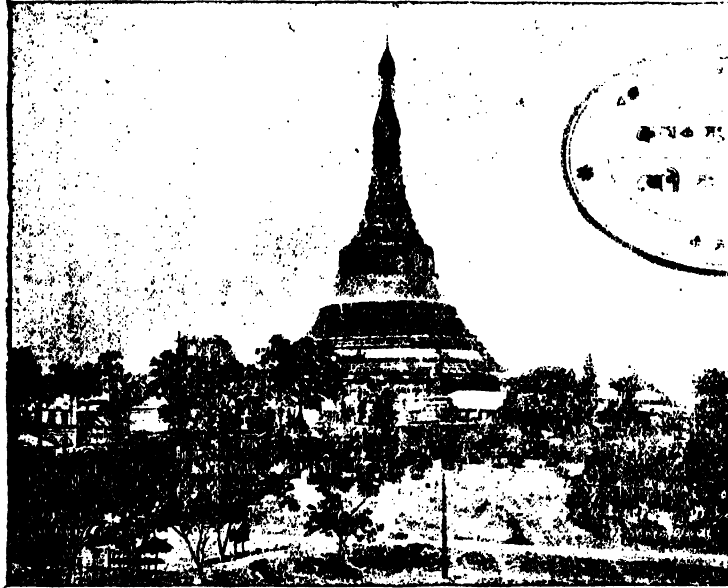
সে দেশের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের জন্মিবার অনেক আগে শাক্যবংশের এক রাজা ব্রহ্মদেশে গিয়া রাজ্য স্থাপন করেন, তিনি সেখানে তাগায়ং নামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরে শাক্যরাজবংশের প্রায় চল্লিশজন রাজা একে একে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ জন্য বৌদ্ধরাজারা আপনাদের বংশের গৌরব করিয়া বলেন যে তাহারা শাক্যবংশোদ্ভব। শাক্যবংশ সূর্য্যবংশের শাখা। ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা এই সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

এ দেশের নাম ব্রহ্মদেশ কেন? সে এক সুন্দর ইতিহাস। ভারতের বৌদ্ধেরা

এক সময়ে পৃথিবীর সব দেশের লোকদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথম এ দেশের লোকদিগকে ব্রহ্মা বলিয়া বলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে হিন্দুদেবতা ব্রহ্মা হইতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, তাই তাহারা 'ব্রহ্মা' বা বর্ম্মা নাম লইয়াছে।

তোমাদের কাছে আমরা এ দেশের সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কয়েকটি কথা বলিব। ব্রহ্মদেশ যখন স্বাধীন ছিল, সেই স্বাধীন রাজাদের আমলে আলাম্প্রা নামে একজন রাজা খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আলম্প্রা এক ব্যাধের ছেলে ছিলেন। বনে বনে শিকার করিয়া বেড়াইতেন, পরে অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন, এবং যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এমন কি সে সময়ের ব্রহ্মের রাজাকে পর্য্যন্ত হারাইয়া দিয়া একেবারে দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তিনি একে একে পেগু, আরাকান, টেনিসেরিম্ প্রভৃতি দেশ জয় করিলেন, শেষটায় শ্যামদেশের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া সেই স্থানেই রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আলাম্প্রা হইতেই ব্রহ্মার শেষ রাজবংশের সূত্রপাত। এ খুব বেশী দিনের কথা নয়, দু'শো বৎসরেরও কিছু কম।

এখন ব্রহ্মদেশে কি কি দেখিবার জিনিষ আছে শোন। ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান রাজধানীর নাম রেঙ্গুন। রেঙ্গুন সহরটি বেশ সুন্দর, পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বড় বড় সোজা রাস্তা, কাঠের সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী—যেন ছবি। তুমি যদি রেঙ্গুন বেড়াইতে যাও, তাহা হইলে দুইটী জিনিষ তোমার চোখে পড়িবে। সে দুইটী বৌদ্ধমন্দির। বৌদ্ধ মন্দির বা মঠগুলিকে এখানে "প্যাগোডা" বলে। একটী প্যাগোডার নাম 'সুলে প্যাগোডা,' অপরটার নাম 'সোয়েডেগুন প্যাগোডা'। সোয়েডেগুন প্যাগোডাকে সকলে বলেন 'Grand Pagoda' বা প্রধান প্যাগোডা। একটী পাঁচশত ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর প্যাগোডাটি অবস্থিত। এই



সোয়েডেগুন মন্দির।

প্যাগোডার চূড়াটি স্বর্ণমণ্ডিত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সোয়েডেগুন। বুদ্ধদেবের পাঁচগাছি চুলের উপর প্যাগোডা প্রতিষ্ঠিত। গল্প আছে যে দুইজন বর্মণ বণিক ভারতবর্ষে যাইয়া তপস্যানিরত বুদ্ধদেবের নিকট হইতে পাঁচগাছি চুল চাহিয়া আনিয়াছিলেন। সে চুলের রক্ষার জন্যই রাজা আলান্ত্রা এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। নানাদেশ হইতে ধার্ম্মিক বৌদ্ধেরা আসিয়া এই মন্দির দর্শন করেন। এই মন্দিরের চারিপাশে ছোটবড় আরও অনেক মন্দির মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে। প্রত্যেক মন্দিরেই শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরে উঠিতে হইলে অনেকটা দূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। এই সিঁড়ির দুই দিকে সারি সারি স্তম্ভ ও অতি সুন্দর ছাত।



ঐ মন্দিরের এক পার্শ্বস্থিত দেবমূর্ত্তি।

সিন-পিউ-ইন রাজা, মণিপুর, শানদেশ এমন কি চীনদিগকে যুদ্ধে হারাইয়া ভামো অধিকার করেন, তিনি মণিপুরের ও কাছাড় জয়ের স্মৃতিস্বরূপ সোয়েডেগুণ মন্দিরের চূড়া সোণায় মুড়িয়া দিয়াছিলেন।

এখানে বর্মণ পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা প্রতিদিন পূজা অর্চ্চনা করেন। মন্ত্র পাঠ করেন, দান ধ্যান করেন। ফুল, পাতা, বাতি কিনিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। আমাদের দেশে যেমন তারকেশ্বরে যাইয়া তারকেশ্বরের মানত মত মাথার চুল দেওয়ার রীতি আছে, এখানেও বর্মণ রমণীরা চুল দিয়া থাকেন। 'সুলে প্যাগোডা'টী দেখিতে সুন্দর তবে সেখানেও একই রকমের ব্যবস্থা কাজেই বিশেষ কোন কথা না বলিলেও চলে। এই দুই মন্দিরেই খুব দুইটী বড় পিতলের ঘণ্টা আছে।

মান্দালয় সহরটি পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। এ সহরটি দুইভাগে বিভক্ত। এক অংশ প্রাচীরের ভিতর, অন্য অংশ প্রাচীরের বাহিরে। মিন্দনমিন রাজা ফরাসীদেশ হইতে একজন ইঞ্জিনিয়ার আনাইয়া এই সহরটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মন্দালয়ের চারিদিক বেড়িয়া নানা মঠ ও মন্দির অবস্থিত। অনেকে এজন্য ইহার নাম দিয়াছেন মন্দিরের দেশ। নগরের উত্তর দিকে মন্দালয় পাহাড়ের উপর কয়েকটি বড় বড় মন্দির আছে। সে সকলের একটীতে পিত্তলের খুব বড় একটী বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। ব্রহ্মদেশের কোথাও অত বড় মূর্ত্তি নাই। কথিত আছে আকিয়াব হইতে এই মূর্ত্তি এখানে আনা হইয়াছিল।

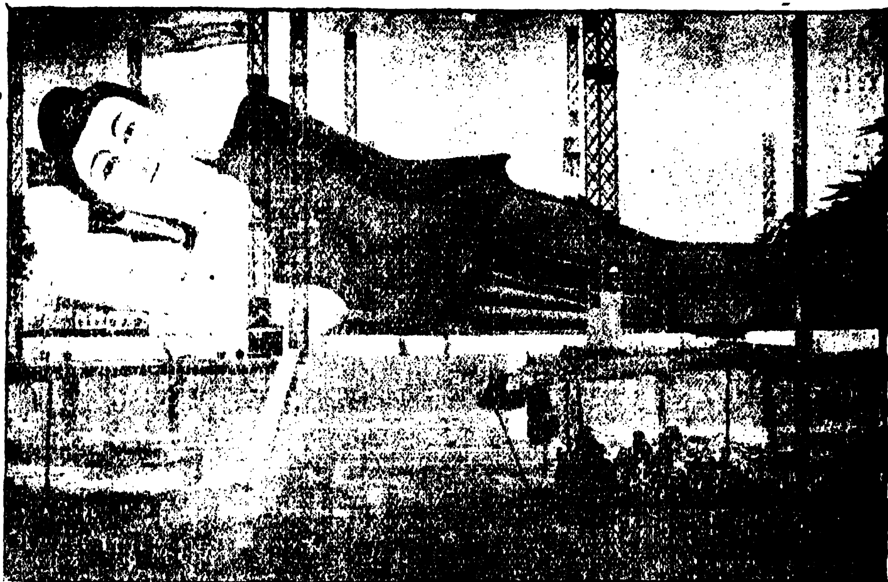
বর্মণরা বুদ্ধদেবের পরম ভক্ত। এদেশের গ্রামে, নগরে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে সর্ব্বত্রই প্যাগোডা, 'ফয়া' ( সমাধি ), ফুঙ্গিচাঙ মানে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী। ফুঙ্গিগণের বাসগৃহ সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। এখনও কত বনে জঙ্গলে যে কত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, মন্দির অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? একবার



মন্দালয়ের একটী প্যাগোডার দৃশ্য।

রেলপথ প্রস্তুত করিতে যাইয়া এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছবি হইতে অনুমান করিয়া লও মূর্ত্তিটি কত বড়। মূর্ত্তিটি শায়িত অবস্থায় নির্ম্মিত। চারিদিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এখন মূর্ত্তিটি রক্ষার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সিঁড়ি বাহিয়া তবে মূর্ত্তির কাছে পৌঁছিতে পারা যায়। এই বিরাট শায়িত মূর্ত্তিটি দেখিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে লোক আসেন। একযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি দেশের লোকের কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পার। বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলিতে যে কত রকমের দেবতা দেখিতে পাওয়া যায়, কি যে তাহাদের নাম, অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরাও তাহা বলিতে পারেন না। এখানে আমরা কয়েকটী বৌদ্ধমূর্ত্তির ছবি দিলাম। বৎসরে বহুবার নানা পর্ব্ব

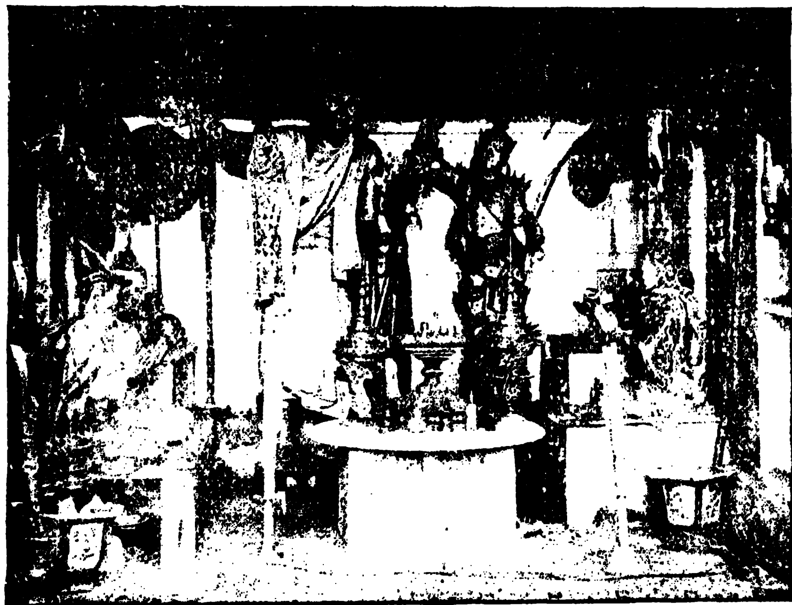
উপলক্ষে বর্মণ পুরুষ ও নারীরা আনন্দে বিভোর হইয়া উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন।



শায়িত বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি।

তোমরা ব্রহ্মদেশে বেড়াইতে গেলে এ দেশের নীল পাহাড়ের সারি, সুন্দর শ্যামল বন ও বৃহৎ অরণ্য, সেগুণ গাছের অফুরন্ত ভাণ্ডার, ধানের ক্ষেতের সোণার শোভা, আর নদ নদীর সুন্দর শুভ্র সলিলধারা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে? অই দেখ, ইরাবতী নদী কেমন পাহাড়ের পায়ের তলা দিয়া, সাদা জলে সাদা ঢেউ তুলিয়া তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মদেশ বরাবরই স্বাধীন ছিল। এইত সে দিন ১৮২৪ সালে ইংরেজরাজ



কয়েকটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি।

ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে ব্রহ্মরাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল, বর্ম্মিরা যুদ্ধকে ভয় করিতেন না। ব্রহ্ম সেনাপতি বান্দুলা বেশ সাহসের সহিত ও দক্ষতার সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে লড়িয়াছিলেন, তিনি শেষটায় একটা গোলার আঘাতে প্রাণ হারান; তাহার মৃত্যুর জন্যই সেবারে ব্রহ্মের রাজাকে ইংরেজদের সহিত সন্ধি করিতে হইয়াছিল। ইহার পর আরও দুইবার ব্রহ্মরাজার সহিত ইংরেজের যুদ্ধ হয়। রাজা থিব যখন ব্রহ্মের সিংহাসনে, তখন সম্পূর্ণ রূপে ব্রহ্মরাজ থিব পরাজিত হইলেন। বহুকালের একটা স্বাধীন জাতি এইভাবে স্বাধীনতা হারাইয়া ইংরেজ রাজের অধীন হইলেন।

আমাদের দেশে ব্রহ্মদেশকে বলে 'মগের মুল্লুক'। এই বর্মণবাসী মগেরা কিন্তু সাহসে বীর্য্যে কোন দিক দিয়াই কম ছিলেন না। একদিন তাহাদের ভয়ে বাঙ্গালা দেশের লোক ভয়ে কাঁপিত, একদিন তাহাদের অত্যাচারে ও উৎপীড়নে পাঠান ও মোগল শাসনকর্ত্তারা দেশে শান্তিস্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা পাঠান, মোগল ও ইংরেজের সহিত দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে এতটুকু পরাঙ্মুখ হয় নাই।

আলাম্প্রার কথা তোমাদের কাছে বলিয়াছি। গুণগ্রাহী ইংরেজ ইতিহাস লেখক তাঁহাকে নেপোলিয়ানের সহিত তুলনা করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই। ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া—আলাম্প্রা দেশের বিবিধ সংস্কার ও শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন। আলাম্প্রা বীর ছিলেন বটে, কিন্তু সদাশয় ছিলেন না। একবার তিনি একজন তাইলাঙ্গ রাজাকে পোড়াইয়া মারিয়াছিলেন। সেই ছোট রাজার অপরাধ,তিনি তাঁহার ছোট দেশটির স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য আলাম্প্রার ন্যায় শক্তিশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাণ না দিয়া অধীনতাকে বরণ করিয়া নেন নাই। এই রূপ নিষ্ঠুরতা থাকিলেও আলাম্প্রা বীর, সাহসী, রাজনীতিবিশারদ এবং ন্যায়বান রাজা ছিলেন। ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে তাঁহার মত রাজা আর হয় নাই। আলাম্প্রার বংশধরদের মধ্যেও এমন অনেক রাজা হইয়াছিলেন যাঁহারা চীন সৈন্যদেরও হটাইয়া দিয়া দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ গৌরবে রক্ষা করিয়া চীনদের রাজ্যেরও অনেক অংশ দখল করিয়াছিলেন। এতটুকু প্রবন্ধে অত শত ইতিহাসের কথা তোমাদের নাইবা বলিলাম।

এইবার এদেশের লোকদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা শোন। বর্মণ পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই গৌরবর্ণ, বেঁটেসেটে। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই লুঙ্গি পরে। গায়ে চীনাদের মত একপ্রকার জামা ব্যবহার করে তাহার নাম এঞ্জি। পুরুষেরা



ইরাবতী নদীর দৃশ্য।

মাথায় চাদর বা রুমাল বাঁধে, আর মেয়েরা চাদর কাঁধের দুপাশ দিয়া ঝুলাইয়া দেয়। পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেই লম্বা চুল রাখে। এদেশের পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই চুরুট টানে। তোমরা একটা কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে এদেশের পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা বেশী পরিশ্রমী। হাট বল, বাজার বল, দোকান বল, ক্ষেতখামারের কাজ বল সব কাজই মেয়েরা করে। পুরুষেরা অধিকাংশ স্থলেই বাড়ী বসিয়া খায় দায় ঘুমায়।



খাগোড়ায় বিরাট ঘণ্টা।

বর্মণরা শিল্পকার্য্যে, সুনিপুণ। কাপড় বুনাইতে, কাঠের ও বাঁশের সুন্দর সুন্দর বাক্স কৌটা এসব প্রস্তুত করিতে ইহারা অদ্বিতীয়! এদেশের লোকের কাছে শোক দুঃখ বলিয়া যে একটু কিছু আছে তাহা মনেই হয় না। আমাদের দেশে কোন বাড়ীতে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কত কান্নাকাটি ও হাহাকার শোনা যায়। আর এদেশে কাহারও মৃত্যু হইলে নাচ, গান, ভোজন ও নৃত্যের ধূম পড়িয়া যায়। ইহারা—আমোদ প্রমোদ অত্যন্ত ভালবাসে।

এখানে ব্রহ্মদেশের ভাষার দুই একটী নমুনা দিতেছি। দুই চারিটি শব্দ মুখস্থ রাখিও, যদি কখনও ব্রহ্মদেশে যাও, তাহা হইলে কাজে লাগিয়া যাইবে।

জল—ইয়ে অগ্নি—মি ডাইল—পে চাউল—সাঁ শ্রীযুক্ত—মং
স্ত্রীলোক—সেইম শ্রীমতী—মা কুকুর—খোরে এক—তক্ষু
গরু—নোয়া একশত—তয়া

আমি বর্ম্মণ ভাষা জানি না এ কথা যদি বলিতে চাও বলিবে 'বর্মা সাগা নাম লেবু।'

আমাদের দেশের ন্যায় সেখানেও গভর্ণর রাজ্য শাসন করেন। সেখানেও স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, কাছারী, রেল ও জাহাজ সবই হইয়াছে। বর্মাদেশে এখন পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্ম্ম উপলক্ষে বাস করিয়া থাকেন। অনেক বাঙ্গালী রাজকার্য্যে ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে বাস করেন। তোমরা বড় হইলে একবার এই দেশটি বেড়াইয়া আসিও। *

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

* পৃথিবীর ইতিহাস সিরিজে 'ব্রহ্মদেশ' নামীয় স্বতন্ত্র বৃহৎ গ্রন্থ বাহির হইতেছে।

# কর্ণাটরাজ ও পারিষদদ্বয়

( নাটিকা )

## সমুদ্র তীরে ঃ

কর্ণাট-রা—সত্যই কি আমি একজন খুব বড় রাজা ?

১ম পা—মহারাজ তা' আর বল্‌তে ! আপনার চেয়ে বড় কে ?

২য় পা—আমরা আপ্‌নার দাসানুদাস। আমরা আপনার পায়ের ধূলোরও সমান নই।

১ম পা—কেবল আমরা কেন, মহারাজ ? এই যে বিশ্ব ব্রাহ্মাণ্ড—জল স্থল তরু লতা পাতা চন্দ্র সূর্য্য তারা ইত্যাদি—অণু পরমাণুটা পর্য্যন্ত আপনার দাস—তারা সকলেই আপনার আদেশ মেনে চলে—মান্‌তে বাধ্য।

কর্ণাট-রা—এই যে সাম্‌নে সমুদ্র—পাহাড়ের মত ঢেউ তুলে যেন পৃথিবীকে তোলপাড় করে ফেল্‌চে—সেও কি আমার আদেশ প্রতিপালন করতে বাধ্য ? আমি ইচ্ছা কর্‌লেই কি ওকে চুপ করাতে পারি ?

১ম পা—পারেন বই কি মহারাজ। সমুদ্র আমাদেরই মত আপনার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। ঐ যে তার বুকে বড় বড় নৌকা জাহাজ ভাস্‌চে—যাদের মধ্যে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য—বহুমূল্য মণি মুক্তা রত্ন ইত্যাদি বোঝাই আছে—ও সব আপনারই তৃপ্তি সাধনের জন্য।—সমুদ্রই ও সব আপনার পায়ে উপহার দেবার জন্য বুকে করে' বয়ে' আন্‌চে। সমুদ্র আপনার শত্রুর পক্ষে বড়ই কঠোর কঠিন দুর্ম্মদ—কিন্তু সে আপনাকে তার রাজা বলে' বিলক্ষণ মানে।

ক-রা—দেখ দেখ জোয়ার আস্‌চে না ?

২য় পা—হাঁ মহারাজ!—ঠিকই ধরেচেন।

ক-রা—যাও আমার সিংহাসন খানা নিয়ে এসে' ওখানে রাখ।

১ম পা—বলেন কি মহারাজ!—ঐ জোয়ারের জলের মুখে!

ক-রা—হাঁ—তাই!

২য় পা—( জনান্তিকে )—এ আবার কি পাগ্‌লামী!

১ম পা—না হে না—মহারাজ এমন বোকা নন—আমরা যেমন তাঁকে ঠাউরেচি।

ক-রা—হে প্রবল প্রতাপ সমুদ্র—তুমি আমার একজন প্রজা মাত্র, আমার পারিষদ দুজন তাই বলে। সুতরাং তোমার উচিত—আমার আদেশ পালন করা। তাই আমি আমার রাজদণ্ডের দোহাই দিয়ে বল্‌চি এবং তোমাকে আদেশ করচি—তোমার উদ্বেল তরঙ্গরাশি এই মুহূর্ত্তে ফিরিয়ে নিয়ে যাও।—খবরদার, তারা যেন তোমার রাজার পা ভিজিয়ে না দেয়!

২য় পা—( জনান্তিকে ) সমুদ্রের শুন্‌তে বয়ে' গেচে।

১ম পা—দেখ হে দেখ, কত জোরে জল এগিয়ে আস্‌চে।

২য় পা—আর একটুকু এলেই সিংহাসন খানাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর অপেক্ষা কর্‌বার দরকার নেই। মহারাজকে সরিয়ে নিয়ে চল—না হয় এস, —আমরা নিজেই সরে' পড়ি।—নইলে সমুদ্রের লোনা জলে আমাদের শরীর জরে' উঠ্‌বে।

ক-রা—ওহে আমার পারিষদ যুগল! সমুদ্র আমার আদেশ পালন করবে! —নয়? সমুদ্র আমার প্রজা? যদি তাই হয় তা হলে বড়ই বিদ্রোহী প্রজা। নইলে আমাকে দেখে' সে অমন ফুলে ফুলে উঠ্‌চে কেন! এবং যেন রাগভরে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে আমাকে আঘাত কর্‌তে ছুটে আস্‌চে কেন? ( খুব

রাগিয়া ) ওরে নীচমনা স্তাবক, তোরা কি ভেবেচিস্ যে তোদের জঘন্য প্রতারণায় আমি ভুলে গেছি! তোদের মিথ্যা তোষামোদের কথা সত্য বলে' ধরে' নিয়েচি! তবে শোন্ তোরা—কেবল মাত্র একজন আছেন—যাঁর আদেশ সমুদ্র ঘাড় পেতে নেয়—যিনি স্বর্গ মর্ত্ত—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা—রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট!—কেবল তিনিই সমুদ্রকে বল্‌তে পারেন—দাঁড়াও সমুদ্র—ঐ পর্য্যন্ত, আর এগিয়ে এস' না। ঐ খানেই তোমার ঢেউ সংযত কর। আমি রাজা—রাজা কি! সামান্য মানুষ মাত্র!—আর মানুষ—সামান্য কৃমি কীট মাত্র। একটা কীটের কি সাধ্য—যে সে পরমেশ্বরের শক্তি ধারণ কর্‌তে পারে—এবং ভাব্‌তে পারে যে সমুদ্র তার আদেশে কেন চল্‌বে।

নিয়ে যাও আমার রাজসিংহাসন—আর এই রাজমুকুট—আমি ওসব আর কিছুই চাই না। আমার এই দৃষ্টান্ত দেখে অন্যান্য রাজারা শিক্ষা করুন—বিনয়ী হ'তে—নিরহঙ্কার হ'তে—আর তোমাদের এই অপমান হ'তে শিক্ষা করুক, অন্যান্য রাজার পারিষদবর্গ ও স্তাবকগণ—তোষামোদ পরিত্যাগ করতে ও সত্যবাদী হ'তে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

---

# খুচরো খবর।

(১) ইয়োরোপের মধ্যে রাসিয়া যে একটি বড় দেশ তা বোধ হয় তোমাদের না বললেও চলে। এই দেশে মূর্খ নিরক্ষরের সংখ্যা সকল দেশের চাইতে বেশী কিন্তু এখানে বইয়ের দোকান কেন যে সব দেশের চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী, তা বুঝিনে।

(২) লণ্ডনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রত্যেক ছেলে পিছু ১৭ পাউণ্ড, ১০ শিলিং খরচ করা হয়।

(৩) যে সব ছেলেরা রোজ ঢক্ ঢক্ করে দু'এক গ্লাস দুধ খেয়ে ফেলে তারা লম্বা চৌড়া আর লেখাপড়ায় দক্ষ হয়—আমেরিকার একজন স্বাস্থ্য-বিদ্‌এর এই মত। যারা দুধ খায় না, তারা ঠিক উল্টো হয়।

(৪) কুকুর পোষাটা জাপানে সোজা নয়। পোষা সহজ হলেও রাখা সহজ নয়। হঠাৎ যদি কুকুর রাত্রে ডেকে বসে এবং তাইতে করে কোন প্রতিবেশীর নিদ্রা নষ্ট হয় তা হলে যিনি কুকুরের প্রভু তাঁকে দস্তুর মত সাজা পেতে হয়। পরের দিন, যার ঘুম ভেঙ্গে ছিল তার বাড়ী গিয়ে বেগার খেটে দিয়ে আসতে হবে। বোঝ!

(৫) তোমরা অনেক হিন্দুস্থানী উড়ে মজুরদের দেখেছ, তামাক পাতা চিবিয়ে খেতে! ইয়র্কশায়ার বলে একটি দেশ আছে, সেখানে অনেক কয়লার খনি আছে, সেখানকার খনির মজুরেরা তামাক না চিবিয়ে, চিবোয় কয়লা। মজাটা দেখ একবার।

(৬) মাটিতে বীজ আর চারা গাছ চন্দ্রকিরণ পেলে যত শীঘ্র বেড়ে উঠে,এত শীঘ্র আর কিছুতে নয়—লিভারপুলের বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি ইহা জানতে পেরেছেন।

(৭) ম্যারিয়েনবাদে বেড়ালের ট্যাক্স দিতে হয়। তাও কম করে—দশটি টাকা বছরে। এখন থেকে আমাদের দেশে কুকুর পুষলেও ট্যাক্স দিতে হবে শুনছি। যা দেখছি শেষে পাখী, ইন্দুর, কিছুই পোষা চলবে না, ট্যাক্সে ট্যাক্সে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে।

(৮) সমস্ত পৃথিবীর বাষ্পীয় পোত গুণে দেখা গেছে ২৬, ৫১২ খানা।

(৯) আর ৫০৮২ খানা যুদ্ধ জাহাজ আছে।

(১০) নিউইয়র্ক সহরের চিড়িয়াখানার বিরুদ্ধে সেখানকার Rat Society তুমুল যুদ্ধ আয়োজন করেছিল। যুদ্ধে Rat Society, ZooSocietyকে হারিয়ে দিয়েছে। Zoo Societyর লোকসান হয়েছে প্রায় পঁচাত্তর হাজার টাকা। আর বিপক্ষ পক্ষের লোকসানের মধ্যে হয়ত গোটাকতক খুঁদে দাত, তা'ও ঠিক লোকসান হয়েছে কি না, সন্দেহ, হলেও, কতগুলো হয়েছে, খবর পাওয়া যায় নি, যাবার কোন উপায় নেই, যে হেতু Rat Society কোথায় যে থাকে তার কোন ঠিকানা নেই। তা ত হল, ব্যাপারটা কি বল দেখি? Rat Society কি? তোমরা কি এই সোসাইটির কোন সভ্যকে চেন?

(১১) হাঁসের পরমায়ু—পঞ্চাশ বৎসর। মানুষের কাছাকাছিই বল?

(১২) পুকুর-নদী—সমুদ্রের ঝিনুকেরা না-কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

(১৩) বিলেতের একটা গির্জ্জা বার বছর জনশূন্য পড়ে থাকার পর একজন ভাস্কর সেটিকে নিজ বাস-গৃহ ও চিত্রশালায় পরিণত করেছেন।

(১৪) লণ্ডনে একটি ষোল-আঠায়ো বছরের মেয়ে প্রায়ই সেখানকার Zooতে আসতেন। আসতে আসতে সেখানকার সমস্ত জানোয়ারের সঙ্গে তাঁর এমন ভাব জমে গেছল যে বাঘ, সিঙ্গী অবধি তাঁর কাছে ঠিক পোষা ভেড়াটির মত চুপ করে পড়ে থাকৃত।

(১৫) চিকাগোয় মোটর-এরোপ্লেনের সঙ্গে বেলুনের বাজী হয়েছিল। এরোপ্লেন হেরে গেছে বেলুনের কাছে।

(১৬) গান শুন্‌তে তুমি নিশ্চয় ভালবাস! কে আর না বাসে? গানের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ না হয় কে? সম্প্রতি আমেরিকার একজন উঁচুদরের অধ্যাপক বলেছেন, বিজ্ঞান বলে যে সব আধি-ব্যাধি মানুষের সারানো যায়, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি প্রয়োগেও ঠিক সেই সব রোগ সারে।

(১৭) আমেরিকায় একখানা ফটো তোলা হয়েছে। সেখানার মাপ—দৈর্ঘ্যে ৯৬ ফিট আর প্রস্থে দশ ফিট। এখানা তুলতে খরচ পড়েছে—৩৫০৲ টাকা। এমন আর বেশী কি বল! বিশেষ এই খানাই যখন সব চেয়ে বড় ফোটোগ্রাফ হবার গৌরব লাভ করেছে।

(১৮) যদি আমি বলি যে বল দেখি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে মোটা ছেলে কে? কেউ বল্‌বে ধ্যানেন মিত্তির; কেউ বল্‌বে ললিত গোঁসাঞী কেউ বল্‌বে শিশির বোস্, কেউবা বলবে রমেন রায় চৌধুরী, নাম আউড়ে যাবে। কিন্তু যদি বলি যে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে মোটা ছেলের নাম ধাম বল, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি চুপ্ হয়ে কড়ি কাঠ গুণবে। কড়ি কাঠ গুণে কাজ নেই, শোন! পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভীমকায় ছেলে হচ্ছে লোন ন্যাসন। বয়স তার এই ১৫।১৬, ওজন ৫মণ, দশ সের। দেহের মোটামুটি বর্ণনাটি এই—কোমরের মাপ তার, ৬৯ ইঞ্চি; ছাতি ৬৪ ইঞ্চি। তোমরা তোমাদের দরজীকে ডেকে এই মাপের লোকের একটা জামা করতে কতখানি কাপড় লাগবে জেনে আমাকে লিখো, ভুলো না।

(১৯) একটি 'রোগা' ছেলের খবর দিলাম, এবার একটি 'সূক্ষ্ম' মানুষের খবর দিই, শোন। এই সূক্ষ্ম মানুষটির বয়স ২৫ বৎসর; দৈর্ঘ্যে তিনি ৯ ফুট, ৩ ইঞ্চি (বলে রাখি, খুব লম্বা মানুষ আমরা সাধারণতঃ ৫৬ ফুটের বেশী

দেখতে পাইনে ) তার আঙ্গুলের ডগা থেকে হাতের কব্জি লম্বায় এক ফুট, এক ইঞ্চি , পায়ের পাতা এক ফুট ৯ ইঞ্চি। বুক চৌড়া ৫৬ ইঞ্চি, মাথার পরিধি ২৫ ইঞ্চি আর দেহের ওজন ৫॥০ মন। সে আহারও করে—সাধারণ ৫ জন লোকের যা আহার। আহারের একটি তালিকা দিই :—৩ সের দুধ, ২০টি ডিম, ২ সের মাংস, ৪২ রুটী, এক হাঁড়া তরকারী আর এক পিপে মদ। এখন কথা হচ্ছে এই, যে লোক এই অকম অল্পাহারী তার কতখানি পরিশ্রমের দরকার হয়, হজম করতে ? মোটেই নয়! বাছা আমার দিন রাত ঘুমিয়েই আছেন, কেবল যখন ফাঁড় জ্বলে ওঠে তখনই কেবল জেগে ওঠেন। জঠরানল জ্বল্‌লে ঘুম আর হয় কার বল ? এই লোকটিকে হাঙ্গেরীর একজিবিসনে হাজির করা হয়ে ছিল তার নাম কাঙ্গাললাক্, বাড়ী সাইবেরিয়া। অনেক দূর, নইলে—তোমাদের বলতাম জীবটিকে একবার দেখে এস।

(২০) একটা বড় থাকলেই একটা ছোট থাক্‌তে হয়। অতিকায় মনুষ্য যেমন আছে, ক্ষুদ্রকায় লোকও তেমনি আছে। একজন ক্ষুদ্রকায় মনুষ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই লোকের বাড়ী রাসিয়ায়। তাঁর বয়স ২০ বছর। লম্বে তিনি দেড় হাতেরও কিছু কম। ইনি খান, একটুখানি মাংস, সিকিখানা আলু, কপির একটু পাতা,এক চামচে ঝোল দু'তিন চামচে কাফি, গোটা দুই আঙ্গুর বা এক চিল্‌তে আপেল কি ন্যাসপতি। মনুষ্যটি এত ছোট বলে ভেবো না যে লোকটি একেবারে অকেজো! আদৌ নয়, অত্যন্ত কর্ম্মঠ ইনি। লেখাপড়া বেশ জানেন, চিত্র বিদ্যায় বেশ নিপুণ। নিজের দেশের ভাষা ত জানেনই, তা ছাড়া জার্ম্মেণ ও ফরাসী ভাষাতেও ইনি পণ্ডিত। চেহারাটি বেশ ভদ্র, নামটি তাঁর রাউনিয়া। ইনি বলেন পৃথিবীতে আমি আর ১৫টি বছর বাঁচতে চাই ( অর্থাৎ তাঁর কাম্য পরমায়ু ৩৫ বছর ) তা হ'লেই আমার কাজ সেরে চাল যেতে পারব।

# গল্প-গাছা।

## যুবরাজের মহত্ত্ব।

যুবরাজ—প্রিন্স অব-ওয়েলসের নাম তোমাদের কারু অপরিচিত নয়। তিনি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি ইংরেজ রাজ্যের ভাবী অধিপতি। এত বড় রাজ্যের ভাবী রাজা লোকটি কেমন, তাঁর হৃদয় কেমন—জান্‌তে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। আমি এখানে তাঁর জীবনী আলোচনা করব না, কেবল এমন একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করব, যা থেকে তোমরা এই যুবা যুবরাজের অনেকখানি পরিচয় জেনে নিতে পারবে। এটি গল্প নয়, সম্প্রতি এই ঘটনাটি ঘটেছিল বলে শোনা গেছে।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন একটি হাসপাতালএ ছত্রিশ জন আহত সৈনিককে রাখা হয়েছিল! প্রিন্স অফ্ ওয়েলস একদিন এই হাসপাতালটি পরিদর্শন করতে যান। হাসপাতালের কর্ত্তারা যুবরাজকে সঙ্গে নিয়ে সসম্ভ্রমে সমস্ত ঘুরিয়ে দেখিয়ে যখন আবার আফিস ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এল, তখন যুবরাজ একজন কর্ত্তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—শুনেছিলাম এখানে ৩৬ জন আহত সৈনিককে স্থান দেওয়া হয়েছে, আমি ত কৈ ২৯ জনের বেশী দেখতে পেলেম না। যুবরাজ যে লোকও গুণে ফেলেছেন, কর্ত্তারা তা ভাবতেও পারেন নি। তাঁরা সসম্মানে বল্লেন—না যুবরাজ, ৩৬ জনই আছে সত্য কিন্তু ৭ জনের চেহারা এত খারাপ হয়েছে যে কাউকে দেখান যায় না।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—রোগীদের কষ্ট হবে বলেই কি এই ব্যবস্থা ?

না যুবরাজ! আপনি সে দৃশ্য সহ্য করতে পারবেন না বলেই আমরা এই রকম ব্যবস্থা করেছি।

যুবরাজ বল্লেন—তা হয় না, চলুন, আমি তাদের দেখব।

কর্ত্তারা আর কি করেন! যুবরাজের জেদাজেদিতে তাঁকে আবার ভিতরে লইয়া গেলেন। সত্যই তাহাদের চেহারা অত্যন্ত বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল। দেখে শিউরে উঠ্‌তে হয়। যুবরাজ প্রত্যেক শয্যার পাশে গিয়ে সমগ্র ইংলণ্ডের অধিবাসীদের হয়ে আহত সৈনিকদের ধন্যবাদ দিলেন, তাদের বীরত্ব, তাদের সহিষ্ণুতার উল্লেখ করে তাদের মঙ্গল কামনা করলেন।

ছ'জনকে দেখানোর পরই কর্ত্তারা আবার যুবরাজকে আফিস ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যুবরাজ বল্লেন—আর একজন?

ক্ষমা করবেন যুবরাজ, সে দেখাবার নয়।—কর্ত্তারা আরও বল্লেন যে সে লোকটার চেহারা এখন এমনই হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে সে যে কোন কালেও মানুষ ছিল তাকে দেখে আর তা বোঝবার যো নেই। সে আবার কানা, কালা, বোবা! সে নড়তে চড়তে পারে না, তার কাছে মানুষ যেতেই পারে না।

যুবরাজ আবার জেদ ধরলেন, তাকে না দেখে তিনি যাবেন না।

কর্ত্তারা কত বুঝালেন, যুবরাজ সে বীভৎস দৃশ্য, আপনার কষ্ট হবে।

না দেখ্‌তে পেলে আরও বেশী কষ্ট হবে।—শুনে কর্ত্তারা আর কি করবেন, বল,—ধীরে ধীরে যুবরাজকে সেই ঘরে নিয়ে চললেন। যুবরাজ ঘরে ঢুকে অবনত মস্তকে লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর প্রাণের ভিতর তখন কি ভাব হচ্ছিল তা বোঝাব কি করে! যুদ্ধের ভীষণ পরিণামের দৃশ্যে যুবরাজের সারা হৃদয় কেঁদে উঠ্‌লো! তিনি আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারলেন না। সেই বীভৎসাকার, মরণাপন্ন লোকটির বিছানার পাশে নত হয়ে ধীরে ধীরে লোকটির মুখ চুম্বন করলেন।......

যুবরাজ যখন দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন, তাঁর সুন্দর মুখখানির উপর চোখের জল টল মল করছে!

# পারস্যের শাহের খেয়াল।

পারস্যের শাহ্ (Shah of Persia)এর ধারণা ছিল তিনি একজন কবি। শাহ্ মাঝে মাঝে নিজের সভাসদদের কাছে কবিতা পড়ে খুব বাহবা নিতেন। হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল তাঁর সভাসদদের স্তুতির কোন মূল্য নেই, তারা ভক্তিতে না হোক্, ভয়েও সুখ্যাতি করবে। যেই মনে হওয়া, অমনি তিনি সভায় কবিতা পড়া বন্ধ করে দিলেন।

পারস্যদেশে তখন এক খুব নামজাদা কবি ছিলেন, শাহ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কবি আসতেই শাহ্ তাঁর কবিতার খাতা খুলে গড় গড় করে কবিতা পাঠ করে যেতে লাগলেন। পড়া শেষ হতে, কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কবি, কেমন লাগল বল ?

কবি বল্লেন—সম্রাট! ও কবিতার শ্রাদ্ধ! না আছে তার ভাব ভাষা, না আছে ছন্দ বন্দ!

শুনে সম্রাটের চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠ্লো। সম্রাট কবিকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে খুব করে বেত লাগালেন। কবিকে বুঝতে হল যে সম্রাটের কবিতার নিন্দা করার ফলটা কি!

আবার কিছুদিন পরে কবির ডাক্ পড়ল। সম্রাট বল্লেন যে এখন তিনি কাব্য শক্তির অনেক উন্নতি বিধান করেছেন, কবিকে তাঁর কবিতা শুনতে হবে।—বলে শাহ্ আবার গড় গড় করে' কবিতা পড়ে গেলেন।

যেমন পড়া শেষ হওয়া কবি হন্ হন্ করে সভা ছেড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিলেন, শাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা যাও কবি ?

কবি উত্তর দিলেন—আজ্ঞে, আস্তাবলে! সেই আপনি নিয়ে গিয়ে বেত ত মারবেনই, তাই নিজেই গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি।

সম্রাট উচ্চ হাস্য করে উঠ্লেন। এবার আর বেত মারা হল না, কবিকে রাজ সভায় রাজকবি করে শাহ্ তাঁরই লেখা কবিতা শুনে আনন্দ পেতে লাগলেন। নিজের কবিতার খাতা শাহ্ নিশ্চয় পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, কি বল ?

# দাড়ী গোঁফ।

সেদিন মার্কিন মুলুকে লম্বা দাঁড়ী আর গোঁফের এক প্রদর্শনী বসেছিল। এই প্রদর্শনীতে ছ হাজার গোঁফ আর ছ হাজার দাড়ী প্রদর্শিত হয়। কত রকম বেরকেমর, রঙ বেরঙের দাড়ী গোঁফ যে এসেছিল তার আর ঠিক ঠিকানা নেই। এখানে আবার সে সবের প্রতিযোগিতাও হয়েছিল। সব চেয়ে লম্বা গোঁফের জন্য প্রথম পুরস্কার যিনি পান্ তাঁর নাম হচ্ছে ল্যাংশেথ। এর গোঁফটি লম্বায় ছিল বা-রো-হা-ত! পুরস্কার ত ইনি পেলেনই তা ছাড়া পেলেন একখানি খেতাব। সেটার নাম হচ্ছে গুঁফোদের রাজা! গুঁফো রাজার ঘর বাড়ী জান্‌তে নিশ্চয় তোমাদের কৌতুহল হচ্ছে (আমার ও বড় কম নয়), শোন, তাঁর বাড়ী আমেরিকা যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ দাকোট অন্তর্গত বালি সহরে। গুঁফো রাজা সেখানেই আছেন এবং কুশলেই আছেন শুনিলাম। গোঁফের চাষও বেশ ভালরকম করিতেছেন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার এই রাজ্য সম্পৎ লইয়া রাজা চিরদিন সুখে থাকুন।

এই ত গেল গোঁফের রাজার কথা! দাড়ীর নবাবও একজন ছিলেন। তাঁর নাম জ্যাকব। এঁর দাড়ীটি লম্বা যদিও বারো হাত নয়, তবে খুব কমও নয়। ক'হাত লম্বা তা জেনে কাজ নেই, শুধু শুনে রাখ, দাড়ীটি তাঁকে কোমরে জড়িয়ে রাখতে হত! খুলে রাখলে না কি পথ চলবার সময় রাস্তা ঝাঁট দেওয়া হয়ে যায়! সাবাস—দাড়ী নবাব!

আমেরিকা অঞ্চলে ইব্রাহিম লিঙ্কনের দাড়ীরও খুব নাম ডাক ছিল। এমনি একটা গল্প শোনা যায় যে তাঁর অনুকরণে একটি লোক সুন্দর দাড়ী রেখে প্রদর্শনী থেকে আটাত্তর হাজার টাকার এক লাইফ্ ইনসিওরেন্স পুরস্কার পেয়েছিল! কেয়াবাৎ! তোমরা বড় হয়ে একবার চেষ্টা করবে না কি? যদিই কর, আমাকে ভাই, খবরটা দিও, বুঝলে।

'ফিঙে'।

———

# বুদ্ধদেব।

তোমরা অনেকেই হয়তো ভগবান্ বুদ্ধের নাম শুনিয়াছ। তিনি আমাদের ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া এদেশ ধন্য ও পবিত্র করিয়াছেন। সমগ্র পৃথিবীতে অদ্যাবধি যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বুদ্ধ তাঁহাদের অন্যতম।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয়ের পাদদেশে কপিল বস্তু নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। শাক্যবংশীয় রাজারা সেখানে রাজত্ব করিতেন। শাক্য বংশে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র গৌতম। এই গৌতমই কালে বুদ্ধ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গৌতম শৈশবেই মাতৃহীন হন। তাঁহার জন্মের পর সপ্তাহকাল মধ্যে তাঁহার জননী মায়াদেবী গমন করেন। মাতার অবর্ত্তমানে গৌতমের বিমাতা ( সম্পর্কে মাসী ) তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন।

যথাকালে গৌতমের বিদ্যারম্ভ হইল। তাঁহার পিতা তাঁহাকে রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী নানা প্রকার বিদ্যা শিখাইলেন। গৌতমের চরিত্রে শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি রাজোচিত গুণের কোনও অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল, অপরের দুঃখ তিনি সহিতে পারিতেন না, সর্ব্বজীবে তাঁহার সমান দয়া ছিল।

ছেলেরা সাধারণতঃ আমোদ প্রমোদ ভালবাসে, কিন্তু গৌতম এ সকল মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সঙ্গীরা যখন খেলা করিত তিনি তখন একলা চুপ করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিতেন। পুত্রের উদাস ভাব দেখিয়া, পিতা শুদ্ধোধন বড়ই চিন্তিত হইলেন। তিনি পুত্রের মন ভুলাইবার জন্য, যশোধারা নাম্নী এক সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু গৌতমের মন ইহাতেও ভুলিল না, বরং সংসারের নানা দুঃখ কষ্ট দেখিয়া, তাঁহার সংসার বিরাগ ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি রথে চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন এমন সময় দেখিলেন যে, একটী লোল চর্ম্ম, পক্ককেশ বৃদ্ধ, রাস্তার পাশ দিয়া অতি কষ্টে লাঠিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছে। গৌতম পূর্ব্বে আর কাহারও এরূপ অবস্থা দেখেন নাই, তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সকলেরই একদিন এমন অবস্থা হইবে। লোকটিকে দেখিয়া গৌতমের মন এত খারাপ হইল যে সেদিন আর তাঁহার বেড়াইতে যাওয়া হইল না। এর পর আর একদিন বেড়াইতে বাহির হইয়া তিনি কুৎসিত ব্যাধি গ্রস্ত একটী লোক দেখিলেন এবং অপর একদিন একটী মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, সংসারে এ সকলের হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই। সংসারের এই সব অবস্থা দেখিয়া গৌতমের মন বড়ই অস্থির হইয়া পড়িল, তিনি কেবলই মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি এক সন্ন্যাসীর দেখা পাইলেন। সন্ন্যাসীর শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, সহজ, সরল ভাব এবং সুস্থ, সবল দেহ দেখিয়া গৌতম প্রাণে বড় আরাম পাইলেন, তাঁহার ও সন্ন্যাসী হইবার খুব ইচ্ছা হইতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই গৌতমের একটী পুত্র জন্মে, ক্রমেই তাঁহার সংসার বন্ধন বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সেই রাত্রেই তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন।

গৃহত্যাগের পর, গৌতম কিছুদিন পর্য্যন্ত সন্ন্যাসীদের মঠে থাকিয়া, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন কিন্তু ইহাতে ও তাঁহার প্রাণের পিপাসা মিটিল না। তিনি গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব গ্রামের কাছে এক বিজন বনে গিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ছয় বৎসর কঠোর তপস্যার পর ও যখন অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইলেন না তখন তিনি বড় নিরাশ হইয়া পড়িলেন। দীর্ঘকাল

কঠোর সাধনায় তাঁহার দেহ নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কথিত আছে, ক্ষীণ দেহে, নিরাশ হৃদয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে, নিরঞ্জনা নদীর তীরে এক অশ্বত্থতরুমূলে তিনি সমাধিস্থ হন এবং সেই স্থানেই তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, তিনি শান্তি লাভের প্রকৃত উপায় জানিতে পারেন। দিব্যজ্ঞান লাভের পর হইতে গৌতম, বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী এই নামে পরিচিত হইলেন। যে অশ্বত্থ বৃক্ষ মূলে বুদ্ধ দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাহা বোধিদ্রুম এবং যে স্থানে তাঁহার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল সেই স্থান বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারে ব্রতী হইলেন। অনেকেই তাঁহার মত গ্রহণ করিল। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ এই:— "সর্ব্ব প্রকার কুপ্রবৃত্তি দমন করিয়া, জীবহিংসায় বিরত থাকিয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র জীবন্ যাপন করিতে পারিলে মনুষ্য দুঃখ ও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অবশেষে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবে তখন আর তাহার জন্ম হইবে না।" বার বৎসর পর্য্যন্ত নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া তিনি পুনরায় স্বীয় জন্মভূমি কপিলবস্তু নগরে ফিরিয়া আসিয়া পিতা ও পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পিতা, পত্নী, পুত্র এবং শাক্য বংশীয় অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক নয় কিন্তু চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল নানাস্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া প্রায় আশী বৎসর বয়সে মহা প্রাণ বুদ্ধদেব কুশীনগরে দেহত্যাগ করেন।

শ্রীকুমুদিনী সিংহ।

---

# নীল-কুঠির সাহেব।

আজ আর নটন নিভাকে বলতে হ'ল না—সন্ধ্যা না হ'তে হ'তেই কাকাবাবু গল্প শুন্‌তে যাই চলনা—বলে' আমাকে শুদ্ধ টেনে পল্লী বুড়োর বাড়ী উপস্থিত! তখনও সন্ধ্যা হয় নি—ক্রমে দু' একটি করে অনেকগুলি ছেলে এসে উপস্থিত হ'ল—বুড়ো হুঁকো রেখে গল্প আরম্ভ করে দিলে, আমিও এক পাশে বসে শুন্‌তে লাগলাম।

"দেখ, ঐ যে মজা নদীটা রয়েছে—ওর উপর এখন ঘাস গজিয়েছে, গরু ছাগল চ'রে বেড়ায়,—চিরকালই কিন্তু ওরকম ছিল না। আমি দেখেছি ওতে নৌকা যেতে—নৌকায় চড়ে কত দূর দেশ যেতাম আমরা।

"আমরা যখন বর্ষাকালে যেমন ওতে ভেলা চড়ে কত দূর চলে যাই, আবার ফিরে আসি, কেমন আমোদ হয়—নয় রে নটন?

"হাঁ, খুব আমোদ হয়; কিন্তু যখন ওতে বান আসতো? গোঁ গোঁ শব্দ করে যখন লাল জল, নদীর দু'কুল ছাপিয়ে মাঠে এসে পড়তো—গ্রামে এসে ঢুকতো? তখন, 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা?' ধুপ ধাপ করে সব ঘর পড়ছে—ঐ কার খড়ের পালুই ভেসে যাচ্ছে—ঘরের চালে দুটী চারটি মানুষ বসে "ত্রাহি" "ত্রাহি" ডাক ছাড়ছে, দু'চার দিন হয় ত ঘরের চালেই থাকতে হল,—সে তোমরা কখনো ত দেখনি!"

"তুমি দেখেছিলে?"

"আমি একবার মাত্র দেখেছিলাম। তখন ছিলাম আমি তোমাদেরই মত ছোট, আমার মনে পড়ে একদিন রাতে শুয়ে ঘুমোচ্ছি—রাত তখন বোধ হয় দুপুর,—মা আমার হাতটা ধরে টানছেন, "ওঠরে—ওঠরে?" আমি ত চোখ রগ্‌ড়াতে

রগড়াতে উঠে বসলুম। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে আমার ত পিলে চমকে গেল,— ঘুমের ঘোর কোথায় ছুটে গেল, মাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"ও কিসের শব্দ মা ?" মা জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বল্‌লেন—"বানের—রে !" আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"বান কি মা ?" মা বল্লেন—"দেখবি এখন। চল পালাই চল। এখনি ঘর চাপা পড়তে হ'বে।" মা আমার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। উঠানে নেমে দেখি, জল ! মাকে বল্লাম—এত জল কোথা হ'তে এল মা ? মা কোন কথার জবাব না দিয়ে আমার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে চললেন। আমি বললাম—মা, আমার সিলেট দপ্তর ? আনলিনে বুঝি ? দাঁড়াও নিয়ে আসছি বলে মায়ের হাত ছাড়িয়ে দৌড় দিলাম, মা "যাসনি যাসনি" বলে বারণ করতে লাগলেন,—আমি ততক্ষণে আমাদের ঘরে ঢুকে সিলেট দপ্তর বগলে করে তখনি তখনি ফিরে এলাম, তারপর মায়ের সঙ্গে গিয়ে উঠলাম একটা মস্ত ঢিবিতে। সমস্ত রাত মা-বেটায় সেই ঢিবির উপর ! সাপ ব্যাঙ পর্য্যন্ত সেই ঢিবির উপর উঠতে লাগলো, পাড়ার আরো লোক সেই ঢিবিতে আশ্রয় নিলে, পরদিন ঢিবির উপর দাঁড়িয়েই দেখলাম—আমাদের ঘরখানি শুয়ে পড়লো।

দুই তিন দিনের মধ্যে জল কমিয়া গেল, আমরা এক জ্ঞাতির বাড়ী গিয়া উঠলাম। ঘর দ্বার তৈরী হ'লে পরবৎসর বাড়ী এলাম, তারপর ইংরাজরা নীলের ব্যবসা করবার জন্য নদীর মুখ বেঁধে ফেললো ; নদীর স্রোত বন্ধ হ'য়ে গেল, প্রতিবৎসর নদীর বুক ভরে যেতে যেতে এমন হ'য়ে পড়লো শেষে লোকে নদীর বুকে চাষ আবাদ আরম্ভ করে দিলে, ওই যে যেখানটায় একটা ভাঙ্গা শিবমন্দির ওকে আঁকড়ে ধরে একটা অশ্বত্থ গাছ এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঐখানটায় ছিল পাকা ঘাট, ঐখান হ'তে নৌকা ছেড়ে বর্ষায় ঐ সন্তোষ পুরের কোলে নৌকা পৌছোতে লাগতো সমস্ত দিন, এত নদীর বেগ ! জানলে ভাইসব কালে কি না হয় ?"

"ওতে জাহাজ আসতো ?"

"আমি দেখিনি—শুনেছি, কত আগে বলতে পারিনা, ওতে নীলকরদের সাত জাহাজ নীল ডুবে গেছলো এক ঝড়ের দিন, এখনো নাকি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে সেই জাহাজের দু'এক খানা কাঠ লোহা বেরোয়।

"একবার আমাকে ঐ নদীতে কুমীরে নিয়ে গেছলো। তখন এখানে নীলকরদের ভারি অত্যাচার ছিল।"

"নীলকর কারা বুড়ো ?

"নীলকরদের নাম তোমরা শোননি ? তখন নীলকরদের নামে ছেলে কাঁদলে চুপ করতো, তাদের ভয়ে ছেলেরা এখনকার মত রাস্তায় খেলে বেড়াতে পারত না, তারা সব সাহেব, জোর করে চাষীদের দিয়ে নীলগাছের চাষ করিয়ে নিয়ে তা হ'তে নীল রঙ তৈরী করতো।"

"তারা থাকতো কোথা বুড়ো ?"

"তারা থাকতো নদীর ও পারে ঐ সন্তোষপুরের কুঠিতে, এখন সেখানটায় কেবল বন জঙ্গল হ'য়ে আছে, মানুষ যায় না। নীলকর সাহেবেরা যখন ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে আসতো তখন ছেলে বুড়ো সকলে রান্না ঘরে গিয়ে লুকোত।

"তখনকার লোকে ভারি ভীতু ছিল—নয় বুড়ো ?"

"বুড়া ঘাড় নেড়ে বললে—"উঁহুঁ। তা কখনো নয় তোমরা তাদের দেখনি, তাদের চেহারা ছিল কি! দেখতে যেন যমের দূত গায়ে বলও ছিল তেমনি ও পাড়ার যদু দত্ত সে ঐ নীলকরদের সঙ্গে এক দাঙ্গায় এক ঢেঁকি ঘুরিয়েছিল! ছেলেও সেকালে তোমাদের মত রোগা পটকা দেখিনি, মধু ঘোষের আর হরি বেনের দুটো ছেলে একবার বোসেদের পুকুরের পাড়ে একটা জাম গাছে জাম খেতে উঠেছিল, দরওয়ান দেখতে পেয়ে তাড়া করে, তা তারা সেই প্রায় এক

শ  সমান উচু জামগাছ হ'তে "টপ্" "টপ্" করে লাফ খেয়ে পড়ে তখনি দৌড়, তোমরা হ'লে পারতে ?

"তবে তারা লুকোত কেন ?"

"কি করবে তা না হ'লে—ধ'রে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দেবে ! ও ! তেমন সব কষ্টের কথা তোমরা কখনো শুননি। চাষীদের ধ'রে নিয়ে গিয়ে—তাদের মাথা কামিয়ে কাদা দিয়ে তাতেই নীলের চারা বসাতো, তোমাদের মত ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে আঙ্গুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিত ;—আর ছেলেগুলো যাতনায় "বাপ্" "বাপ্" শব্দ করতো।"

"কেন ?"

তা হলেই চাষীরা নীল চাষ করবে কিন্তু কিছুতেই আমাদের গাঁয়ের চাষীদের কায়দা করতে পারেনি। আমি একবার একটা সাহেবকে ভারী নাকাল করেছিলাম।"

"কি করে ?"

"আমার তখন তের চোদ্দ বৎসর বয়েস, তখন তের চোদ্দ বৎসরের ছেলে তোমাদের মত ছিল না তারা ছিল জনে জনে এক একটা যোয়ান, তোমাদের দেহ তেমন হ'বে কোথা হ'তে বল ? নিত্য রোগ ভোগ করবে আর অষুধ খাবে ! আজ মাথা টিপ্ টিপ্ করছে—আজ গা কেমন করছে, আর মা-বাবা কেবল "আহা" "আহা" করছেন, "রোদে বেরিও না, মাথা ধরবে ; জলে ভিজনা—জ্বর হ'বে , গায়ে ধুলি মেখোনা—ময়লা হ'য়ে যাবে।" কেমন ?—এই সবইত তোমাদের মা-বাবা বলেন ! তা—জান ভাইসব ? আমরা যেমন মাটির মানুষ মাটি ছাড়া হ'লে কি আমাদের দেহ ভাল থাকে, না রোদ জলকে এড়িয়ে চল্‌লেই রোগকে ফাঁকি দেওয়া যায় ? কথায় বলে—

ভোগের জিদে নষ্ট শরীর,
রোগের খাদ্য যোগায় আমীর ॥
রোদ জলকে যে সমান পায়,
তার কাছে কি বদ্যি যায় ?

এই দেখ না—রোদে জলেই পৃথিবী কেমন সুন্দর শোভা ধরেছে, সাট কোট ফেলে, খালি গায়ে যদি রোদে একটু ঘোর, জলে যদি একটু ভেজ, গায়ে যদি একটু মাটি মাখ, তাতে তোমাদের শরীর কখনো খারাপ হবে না, হাওয়া, জল, মাটি, রোদ, এসব যে ভগবানের দান, এই সব নিয়েই ত আমাদের দেহ তৈরী।

"হাঁ—কি বলছিলাম,—একদিন সকালে ঐ পারঘাটায় আমি দাঁড়িয়ে দাঁতন করছি—দেখি একটা সাহেব খেয়া নৌকা হ'তে তীরে নামলো। নেমেই খট্‌মট্‌ করে আমার কাছে এসে দাঁড়াল আর চোখ দুটো লাল করে বল্লে—"এই উল্লুক আমাকে কাঁধে করে নিয়ে চল।" আমি ত অবাক হ'য়ে তার মুখ পানে চেয়ে রইলাম, সে আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে বল্লে— "বুঝতে পারছিস্ না আমায়, কাঁধে করে নিয়ে চল্। আমি আর কি করি—আস্তে আস্তে তাকে কাঁধে তুলে নিলাম।

"যেতে যেতে একটা মতলব মাথায় এল। সামনে মশাইয়ের পুকুর। বাছাকে সেই পুকুরের জলে ফেলে দিয়েই—দৌড়, দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম—কাদা পানা মেখে আমার দিকে কটমট ক'রে চাইতে চাইতে সাহেব চলে গেল। পুকুরটা পানায় ভরা ছিল—পাঁকও ছিল খুব! আমি দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলাম।

"তার পরদিন বৈকালে ঐ শিবতলাটাতেই আমরাও চু-চুকাটি খেলছি, দেখি বড় একখানা নৌকা ঘাটে এসে লাগলো, তার মধ্য হইতে একটা সাহেব আর

কতকগুলা লোক ঝপ্ ঝপ্ করে লাফিয়ে পড়লো—আমার সঙ্গীরা "ঐরে সাহেব ধরতে এসেছে বলেই"—ছুট! আমি তাড়াতাড়ি অশ্বত্থ গাছটায় উঠে, একটা ফোকরের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম, লোকগুলো আমায় দেখতে পায়নি তারা আমার সঙ্গীদের পিছু পিছু ছুটলো, কিন্তু সাহেবটা নড়লো না, গাছের তলা হ'তে। ভয়ে আমার বুক ঢিব ঢিব করতে লাগলো, কিছুক্ষণ পরে লোকগুলো ফিরে আসলে সাহেব তাদের বল্লে—এই গাছটার উপর একটা আছে—উঠে পাকড়াও।

লোকগুলো তখনি গাছে উঠে পড়লো। আমি এ ডাল ও ডাল করে—একটা খুব লম্বা ডালে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। ডালটা নদীর বুকে নুয়ে পড়েছে, আমি ডাল হ'তে ঝপাঙ্ করে নদীর মধ্যে লাফিয়ে পড়লাম, গাছের উপর যারা আমায় ধরতে আসছিলো তারা চোখ দুটো চাকার মত করে খানিক চেয়ে রইলো।

আমি জলে পড়েই সাঁতরে চল্লাম, পিছু ফিরে দেখলাম—সাহেব ও দুটো লোক তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে নৌকা ছেড়ে দিলে।"

"সাহেব তোমায় ধরে ফেললে?"

"উহুঁ। সাহেব ধরলে না—ধরলে একটা কুমীর। কুমীরটা সাঁসাঁ করে আমায় জলের মধ্যে দিয়া নিয়ে চল্লো।"

"সাহেবটা কি করলে?"

তার পর-আর-কেমন করে বল্ব? তবে শুনেছিলাম তারা সবাই মিলে আমায় অনেকক্ষণ ধরে খোঁজা খুঁজি-করেছিল।

"তারপর-কি হ'ল?"

"বলছি, দাঁড়াও—তামাকটা সেজে নিই।" বুড়ো কল্কেতে তামাক সেজে তাতে আগুণ দিয়ে হুঁকোটী চড়িয়ে হাওয়া করতে করতে বললে—"অনেক রাতে

চেতন পেয়ে দেখি, আমি একটা মস্ত বড় গর্ত্তের-মুখে-পড়ে-আছি—বুকের উপর —একটা বিশামুণে বোঝা।

"সেটা কি ?"

"কুমীরটা আমার বুকের উপর শুয়েছিল—পাছে আমি পালিয়ে যাই!"

"খেয়ে ফেল্লে না ?"

"না সমস্তরাত নড়ন চড়ন শূন্য হ'য়ে, মরণ ভয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, ভোর-বেলা ঝপাঙ্ করে শব্দ হ'তে চেয়ে দেখি কুমীরটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোথা চলে গেল।"

"কোথা গেল ?"

"বোধ হয়—বন্ধু বান্ধবদের ভোজ দেবে, নেমন্তন্ন করতে। এমন সুযোগ আর হ'য় না। আমি ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।"

"উঃ গা ময় রক্ত লেগে—মাটীতেও রক্ত! সারা শরীরটা ঝিম্ ঝিম্ করছে। যাহোক, পালাতে ত হ'বে? উঠে দঁড়ালাম। এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম—এখানে ওখানে হাড়গোড় পড়ে রয়েছে, আর সেই সঙ্গে সোণারূপোর গয়না! আমি সোণার গয়না গুলি কুড়িয়ে নিয়ে আচ্ছা করে কাপড়ে বাঁধলাম, তারপর—নড়ে উঠতে লাগলাম কিন্তু শরীর বড় দুর্ব্বল—যত উঠতে যাই তত পিছলে নিচে পড়ে যাই—আর পিছু ফিরে ফিরে চেয়ে দেখি, সেখানটায় নদীর ধারটা খুব উচু। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টার পর উপরে উঠেছি,—দেখি,—দুটো কুমীর, আর কতকগুলো ছানা এসে উপস্থিত! তারা এদিকে ওদিকে শীকারের সন্ধানে খুঁজতে লাগলো, একটা কুমীর হাঁ করে পাড়ের দিকে চাইতেই, আমায় দেখতে পেয়ে ধড়্মড়্ করে পাড়ের দিকে ছুটে এল, আমি ত তখন ছুট! ছুটতে পারি না—কেবল মাথা ঘুরে

পড়ে যাই, যখন মাঠের মধ্যে,—দেখি,—কুমীরটা নদীর ধারে হাঁকরে-আমার দিকে চেয়ে—দাঁড়িয়ে আছে, আমি তাকে দিব্যি দু বুড়ো আঙ্গুলের দুটি কলা দেখিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম।

গ্রামের সকলের আমায় দেখে ভারি আহ্লাদ, তারা মনে করেছিল—সাহেব আমাকে ধরে নিয়ে গেছে। মায়ের হাতে গয়না গুলো দিলাম—মা'ত কেঁদেই অস্থির।

আজ যাও ভাই রাত হয়েছে—ঐ দেখ বিভু ঢুলছে। আবার কাল এস।"

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



# নব-বর্ষ।

১৩৩০

"আমার দেশের" নববর্ষ নয়, বাঙ্গলা বর্ষের একটি নূতন বর্ষ আরম্ভ হইল। ১৩২৯ সাল ছিল, গত কল্যকার রাত্রির অবসানে আজ প্রভাতে ১৩৩০ আরম্ভ হইল। কাল হয়ত তোমার বয়স বারো ছিল, আজ তোমাকে তেরো বলিতে হইবে, অবশ্য যদি মাস ধরিয়া তারিখ গণিয়া তুমি বারোই বলিতে চাও, বলিতে পার, কিন্তু সাধারণ হিসাবে তোমার একটি বৎসর বয়স বাড়িয়া গেল। এমনই করিয়া পৃথিবীর স্থিতি কাল বাড়িয়া চলিয়াছে, আরও কতকাল চলিবে, কে জানে! তেরো বছর আগে তুমি এ পৃথিবীতে ছিলে না, কোথায় ছিলে সে তুমিও জান না, আমি ও জানি না, এক ভগবান ছাড়া বোধ করি কেহই জানে না। তেমনি পৃথিবীতে এমন একসময় ছিল যখন পৃথিবীই ছিল না, তারপর তেরো বছর আগে তুমি যেমন একদিন জন্মিলে, পৃথিবী ও একদিন তেমনি জন্মিয়াছিল, তোমার যেমন পরমায়ু একবছর একবছর করিয়া আজ তেরো বছরে আসিয়া দাঁড়াইল, যাঁহারা পৃথিবীর জন্মের হিসাব করেন, তাহারাও বলিবেন পৃথিবীর বয়স এতদিন এতবছর, এত মাস হইয়াছে।

হোক, ক্ষতি নাই, তোমাদের পরমায়ু বর্দ্ধিতই হোক এই আমরা কামনা করি। এক একটি বছর যায় যেন তোমার সুখে, স্বচ্ছন্দে শান্তিতে যায়; এক একটী বছর যায়, যেন তোমাকে স্বাস্থ্যবান, প্রফুল্ল, চরিত্রবান করিয়া যায়; এক একটি বছর যায়, যেন তোমাকে সকলবিষয়ে উন্নত করিয়া দিয়া যায়—যেন কখনো তোমাকে যে বছর চলিয়া গিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্নমনে ম্লান-

মুখে নিঃশ্বাস ফেলিতে না হয়; যেন কখনো ভাবিতে না হয় গত বছর তোমার যাহা করিবার ছিল তাহা হয় নাই, কাজ তোমার অসমাপ্ত রাহিয়াছে, পাঠ তোমার অপাঠ্যই রহিয়া গিয়াছে, স্বাস্থ্যের দিকে তুমি মন দিতে পার নাই, ধর্ম্ম-কার্য্য, পুণ্য কার্য্য করিতে তোমার বাসনা জাগে নাই, দীনের প্রতি, দরিদ্রের প্রতি, দেশের প্রতি তোমার যতটুকু কর্ত্তব্য ছিল, তাহা তুমি করিতে পার নাই। এ সব ভাবিয়া যেন নূতন বছরের কোন দিন কোন রাত্রি তোমার না অতিবাহিত হয়! নূতন বছরের প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক রাত্রি যেন তোমার আনন্দে কাটিয়া যায়, প্রতিদিন যেন তোমাকে নবীন উৎসাহ, নূতন উদ্যম, নূতন প্রাণ, নূতন তেজ—তোমার প্রাণে আনিয়া দেয়।

এই ৩৬৫ দিন পরে আবার যখন একটি নূতন বৎসর আসিবে, ১৩৩০ গিয়া আবার যখন ১৩৩১ সাল আসিবে, তখন যেন তুমি সগর্ব্বে বলিতে পার, একটি দিন আমার বিফলে যায় নাই, একটি মুহূর্ত্ত আমি বৃথায় অতিবাহিত করি নাই—আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি!

কাহাকেও শুনাইয়া বলিতে হইবে না, আপন মনেই বলিও, আপনার বুকের ভাষায় বলিও, তাহাতেই কাজ হইবে। তোমার কর্ত্তব্য সাধনের পুরস্কার দিবার কর্ত্তা যিনি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা যিনি, তিনি তোমার মনের ভাষাও বুঝিতে পারিবেন এবং তার পুরস্কারও তুমি পাইবে, পাইবে, পাইবে।



# খবরাখবর।

আমরা সবাই ভাত খাই, ডাল খাই, তরকারী খাই। মিষ্টি ছাড়া যাই কেন খাবার জিনিষই বল আমরা খাই-না, নুন দিয়ে খেতে হয়। আলুনি কোন জিনিষ গলা দিয়া গল্‌তেই চায় না। সেই নুনের ওপর আমাদের গবর্ণমেণ্ট ট্যাক্স বসিয়ে দিলেন। কোন একটা ট্যাক্স বসালেই সে জিনিষের দাম বেড়ে যাবেই। নুনের মত এমন নিত্য দরকারী জিনিষের দাম বেড়ে গেলে, তোমার-আমার হয়ত তেমন কষ্ট হবে না কিন্তু ভেবে দেখ ত ভাই, যারা অতি গরীব দিনমজুর খেটে চাট্টি চাল, দু'টো শাক সেদ্ধ করে একটু নুন মিশিয়ে পেট ভরায়, এই নুনের দাম বেড়ে গেলে তাদের কত কষ্ট হবে! নুন-ভাত খাওয়ার লোকও যে এ দেশে কত, তা বল্‌তে পারা যায় না। একশ' জনের ৯৮ জনের সেই অবস্থা। তাদের সকলের দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না।

অনেকের পাতে নুন নষ্ট হয়, অনেক বাড়ীতে বামুন-ঠাকুররাও ফেলা ছড়া করে নুন নষ্ট করে, এখন থেকে এরকম অপচয় যা'তে কারো সংসারে না হয়, বাড়ীর গৃহিণীরাও যেন তা করেন, তোমরাও চেষ্টা করো। দাম যে বেড়ে গেছে বলেই যে শুধু তা নয়, অপচয় হওয়াটাই খারাপ।

* * * * *

আমার মনে হয়, তোমরা সবাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। তোমরা যে সব স্কুলে পড়ছ, সেই স্কুলগুলি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন, এদিককার বাংলায় যারা বসবাস কর, তারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুলে আর ওদিককার বাংলার ছেলে-মেয়েরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ স্কুলে পড়ে। অমনই ভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ও ভিন্ন ভিন্ন আছে। আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বল্‌ছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দশবছর ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। এই এপ্রিল হইতে মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চেন্সেলার হলেন। স্যার আশুতোষ যেমন বহুদিন ধরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব করেছেন, তেমনি উন্নতিও

করে দিয়েছেন। সে সব কথা আজ তোমরা বুঝতে পারবে না, বড় হবে যখন, দু'একটা পাশ করে' যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে আসবে, তখন বুঝবে, স্যার আশুতোষ এদেশে উচ্চশিক্ষার বিস্তার করবার জন্য কি করেছেন, কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, কত অসাধ্য সাধন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব যিনিই করুন, বিশ্ব-বিদ্যালয় যতদিন থাক্‌বে, উচ্চ ধরণের লেখা পড়ার চর্চ্চা যতদিন দেশের লোকে করবে, স্যার আশুতোষের নাম ততদিন উজ্জ্বল থাক্‌বে! হাইকোর্টের জজিয়তী—তার সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের এত বড় কাজ এত কাল ধরে, তাঁর মত কেউ চালাতে পারে নি আজও, পরেও পারবে কি না সন্দেহ।

* * * * *

আমরাই একদিন তোমাদের কাছে বাঙ্গালী বীর ভীমভবানীর পরিচয় দিয়েছিলাম, আমাদের দুর্ভাগ্য আবার একদিন তাঁর মৃত্যু সংবাদ আমাদেরই দিতে হয়েছিল। সেদিন বড় দুঃখে বলেছিলাম, বাংলা দেশের একটা গৌরব চলে গেল। বলতে আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে যে এখন আর একটি শক্তিশালী যুবকের খবর পেয়েছি। ছেলেটির নাম শ্রীমান বীরেন্দ্র সেন। তার বয়স মোটে ১৮ বছর। এই বয়সেই শ্রীমান ৩০টি অশ্বের বলযুক্ত মোটর গাড়ী ধরে রেখেছেন। ৩টন অর্থাৎ ৮১ মণ ওজনের যে কোন ভারী জিনিষকে বুকের ওপর তুলে রেখে অসীম শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

একদিন ছিল এই দেশে যখন যুবকদের জনে জনে শক্তি ও বলের পরিচয় দিত। সেদিন আজ আর নেই। তাই এ রকম দু'একটা খবর শুন্‌লে ভারি আহ্লাদ হয়। আর শোনাতেও হয় এই জন্যে যে শুনে যদিই কেউ শক্তির চর্চ্চা করে, মঙ্গলই হ'বে।

* * * * *

আমাদের দেশে যে কয়খানি ভাল দেশী খবরের কাগজ (ইংরাজী) প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রতিষ্ঠাতাদের নাম জান্‌তে অনেকের আগ্রহ হয়। সম্প্রতি আমি এই কয়েকখানার খবর পেয়েছি, তোমাদের জানাচ্ছি।

কল্‌কাতা থেকে যে অমৃতবাজার পত্রিকা বার হয়, সেখানির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ, ইণ্ডিয়ান মিররের প্রতিষ্ঠতা ছিলেন ৺নরেন্দ্রনাথ সেন রায় বাহাদুর; বেঙ্গলী প্রতিষ্ঠা করেন স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; হিন্দু পেট্রিয়টের প্রতিষ্ঠতা ছিলেন—স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ, মাদ্রাজের 'হিন্দু'র প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় সুব্রাহ্মণ আয়ার ও বোম্বাইয়ের বোম্বাই ক্রণিকেল পত্রের প্রতিষ্ঠা হয় স্বর্গীয় সার ফিরোজ সা মেটার দ্বারা!

সংবাদ পত্র দেশের লোকের প্রভুত কল্যাণ সাধন করে, সেই কল্যানকর কার্য্যের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের কাছে দেশবাসী চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

* * * * *

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় একটি নিখিল-ভারত প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল তোমরা "আমার দেশের" মারফতে তার কিছু কিছু খবর পেয়েছিলে! এই বছর ডিসেম্বর মাসে আবার একটি প্রদর্শনী হবে এর নাম হবে, Priliminary British Empire Exhibition প্রাথমিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী। প্রাথমিক নাম হল কেন, একথা তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার। তবে শোন, কেন হল। আসছে বছর ইংলণ্ডে একটি খুব বড় গোছের একজিবিসন হবে তার নাম হচ্ছে British Empire Exhibition ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনী। সেই প্রদর্শনীতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের সকল স্থান থেকেই জিনিষ যাবে। যেখানকার যে জিনিষটি ভাল, দেখাবার মত, তাই সেখানে পাঠান হবে। তাই এই প্রাথমিক প্রদর্শনী বসিয়ে জিনিষ বেছে নেওয়া হবে। এটা না বসিয়ে যদি একেবারেই সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে জিনিষ পাঠাবার ব্যবস্থা থাকত তা হলে যার যা খুসী সে তাই সেখানে পাঠিয়ে বসত! তাতে হত এই যে অনেক খেলো ও দেখাবার নয় জিনিষই কিছু কিছু গিয়ে পড়ত। তাই এখানে এই প্রাথমিক প্রদর্শনী খোলা হচ্ছে, এখানে পরীক্ষা হ'বে, পরীক্ষায় যে সব জিনিষ পাস হবে তারাই বিলেত যেতে পাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা আর কি! এখানে আগে পাশ হও তার পর—বিলেত।

* * * * *

আমাদের "পৃথিবীর ইতিহাস—চিত্রে ও গল্পে" সিরাজের সাত খানা বহি একসঙ্গে ছাপা হচ্ছে। ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান পারস্য, রোম গ্রীস, জার্ম্মেণী। তোমাদের মধ্যে যারা

পৃথিবীর ইতিহাসের গ্রাহক তারা "আমার দেশ" পাবার ক'দিন বাদেই এই বহিগুলিও পেয়ে যাবে।

এই সিরিজের প্রথম দুসংখ্যার—বৈদিক ভারত ও ইংলণ্ড—সকলেই সুখ্যাতি করেছেন, এ গুলিও ভাল করার চেষ্টা করতে আমরা কসুর করিনি, ভাল মন্দ তোমরা বলো।

* * * * *

"আমার দেশ" সেবাভাণ্ডারে এমাসে শ্রীমান কিরণ কুমার সাহা (সিরাজগঞ্জ) দ্বারা সংগৃহীতশ্রীমতী সাগর দাসী ফৌজদার (দৌলতপুর), বন্ধুর দেওয়া ১৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। মোটের উপর ৮২৸৹ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের আশীর্ব্বচন তোমাদের শিরে আগামী মাসের কাগজের মধ্য দিয়া বর্ষিত হইবে।

---

# চিত্র-পরিচয়।

আদর গ্রুজ (১৭২৫-১৮০৫)

তোমরা এই ছবিটী যদি কিছুক্ষণ ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে যে মেয়েটী এই দু'টি ঘুঘু-পাখীকে লইয়া সে-যেন সব ভুলিয়া গিয়াছে! মেয়েটির কোলের উপর খাবার ফল রহিয়াছে, হাতের নীচে খাঁচায় আর একটা কি পাখী মুখ বাহির করিয়া তাহাকে ডাকিতেছে, তাহার সেদিকে দৃষ্টিও নাই, সে এই পাখী দু'টীকে লইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছে। পাখী দু'টি যেন তার শিশুহৃদয়ের সুখ দুঃখ, ধন, সব।

গ্রুজ এই রকমের সরলতা মাখা পবিত্র কোমল কচি মুখ আঁকিতে বড় ভালবাসিতেন। এই ছবিখানি হইতে তোমরা তাঁহার অঙ্কিত "সরলতার" চিত্র সমূহের কতকটা আভাস পাইতেছ। ছবিখানি তিনি মিঃ উইলকিনসন নামক এক ইংরাজের ফরমাসে ১৮০ পাউণ্ড পারিশ্রমিকে অঙ্কিত করেন। আবার সেই ভদ্রলোক বিক্রয় করেন ২৫৭ পাউণ্ডে তার পর আবার মার্কুইস্ অব্ হাটফোর্ড ৭৮৭ পাউণ্ডে এই ছবিখানি ক্রয় করিয়াছিলেন।

যাঁহার অঙ্কিত ছবি এই রকম দামে বিক্রীত হইত, তোমরা নিশ্চয়ই ভাবিতেছ, তিনি নিশ্চয়ই খুব ধনী ছিলেন। বড়ই দুঃখের কথা যে জীবনের শেষ দশায় তাঁহার দু'টুকরা

রুটি উদরে ঢুকিত না, কেহ চোখ চাহিয়া দেখিত না। লোকচক্ষুর অন্তরালে ক্ষুধার জ্বালায় দারিদ্রের পীড়নে এই অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়াছিল।

মেষপালিকা মিলে (১৮১৪-১৮৭৫)

অতি শিশুকাল হইতে মিলে দীন দরিদ্র চাষা ভূষার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর বাপ-মা দু'জনেই ছিলেন কৃষক। কৃষক পুত্র মিলে তাই চাষা-ভূষার ঘরের ছবি, মাঠের ছবি সবই চক্ষু দিয়া দেখিতেন, আর যখন আঁকিতেন প্রাণ দিয়া আঁকিতেন।

মিলে যখন শিশু তখন তাঁর শিক্ষার ভার তাঁহার দিদিমার উপর পড়িয়াছিল,—দিদিমা-টি ভারি রসিক ছিলেন। তাঁর মুখে মুখে ছড়া গল্প কবিতার যেন খই ফুটিত। মিলেকে ভোর বেলায় ঘুম ভাঙ্গাইতেন, বলিতেন—যাদু যাদু উঠ, পাখীরা যে বিভুনাম গাহিয়া গাহিয়া থামিয়া যায়। উঠ, উঠ! মিলে শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেন। দিদিমা গাছের শিরে শিরে সূর্য্যরশ্মি দেখাইয়া দিতেন, ছেলেমানুষ মিলে হাঁ করিয়া দেখিতেন। মিলের বাপও চিত্রকর ছিলেন কিন্তু আঁকিবার শক্তি তাঁহার ছিল না, তিনি শুধু চিত্রকরের চোখ পাইয়াছিলেন, যা দেখিতেন সেই চোখ দিয়াই দেখিতেন। তাই ছেলের চিত্র-প্রিয়তার কথা জানিয়া তাহাকে সেই মতই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মিলের যখন আঠারো বৎসর বয়স মিলের বাপ মেলিতে লইয়া এক প্রসিদ্ধ চিত্রকরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিলে খেয়ালে আঁকা কয়েকখানি ছবি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া চিত্রকর আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন—চমৎকার। মিলের পিতাকে বলিলেন কালে তোমার পুত্র একজন বড় চিত্রকর হইবে।

তখন হইতেই মিলের শিক্ষা আরম্ভ হয়। মিলে সারাজীবন ধরিয়ায় কৃষক প্রভৃতির চিত্রই আঁকিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রভূত যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন।

মিলে প্রকৃতির কোল, প্রান্তর বন এত ভালোবাসিতেন যে সর্ব্বদাই তাহার মন সেদিকে পড়িয়া থাকিত। ১৮৭৫সালের জানুয়ারী মাসের একদিন প্রভাতে বন হইতে এক আহত হরিণের করুণ ক্রন্দন শুনিয়া মিলে কাতরকণ্ঠে বলিলেন—ও মৃত্যুর আর্ত্তনাদ! কে উহাকে হত্যা করিয়াছে, আহা ও আমাকে সাহায্যের জন্য ডাকিতেছে, আমি চলিলাম—"মিলে মহাযাত্রা করিলেন।

বন মাঠ তিনি এত ভালবাসিতেন বনের জীব জন্তু তাঁহার এত প্রিয় ছিল। এই মেষ পালিকাটিও ছবি নয়, দেখায় যেন একটি জীবন্ত মেষ পালিকা।

---

## জানাজানি।

১। কেউ আমাকে বলে দিতে পারেন, পাণের খিলির শেষ ভাগটুকু দন্তদ্বারা ছিঁড়ে কোণ খায় কেন?

—শ্রীকিরণ কুমার সাহা।

২। বাণভট্ট, কে ছিলেন? তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল? এবং কি কি পুস্তক লিখিয়া ইনি সাহিত্যজগতে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন?

—শ্রীসুধাংশু শেখর গুপ্ত।

৩। রাজপুত জাতিরা কোথা হইতে আসিল?

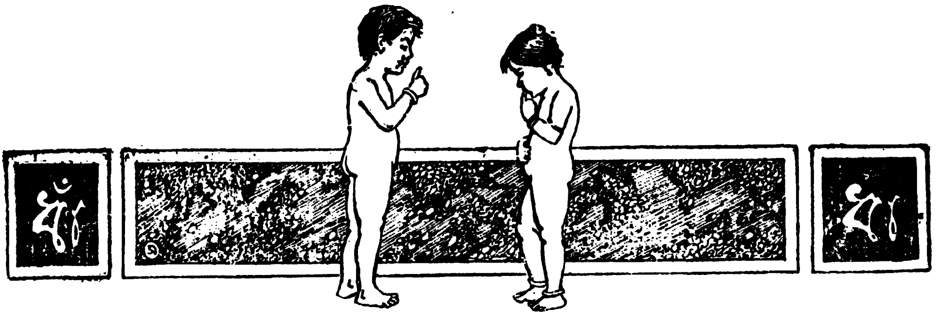
শ্রীঅজিত কুমার সিংহ রায়।

---

## গত মাসের উত্তর।

বরুণা ও অসির সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহাকে বারানসী বলে।

—শ্রীমতী বীণাপানি দেবী, শ্রীচন্দ্র ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমরেন্দ্র নাথ চৌধুরি, শ্রীমতী সুষমা চৌধুরি শ্রীদেবী রতন সেনগুপ্ত, শ্রীশম্ভুচরণ সেন, শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরসময় দাস, শ্রীসুকুমার মিত্র, শ্রীরবীন্দ্র নাথ সন্ন্যাল. শ্রীপ্রভাত কুমার গুপ্ত ও শ্রীআর্য্য কুমার গুপ্ত।




১। নীচে ব্রাকেটের মধ্যে যে সব শব্দ দেওয়া গেল তাহার পরিবর্ত্তে এক একটী প্রতিশব্দ অর্থাৎ একই অর্থ হয় এইরূপ শব্দ বসাইয়া পত্র খানা পাঠ কর।

পোর ( প্রবীরের মাতা )

প্রিয় ( সর্প ) বাবু—

তোমার ( পাতা ) পাইয়াছি। গতকল্য অ ( দাম )র সহিত ( আকাশ চুল ) বাবুর বি ( বিয়োগ ) হয় এবং সে ( ছুরি )রী ত্যাগ করিয়া সি ( আবর্জ্জনা ) গিয়াছে সে শীঘ্রই ( আবৃত ) যাইবে। আমরা কে ( মৃতদেহ ) বাবু সহ ( মন্দ নয় ) আছি। আমি ( চাঁদের আলো ) দের বাড়ীতে গিয়াছিলুম। তাহারা শীঘ্রই ( বীরের দেশে ) রওনা হইবে। আমার ( মন্দ নয় নীড় নিও ! তবে এখন ( ৮০ )

ইতি—

তোমার—

( লক্ষ্মী ) ( সূর্য্যদেব ) পাগলা—

( ঋতুরাজ ) পূর্ণিমা।

২। ১০০ কে এমন চার ভাগে বিভক্ত কর যেন ৪ দ্বারা ভাগ, ৪ দ্বারা বিয়োগ, ৪ দ্বারা গুণ এবং ৪ যোগ করিলে ফল একই হইবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ শান্যাল।

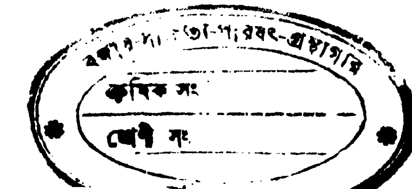
৩। ইংলণ্ডে একজন ভদ্রলোক তাঁহার কর্ম্মচারিকে একখানি চেক্ ভাঙ্গাইতে দিল। চেকটি পাউণ্ড, সিলিং পেন্সে ছিল। ব্যাঙ্কের লোক চেকটী ভাঙ্গাইয়া টাকা দিবার সময় ভুল ক্রমে পাউণ্ড সিলিংএ ভুল করে। অর্থাৎ চেকে যত পাউণ্ড ছিল তত সিলিং দেয় ও যত সিলিং ছিল তত পাউণ্ড দেয়। কর্ম্মচারী সেই টাকা লইয়া রাস্তায় ২॥ সিলিং খরচ করিয়া মনিবকে দেয়। মনিব দেখিল তিনি যত টাকার চেক দিয়াছিলেন, ঠিক তাহার দ্বিগুণ পাইয়াছেন। তিনি কত টাকার চেক দিয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীআদ্যাশক্তি দেবী।

৪। ভুবন বিদিত আমি নাম বেদক্ষরে,
বিবাহ উৎসবে মোরে সমাদর করে।
কভুবা বিচিত্র রঙ্গে আকাশেতে ভ্রমি
কভুবা পদ্মজ বলে ডাকিবে হে তুমি।
দুই ভাগে ঠিক মোরে করিলে বিভক্ত,
প্রথম ভাগেতে হই রাজ অনুগত।
দ্বিতীয় ভাগেতে হই নারীর ভূষণ;
কি নাম আমার এবে বল ভদ্রগণ॥

শ্রীকিরণ কুমার সাহা।

---





সরলা বালিকা।

চিত্রশিল্পী—গ্রুজ

# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।　　　　　　　　　　জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

## কোহাট দুর্ঘটনা।

সেদিন ভারত সীমান্ত প্রদেশে এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

মেজর এলিস ছিলেন, কোহাট জেলার সেনাদলের কর্ত্তা,—জেনারেল ষ্টাফ্ অফিসার। গত ১৩ই এপ্রিল তারিখে শেষ রাত্রে কতিপয় দস্যু মেজর এলিসের বাঙ্‌লোয় প্রবেশ করিয়া, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী এলিস্‌কে হত্যা করিয়া, তাঁহার ১৫ বছরের মেয়ে কুমারী এলিস্‌কে লইয়া পলায়ন করে।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিলেও, রজনীর নিস্তব্ধতা তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। হঠাৎ মেজর এলিসের গৃহ হইতে রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ রজনীর শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ফেলিল, কিন্তু কেহ সাহায্যে আসিবার পূর্ব্বেই দস্যুরা শ্রীমতীকে হত্যা করিয়া, পিতামাতার আদরের ধন,

নয়নান্দকর কন্যাটিকে লইয়া পলাইয়া যায়। কুমারী তখন গাঢ় নিদ্রামগ্ন ছিল, —রাত্রিবসন পরিয়া, খালি পায়ে বিছানায় শুইয়াছিল, দস্যুরা তাহাকে সেই অবস্থাতেই কাঁধে তুলিয়া পলাইয়া যায়। সেখান হইতে তাহাকে মাঠের উপর দিয়া হাঁটাইয়া একটা পাহাড়ে লইয়া গিয়াছিল। দস্যুরা এইভাবে পাঁচদিন হাঁটিয়া চলিয়াছিল। দিনের বেলা তাহারা হাঁটিত না, বোধ হয়, কেহ দেখিতে পায়, এরূপ ইচ্ছা তাহাদের ছিল না, তাই তাহারা দিনের বেলাটা বিশ্রাম করিত আর সারারাত্রি ধরিয়া হাঁটিত। ঘটনাটা একবার তোমরা মনে মনে ভাবিয়া দেখ। ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের আদরের কন্যা, জীবনে কোনদিন কোন কষ্ট সহিতে হয় নাই, কোনদিন পথ হাঁটিতেও হয় নাই, না সময়ে আহার, না ঠিক সময়ে নিদ্রা, সারা রাত পথ চলিতেছেন। গোলাপ ফুলের মত পা দু'খানি ফাটিয়া রক্ত ঝরিতেছে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, বাপ মা'র কথা মনে পড়িতেছে আর দুই চক্ষু ভরিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতেছে, মুখের দিকে চাহিবার, কষ্ট বুঝিবার, দুঃখ দেখিবার—কেহ নাই!

পাঁচদিন এইভাবে দিনে বিশ্রাম রাত্রে পথ হাঁটার পর দস্যুরা কুমারী এলিসকে এমন এক স্থানে আনিয়া উপস্থিত করিল যে সেখানকার শীতে প্রাণ বাঁচানই একরূপ দুঃসাধ্য। পরিধানে সেই রাত্রি-বসনটি মাত্র, আর কিছুই নাই। উদরে ক্ষুধার জ্বালা আর বাহিরের শীতে সারা অঙ্গ জ্বলিতেছে। দুগ্ধফেণনিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া যে বালিকা ঘুমাইত, নানাবিধ সুস্বাদু, সুপেয় খাদ্য পানীয় ছিল যাহার আহার, তাহার দুরবস্থা দেখ একবার। এলিসের চোখের জল শুকায় না, দিন রাত দু'টি চক্ষে সহস্র ধারা বহে!

এইস্থানের নাম থাঁকি উপত্যকা, থাঁকি বাজার হইতে ছয়মাইল দূরে অবস্থিত। এইখানেই কুমারী এলিসকে একব্যক্তির বাড়ীতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল,

সেই ব্যক্তির নাম—সুলতান মীর। সে, খাঁকি উপত্যকার সর্দ্দার এবং যে দস্যুদল কুমারীকে চুরি করিয়া আনে, সেই দলের দলপতির একজন বন্ধু। কুমারী এই দস্যুদলপতির গৃহে আবদ্ধ রহিলেন।

দস্যুরা কুমারীকে লইয়া কি করিত বলা যায় না, ভগবান তাঁহার উদ্ধার সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীমতী ষ্টার নাম্নী এক হাঁসপাতালের নার্সকে দিয়া তিনি কুমারীর উদ্ধার সাধন করিলেন। কি উপায়ে ও কেমন করিয়া শ্রীমতী ষ্টার কুমারী এলিসকে দস্যুদলের কবল হইতে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমতীর লিখিত এই পত্রখানি পড়িলেই তোমরা জানিতে পারিবে।

শ্রীমতী ষ্টার লিখিতেছেন,—গত ১৯শে এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে হাসপাতালের রোগীদিগের পরিচর্য্যা করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট হাউসের এক দূত আসিয়া আমাকে এক পত্র দিল। পত্র লিখিতেছেন, সার জন ম্যাফী। তিনি আমাকে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। দূত আমার জন্য মোটর আনিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলাম। আমি যে হাসপাতালের কর্ত্তৃত্ব করিতাম, সেখানকার অনেক রোগী গত দুদিনের মধ্যেই হাসপাতাল ছাড়িয়া নিঃশব্দে পলায়ন করিয়াছিল। তাহাদের বোধ হয় ভয় হইয়াছিল যে কোহাটে দস্যুদের উৎপাত লইয়া একটা বিষম হাঙ্গামা বাধিবে; তাহাদের হয়ত টান পাড়বে, তাই তাহারা কাহাকে কিছু না বলিয়াই চম্পট দিয়াছিল।

সার জন আমাকে কুমারীর অনুসন্ধান করিতে বলেন। তিনি আরও বলেন ইংরেজ শিবিরে যে সেনাদল নাই, অথবা তাঁহারা রাজ কর্ম্মচারীদের নিযুক্ত করিতে পারেন না এমন নয়, কিন্তু তাঁহাদের সেরূপ না করার প্রধান কারণ, দস্যুরা কুমারীকে হত্যা করিয়া বসিবে। কিম্বা এমন কোন স্থানে লুকাইয়া

রাখিবে যে কিছুতেই আর তাহার সন্ধান মিলিবে না। সার জন বলেন, একাজ যে খুব শক্ত তাহা তিনি জানেন, কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তিনি আমাকে কুমারীর অনুসন্ধানে পাঠাইতে চান।

আমিও তথাস্তু বলিয়া আসিলাম।

পরদিন ৮টার পর আমি কুমারী এলিসের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। কোথায় যাইব জানি না, কি করিব তাহাও একরূপ অজ্ঞাত, তবু মনে কত আশা কত উদ্যম! মোটরে করিয়া নব্বই মাইল রাস্তা পাঁচঘণ্টায় চলিয়া আমরা শিন্‌উরীতে পৌঁছিলাম। এখানে আমাকে পুরুষবেশ ধারণ করিতে হয়। কারণ আমি ইহা ঠিক বুঝিয়াছিলাম যে মাথায় টুপি দেখিলে ইংরাজ সন্দেহে কেহ গুলি লাগাইলেও লাগাইতে পারে। এখানকার লোক দেখিলাম সকলেই খুব লম্বা চৌড়া, বেশীর ভাগ লোকেরই দাড়ি আছে, কোমরে তাহাদের টোটা ও ব্যাগ কাঁধে বন্দুক। বন্দুকগুলিকে তাহারা এমন ভাবে নাড়াচাড়া করিতেছিল যে আমার মনে হইল, ছেলেরা কাঠের খেলনাকে নিয়া অমনি ভাবে নাড়াচাড়া করে। আমি সঙ্গে করিয়া দুইটি আফ্রিদীরমণীর পোষাক আনিয়াছিলাম, নিজে একটি পরিব, কুমারীকে পাই যদি, তাহাকেও একটী পরাইব।

খাঁকিতে মোল্লা আকুদ জাদার বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তখন বহুলোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—সে আমাকে কিছুতেই বাড়িতে ঢুকিতে দিবেনা। তারপর কি জানি কেন, খুব খাতির করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া, বসাইল। মোল্লা আমাকে বলে, ইংরাজ তাহার চারজন লোককে আটক করিয়া রাখিয়াছে ও পঞ্চাশ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছে, যদি সেই লোকচতুষ্টয়কে ছাড়িয়া ও টাকা ফিরাইয়া দেয় তবেই সে কুমারীকে ছাড়িয়া দিতে পারে।

শুনিলাম, কুমারী আজবখাঁ নামে একটা লোকের বাড়ীতে বন্দিনী অবস্থায়

আছে। রাত্রে মোল্লা কুমারীকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। রাত যখন তিনটা, খবর পাইলাম, এলিস্ আসিয়াছে। আমি এলিসের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সে তখন একটা খাটে শুইয়াছিল, তাহাকে ভারি দুর্ব্বল দেখাইল। তবে সে প্রথমেই জানাইয়াছিল, তাহার উপর কোনো দুর্ব্ব্যবহার করা হয় নাই।

আজব খাঁকেও দেখিলাম। তার চেহারা ভীষণ কালো, এত কালো রঙ যে পাঠানের হয়, তা জানিতাম না; খুব লম্বা দাড়ী। লোকটা নেহাৎ অভদ্র নয়, আমরা তাহার সঙ্গে এক যায়গায় বসিয়া চা'ও খাইয়াছিলাম।

পরদিন বৈকালে আজব খাঁর ভাই আমার কাছে আসিয়া বলিল যে লস্করেরা এই বাড়ী আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আমি যদি তাহাদের ফিরিয়া যাইতে না বলি ত তাহারা আমাদের খুন করিবে। লোকটার সঙ্গে আমার খুব একচোট বচসা হইয়া গেল, বুঝিলাম সে আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে।

মোল্লার বড় ভাই পায়ের গাঁটের ব্যথায় বড়ই কষ্ট পাইতেছিল, শুনিয়া তাহাকে দেখিতে গেলাম। আমার সঙ্গে সামান্য কিছু-কিছু ঔষধ ছিল, লোকটার চিকিৎসা-ও করিলাম। লোকটা তাহার পরিবারের আরও কয়েকটি বালক বালিকা ও পীড়িতা স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করিতে বলিল। মোল্লার দাদা আমার হাতে একখানা দশটাকার নোট দিয়া বলিল, আমি আবার যেন কিছু ঔষধ লইয়া আসি। আমি যদি তাহাদের ওখানে থাকি তাহারা আমার যত্নের ক্রুটী করিবে না।

মোল্লা এলিসকে তুরস্কের মুদ্রা দ্বারা প্রস্তুত একটি সোণার হার উপহার দিয়াছিল। এলিসকে বুকে করিয়া আমি যখন মোটরে চড়িলাম, আমার কণ্ঠের মধ্যে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই নাম ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল যাঁহার দয়ায় অপহৃতা বালিকার উদ্ধার সাধন আমার মত এক নগন্যা রমণীর দ্বারা সাধিত হইতে পারিয়াছিল।

* * * * শ্রীমতি ষ্টারের সাহসিকতায়, বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া মহামান্য ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় একটি স্বর্ণ পদক ও কাইজরী-হিন্দ্ উপাধি উপহার প্রদান করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর কুলী খাঁ ও মোগলরাজ খাঁও এই অসমসাহসিক কার্য্যে শ্রীমতী ষ্টারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহারা না থাকিলে কুমারী কোন দিনই দস্যুর কবল হইতে মুক্তি পাইতেন কি-না সন্দেহ! তবে তাঁহারা পদক-উপাধি কিছুই পান্ নাই বটে, না পান্, ক্ষতি নাই, ঈশ্বর তাঁহাদের পুরস্কৃত করিবেন ইহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

---

## অনুতপ্ত।

( Count Leo Tolstoi এর The Penitent Sinner অবলম্বনে )

সারাজীবন পাপ করার পর সত্তর বৎসর বয়সের সময় যেদিন যমরাজের কাছ থেকে তার তলব এল সে দিন প্রথম সে অতীত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখল আজন্মের সঞ্চয় তার পূঞ্জীভূত পাপরাশী। অনুশোচনায় তার অন্তর ভরে উঠল। কিন্তু আর ত সময় নাই যে নূতন করে জীবন যাত্রা সুরু করবে। বৃদ্ধ সাশ্রু নয়নে ভগবানের চরণে নিজের আবেদন জানাল, "ওগো প্রভু দয়াময়! দয়ার তোমার অন্ত নাই। জীবনে তোমায় ডাকি নাই বলে যেন মৃত্যুতেও তোমার করুণার কণা হতে বঞ্চিত না হই নাথ।"

যতই পাপ করুক সে, ভগবানের অসীম করুণায় তার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তাই মৃত্যুর পরে সে স্বর্গের দ্বারেই উপস্থিত হল।

দ্বার রুদ্ধ; বৃদ্ধ রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করায় ভিতর হতে প্রশ্ন হল "কে তুমি স্বর্গের দ্বারে ঘা দিচ্ছ? মর্ত্তে তুমি কি কি কাজ করেছ?"

বৃদ্ধ একে একে অনুষ্ঠিত পাপকার্য্যের বর্ণনা করল—কিন্তু সৎকার্য্যের যে তার এতটুকুও পুঁজি নাই!

উত্তর এল, "স্বর্গরাজ্যে পাপীর স্থান নাই!"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করল, "কে তুমি দ্বারী? কি নিষ্ঠুর তোমার আদেশ!"

"আমি বাল্মীকি।"

মহর্ষি "বাল্মীকি!—ঋষিবর! সর্ব্বদর্শী! তোমার অবিদিত নয় মানুষ কভ দুর্ব্বল, কত তার ভুল ভ্রান্তি, আর ভগবান কি অসীম করুণাময়! সর্ব্বজীবে তাঁর করুণা প্রসারিত। আমিই কি পাপী বলে তাঁর কৃপার কণা হতে বঞ্চিত থাকব! মহর্ষি, অজ্ঞান মানবের অপরাধ ক্ষমা কর। আমায় স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার দাও।"

দ্বারীর সেই একই উত্তর—স্বর্গরাজ্যে পাপীর স্থান নাই।

বৃদ্ধ বলল, "স্মরণ কর ঋষিবর, তোমারই অতীত জীবনের কথা! কত অগণিত নিরীহ নরনারীর শোণিতে তোমার হাত দুখানি রঞ্জিত করেছিলে। কে তোমার সে কলঙ্ক চিহ্ন ধৌত করে দিয়েছিল? কে তোমাকে মহর্ষির আসনে বসায়েছে?"

দ্বারী নীরব।

কিছু কাল অপেক্ষা করে বৃদ্ধ আবার দ্বারে আঘাত করল। আবার প্রশ্ন হ'ল 'কে তুমি স্বর্গের-দ্বারে ঘা দিচ্ছ? মর্ত্তে কি কি কাজ করেছ?'

বৃদ্ধ আবার অনুষ্ঠিত পাপকার্য্য বর্ণনা করল।

আবার উত্তর এল "স্বর্গরাজ্যে পাপীর স্থান নাই।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি বিচারক? কার এ নির্ম্মম আদেশ!"

"আমি অশোক।"

"বৌদ্ধবীর! সুধীশ্রেষ্ঠ! ভগবান কি শুধু পুণ্যাত্মার? তিনি কি পাপীর ত্রাণকর্ত্তা নহেন? আমি পাপীর অধম কিন্তু তিনিও যে করুণার আধার। দুর্ব্বল মানবের প্রতি করুণা কর প্রভু! আমায় স্বর্গসুখ হতে বঞ্চিত কর না।

দ্বারীর সেই একই উত্তর "স্বর্গরাজ্যে পাপীর স্থান নাই।"

বৃদ্ধ বল্‌ল—মহারাজ অশোক! একবার তোমারই অতীত জীবনের কথা স্মরণ কর। সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার জন্য তুমি কি পাপকার্য্যেরই না অনুষ্ঠান করেছ। তার পর একটা উদ্দাম উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় কলিঙ্গ জয় কালীন সে কি নিষ্ঠুরতার অভিনয়!"

দ্বারী নীরব।

কিছুকাল অপেক্ষা করে বৃদ্ধ তৃতীয়বার দ্বারে আঘাত করল। আবার সেই একই প্রশ্ন—বৃদ্ধের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্যের পুনর্বর্ণন—সেই একই উত্তর, "স্বর্গরাজ্যে পাপীর স্থান নাই।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কে তুমি পুণ্যবান? করুণায় আদ্র তোমার কণ্ঠস্বর, কিন্তু কি কঠিন তোমার বিচার।"

"আমি চৈতন্য।"

বৃদ্ধ আনন্দোৎফুল্ল হয়ে বলল, "মহাপ্রভু! প্রেমের অবতার। বাল্মীকি ও অশোক আমায় নিরাশ করতে পারেন, কিন্তু তুমিত আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না, দয়াল! বাল্মীকি ও অশোক জানেন মানুষ কত দুর্ব্বল ও ভগবান কি অসীম করুণার সাগর, তাই আমিও তাঁদের কাছ করুণা ভিক্ষা করেছিলাম। তাঁরা আমায় নিরাশ করেছেন। কিন্তু প্রভু প্রেমেই যে তোমার প্রাণ, তোমার প্রেমের ছবি যে পুণ্যাত্মায় ও পাপীতে প্রভেদ জানে না। মর্ত্তে তুমি প্রচার

করেছ, প্রেমের মাহাত্ম্য, জগাই মাধাই ঘোর পাপী তোমার প্রেমের কণা পেয়ে মুক্ত হয়েছে। তুমি আমায় কেমন করে বঞ্চিত করবে প্রভু ?”

স্বর্গের দ্বার মুক্ত হল। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস গুপ্ত।

---

# সারা-সেতু।

গৌরীনদী থেকে আমাদের নৌকা যখন পদ্মার বুকে পৌছল তখন রোদের ঝাঁজ খুব বেড়ে উঠেছে। জোর হাওয়ায় মাঝে মাঝে নৌকা দোল খাচ্ছে, পদ্মার ঢেউ উঠ্‌ছে—আমরা কলকাতার ছেলে, গোলমাল করে মাঝিদের অস্থির ক'রে তুলচি! তারা বল্‌ছে—চুপ ক'রে বসুন বাবুরা, ডোববার ভয় নেই। সে কথা কে শোনে? আমরা বলি গোলদীঘি একবার পার হ'তে পারি, এই হল আমাদের সাঁতারের দৌড়। এখন এইখানে তোমার নৌকাটা যদি টুপ্‌ ক'রে উল্টে যায়, তাহলে

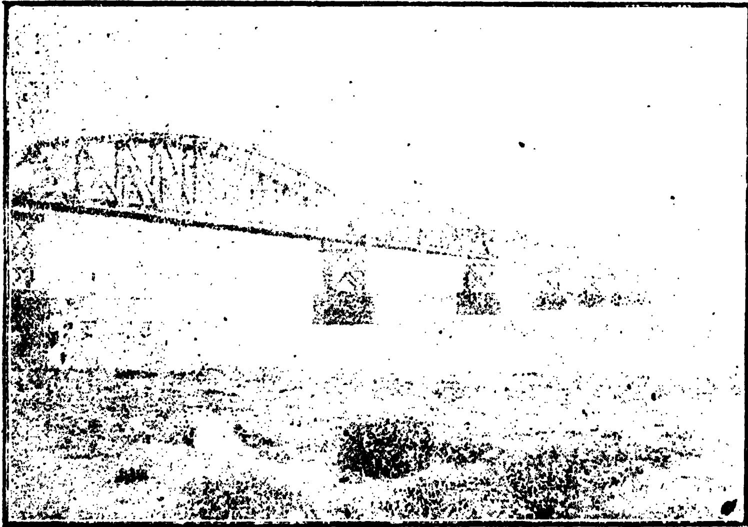
একূলে ওকূলে দুকূলে গোকুলে
কে আর আমার আছে!

জবাব না দিয়ে তারা আপনার মনে নৌকা বেয়ে চলেছে। তীরে ছোট ছোট গ্রাম, ঘন গাছপালা, সবুজ মাঠ; মাথার ওপর নীল আকাশ, নিচে নীল জল। অনেক দূরে ভারতের অদ্বিতীয় সেতু “সারা ব্রীজে”র পনেরটা খিলান বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বারোটা বাজার পর নৌকা এসে পাক্‌শির ঘাটে এসে লাগলো, তখন একখানি ট্রেণ আস্তে আস্তে সারার পোল পার হচ্ছে। গাড়ীশুদ্ধ মেয়ে-পুরুষ আশ্চর্য্য

হয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখচে। সাহেবেরা কামরার দরজা খুলে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ঘড়িটা হাতে ক'রে নিয়ে ঠিক করে নিচ্ছে—পার হতে কতক্ষণ লাগে!

দেখবার জিনিষ বটে! শোণ, মহানদী গোদাবরীর পোল দেখেছি, সারা ব্রীজের কাছে সে সব কিছুই নয়। সে সব নদীতে বর্ষা ছাড়া অন্যসময়ে ধূ ধূ করছে বালি, কিন্তু সারার নীচে সব ঋতুতেই গভীর জল। বড় বড় কড়ি দিয়ে সে যে কি বিরাট ব্যাপার একটা করে তুলেছে তা না দেখলে বোঝবার যো নেই। ব্রীজের একপাশ দিয়ে রেলিংঘেরা রাস্তা গেছে, সেখান দিয়ে হেঁটে এপার-ওপার করা যায়। সমস্ত ব্রীজটা লম্বা তিন মাইল। পাছে কোনরকমে গাড়ীর চাকা পিছ্‌লে যায় এইজন্যে প্রত্যেক লাইন ডবল ক'রে দেওয়া হয়েছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দেখলে এমন



সারা সেতু।

একটা বৃহৎ জিনিষ কেমন বিচিত্র দেখায়, পাশের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

একদিন যখন এই গঙ্গার ওপরেই হুগলীর কাছে জুবিলী ব্রীজ হয়েছিল, তখন দেশে কি হুলুস্থূলই না প'ড়ে গেছল। তার চেয়ে এত বড় একটা পোল যে সেই গঙ্গারই রূপান্তর পদ্মার বুকে কেউ কোনদিন বাঁধতে পারবে এমন ধারণাকেই লোকে স্বপ্ন মনে করত! দুবার ভেঙ্গে গিয়ে তিনবারের বার পোলটা তৈরী হয়।



লাইন ডবল করে' দেওয়া হইয়াছে।

আগে দার্জ্জিলিং যাবার পথে দামুকাদিয়ার ঘাটে ওঠানামা কি কষ্টের ছিল, তোমাদের অভিভাবকদের অনেকের মনে পড়বে। আজ সুবিধে অনেক হয়েছে বটে, কিন্তু পোল পার হবার মাশুলটি টিকিটের সঙ্গে এখনও ধ'রে নেওয়া হয়।

কলকাতা থেকে ট্রেণ এসে এপারে দাঁড়াল—পাক্‌শি ষ্টেশনে। ষ্টেশনের প্লাটফরম নদী থেকে অনেক উঁচুতে। নীচে সবুজ গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে লাল রাস্তা কতদূর চলে গেছে। ওধারে পদ্মার জল একখানা আর্শির মতন চক্‌চক্ করছে।

ট্রেণ থেকে সারা ব্রীজের কারুকার্য্য দেখবার সুবিধে হয় না। আবার অনেক গাড়ী আছে যা রাত্রের অন্ধকারে সারা পার হ'য়ে যায়। এজন্য দিনের বেলা এসে পাক্‌শি ষ্টেশনে নাম্‌লে সারা ব্রীজ ঘুরে ঘুরে দেখবার বেশ সুযোগ হয়।

আধমাইলের মধ্যে একটা বাজার আছে। দেখলুম সেখানকার দোকান-দারেরা অতিথিসৎকার সম্বন্ধে খুবই ভদ্র।

সারার নাম—"হার্ডিঞ্জ ব্রীজ"। দেশের লোকে যাঁকে ভালবাসে, এমনি একজন লাটের স্মৃতির সঙ্গে এমন একটি সুন্দর জিনিষের নাম জড়ান রয়েছে।

বিকেল বেলা যখন ফটো তোলা শেষ হলো, তখন পদ্মার কোলে মেঘ উঠেচে। সকলে বল্‌লে এই কালবোশেকীর দিনে অবেলায় আমাদের মতন আনাড়িদের জলপথে যাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

কাজেই ট্রেণে চড়ে আমরা কুষ্টিয়ায় ফিরে এলুম।

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

---



“জল ?—কৈ [illegible] !”

[illegible]

# টাকার তোড়া।

মাণিকচাঁদ ও পদ্মলোচন উভয়ের মধ্যে বড়ই ভাব, পদ্মলোচন বড়ই অর্থলোভী, তাহার বিস্তর টাকা পয়সা, তথাপি টাকার লোভ সহজে সংবরণ করিতে পারে না। মাণিকচাঁদ তেমন ধনী না হইলেও অন্যায় ভাবে টাকা পয়সা উপার্জ্জন করিতে সে ভালবাসে না।

একদা মাণিকচাঁদ কোনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে মনস্থ করিল, কিন্তু তাহার নিকট ১০০ একশত স্বর্ণমুদ্রা ছিল, সে তাহা লইয়া যাইতে চাহিল না, কোথাও রাখিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। মাণিকচাঁদ তাহার বন্ধু পদ্মলোচনের নিকট স্বর্ণমুদ্রাগুলি গচ্ছিত রাখিয়া যাইতে চাহিল, পদ্মলোচনও তাহা রাখিতে রাজী হইল। মাণিকচাঁদ একটী তোড়ার মধ্যে ঐ একশত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া তোড়ার মুখ বন্ধ করিয়া তোড়ার গায়ে বড় বড় অক্ষরে—'একশত স্বর্ণমুদ্রা' লিখিয়া এবং মাণিকচাঁদের নাম দস্তখত করিয়া পদ্মলোচনের নিকট রাখিয়া গেল, পদ্মলোচনকে মাণিকচাঁদ খুব বিশ্বাস করিত এজন্য পদ্মলোচনের নিকট হইতে কোন রসিদ লইল না। স্বর্ণমুদ্রার তোড়াটী রাখিয়া মাণিকচাঁদ দেশান্তরে চলিয়া গেল।

পদ্মলোচনের স্ত্রী মাণিকচাঁদের এই প্রকার বিশ্বাস দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, এদিকে পদ্মলোচন টাকার তোড়াটী তাহার সিন্দুকে রাখিয়া দিল। প্রায় এক বৎসর পরে মাণিকচাঁদ গৃহে ফিরিল বাড়ী আসিয়া পদ্মলোচনের সহিত দেখা করিয়া টাকার তোড়াটী চাহিল, মাণিকচাঁদের কথা শুনিয়া পদ্মলোচন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল "সে কি মাণিক, তোমার টাকা ত আমি রাখি নাই, আমার নিকট রাখিতে আসিয়াছিল। কিন্তু আমিও তাহা তখনই তোমাকে ফিরাইয়া

দিয়াছি, আমার কাছে রাখিয়া যাও নাই।" এই কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ যারপরনাই মর্ম্মাহত হইল এবং পদ্মলোচনের স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল "পদ্মলোচন যাহা বলে তুমিও কি তাহাই বলিতে চাও?" পদ্মলোচনের স্ত্রী বলিল "আমি আর বেশী কি বলিব, আমার স্বামী মিথ্যা কথা বলে না।"

এই কথা শুনিয়া মাণিকচাঁদ মনে মনে ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গেল এবং ইহার কোন প্রতিবিধান করিবার ব্যবস্থা বাহির করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মাণিকচাঁদ একজন জজের নিকট যাইয়া সমুদয় ব্যাপার বর্ণনা করিল. জজ ব্যাপার শুনিয়া মাণিকচাঁদকে তাহার বাসায় গোপনে লুক্কায়িত থাকিতে বলিয়া একজন লোক পদ্মলোচনের নিকট প্রেরণ করিলেন, লোকটীর সঙ্গে পদ্মলোচনকে তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়া দিলেন, পদ্মলোচন পত্র পাইয়া জজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

জজ পদ্মলোচনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুদিন পূর্ব্বে আপনার বন্ধু মাণিকচাঁদ আপনার নিকট একশত স্বর্ণমুদ্রা রাখিয়া স্থানান্তর গিয়াছিল। এখন আপনি তাহাকে সেই টাকার তোড়াটী প্রত্যর্পণ করিতেছেন না, আপনি এখন সেই টাকার কথা অস্বীকার করেন, এই মর্ম্মে আপনার বিরুদ্ধে আমার নিকট অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে—আপনার বক্তব্য কি বলুন।" পদ্মলোচন উত্তর করিল "আমি মাণিকচাঁদের টাকা রাখি নাই, সে আমার নিকট রাখিতে আসিয়াছিল, আমি তাহা রাখি নাই।"

জজ বলিলেন "ভাল আমি মনে করি আপনি নির্দ্দোষ কিন্তু আমার মনের সন্দেহ দূরীকরণার্থে আপনাকে একটী কাজ করিতে হইবে, আমি যাহা বলিতেছি আপনি সেই ভাবে আপনার স্ত্রীর নিকট একখানা পত্র লিখুন।" পদ্মলোচন বিস্ময় সহকারে বলিল "সে, কি আমার স্ত্রীর নিকট আমি নিজে যাইয়াইত যাহা

করিতে হয় করিয়া আসিতে পারি, পত্র লিখিতে হইবে কেন?" জজ বলিলেন মহাশয় আমার বুদ্ধি আপনার চেয়ে কম নয়, আপনি লিখুন, অনেক অনুরোধের পর পদ্মলোচন পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল, জজ বলিয়া দিতে লাগিলেন !—

"যে একশত স্বর্ণমুদ্রার তোড়াটী আমার সিন্ধুকে আছে আমি এখন স্থির করিয়াছি তাহা দান করিব। এই লোক সঙ্গে পাঠাইয়া দিবা, ইতি—শ্রীপদ্মলোচন !"

পত্রখানা লিখিয়াই পদ্মলোচন গৃহ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল এমন সময় জজ খুব কর্কশস্বরে বলিলেন "মহাশয় বসুন, এই পত্রখানা লইয়া এই লোকটী আপনার স্ত্রীর নিকট যাইবে, সেখান হইতে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এইখানে অপেক্ষা করুন।" এই বলিয়া ভৃত্যদ্বারা পত্রখানা পদ্মলোচনের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই পত্রবাহক একতোড়া সোনার মোহর হাতে করিয়া আসিল এবং তোড়াটী জজের হাতে দিল, জজ তোড়ার গায়ে লেখা দেখিলেন 'একশত স্বর্ণমুদ্রা' এবং মাণিকচাঁদের দস্তখত ও দেখিলেন, তখন তোড়াটী খুলিয়া গণনা করিয়া দেখিলেন উহার ভিতর ঠিক একশত মোহরই রহিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া পদ্মলোচন জজের পদতলে লুটাইয়া পড়িল, এবং অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল, তখন জজ মাণিকচাঁদকে ডাকিয়া বাহিরে আনিলেন এবং পদ্মলোচনকে বলিলেন "আমার নিকট ক্ষমা চাহিবেন না, ইহার নিকট ( মাণিককে দেখাইয়া ) ক্ষমা চাহিতে পারেন।

তখন সরল হৃদয় মাণিকচাঁদ বলিল "মহাশয় আমার বিশ্বাস পদ্মলোচনের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে আর ক্ষমা চাহিতে হইবে না।" কিন্তু জজ বলিলেন "এই প্রকার লোকের শিক্ষা সহজে হয় না। তবে আপনি যদি ছাড়িয়া দিতে

বলেন ত আমি ইহাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।" মাণিকচাঁদও বন্ধুর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জজকে বলিলেন।

জজ একশত মোহর গণিয়া মাণিকচাঁদের হাতে দিলেন এবং পদ্মলোচনকে ক্ষমা করিয়া মুক্তিদান করিলেন। তিনি মাণিকচাঁদকে বলিয়া দিলেন যেন আর ভবিষ্যতে কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া বিনা রসিদে টাকা পয়সা না দেন।

মাণিকচাঁদ টাকা নিয়া বাড়ী ফিরিল, পদ্মলোচনের সহিত বন্ধুত্ব সেইদিন হইতে তাহার শিথিল হইয়া গেল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

## ফরাসী বিপ্লব।

ইংরাজী ১৪ই জুলাই ফরাসী দেশে আমোদের অফুরন্ত ফোয়ারা প্রবাহিত হয়। ঐ দিনটী ফরাসী জাতীর বড়ই আদরের, তাহাদের ইতিহাসে বড়ই সুপ্রসিদ্ধ। কেন জান? ঐ দিনে ফরাসী প্রজাদের রাজার অধীনতা পাশ ছেদন করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা প্রথম সফলতা লাভ করে। কাজেই সেই নূতন যুগের আরম্ভের দিনকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাহারা ঐ দিন প্রতি বৎসরই আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়! আমেরিকা ও ইটালী দেশেরও ৪ঠা জুলাই তারিখ এইরূপ স্মরণীয় দিন।

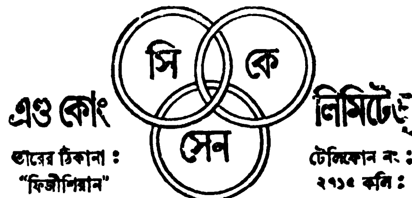
নিজের দেশে স্বজাতীয় রাজা পাইয়াও ফরাসী দেশ কেন এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়া এমন মহামারি কাণ্ড বাধাইল তাহা ভাবিলে আমরা হয়ত আশ্চর্য্য হইয়া যাইব। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যের সহ্য শক্তির একটা সীমা আছে। সেই



# ইস, বাবা কি দুষ্টু—

কী ভীষণ দুষ্টু বল' দেখি, আমার জন্য 'জবাকুসুম' এনে বলেছেন কি না আনি নি! আমি বুঝি তোমার দুষ্টুমি ধরতে পারি নি, না? 'জবাকুসুম' তেল মেখে নাইতে হাঁ—ঃ—ঃ—ঃ আমার যে কী ভাল লাগে বল্‌তে পারি না!

তোমাদের বলা রইল, যদি তোমাদের বাবা 'জবাকুসুম' তেল না এনে দেন, আমাদের চিঠিতে লিখো—নইলে ভাল হবে না কিন্তু—




২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সীমা অতিক্রম করিলেই মন আপনা হইতেই বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তখন তাহাকে থামাইয়া রাখা সহজ নয়। এই ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হইয়াছিল। প্রজারা যখন সহ্য শক্তি হারাইল তখন তাহারা কাণ্ডজ্ঞানহীন পাগল হইল।

তখন রাজা ষোড়শ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি অত্যন্ত অল্প বয়স্ক ছিলেন। কাজেই রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলায় করিতে পারিতেন না। তাহার উপর কয়েক জন দুষ্ট ব্যক্তির পরামর্শে চলিতেন বলিয়া তাহারা তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করাইয়া লইত। কাজেই প্রজারা মহা অশান্তিতে থাকিতেন।

ফ্রান্সে তখন দুইটী দল ছিল। একদল 'রাজার দল' নামে পরিচিত, অন্য একদল 'জন সাধারণের দল' নামে পরিচিত। এই দুই দলের ব্যবহার ছিল ভৃত্য ও প্রভুর। যাহারা ধনী, সুতরাং বংশে বড় তাহারা 'রাজার দলে' স্থান পাইত। তাহারা সাধারণ প্রজাবর্গকে দিয়া বেগার খাটাইয়া লইত, তাহারা গরীব, কাজেই হীনবংশ বলিয়া ঘৃণা করিত—তাহাদের উপর অযথা অত্যাচার করিত—যেন তাহারা এ পৃথিবীতে আসিয়াছে ধনীলোকদের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই সব কারণে জনসাধারণের 'রাজার দলের' প্রতি মনের ভাব বড় ভাল ছিল না। তার উপর সময়ে অসময়ে, কারণে বিনা কারণে তাহাদের উপরই কর স্থাপন করা হইত—ধনীরা রাজার দলের লোকেরা তাহা হ..তে অব্যাহতি পাইতেন। তাহারা দিব্য আরামে থাকিতেন—আর প্রজা সাধারণ. ভয়ানক কষ্ট ভোগ করিত—তাহার কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া মনে মনে আগুন হইত। এইরূপে বহুদিন হইতে একটু একটু করিয়া আগুন জ্বলিতে আরম্ভ হইয়াছিল—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তাহা ভীষণ আকার ধারণ

করিয়া সমস্ত ফ্রান্সে ছড়াইয়া পড়িল। সেই আগুনে রাজবংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল।

একে ত জন সাধারণ এইরূপ করভাবে, অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, শিলা বৃষ্টিতে সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া গেল। আর দুইদিন পরেই শস্য কাটা হইয়া ঘরে উঠিত কিন্তু ভগবান সেই 'পাকা ধানে মই' দিলেন—জনসাধারণের দুর্দ্দশার একশেষ হইল। লোকে না খাইয়া মরিতে লাগিল—চতুর্দ্দিকে একটা হাহাকার উঠিল। কিন্তু ধনীদের গৃহে পূর্ব্বের মতই আমোদ প্রমোদ চলিতে লাগিল—তাহারা একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না। এ দিকে রাজকোষে এক পয়সাও নাই—কাজেই রাজা দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। দলে দলে ক্ষুধিত লোক আসিয়া সহরে জমায়েৎ হইতে লাগিল—আশা ভিক্ষা পাইবে, নচেৎ দস্যুতা ইত্যাদি দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ করিবে। রাজা ও মন্ত্রীরা কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না, রাজ্যে বিশৃঙ্খলার একশেষ হইল। পুনঃ পুনঃ মন্ত্রী পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই শান্তি স্থাপন করা গেল না।

এই সময় দেশে কয়েকজন প্রসিদ্ধ লেখকের আবির্ভাব হয়। তাহারা সকলেই পুস্তকের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা, সমতা ও মিত্রতা বিষয়ে জনসাধারণের অধিকার দেশময় প্রচার করিতে লাগিলেন। সকলেরই মত এই যে পৃথিবীতে সকলেই স্বাধীন, সকলেই সমান, কেহ বড় বা কেহ নীচ নহে। পরের উপর অত্যাচার করিবার কাহারও অধিকার নাই।

একেত দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, ভীষণ অত্যাচার অবিচার—তাহাতে লোকেরা পাগলের মত হইয়া আছে, তাহার উপর আবার লেখকদের এই উত্তেজনাজনক লেখা—এই সব একত্র হইয়া রাজ্যে ঘোরতর অশান্তির সৃষ্টি করিল—লোকেয়া

ভীষণ উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রাজা বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া এক সভা করিবার জন্য মহা ব্যগ হইলেন। সেই ফলে সভা হইল বটে, কিন্তু সভার উদ্দেশ্য মোটেই সফল হইল না—বরঞ্চ তাহাতে ফল বিপরীত হইল। সভায় মতভেদ হওয়ায় "জাতীয় সমিতি" নামে একটী ভিন্নদল হইল। এইদলে বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তি যোগদান করেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া এই দলের সহিত খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করায়, তাহারা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন যে যত দিন পর্য্যন্ত না রাজ্যশাসন বিষয়ে তাহাদের মত নেওয়া হয় তত দিন তাহারা একত্র থাকিয়া এই জন্য প্রাণপণ লড়িবেন। তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। রাজ্যে অশান্তির মাত্রা বাড়িয়াই চলিল।

ইহার পর হইতে নানাস্থানে নানা দল প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল; গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে সভাসমিতি হইতে লাগিল। সকলেরই এক উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা লাভ। সকলেই প্রায় উন্মাদ। রাজাও তাহাদের দমনের জন্য নানাবিধ কঠোর আইন প্রচলিত করিতে লাগিলেন। পরে তিনি এক দরবার আহ্বান করিয়া ঐসব সভার সদস্যদের ও যাহারা জনসাধারণের হইয়া লড়িলেন, তাহাদের অপমান করিলেন। তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে তাহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে এমন সাধ্য কাহারও নাই। এই জোরের কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন ও জনসাধারণকে ভয় দেখাইবার জন্য সুইজারল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণি হইতে সৈন্যদল আনাইয়া রাজধানীর চারিদিকে স্থাপন করিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী তাহার এই কাজে বাধা দেওয়ায় তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে দেশে একটা মহা হৈচৈ পড়িয়া গেল। দলেদলে লোক রাস্তায় বাহির হইয়া

আনন্দে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহাদের উপর গুলি চালান হয়। একজন জার্ম্মাণ সৈন্যের গুলিতে একজন ফরাসী-সৈন্য মারা গেল। ইহাতেই বিপ্লবের আরম্ভ হইল। এই ব্যাপারে রাজা বিদেশীয় সৈন্য আনাইয়া ফরাসী প্রজাদের দমন করিতে উদ্যত হইয়াছেন বলিয়া জনসাধারণের মনে ধারণা হইল। দেশময় এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ বহু ফরাসী সৈন্য আসিয়া এই বিপ্লবে যোগদান করিল। দেশময় এই প্যারিসেই এই বিপ্লবের সূচনা হইল।

ফরাসীরাজ্যে "ব্যাষ্টিল" নামে একটী দুর্গ আছে। তাহা খুব শক্ত ও সহজে অধিকার করা যায় না। উন্মত্ত জনসাধারণের ইহাই হইল প্রথম লক্ষ্য। তাহারা ১৪ই জুলাই তারিখে এই দুর্গ আক্রমন করিয়া অধিকার করেন। রাজা ষোড়শ লুই জনসাধারণের হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন—প্রকারান্তরে সাধারণ-তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন।

এই সংবাদ প্রচার হওয়ামাত্র দেশের চারিদিকে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। দেশের সমস্ত কার্য্যভার তখন মিউনিসিপালিটির হাতে গেল। সর্ব্বত্র জাতীয় প্রহরী নিযুক্ত হইল। ৪ঠা আগষ্ট তারিখে জাতীয় সমিতি সাধারণের স্বত্ত্ব সম্বন্ধে এক ঘোষণা প্রচার করিল যে সকল মানুষই সমান এবং শাসন বিষয়ে সকলেই মত দিতে পারে ও সেই মত অনুসারে কার্য্য হইবে। এই জন্য একটী সভা হইবে ও রাজা সেই সভার সভাপতি হইবেন।

কিন্তু ইহাতেও শান্তি হইল না। পুনরায় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের সাহায্যের প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে কিন্তু রাজভাণ্ডারে অর্থ নাই, সাহায্য করিবেন কোথা হইতে? কাজেই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় রাজধানীতে লুট তরাজ

করিতে লাগিল—দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রবলবেগে চলিতে লাগিল। অনেক রমণীও এই বিপ্লবে যোগদান করিল। রাজা এইসময় 'ভার্সেলিস' নগরে বাস করিতেছিলেন। সেইখানে থাকিয়াই তিনি রাজকার্য্য চালাইতে ছিলেন। এখন জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইল যে তাহারা না খাইয়া মরিতেছে, আর রাজারাণীরা বেশ সুখে কাল কাটাইতেছে। এই সময় তাহারা শুনিল যে সেখানে এক ভোজ হইতেছে। এই সংবাদ শ্রবণে দলেদলে নরনারী ভার্সেলিসের দিকে চলিল। পথে যাহাদের পাইল তাহাদেরই ডাকিয়া লইতে লাগিল। মাথার উপর ভীষণ জলঝড় হইতে লাগিল কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। ভিজিতে ভিজিতে সহস্র সহস্র নরনারী ভার্সেলিসে উপস্থিত হইল—পথে রক্ষীদল তাহাদের বাধা দিতে পারিল না। সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা রাজার বাসস্থান আক্রমণ করিল কিন্তু বাধা পাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল—"আমরা রাজাকে চাই, নচেৎ এখান হইতে এক পাও নড়িব না।"—তাহাদের অবস্থা দেখিয়া রাজা অগত্যা প্রহরীবেষ্টিত হইয়া জনসাধারণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। প্যারিসে আনিয়া তাহাদের এক প্রকার নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। কিন্তু রাজা জাতীয় সৈন্যদের মনোভাব অবগত হইয়া নিরাপদ স্থানে যাইবার জন্য ছদ্মবেশে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ধরা পড়েন। এবার তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া সম্পূর্ণ নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল।

ইহার পর প্যারিসে রাষ্ট্র হইল যে 'বরণস্ উইকের' ডিউক সৈন্য লইয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এই সংবাদে লোকগুলি ক্ষেপিয়া গিয়া যাহারা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল ও রাজার পক্ষে সাহায্য করিবার জন্য যাহারা বন্দী ছিল, তাহাদের একে একে হত্যা করিতে লাগিল।

গ্রামে গ্রামে পথে পথে রক্তের স্রোত বহিল। একদিনে এক হাজার পঁচাশি জন লোক হত হইল। এই সময়ই যুবরাজের পত্নী হত হন। তাহাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে ও অমানুষের মত হত্যা করা হয়। জাতীয়দলের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আদেশ উচ্চারণ করামাত্র সকলে তাহাকে রাস্তা দিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যায়। রাস্তার সেই রক্ত ও মৃতদেহ দেখিয়া তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতে আরম্ভ করেন শেষে যখন তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইলেন, আর চলিতে পারেন না, তখন তাহার মস্তক ও হস্তপদ ছেদন করা হয়। তারপর সেই ছিন্নমুণ্ড বর্ষার মাথায় বিদ্ধ করিয়া উন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহা রাণীকে দেখাইতে চলিল। অসহায় স্ত্রীলোকের উপর এই অত্যাচার করায় ফরাসীর ইতিহাসে মহাকলঙ্ক রহিয়া গিয়াছে।

প্যারিসে আসিয়া রাজা প্রথম প্রথম কিছু কিছু অধিকার পাইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহার সে ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইতে থাকে ও ১৭৯২খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে তাহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পায় ও প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়।

এইবার রাজার পালা। তাহার নামে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্য অভিযোগ আনয়ন করা হইল—তিনি বন্দী হইলেন। অবশেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারীর বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি স্ত্রী পুত্রের সহিত শেষ দেখা করিতে চাহিলেন। অনেক তর্কবিতর্কের পর অল্প সময়ের জন্য তাঁহার শেষ বাসনা মঞ্জুর হইল। তারপর বিদায়দৃশ্য। মনে পড়িলেও চোখে জল আসে। কাজ নাই সে দৃশ্য বর্ণনায়। তারপর রাজাকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া 'গিলোটিন' নামক নূতন যন্ত্রে তাঁহার ফাঁসি দেওয়া হইল। কেহ কেহ সে রক্তের উপর তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল, কেহ সেই

রক্তে রুমাল ভিজাইয়া লইল ও ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিলেন—"জয় ফরাসী সাধারণতন্ত্রের জয়"।

কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া রাণীকে পুত্রকন্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জেলে বন্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহার পর জুলাইমাসে তাঁহার বিচার হয় ও ফাঁসির আদেশ হয়। তারপর তাঁহাকে খালি পায়ে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া গিলোটিন যন্ত্রে ফাঁসি দেওয়া হইল। একমাত্র জীবিত ছিলেন রাজকুমার। তাহাকেও কারাগারে বন্দী রাখা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরে আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কি হইল—তাহা ভগবানই জানেন। বংশের একমাত্র বাতি তাহাও চিরদিনের মত নিবিয়া গেল—রাজবংশ নির্ব্বংশ হইল।

এইরূপে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল বটে, কিন্তু এখন গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দেশে বহু দলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা প্রত্যেকেই প্রধান হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে বহু যুদ্ধবিবাদ হইতে লাগিল—বহু লোক হত হইতে লাগিল। এতদিন রাজপক্ষের রক্তে পথ লাল হইয়াছিল, এক্ষণে প্রজাসাধারণের নিজেদের রক্তে পথঘাট লাল হইয়া গেল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তিনবার সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষণে ফ্রান্স তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের অধীন। এই দিকে এই গৃহবিবাদের সময় রাজার ভাই 'প্রভেন্স' নামক প্রদেশে নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন—ইয়োরোপের অন্য সমস্ত রাজারা তাহাকেই রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। আবার রাজার দলে ও প্রজাদের দলে যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে দুই পক্ষে দুই হাজার সাতশত এগার জন লোক গুলি করিয়া মারা হইল, নরহত্যার চুড়ান্ত হইল।

এই বিপ্লবের সহিত একজন বাঙ্গালীর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

তাহার ডাকনাম 'জামর'। তিনি দেশ হইতে অপহৃত হইয়া ফ্রান্সে বিক্রীত হন। তাহার ফরাসী নাম ছিল—লুই বেনেডিক্ট। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই কয়েকটা দলের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন ও কৃতিত্বের সহিত নিজ কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। বাঙ্গালী না পারে কি?

এই সময় মহাবীর নেপোলিয়নের আবির্ভাব হয়। তিনি তাহার শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য ফ্রান্সের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হন ও ইয়োরোপের নানাস্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকেন। এই সময় তিনি শুনিলেন যে অন্যান্য দেশের রাজারা ফ্রান্সকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংবাদে তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে রাজ্যে মহা বিশৃঙ্খলা—প্রজারা শাসনে বড়ই ব্যতিব্যস্ত। তিনি আসিয়া এক নূতন সভা স্থাপন করিয়া, নিজে তাহার পরিচালক হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রান্সের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করা হইল। সম্রাট্ হইয়াই তিনি ইয়োরোপের অন্যান্য বড় বড় রাজাদের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। কিন্তু কয়েক স্থানে হারিয়া গিয়া, ও রুশিয়া দেশ আক্রমণে অসমর্থ হইয়া ভগ্নমনে ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন। এইবার অন্যান্য রাজারা একত্র তাহাকে প্যারিসে ঘেরিয়া ফেলিল—তিনি তাহাদের হাতে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। সমবেত রাজারা রাজার ভাইকেই আবার সিংহাসনে বসাইয়া তাহাকে পুতুলের মত চালাইতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ন যখন শুনিলেন যে তাহার প্রিয় দেশে অন্যদেশের রাজাদের এইরূপ আধিপত্য তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, গোপনে নির্ব্বাসন হইতে পলাইয়া আসিলেন। দেশের জনসাধারণ তাহাকে আবার সম্রাট্পদে বরণ করিয়া লইল। বিনা রক্তপাতেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই ব্যাপারে

ইয়োরোপের অন্য রাজারা ক্ষেপিয়া উঠিল, সকলে এক সঙ্গে নেপোলিয়নকে আক্রমণের জন্য উদ্যত হইল। ইংরাজ ও জর্ম্মণির সম্মিলিত সৈন্যের সহিত 'ওয়াটারলু' যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়ন হারিয়া গিয়া সম্রাটপদ ত্যাগ করিয়া ইংরেজের হাতে ধরা দেন। ইংরেজরা তাঁহাকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী করিয়া রাখে, সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

নোপালিয়নের সম্রাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম সাধারণতন্ত্রের শেষ হয়। মধ্যে অষ্টাদশ লুই, চার্লস ও ফিলিপ রাজত্ব করেন। এই ফিলিপের রাজত্ব সময়েই রাজ্যে আবার বিদ্রোহ হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন গোলযোগ বাধে। রাজা ফিলিপ ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। কয়েকটী দাঙ্গাহাঙ্গামার পর ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রশাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্র। ইহা মাত্র তিন বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র ইহার প্রেসিডেণ্ট বা সভাপতি নিযুক্ত হন। এই সময় রাজ্যশাসন বিষয়ে বহু সংস্কার হয়। কিন্তু সুযোগ বুঝিয়া ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লুই নেপোলিয়ন নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই হইতেই দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের শেষ হইল। তিনি প্রায় ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজা হন। কিন্তু তিনি প্রুসিয়া বা জার্ম্মাণির সঙ্গে যুদ্ধে আত্ম-সমর্পণ করায় রাজধানী প্যারিস অবরোধ করা হইল। সেই সময় কয়েকদিন খুব মারামারি কাটাকাটি হইল। অবশেষে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বহু কষ্টে সন্ধি স্থাপিত হইল। এইবার পূর্ণরূপে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু এসময়েও কয়েকদিন দেশের মধ্যে মারামারি খুনোখুনির অন্ত ছিল না। এমন কি এক সপ্তাহে একবার ২০।৩০ হাজার নরনারী গুলিতে হত হয়। ফ্রান্সে এখন পূর্ণশান্তি বিরাজমান।

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

# দুষ্ট ছেলে।

সন্ধ্যা না হ'তে হ'তে ছেলেরা এসে উপস্থিত হ'ল। বুড়ো গল্প আরম্ভ করে দিলে :—

"আজ নয় রথ ? দাদাভাই, তোমরা সব রথ দেখতে গেছলে ?

কেউ বল্‌লে—"হাঁ !"

কেউ বল্‌লে—আহা ! রথ কোথায় ? দেখ বুড়ো, ওরা কখনো রথ দেখেনি—তাই বল্‌ছে।

"রথ আবার—কি রকম ?"

"আহা !—সে কেমন কাঠের তৈরী—ঐ তাল গাছের মত উচু—মানুষে টানে আমি হাতীতেও টান্‌তে দেখেছি !

"হাঁ—বুড়ো রথ কিসের তৈরী হয় ?"

বুড়ো ঘাড় নেড়ে বললে—"রথ কাঠের তৈরী হয়, লোহার তৈরী হয়, পেতলে তৈরী হয়,—যার যা ইচ্ছে।

"আমাদের মামার বাড়ীর রথ কত বড় জান বুড়ো ? —সেটা লোহার তৈরী—হাতীতে টানে।

বুড়ো বললে—"এখানেও রথ ছিল, খুব বড় ;—কাঠের তৈরী ?

"কৈ বুড়ো—আমরা ত-কৈ দেখিনি !"

বুড়ো বল্‌লে—না ভাই। সে তোমরা জন্মাবার অনেক আগে, এক বৎসর এই রথের দিনে ঐ-কালী দীঘির জলে নেমে গেছে ! ও ! সে এক গল্প।

"বল না বুড়ো, বল না !"

"বলি শুন—ঐ যে কালদীঘীর ধারে, যেখানটায়—রথ যাত্রার দিন এখনও মেলা বসে, ঐ খানটায় সেই রথখানা থাকতো, সে রথখানা ছিল নয় চুড়া।

"নয় চুড়া,—সে কি রকম ?"

"ওরা জানেনা বুড়ো ! দেখ—সে কেমন মাথায় নয়টা লম্বা লম্বা চুড়ো থাকে।

বুড়ো বল্‌লে—"হাঁ। মাথায় ছোট-ছোট মন্দিরের মত থাকে, তাকে বলে চুড়ো, কালদীঘির ধারে ধারে রথ টানা হত, শ্যাম পুকুরের কোলে গিয়ে রথটা দাঁড়াত। রথটা ছিল বোসেদের। বোসেদের বাড়ীতে একটা ছোট ছেলে, বড় দুষ্ট। লেখা পড়া করতো না, কেবল খেলা নিয়েই থাকতো, বোশেখ জষ্টি মাসে গাছের তলায় তলায় ফিরতো পাখীর ছানা ধরে, বড় দুষ্ট, সেই সব ছানা এনে বলিদান দিয়ে আমোদে নাচতো আর পাখীগুলো চীৎকার কর্‌তে করতে চারদিক্‌ ঘুরে উড়তে থাক্‌তো, বাপ মায়ের ঐ এক ছেলে,—ছেলে বেলা হ'তে আদর পেয়ে,—অত দুষ্ট হ'য়ে পড়ে ছিল, তা—দেবতারা অত সইবেন কেন ?

"যে সব ছেলে দুষ্ট, তাদের কেউই ভাল বাসে না,—দেবতাও না—মানুষও না যে ভাল ছেলে হয় তাকে মানুষেত ভাল বাসেই,—দেবতাও ভাল বাসেন জান্‌লে বিভু ? কিন্তু যে দুষ্ট হয় তাকে কেউ ভাল বাসে না, সকলেই তাকে ঘৃণা করে, সে ছেলে কেবল বাবা মার নাম ডুবায়।"

"সে দুষ্ট ছেলের—নাম কি ছিল ?"

"তার নাম—ছিল নীলু।"

"কালদীঘির পাড়ে কয়েক ঘর—ডুলের বাস ছিল, ঐ পাড়ায় এক বুড়ী বাস করতো তার দুটী হাঁস ছিল, সেই হাঁস দুটী—ঐ কালদীঘির জলে চরে বেড়াত, দীঘির ধারে ধারে শালুক দলের মাঝ দিয়ে যখন হাঁস দুটো মনের আনন্দে ছুটে-ছুটে খেলা করে বেড়াত; বুড়ী হাতে একটা বাঁশের ছড়ি নিয়ে

পাড়ে বসে বসে তাই দেখতো, কখনো বা হাঁস দুটো ডাক্‌তে ডাক্‌তে মাঝ দীঘিতে ভেসে চলে যেত, ডুব দিত বুড়ী অমনি ডাক্‌তো—"আয়-আয়" হাঁসদুটো তার ডাক শুনে পাখা ঝাড়া দিতে দিতে আবার কিনারায় ফিরে আসতো।

"তার কেউ ছিল না ?"

"ছিল, এক নাতনী ছিল কিন্তু সে কত দিন আর বুড়ীর কাছে থাকবে ? বড় হ'তেই তার বিয়ে হ'য়ে গেল, ওপাড়ার ছিদামের সঙ্গে। ছিদাম তার বৌকে অনেকদিন বুড়ীর কাছে রেখে দিয়েছিল, কিন্তু তার বাবা মা মরে গেলে ; সে তার বৌকে নিয়ে চলে গেল।

"বুড়ী একা পড়ে রইলো ?"

"তা—রহলো বইকি ! ছিদাম অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু কিছুতেই সে তার কুঁড়ে খানি ছেড়ে যেতে চাইলো না, ছিদাম কিন্তু রোজ বুড়ীকে চালডাল তরিতরকারি—যা তার ক্ষেতে হ'ত—দিয়ে যেত।

একদিন ছিদামের বৌএর অসুখ হ'ল, বুড়ো সকালে দীঘির জলে হাঁসদুটোকে ছেড়ে দিয়ে তার নাতনীকে দেখতে গেল, নাতনীর ভারী অসুখ। সমস্তদিন আর আসতে পারলে না। সন্ধ্যের সময় এসে হাঁস আন্‌তে দীঘির ধারে গেল হাঁস পেলে না, চার পাড়ে ডেকে ডেকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো—কোথাও হাঁসের শব্দ তার কাণে পৌছোল না, শেষে একটা ছেলে এক বুড়ীর হাত ধরে বল্‌ল—"হাঁস দেখবি ? আয়,"—হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সে রথতলায়। বুড়ী বল্‌লে—"কৈ ?" ছেলেটা বল্লে—ওই যে তোর হাঁসের পালক পড়ে রয়েছে। নীলু বেগ তোর হাঁস ধরে খেয়েছে।" বুড়ী সেইখানেই শুয়ে পড়লো—আর উঠলো না।

"দুষ্টছেলের এম্‌নি দুষ্টমি! এখন লোকে সন্ধ্যায় পুকুর-পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালে, দেখতে পায়—বুড়ী পাড়ে পাড়ে ঘুরে হাস খুঁজে বেড়াচ্ছে!

"সে দিন রথ, সেদিনও এমনি মেঘ্‌লা মেঘ্‌লা, শুনা গেল—রথ চলেনি, কত লোক কতক্ষণ ধরে টানাটানি করেছে, তবুও একটুকুও নড়াতে পারেনি। হতাশ হ'য়ে সব লোক ফিরে যাচ্ছে, বাজনদারেরা বাজিয়ে বাজিয়ে নাকাল হ'য়ে চুপ করে ঘরে ফিরে গেছে, রথের চূড়ায় একটা হাঁস কোথা হ'তে উড়ে এসে বসেছে, তাকে কত লোক উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে, কিছুতেই ওড়াতে পারেনি।

"কেন?—একটা তীর ছুড়লেই ত মারা যেত।"

"যেত! কিন্তু ওযে জগন্নাথের রথ, যাঁর দয়ায় মানুষ হ'তে সামান্য কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত বেঁচে রয়েছে, তাঁর রথের উপর ওই যে পাখী,—ওকে মারে কার সাধ্য?

"বোস বুড়ো সমস্ত দিন না খেয়ে উপবাস করেছিল—রথ টানা হ'লে তবে জল খাবে;—রথ তলায় পড়ে কাঁদ্‌তে লাগলো, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ, কাঁধে মোটা একগোছা পৈতে, বগলে পুঁথি, গায়ে নামাবলী, এল, বোস বুড়োকে বললে—"তুমি ওঠ, কেঁদনা, রথ চলবে, তোমার নাতি এসে রথ চালালে—রথ চলবে! বোস বুড়ো উঠে আর ব্রাহ্মণকে দেখতে পেল না। তখনি সে নীলুকে ডাক্‌তে পাঠালে।

নীলু এসেই রথে উঠে ঘোড়ায় চড়ে বসলো, মুখে "রথ চালাও" শব্দ, ভারি স্ফূর্ত্তি, আবার ঢ্যাঙ্‌ ঢ্যাঙ্‌ করে রথের কাঁশর বেজে উঠলো। যে কজন লোক তখনও রথ তলায় ছিল, এসে উৎসাহ করে রথের কাছি ধরলে। বোস বুড়ো হাত যোড় করে সামনে রথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিন্তু রথ চল্লো না লোকে কিছুক্ষণ টানাটানি করে কাছি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, নীলু তখনও

"রথ চালাও রথ চালাও" শব্দ করছে, হঠাৎ "গোঁৎ" করে একটা শব্দ উঠ্‌লো। সকলে চেয়ে দেখলে—রথখানা হুড়মুড় করে ঈশান কোণ দিয়ে কালদীঘির জলে নেমে গেল।

"নীলু!"

"নীলু সেই রথেই রয়ে গেল। সে আর জল থেকে উঠতে পারলে না! দুষ্ট ছেলে পাপের শাস্তি পেলে, যেখানটায় রথটা ডুবে গেল, সেখানকার জল আজও বন্ বন্ করে ঘুরে। তোমরা লক্ষ্য করে দেখলেই দেখতে পাবে।

"পুকুরের যে কোণ দিয়ে রথটা নেমে গেছলো এখনও সেই কোণে, প্রতি বৎসর রথযাত্রার দিন সকালে, সুর্য্যের অভ্যুদয়ে একখানা চাকা ভেসে উঠে, সেই চাকায় সিঁদূর দিয়ে আসে, চাকাখানা তখনি সাত পাক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নীচে নেমে যায়। অমনি দীঘির কাল জল একবার তোলপাড় করে উঠে। দূরে কি নিকটে—কি দীঘির জলের তলে, কোথায় ঠিক বলা যায় না, শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠে। তোমরা যদি শুন্‌তে চাও, রথের দিন ভোরে উঠে দীঘির ধারে যেও।

"দেখলে?—দুষ্ট হ'লে, মানুষের ত কথাই নাই, দেবতারও কোপে পড়তে হয়। তোমরা যেন দুষ্ট হ'য়ো না, আজ আর থাক। কাল আবার এস। কাল আরো ভাল গল্প বলবো।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

# সওদাগর-কন্যার গল্প।

## জাপানী-উপকথা।

সহর থেকে দূরে গাছ-পালায় ঘেরা—ছবিটির মত সুন্দর গ্রাম খানি—তার নাম তাই গ্রাম। সেই গ্রামে কিচিজিরো বলে একটি ছেলে থাক্‌ত, বয়স তার আঠারো বছর! যখন তার বাবা মারা গেল, তখন বড় ভাই কিচিসুকি ছাড়া, পৃথিবীতে তার আপনার বল্‌তে কেউ রইল না। কিচিজিরো তার দাদার কাছে থাকে—খায় দায়—বেড়িয়ে বেড়ায়। একদিন হঠাৎ তার মনে হ'ল,—তাইতো এ কি কর্‌ছি; দাদার ঘাড়ের ওপর বসে দিব্বি খাচ্ছি-দাচ্ছি, আর আমার নিজের উপায় কর্‌বার ক্ষমতা নেই! না,—আজ থেকে আমি নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াব।

সেই থেকে কিচিজিরো চাকরীর সন্ধানে ঘুর্‌তে লাগল,—তার দাদাকে জান্‌তে না দিয়ে। একদিন তার কপাল খুলে গেল! মাইদ্‌জারু সহরের সওদাগর হাকিয়োমন, মস্ত বড় লোক—লাখপতি বল্‌লেও হয়;—কিচিজিরো তার চোখে পড়ে গেল। হাকিয়োমন কিচিজিরোকে একটি চাকরী দিল। কিচিসুকি প্রথমে ছোট-ভাইটিকে চাকরী করতে দিতে রাজি হয় নি, কিন্তু পুরুষমানুষের নিজের পায়ের ওপর দাঁড়ানো উচিত বলে বিশেষ কোন আপত্তি কর্‌ল না। এদিকে হাকিয়োমন দিন দিন কিচিজিরোর কাজ কর্ম্মে বেশী করে সন্তুষ্ট হতে লাগ্‌ল! শেষে তাকে এত বেশী বিশ্বাস করে ফেল্‌ল যে, তার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবি পর্য্যন্ত দিয়ে ফেল্‌ল।

হাকিয়োমনের একটি মেয়ে ছিল—বয়স তার ষোলো, আর তার নাম ছিল

ইমাসান্। গায়ের রঙে তার, চোখ মোহিত হয়ে যেত; কুচ্‌কুচে তার কালো চুল, চোখের ভুরু যেন তুলি দিয়ে আঁকা আর তার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীতে বসন্তের হাওয়া বয়ে যেত। ইমাসান যেদিন থেকে কিচিজিরোকে দেখল, সেই দিন থেকে তাকে ভাল বেসে ফেল্‌ল; কিচিজিরোর সঙ্গে দেখা হলেই তাকে হাস্নুহানার গন্ধের চেয়ে মিষ্টি একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা কর্‌ত। কিচিজিরো কিন্তু বুঝ্‌তে পারে নি যে, ইমাসান্ তাকে ভাল বাসে তার সব ব্যবহার সহজ ভাবেই নিতে লাগ্‌ল।

দিন যায়। একবছরের মধ্যেই কিচিজিরো খুব নাম কিনে ফেল্‌ল। হাকিয়োমনও তাকে সকল বিষয়ে কর্ত্তা করে দিল। এর ফল হল বড় খারাপ। হাকিয়োমনের আর কর্ম্মচারীরা কিচিজিরোর সৌভাগ্যে ঈর্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল, আর সব চেয়ে বেশী ঈর্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল, কান্‌সিকি বলে একজন কর্ম্মচারী। কান্‌সিকি বড় খারাপ লোক ছিল, সে শুধু শুধু কিচিজিরোক হিংসা কর্‌ত না;—সে ইমাসানের রূপ দেখে, তাকে বিয়ে কর্‌বার জন্যে পাগল হয়েছিল।

হাকিয়োমন একদিন কিচিজিরোকে বল্‌ল—ওহে তোমাকে একবার বন্দরে যেতে হবে—জাহাজ কেন্‌বার জন্যে। কিচিজিরো সেইদিনই জাহাজ কিন্‌তে বন্দরে রওনা হল। এদিকে কান্‌সিকি—কর্‌ল কি,—সেইদিন সন্ধ্যার সময়, —যখন চারদিক বেশ নির্জ্জন হয়ে এসেছে, সে চুপে চুপে লোহার সিন্দুকের ঘরে ঢুকে পড়্‌ল। তারপর একটা নকল চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলে, তার ভেতর থেকে একটা মোহরের তোড়া বার করে নিয়ে, সিন্দুক বন্ধ করে আস্তে আস্তে সরে পড়্‌ল। দুদিন পরে কিচিজিরো বন্দর থেকে ফিরে এল। এ চুরির বিষয় সে কিছুই জান্‌ল না।

সকাল বেলা। সওদাগরের কর্ম্মচারীরা সব কাজ কর্‌ছে, এমন সময়ে

হাকিয়োমন এসে বল্‌ল,—কিচিজিরো সিন্দুকে তিনটে মোহরের তোড়া আছে, বার করে দাও তো! কিচিজিরো তখনি উঠে গিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলল। মোহরের তোড়া বার করবার জন্যে হাত বাড়িয়েই, সে চমকে হাত গুটিয়ে নিল; তিনটে তোড়ার জায়গায় দুটো রয়েছে! কিচিজিরো মুখ চুণ করে দুটো তোড়া হাকিয়োমনের হাতে তুলে দিল। হাকিয়োমন বল্‌ল—আর একটা? ভীতস্বরে কিচিজিরো উত্তর দিল, তিনটে তো ছিল, কিন্তু আর একটা খুঁজে পাচ্ছি না। হাকিয়োমন আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌ল, লোহার সিন্দুক থেকে কি আর উড়ে যাবে! অন্যকোনও কাজে খরচ করে ফেল নি তো? কিচিজিরো বিষণ্ণ-ভাবে ঘাড় নাড়্‌ল। এর মধ্যে কান্‌সিকি সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্‌ল,—দেখুন,—বাড়ীর সব ঘরগুলো একবার খুঁজে দেখলে হয়, হয়তো কোথাও হারিয়ে পড়ে আছে।

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল—সকলের ঘর খোঁজা হল, বিশেষ করে দাসী চাকরদের, কিন্তু মোহরের তোড়া কোথাও পাওয়া গেল না। শেষে খুঁজতে বাকী রইল কেবল কিচিজিরোর—ঘর। কান্‌সিকি একটু হেসে বল্‌ল, —'এখন কিচিজিরোর ঘরটা বাকী—তা ওর ঘর খুঁজে আর কি হবে?' কিচিজিরো মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতড়ি বল্‌ল—তাকি হয়—সকলের ঘর যখন খোঁজা হয়েছে, তখন আমার ঘরটাই-বা-বাকী থাক্‌বে কেন! কিচিজিরোর ঘর খেঁাজা আরম্ভ হ'ল। হঠাৎ কান্‌সিকি চেঁচিয়ে বলে উঠল— এই যে—এই যে। সকলে চেয়ে দেখল, কিচিজিরোর বিছানার তলায় সেই মোহরের তোড়া।

হাকিয়োমন কিচিজিরোর মুখ দেখেই বুঝতে পার্‌ল যে, সে নির্দ্দোষী; কিন্তু এ যে চোখের সাম্‌নে হাতে হাতে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ। হাকিয়োমন

কি কর্‌বে ঠিক করতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। দুষ্টু কানসিকি ঠিক বুঝতে পারল যে তার প্রভু, কিচিজিরোকে সন্দেহ করেন না। সে তখন হাকিয়োমনকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বল্‌ল,—'দেখুন আমি আপনার পুরোনো চাকর—একটা কথা বলি। বাস্তবিক হয় তো কিচিজিরো মোহরের তোড়াটা নেয়নি ; কিন্তু কেউ নিয়েছিল এটা তো ঠিক ? তাহলে কথাটা দাঁড়ায় যে আমাদের মধ্যে কেউ নিয়েছিল, আর তাহলে আপনার কাছে চাকরী করা আমাদের পোষাবে না এটাও ঠিক,—কেননা চোর অপবাদ নিয়ে কে চাক্‌রী কর্‌বে ?—এখন আপনার ব্যবসাটা বজায় রাখা উচিত নয় কি—তার জন্যে কিচিজিরোকে যদি তাড়িয়ে দিতে হয় তাও ভাল।

কথাটা যে সত্যি, হাকিয়োমন তা অনুভব কর্‌ল। কিচিজিরোকে ডেকে পাঠিয়ে সে বলল—তোমাকে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী মনে করি ; তোমাকে ছেড়ে দিতে আমার প্রাণে বড় কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি কর্‌ব কিচিজিরো, ঘটনাচক্রে পড়ে তোমাকে ছাড়তে হচ্ছে—তা ছাড়া আর উপায় নেই। যদি কখনো তুমি নিজেকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে পারো, তবে ফিরে এসো, আমি তোমাকে বুকে করে তুলে নেব,—এমন কি আমার মেয়ে ইমাসানের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব।—কথা শেষ হয়ে গেলে হাকিয়োমনের চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল, তাড়াতাড়ি সে তা মুছে ফেলল।

কিচিজিরোর বুকের ভেতর রাজ্যের অন্ধকার জমাট হয়ে আস্‌ছিল। কে তার মাথায় এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে, তার এমন সর্ব্বনাশ করল! হাকিয়োমনের আশ্রয় ছেড়ে যেতে, তার বুক ফেটে যেতে লাগ্‌ল—আরও কষ্ট বেশী হতে লাগ্‌ল ইমাসান্‌কে ছেড়ে যেতে। এখন তার মনে হ'ল যে সত্যিসত্যিই সে ইমাসানকে ভালবাসে।

কিচিজিরো তাই গ্রামে, তার দাদার কাছে ফিরে গেল। তারপর দুই ভাইয়ে মিলে এমন ব্যবসা কর্‌তে লাগ্‌ল যে দু বছরের মধ্যে কিচিজিরো বেশ বড় লোক হয়ে উঠ্‌ল।

এদিকে হয়েছে কি—কিচিজিরোকে তাড়িয়ে দিয়ে, কান্‌সিকি চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল,—ইমাসান্‌কে বিয়ে করবার জন্যে। ইমাসান্‌ তো রাজিই হ'ল না, এমন কি হাকিয়োমন একদিন তাকে স্পষ্টই বলে দিল—'ইমাসানের সঙ্গে তোমার বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না।' কান্‌সিকি খারাপ লোক কি না,— তাই সে এবার হাকিয়োমনের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করতে লাগল। একদিন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাতে—যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, কেবল আকাশের তারাগুলি মিট্‌ মিট্‌ করে চেয়ে আছে—দুষ্টু কান্‌সিকি চুপি চুপি এসে হাকিয়োমনের বাড়ীতে আগুণ লাগিয়ে দিল। কিন্তু অত পাপ দেবতারা সইলেন না! আগুণ যখন চারিদিকে ধূধূ করে জ্বলে উঠ্‌ল, কান্‌সিকি আর তার ভেতর থেকে বাইরে আস্‌তে পারল না, সেই বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে সেও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হাকিয়োমন আর ইমাসান্‌ অতি কষ্টে রক্ষে পেয়ে গেল বটে, কিন্তু তাদের সহায় সম্পত্তি বল্‌তে আর কিছুই রইল না।

নদীর ধারে একখানি গ্রামে, ছোট্ট একখানি কুঁড়ে ঘর বেঁধে হাকিয়োমন সওদাগর, আর তার রূপসী মেয়ে বাস করতে রইল। দুঃখের ভারে হাকিয়োমন একেবারে নুয়ে পড়েছিল,—ইমাসান্‌কে একলা ফেলে রেখে, সে একদিন চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়্‌ল। ইমাসানের আপনার বল্‌তে আর কেউ রইল না; বাপের শোকে কেঁদে কেঁদে, চোখের জলের আড়ালে, পৃথিবীর আলো ক্রমশঃ তার কাছে নিভে আস্‌তে লাগ্‌ল,—তার দুটি চোখ অন্ধ হয়ে গেল।

কিচিজিরোর অবস্থা এদিকে খুব ভাল হয়ে উঠেছে। একদিন সে বেরিয়ে

পড়ল, হাকিয়োমনের কাছে গিয়ে, নিজের কলঙ্কের বোঝা নামিয়ে দেবার জন্যে। কত আশাই নিয়ে সে গিয়েছিল, কিন্তু মাইদ্জারু সহরে পৌঁছতেই সব যেন ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। কিচিজিরো সকল কথা শুনে, মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তারপর অনেক খুজতে খুঁজতে সে ইমাসেনের সন্ধান পেল। কি অবস্থাই হয়েছে ইমাসানের! কিচিজিরোর দুটি গাল বেয়ে চোখের জলের বন্যা বইতে লাগ্‌ল। সে ধীরে, অতি ধীরে ডাক্‌ল—'ইমাসান।' সে ডাকে ইমাসানের মুখখানি মেঘের ফাঁকে চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল—তার গাল দুটিতে চেরী ফুলের গোলাপী আভা এসে লাগ্‌ল। মিষ্টি গলায় সে বল্‌ল—'কে, —কিচিজিরো? তোমার গলার স্বর আমায় বলে দিচ্ছে যে তুমি! কিচিজিরো! কোথায় ছিলে এতদিন? বড় অসময়ে এসেছ তুমি; জীবনে আর তোমায় দেখতে পাব না—আমি অন্ধ।'

কিচিজিরো থম্‌কে থেমে গেল; তারপর এগিয়ে গিয়ে বল্‌ল—'তাতে হয়েছে কি ইমাসান্? আমার চোখ যতদিন আছে, ততদিন তুমি সবই দেখতে পাবে।'

অনেকদিন পরে ইমাসানের কষ্টের শেষ হ'ল; তাদের দুই হাত এক হয়ে গেল। দেবতারা তাদের মাথায় আশীর্ব্বাদ ঢেলে দিতে লাগ্‌লেন।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

# জানাজানি।

## চৈত্র মাসের জানাজানির উত্তর।

১। সব সময়েই যে আমাদের ছায়া লম্বা হয় তাহা ঠিক নয়। সকালে ও বিকালে আমাদের ছায়া লম্বা হয়, কারণ তখন সূর্য্যের আলো ব্যাঁকা ভাবে আমাদের উপর পড়ে, কিন্তু দুপুর বেলা সূর্য্যের আলো প্রায় সোজা ভাবে পড়ে সেজন্য ছায়া দুপুরে খুব অল্প হয়।

আকাশ থেকে নক্ষত্রর ন্যায় বস্তু ছুটে উহা নক্ষত্র নয়। উহাকে উল্কা বলে। পণ্ডিতগণ ঠিক করিয়াছেন যে উল্কাপিণ্ড সকল পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে করিতে পৃথিবীর নিকটে আসিলে, পৃথিবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসে। আসিবার সময় কোন কোনটি বাতাসের সংঘর্ষিত হইয়া আকাশে মিলাইয়া যায়। এবং কোন কোনটি মাটিতে পড়িয়া ছাই হইয়া যায়।

শ্রীসন্তোষকুমার গুপ্ত।

---

বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম কবি ছিলেন, কীর্ত্তিবাস এবং তাহার কাব্য-কুসুমের নাম ছিল রামায়ণ।

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা।

বৈশাখের ৩য় প্রশ্নের উত্তর।—

রাজপুতগণ আপনাদিগকে অযোধ্যা ও হস্তিনাপুরের সূর্য্য ও চন্দ্র বংশ হইতে সমুদ্ভুত বলিয়া পরিচয় দেন। কিন্তু ইউরোপীগণ বলেন যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে শক জাতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আসিয়া বাস করেন, রাজপুতগণ

তাহাদেরই বংশধর। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে কতকগুলি রাজপুতবংশ ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব এবং অবশিষ্ট রাজপুত শক জাতি হইতে উৎপন্ন।

রাজপুত জাতি অগ্নিকুল হইতে উৎপন্ন। শ্রীসরোজিনী দেবী। শ্রীবিধুভূষণ শীল, কলিকাতা।

রাজপুতগণ মধ্য এসিয়া ও বালটিক সীর তীরবর্ত্তী দেশে বাস করিতেন—

শ্রীপ্রভাতকুমার সেন, বিহার, সরিফ।

২য় প্রশ্নের উত্তর !—

বাণভট্ট একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার এই কয়খানি গ্রন্থ খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ইনি হর্ষবর্দ্ধনের সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সেই সময়েই ইনি শ্রীহর্ষচরিত লিখিয়াছিলেন।

শ্রীসরোজিনী দেবী, শ্রীরামপুর।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার, বাতিখালি।

১ম প্রশ্নের উত্তর !—

শুনা যায়, পাণের কোণ-টুকু ছিঁড়িয়া না খাইলে শনির দৃষ্টি পড়ে।

পাণের খিলির শেষ ভাগ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পাণ খায়। সংস্কার এই যে পাণে অনেক তুক্ গুণ থাকিতে পারে (অর্থাৎ পূর্ব্বকালে কাহাকেও বশিকরণ করিতে হইলে পাণে কিছু মন্ত্র ঔষধাদিদ্বারা করা হইত) ঐ জন্য দন্তদ্বারা কাটিয়া কোণ ফেলিয়া খাইলে ঐ তুক্ গুণ নিষ্ফল হইয়া যায় এই প্রবাদ ও ধারণা বশত ঐরূপ করা হয়।

কুমারী বিজয়া দেবী।

## নূতন প্রশ্ন !—

১। লীলাবতী কে ছিলেন? তাঁহার বাসস্থান কোথায় ছিল? এবং ইনি কি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন?

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত।

২। এমন একটা জিলার নাম কর যাহা উল্টাইলে সেইটাই হইবে।

৩। বল দেখি, কে তোমার বাবারও মামা, তোমার ঠাকুরদারও মামা, তোমারও মামা অর্থাৎ সকলেরই মামা ?

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়।

---

## বৈশাখ মাসের ধাঁধার উত্তর।

পোরজানা।

১। প্রিয় ফণী বাবু,

তোমার পত্র পাইয়াছি। গত কল্য অমূল্যর সহিত ব্যোমকেশ বাবুর বিবাদ হয় এবং সে চাকুরী ত্যাগ করিয়া সিমলা গিয়াছে, সে শীঘ্রই ঢাকায় যাইবে। আমরা কেশব বাবু সহ ভাল আছি। আমি জ্যোৎস্নাদের বাড়ীতে গিয়াছিলুম। তাহারা শীঘ্রই বীরভূম রওনা হইবে। আমার ভালবাসা নিও! তবে এখন আসি। ইতি—

তোমার—

শ্রীরবি পাগলা

বসন্ত পূর্ণিমা।

২। ৬৪+২০+৪+১২=১০০

৬৪÷৪=১৬, ২০−৪=১৬, ৪×৪=১৬, ১২+৪=১৬

৩। ৫ পা, ১১ শি, ৬ পে £ 5, 11 s, 6 d,

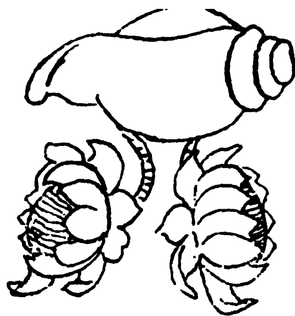
৪। প্রজাপতি।

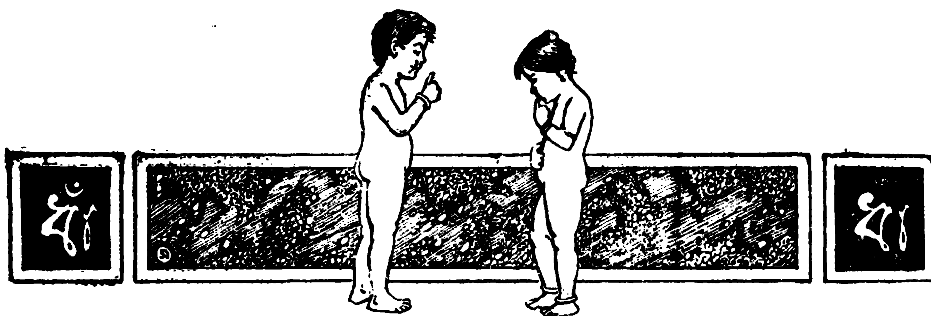
এবার যাঁহারা সকল ধাঁধারই উত্তর দিতে পারিয়াছেন তাঁহাদেরই নাম দিলাম ঃ—

শ্রীমতী উমা দেবী, পাটনা; রাজেন্দ্রনাথ সরকার, খুলনা; সন্তোষকুমার গুপ্ত; হেমেন্দ্রনাথ দে, সোণামুখী; পরিমলবালা বসু; অমিয়ভূষণ সেন, শিলচর; প্রবুদ্ধ সমিতির বালক সভ্যগণ, সেনহাটি; ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, জলেশ্বরী তলা; কুমারী বীণাপানি রায়, দিনহাটা; শ্রীমতী সরোজিনী গোস্বামী, শ্রীরামপুর: নৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ওয়ারী; কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, কাশীপুর; বিজয়গোপাল ও অজয়গোপাল রায়, সাতক্ষীরা; হরিদাস রায়, রাঁচি; বিজয়ভূষণ ঘোষ; মহম্মদ এজাহার মণ্ডল, ভাবেলা; বৈদ্যবাটী বালক সমিতির সভ্যগণ; অনিলকুমার গোস্বামী, নবদ্বীপ; সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়; প্রভাতকুমার সেন, বিহার সরিফ; আবদুল সুম্মদ খাঁ চৌধুরী, সাতক্ষীরা; সুষমা চৌধুরী, কলিকাতা; কুমিল্লা জিলা স্কুলের অষ্টম শ্রেণী(এ)র ছাত্রগণ; রামকৃষ্ণ মজুমদার; অমূল্যকুমার রায়, হাসারা; গ্রাহক ১২৯৮; জিতেন্দ্রমোহন রায় ও শম্ভুচরণ সেন, পাটনা; মীনরাণী দাশগুপ্ত; অয়সকান্ত ঘোষ, কলিকাতা; শরদিন্দু নারায়ণ সিংহ, কলিকাতা; মোহাঃ নসেরআলি সিকদার, ধাইদা; শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; সেক্রেটারী, তিলক সমিতি লাইব্রেরী; অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা; বিধুভূষণ শীল, কলিকাতা; প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডোমজুড়; চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, সুধিয়া; মলিনাবিকাশ মণ্ডল, রেঙ্গুন; হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিলকামারী; প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহাদেবপুর; অন্নপূর্ণা সেন, ইতনা; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, নারিন্দা, ঢাকা; হরিপদ সরকার, উল্লাপাড়া; মহিউদ্দীন খাঁ, সিরাজগঞ্জ; সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, লক্ষ্ণৌ; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; রবীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, পোরজনা;

অজিতকুমার সিংহ রায় ; চণ্ডীচরণ চৌধুরী, ভবানীপুর ; চিত্তরঞ্জন সিংহ, শিলচর ; রবীন্দ্রনাথ দত্ত, কলিকাতা ; শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা ; হরেন্দ্রমোহন শেঠ ; কলিকাতা ; কুমারী হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা ; সুনীলচন্দ্র নিয়োগী, কলিকাতা ; কুশলচন্দ্র নিয়োগী, রেঙ্গুন ; সুকুমার মিত্র, বারাণসী ; সৌরীন্দ্রমোহন ঘোষ, পুরুলিয়া ; কুমারী মুকুলরাণী দাসী, মজঃফরপুর , সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা ; মায়াময়ী মজুমদার, কলিকাতা ; হেরম্বপ্রসাদ বড়ুয়া, গোয়ালপাড়া ; কিরণকুমার সাহা, সিরাজগঞ্জ ; কুমারী আশামুকুল দত্ত, করিমগঞ্জ ; পুষ্পময়ী মজুমদার ; আভারাণী মজুমদার, কলিকাতা : বেলা গুহ, কলিকাতা।

---






# নূতন ধাঁধা।

প্রথম দ্বিতীয়ে আমি সুস্বাদু ফল।
দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে হই বালুকা কেবল।
তৃতীয়ে চতুর্থে আমি হই ছোট লাঠি।
আমার প্রতাপে কাঁপে জেনো সবে খাঁটি।
প্রথম চতুর্থে মিলে হই যাহা আমি
ফাঁদ কয় তারে—ধরে মাছ জলে নামি।
দ্বিতীয় চতুর্থ মিলে হই আমি যাহা
ঘৃণায় সরিয়া যায় দেখে লোকে তাহা।
চারিটি অক্ষরে আমি পরিচিত ভবে
কি জিনিষ হই আমি বল দেখি সবে।

শ্রীহিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২। লোকে জিনিষ ইচ্ছায় খায় কিন্তু সে জিনিষটী অনিচ্ছায় খায়। তবে সকলের সামনে খেলে একটু লজ্জায় পড়তে হয়। সে জিনিষটী কি ?

শ্রীপরিমলবালা বসু।

৩। অতি ক্ষুদ্র মুখ তার উদর গভীর,
হস্তপদ নাহি তার সামান্য শরীর।
দিবসেতে কোনরূপে জলযোগে রয়
অস্ত গেলে দিবাকর নিজ ভক্ষ্য খায়।
যত পায় তত খায় করিয়া আনন্দ,
আহার না দিলে সে সবে করে অন্ধ।
এহেন অপূর্ব্ব দ্রব্য প্রতি গৃহে হেরি,
কহ দেখি নাম তার মনেতে বিচারি'।

৪। জীব জন্তু নহে, উহা ধাতুময় কায়,
আপনি জানে না কিন্তু পরেরে বুঝায়।
হস্তপদ নাহি তার দিবানিশি চলে,
পরমায়ু গেলে লোকের ডেকে ডেকে বলে।
জগতের কার্য্য চলে ইঙ্গিতে তাহার
বল সবে বিচারিয়া কি নাম উহার

৫। বেদবর্ণ ষোল সখী অতি চমৎকার,
তিন পতি সহ সদা করয়ে বিহার।

ইন্দ্র নয়,—সে পতি অঙ্গভরা আঁখি,
আঁখি ইসারায় নাচে ষোলজন সখী।
কোন সখী হ’তে যদি কোন সখী মরে,
স্বামী হ’তে পুনরায় জন্মে নিজ ঘরে।
কে কোথা শুনেছ এহেন অপূর্ব্ব কাহিনী,
কি নাম তাদের এবে কহ দেখি শুনি।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার।





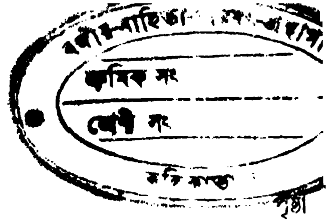
“জল ?—ঐ যে !” হোরেস ভারনেট (১৭৮৯—১৮৬৩)

এই ছবিখানি দেখে কি মনে হয় ? মনে হয় না-কি যে মরুভূমির মধ্য দিয়া ঐ যে যাত্রীরা যাইতেছে, পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইরা গিয়াছে, কোথাও একটু ছায়া নাই, চারিদিকে ধূ ধূ মরুভূমি, শ্রান্তক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে পানীয়ের সন্ধান করিতেছে ? কে একজন পথিক তাহাদের জলের সন্ধান বলিয়া দিতেছে,—এই মনে হয় না কি ?

ছবিখানিতে দেখ, প্রথম আরোহীর মুখে-চোখে কেমন একটা অবসন্নতা আসিয়া গিয়াছে, অমন যে মরুপথের একমাত্র পশু উট্ ( ২য় জীবটি ) সে’ও যেন জল খুঁজিতেছে, কিন্তু জল সেখানে কোথায় ? “জল—দূরে—ঐ যে !”

হোরেস ভারনেট শিল্পীর পুত্র, শিল্পীর পৌত্র ! চিত্রবিদ্যা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন এবং চিত্র দ্বারাই প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন ।

---



# সূচী।

## আষাঢ়—১৩৩০।



ধাঁধা ও জানাজানি আগামী মাসে থাকিবে।

---


কলিকাতা ১৭ নং রাধানাথ বোসের লেনস্থিত বিদ্যোদয় প্রেস হইতে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



সুরের হাওয়া।






৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। আষাঢ়, ১৩৩০।

## স্বাস্থ্য—চিত্রে ও গল্পে।

## পরিমিত আহার।

পালেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ, মহা ধূমধাম হৈ চৈ, লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি। নিমন্ত্রণ আসরে রাম, শ্যাম, যদু সবাই ছিল, আর ছিল আধমণি কৈলাস। সে একাই আসর জমাইয়া রাখিয়াছিল। তাহার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়াছিল।

কৈলাস খাইতে পারিত অসাধারণ, ঝাঁকায় ঝাঁকায় লুচি, হাঁড়ি হাঁড়ি দই সন্দেশ সে একবারে খাইয়া ফেলিত। পাকা আধ মণ খাবার সে অকাতরে উদরের গর্ত্তে ফেলিয়া দিত, তাই লোকে তাহাকে ডাকিত আধমণি কৈলাস। এ হেন কৈলাস, সেদিন পালেদের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিল।



আধমণি কৈলাস

সকলেই কৈলাসের খাওয়া অবাক হইয়া দেখিতেছিল। তাহার পাশেই বসিয়াছিল রামধন নামে একটী পেট রোগা জীর্ণ শীর্ণ ছেলে। যদিও সে এদিকে কিছু পেটুক ছিল, কিন্তু খাইতে সে তেমন কিছুই পারিত না। তাহার পাশেই বসিয়া কৈলাস যে অদ্ভুত কার্য্য করিতেছিল তাহাই সে বিস্মিতনেত্রে দেখিতেছিল।

পালেদের বাড়ীর নিমন্ত্রণের জের—পরদিন হরিধন ডাক্তার বেজায় ব্যস্ত। সকাল হইতে তার এতটুকু অবসর নাই। অপরিমিত ভোজনের ফলে কত লোকের পেটের অসুখ হইয়াছে, দলে দলে লোক অসিতেছিল সেই ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে ঔষধ লইতে। সেই দলের মধ্যে আমাদের সেই পেটরোগা রামধনও ছিল। গত দিনে সে খাইতে বসিয়াছিল ঠিক কৈলাসের পাশেই, তাই সকলেই তাহাকে চিনিতে পারিল। দলের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল,

"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই ত আমরা এক সঙ্গে নিমন্ত্রণ খাইলাম, কিন্তু কতকের হইল অসুখ, আর কতক ত বেশ সুস্থ আছেন, ইহার কারণ কি? এই যে রামধন ছোঁড়া এ ত কিছুই খায় নাই—উহার হইল অসুখ! আর কৈলাস, যে একাই পঞ্চাশ জনের খাবার খাইল, কৈ, তাহার ত কিছুই হইল না। সে বেশ সুস্থ সবলভাবে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে।"

ডাক্তারবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "সকলের সমান সহ্য হয় না তাই যাহার যেরূপ সহ্য হয়, তাহার সেইরূপই আহার করা উচিত, কমও না, বেশীও না। কৈলাস খাইতে পারে আধ মণ, কাল সে খাইয়াছেও আধ মণ সুতরাং তাহার অসুখ হইবে কেন? যদি আধমণের কম সে খাইত, তবে হয়ত সে এমন সুস্থ থাকিত না, আর আধমণের বেশী খাইলে তাহার অবস্থাটা

আপনাদেরই মত হইত। রামধন সচরাচর যাহা খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহার চাইতে কাল সে বেশী খাইয়াছিল, তাই আজ তাহার এই দুর্দ্দশা।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "এমন ধারা কেন হয়, একজন বেশ খায় দায়, হজম করে, আর একজন জন্ম পেটরোগা, কিছু খাইয়া হজম করিতে পারে না—এই সব বেচারীদের কি কোন উপায় নাই?"

ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "কি জানেন, মানুষের স্বাস্থ্য সবটাই তাহার নিজের উপর নির্ভর করে না। পিতামাতার স্বাস্থ্যানুযায়ীও অনেক সময়ে ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য হয়। যদি কেহ পিতামাতার স্বাস্থ্য পাইয়া জন্মাবধিই পেট রোগা হয় তবে তাহাকে খুব সাবধানে থাকিতে হয় এবং নিজের পুরুষকার ও সংযমের ফলে সে শীঘ্রই আবার সবল ও সুস্থ হইতে পারে। আর কেহ কেহ পিতামাতার সুন্দর স্বাস্থ্য পাইয়াও অত্যাচার করিয়া শেষে রামধনের মত অবস্থা প্রায়। তবে একটা জিনিস আপনারা জানিয়া রাখুন, স্বাস্থ্যের ভাল মন্দ অল্প কিছু গোড়ার দিকে পিতামাতার উপর নির্ভর করিলেও বেশীর ভাগ নির্ভর করে নিজের উপর। যেরূপ যার সহ্য হয়, মানুষ যদি সেইরূপ আহার করে তবে অসুখ বিসুখ বড় একটা হয় না। এই যেমন, যে দৈহিক পরিশ্রম করে বেশী, তার তদুপযোগী আহার করা আবশ্যক, এবং সে সেরূপ আহার করিয়া হজমও করিতে পারে। কিন্তু যে শারীরিক পরিশ্রম করে না, তাকিয়া হেলান দিয়া ও দিবা নিদ্রায় দিন কাটায় তাহার আহার সেইরূপ লঘু হওয়া দরকার। শারীরিক পরিশ্রম না করিলে খাবার তেমন হজম হয় না, আর হজমের ব্যবস্থা না করিয়া অতিরিক্ত ভোজন করিলে তাহার বিষময় ফল ফলিবেই।"

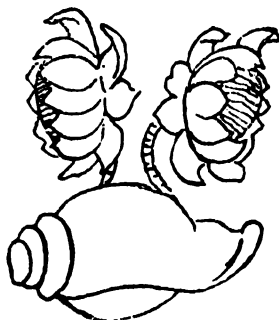
পরে ডাক্তার বাবু হাসিয়া বলিলেন, "এইরূপ নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ আছে

বলিয়াই আমাদের ব্যবসা চলিতেছে। সকলেই যদি পরিমিত আহার করে, নিয়ম মত চলে, তবে ত আমাদের ব্যবসা একরূপ তুলিয়াই দিতে হয় ও তাহা হইলে আপনাদেরও আজ এখানে শুভাগমন হইত না।”

সকলেই অপরাধীর ন্যায় এ-ওর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

আহার পরিমিত হওয়ার দরকার। যাহার যেরূপ সহ্য হয় তাহার তদতিরিক্ত কিম্বা তদপেক্ষা কম আহার করা অন্যায়। যাহারা শারীরিক পরিশ্রম করেন তাহাদের তদুপযোগী সারবান আহার্য্য খাওয়া উচিত, আর শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যাহারা অলস ভাবে দিন যাপন করেন তাহাদের আহার সেইরূপ লঘু হওয়া উচিত—নতুবা অজীর্ণ হইবেই হইবে।

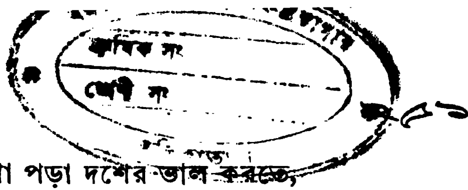


# শিক্ষার্থীর কামনা ।

ভোরের বেলা উঠব জেগে ইষ্টদেবে স্মরি,
পাখীর গানে ফুলের বাসে নব পরাণ ভরি ।
মুখ হাত ধুয়ে বাবা মায়ের নিয়ে পায়ের ধূলি,
ভাই বোনদের চুমো দিয়ে বস্‌ব 'পড়া' খুলি ।
চাইব নাক' কোন দিকে—নয়ন দুটী নত—
ভাব্‌বনাক বাজে কথা দুষ্টু ছেলের মত ।
সময় হলে নেয়ে খেয়ে স্কুলেতে গিয়ে,
বস্‌ব নিজের ঠাঁইটীতে ভাই বই ক'খানি নিয়ে ।
শিক্ষকেরি কথা গুলি দীক্ষা সম কানে,
ধর্‌ব যে ভাই, চুপটী ক'রে থাকব মানে মানে ।
পড়ার সময় কর্‌ব পড়া—খেলার সময় খেলা,
কাটাব না ছেলেবেলা করে হেলা ফেলা ।

শিখতে চাই না লেখা পড়া চড়্‌তে গাড়ি ঘোড়া,
শিখ্‌তে চাই না লেখা পড়া বাঁধতে টাকার তোড়া ।
শিখ্‌তে চাই না লেখা পড়া পর্‌কে দিতে দুঃখু
তার চেয়ে ভাই হয়ে রব আস্ত গাধা মুখ্যু ॥
শিখতে চাই ভাই লেখা পড়া কর্‌তে বাপ মার সেবা,
নরদেহে দেবতা যাঁরা—আছে অমন কেবা ।

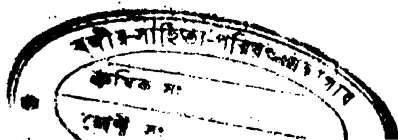



# আমার দেশ

শিখতে চাই ভাই লেখা পড়া দেশের ভাল করতে,
দুখীর নয়ন মুছিয়ে দিতে দেশের তরে মরতে।
পরের দেশের পায়স ছেড়ে নিজের দেশের পান্তা,
চাইরে খেতে হাস্য মুখে—ঠাণ্ডা করে প্রাণ তা।
চাই না কেবল গোলামখামার তকমাধারী হ'য়ে,
এ জীবনটা বইয়ে দিতে উপবাসে র'য়ে!
চাই না রে ভাই পরের কাছে চাকরি স্বীকার কর্‌তে
মুনিবেরি পিছু পিছু শীকার হ'য়ে ফির্‌তে!
চাই না নিজের গাঁটী ছেড়ে বেচে ভিটে মাটী
সহরেতে কর্‌তে বাস—চাকরে বাবু খাঁটী
সে যেরে ভাই চল্লিশেতেই চিঁ চিঁ আহার বিনে
বিকিয়ে দিতে চুলগুলি সব মহাজনের ঋণে!
তার চেয়ে গো হব চাষা—ধরব লাঙল নিজে,
কলম ধরার চেয়ে ভাল—ফলিয়ে সোণা বীজে।
সরল ভাবে কটিয়ে দেব মেখে কাদা ধূলো,
ধর্ম্মে কর্ম্মে পরিশ্রমে জীবনের দিন গুলো।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

---



# সম্পাদকীয়।

কি ছেলে কি বুড়ো—সকলকার একটা কেমন ধারণা জ্ঞান হওয়ার সময় হইতেই জন্মে যে নিজের জিনিষটি অন্যের অপেক্ষা ভাল। এ ধারণা খারাপ নয়। ইহা হইতেই মানুষের মনে সন্তোষ আসে, সন্তোষ মানুষকে সুখ ও শান্তি দেয়। আমার দেশটি, অন্য দেশের চেয়ে ভাল; আমার দেশের অধিবাসীরা অন্য দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা উচ্চ, মহৎ; আমার ঘরটি সুন্দর; আমার ভাই-বোন-গুলি সুন্দর এ ধারণা মানুষ মাত্রেরই থাকে। থাকুক, ভাল কথাই। তবে থাকারও একটা সীমা আছে। সীমার বাহিরে গেলে সে আর ভাল থাকে না, মন্দ হইয়া যায়। কাজেই মানুষ মাত্রেরই উচিৎ, আপনার-টুকুকে ভালো জানার সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাল টুকুর প্রতিও শ্রদ্ধান্বিত হওয়া। আপনার যা কিছু সব ভাল, আর অপরের যা, সবই মন্দ—এ অতি নীচ, স্বার্থপরের কথা।

* * * *

আর এক কথা, নিজের জিনিষকে নিজে ভাল বলিয়া চীৎকার করিলে ভাল হয় না, ভাল জিনিষ, অপরে ভাল বলিবেই, তবেই সে ভাল-র স্বার্থকতা, নইলে তার কোন মূল্যই নাই। বিচার ভার অন্যের উপর থাকিলেই জিনিষের ভাল-মন্দ বিচার সম্ভব হয়, নিজেই নিজের ভাল-মন্দর বিচারক হইতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * * *

"আমার দেশ" ছেলে-মেয়েদের মাসিক। "আমার দেশে"র সহিত যাহারা ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ তাহাদের অধিকাংশই বালক-বালিকা বলিয়াই আমরা জানি। তবে সকলকে যখন চক্ষে দেখি নাই, দেখা সম্ভবও নহে তখন

কাহার কি বয়স, কে-কি-পড়ে এ সকলের কোন খবর আমরা জানিতে পারি না। মাঝে মাঝে গ্রাহক-গ্রাহিকাদের নিকট হইতে আমরা যে সকল পত্র পাই, সেগুলি দেখিয়া, পড়িয়া অনেকটা জনিতে পারি যে তাহারা সুকুমার মতি সরলচিত্ত বালক-বালিকা। কেমন কচি-কচি কাঁচা হাতের লেখাগুলি, লেখার মধ্যে কেমন একটা সহজ ছেলেমানষী ভাব—দেখিয়া আমাদের আনন্দই হয়।

* * * *

আবার মধ্যে মধ্যে এমন চিঠিও আমাদের হাতে আসিয়া পড়ে যে আমরা অনেক সময় ভাবিতেও লজ্জিত হই যে সে সব পত্র "আমার দেশের" সরল-প্রাণের গ্রাহক বা গ্রাহিকার রচিত। অত্যন্ত দুর্বিনীত ভাব, লজ্জাকর ভাষা—উদ্ধত আচরণ দেখিয়া সত্যই মনে হয় "আমার দেশ" অতি অপাত্রে ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ হয়ত একটি ধাঁধা বা একটি জানা-জানি বা একটি কবিতা পাঠাইয়াছেন, পাঠাইবার সময় অনুরোধও করিয়াছিলেন—যেন এই মাসেই ছাপা হয়।' তারপর প্রবন্ধ অমনোনীত অথবা স্থানাভাব যে কারণেই হৌক যদি সে মাসের কাগজে আপনার নাম—রচনা-সহ—দেখিতে না পান, অধৈর্য্য হইয়া, অভদ্র ভাব ও ভাষার সাহায্যে সম্পাদকের চৈতন্য জাগাইতে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়া বসেন। তখন তাঁহাদের মনে থাকে না যে পত্র তাঁহারই একলার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য বাহির হয় নাই। তিনি ছাড়া পত্রের আরও লেখক বা লেখিকা আছেন, যাঁহাদের দাবী তাঁহার চেয়ে কোন কারণেই কম নহে।

* * * *

আমরা সম্প্রতি একখানি পত্র পাইয়াছি, লেখক বলিতেছেন, আমি গর্ব্ব করিয়া বলিতে পারি, আমার রচনা......চেয়ে ভাল” এরূপ গর্ব্ব করিতে লজ্জা পাওয়ারই কথা। তাহা না হইয়া এই লেখক-টি দুই পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ পত্রে নিজকে আরও হীন করিয়াছেন। এই লেখকের বয়স কত এবং সে কি করে আমরা জানি না। তবে সে-যে লেখা পড়া করে না, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে, কারণ বিদ্যাচর্চ্চা করিলে স্বভাব এমন দুর্বিনীত ও উদ্ধত হইত না। ইহার অভিভাবকের উচিৎ, ইহাকে অনতিবিলম্বে কোন সংশোধনী স্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া।

*　　*　　*　　*

সকলেরই জানা উচিৎ, সম্পাদক ভাল লেখা পাইলেই ছাপাইবেন। না ছাপাইয়া তাঁহার কোনই লাভ নাই, অথচ ছাপাইলে সেই লেখক বা লেখিকাকে উৎসাহ দিলে সম্পাদকের এবং সাধারণের যথেষ্ট লাভ আছে। সম্পাদক যে বুদ্ধিবিহীন হইয়া সে লাভ উপেক্ষা করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নয়।

*　　*　　*　　*

অনেকে দেরীতে ধাঁধা ও জানাজানির উত্তর পাঠান, তাহা সত্বেও কাগজে নাম প্রকাশিত হইবে এইরূপ আশা করিয়া থাকেন। এবং ছাপা না হইলে অধৈর্য্য হইয়া সম্পাদকের প্রতি পক্ষপাতীত্বের অভিযোগ আনিতে দ্বিধা করেন না। আমরা তাঁহাদের শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে নিয়মানুবর্ত্তিতা ও

সময়ের মূল্য বুঝিলে কাহারো অভিযোগের কোন কারণ থাকিবে না। ১৫ই তারিখের মধ্যে ধাঁধা বা জানা-জানির উত্তর আমাদের হস্তগত না হইলে, কাহারো নাম ছাপা হইবার সম্ভাবনা নাই।

* * * *

আমার দেশের গ্রাহক-গ্রাহিকা অনেকেই ধাঁধা লিখিয়া পাঠান। কেহ কেহ প্রতি মাসে পাঁচ সাতটি ধাঁধাও পাঠাইয়া থাকেন। কাহারো এমন আশা করা উচিৎ নহে যে সকল ধাঁধাই কাগজে ছাপা হইবে। আমরা প্রাপ্ত ধাঁধার মধ্য হইতে বাছিয়া প্রতি মাসে তিন, চারিটির বেশী দিতে পারি না তাহার বেশী দেওয়া সম্ভব হয় না।

* * * *

প্রসিদ্ধ কবিরাজ সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড বৈশাখ মাসের "আমার-দেশে" একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, "তোমাদের বলা রইল, যদি তোমাদের বাবা 'জবাকুসুম তেল' না এনে দেন, আমাদের চিঠিতে লিখো—নইলে ভাল হবে না কিন্তু"—ইহার বিরুদ্ধে কোন একটি গ্রাহক আমাদের লিখিয়াছেন—"আপত্তিজনক। ছেলেদের মধ্যে অবাধ্যতার শিক্ষা দেয়!" উপদেষ্টা ব্যক্তি বালক নহেন, বুঝিলাম। কেবল বুঝিলাম না, এককালে বালক থাকিয়াও ইনি ছেলে-মেয়েদের মনের ভাবটি কেন ধরিতে পারিলেন না! ছেলে চিরকালই ছেলে, তাহাদের আব্দারও ছেলে-মানুষী হইয়া থাকে। সি, কে, সেন কোম্পানী ছেলেদের মুখের কথাটি কাড়িয়া

লইয়াই যেন বলিয়াছেন—"নইলে ভাল হবে না কিন্তু"—এটা আব্দার! অবাধ্যতা শিক্ষা নয়, ছেলেদের ছেলে-মানুষী!

* * * *

এই রকমের কত মজার কথা আমরা কত চিঠির মধ্যে পাই। কেহ কেহ আবার এমন কথাও লিখিয়া থাকেন, "দেখিবেন মহাশয়, যেন আমাদের উপর রাগ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না।" ভাষা দেখ একবার! আমরা পত্র পড়িয়া হাসি। পাগলের প্রলাপে লোকে রাগে না, হাসে।

* * * *

গত মাসে "সারা-সেতু" শীর্ষক যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে একটি ভুল আছে। লেখক লিখিয়াছিলেন. সারা সেতু লম্বায় ৩ মাইল; এ-সংবাদ ঠিক নয়। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ১০গজ কম এক মাইল। ঢাকা হইতে শ্রীমান আনওয়ারল হক্ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। "সারা-সেতু" লেখক লোকমুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন; লোকের বাস্তবিক ঐরূপ ধারণা।

* * * *

কি ভীষণ গরম পড়িয়াছে! আজ আবার তেমনি গুমোট্! এইটুকু লিখিতেই গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছি। তোমরা যখন পড়িবে তোমাদের অবস্থা এত খারাপ না হৌক, কতকটা হইবে। তাই ভাবিয়াই আজিকার মত নিরস্ত হইলাম।





# আয়রে আমার সোণা।

আয়রে আমার প্রাণের মানিক,
আয়রে আমার সোনা;
তুইযে আমার দুলাল ছেলে,
প্রাণের তারে বোনা।

টুটু বলে ডাক্‌লে পরে,
অমনি ফিরে চাস;
হাত বাড়িয়ে ছুটে আসিস্‌,
ছড়িয়ে হাসির রাশ।

তুইরে আমার সুখ তারাটী,
নীল আকাশের গায়;
আয়রে টুটু দুলাল সোণা
আয়রে বুকে আয়।

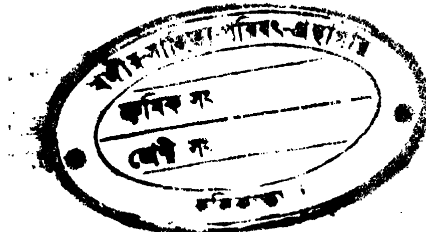
তুইরে আমার হীরে পানা,
বুক জুড়ান ধন;
স্বর্গ থেকে নেমে এলি,
বড়ই শুভক্ষণ।

দুইটী প্রাণের মধুর মিল,
তুই যে তারই মায়া;
তাইতে দেখি তোর মুখেতে,
আরেক্‌ জনের ছায়া।

ধন ধন দুলাল রতন,
বাদ্‌লা হাওয়ার গান;
প্রেমের স্মৃতি প্রাণের প্রীতি,
ভগবানের দান।

—"মা"—

---



ভাবিয়াছিল, চাবিতালার ভিতরে থাকিয়া মমির ক্ষমতা প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু রাত্রেই তাহাদের সে ধারণা ভাঙ্গিয়া গেল। হঠাৎ তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, শুনিল, বাড়ীর সিঁড়ি দিয়া ধুপধাপ শব্দে ক্রমাগত লোক উঠা নামা করিতেছে আর বাড়ীটার চারিদিকে রঙ-বেরঙের আলো জ্বলিতেছে। বাড়ীর লোক কোন রকমে 'দুর্গানাম' করিয়া রাতটা কাটাইয়া সকালে উঠিইয়া দেখিল —বাড়ীর তৈজসপত্র একখানি আস্ত নাই, সব চুরমার হইয়া গিয়াছে।

কাজেই তোমরা দেখিতেছ যে মৃত ব্যক্তির সমাধি খনন করিয়া তাহার চিরশান্তি দূর করিলে মৃতদেহ সন্তুষ্ট ত হয়-ই না বরং এমন ভাবে প্রতিহিংসা লয় যে আমরণ সে লোককে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়।

তবু যে ইংরেজরা সমাধি খুঁড়িতে ছাড়েন না, তাহাতে তাঁহাদের সাহসের যতই প্রশংসা করা যাক্, তবুও আমাদের মতে মৃত ব্যক্তিকে বিরক্ত করা উচিৎ নয়। মৃতের সন্মান দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।



পুরোহিত পত্নী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মধ্যে আসিয়া কি জানি কেন আর কোন গোলযোগ ঘটান নাই। বেশ শান্তশিষ্টভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তবে লোকে নানারকম গুজব রটাইত বটে, কিন্তু সে-সকলের মূলে কোন সত্য আছে বলিয়া জানা যায় নাই, তাই তাহার উল্লেখ আর করা দরকার মনে করি না।

বিলাতের বিখ্যাত Review of Reviewsনামক প্রসিদ্ধমাসিকপত্রের জগদ্-বিখ্যাত সম্পাদক স্বর্গীয় মহামতি ষ্টেড্ সাহেব মিশরের মমীর সম্বন্ধে একটি ঘটনা বিবৃত করিয়াছিলেন। ঘটনাটি আমরা তোমাদের বলিতেছি শুনিলেই বুঝিবে—কি ভীষণ।

এক ইংরেজ মহিলা মিশর পরিভ্রমণ কালে একটি মমি কুড়াইয়া পান। মমিটি তিনি বিলাতে আনিয়া বৈঠকখানায় অন্যান্য আসবাব ও খেলনার সঙ্গে সাজাইয়া রাখেন। রুচি দেখ একবার! একটা মৃতদেহ হইল, গৃহসজ্জা।

যাক্, মহিলাটি রাত্রে ত বৈঠকখানায় মমিটিকে সাজাইয়া গুজাইয়া রাখিয়া গেলেন! পরদিন ঘরে ঢুকিয়া দেখেন, জিনিষ পত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার হইয়া পড়িয়া আছে। আরও আশ্চর্য্য এই যে একমাত্র সেই শুষ্ক মৃতদেহটি ছাড়া ঘরের কোন আসবাবই অক্ষুণ্ণ নাই। তখন অনেকেরই সন্দেহ হইল যে মমি হইতেই এই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। তখন মমিটিকে বৈঠকখানা হইতে সরাইয়া অন্য একটা ঘরে পরীক্ষার্থ রাখা হইল। প্রাতঃকালে সে ঘরের অবস্থাও দেখা গেল, ঠিক আগের দিনের মত হইয়া পড়িয়া আছে। মমিটি কিন্তু অক্ষত অটুটই রহিয়া গেছে।

বাড়ীর লোকের আর সন্দেহ রহিল না, তাহারা মমিটিকে এবার একটা আল্‌মারির মধ্যে পুরিয়া চাবিতালা লাগাইয়া দিল। বুঝি বা তাহারা

পুরোহিত মূর্ত্তি।



পুরোহিত হাত তুলিয়া যেন কি প্রচার করিতেছেন।

তিনি ভৌতিক জগতের তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃতা ছিলেন। ডালাধিকারিনীর বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই ম্যাদাম বলিয়া উঠিলেন—এই বাড়ীতে ভৌতিক উপদ্রব আছে।” গৃহস্বামিনী ত একথা শুনিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ম্যাদাম গৃহস্বামিনীর নিকট হইতে ডালাখানি পাইলেন; তাহা দেখিয়াই বলিলেন—শীঘ্র এ খানিকে দূর করুন। ইহাতেই বিপদ ঘটিতেছে।”

তারপর যিনি ডালাখানি পাইলেন, তিনি এক ফোটাগ্রাফওয়ালার কাছে ডালাটির ফোটো তুলিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এই খানে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। ফোটাগ্রাফার পুরোহিত পত্নীর ফোটো ত তুলিলেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে পুরোহিত গৃহিণীর মুখ না উঠিয়া, উঠিল এক জীবন্ত রমনীর মুখ,—তাহার চক্ষে বিজাতীয় ঘৃণা, সারা মুখে একটা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত ভাব।

ফোটোগ্রাফারের ত চক্ষুস্থির। তিনি তৎক্ষণাৎ ডালার মালিককে আনিয়া ফোটো দেখাইলেন, মালিকেরও দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ উড়িয়া গেল।

তিনি ডালাটিকে তখনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠাইয়া দিলেন। ইনিই প্রথম ইংরাজ যিনি কু-সংস্কারে বিশ্বাস করেন; পাছে তাঁহার কোনরূপ বিপদ আপদ ঘটে, ডালাটিকে বিদায় করিয়া বাঁচিলেন।

যে লোকটি ডালাটি বহিয়া মিউজিয়ামে গিয়াছিল, সে লোক কিন্তু জীবনে আর কোনও ভার বহিল না, পুরোহিত-গৃহিণীর প্রতিমূর্ত্তি-সহ ডালার ভারই—জনমের মত তাহার শেষ ভার হইল, অর্থাৎ সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। আর একটি লোক, যে এই ডালার ও পুরোহিতপত্নীর ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিল সেও কালিকলম ফেলিয়া হঠাৎ একদিন কোন্ রাজ্যে যে চলিয়া গেল, বিশ্বের লোক আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

উক্ত মহিলাটির বাড়ীতে এই সময়ে একদিন ম্যাদাম ব্লাভাৎস্কি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া ছিলেন। ম্যাদাম একজন প্রেততত্ত্ববিদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রিন্সেস নিফ্রেটের প্রতিমূর্ত্তি।



এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কাইরো মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। লোকে বলে, মিশরীদের ভাস্কর্য্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মূর্ত্তি।

হাতে আসিয়া পড়ে, সে সেইখানি একজন ইংরাজ পরিব্রাজককে বিক্রয় করিয়াছিল।

ডালার মাহাত্ম্য এই সময় হইতেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। পরিব্রাজক মহাশয় চাকচিক্যময় চিত্রশোভিত ডালা লইয়া কাইরোর পথে চলিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার হাতের বন্দুকের চোঙাটি ফাটিয়া একখানি হাতই তাঁহার উধাও হইয়া যায়। পরিব্রাজক তখন ডালাখানি বিক্রয় করিয়া দেন, আর একজন ইংরাজ ডালার চাকচিক্যে ভুলিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেটি ক্রয় করেন। তাঁহারও দুর্ভাগ্য, ডালা ক্রয়ের পর সাতটি দিন না কাটিতেই বিলাত হইতে তারের খবর আসিয়া উপস্থিত, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। ডালা মাহাত্ম্য তিনি জানিতেন না, ডালাখানি তিনি ছাড়িলেন না। ডালা হাতে থাকিতেই বেচারা পথের ভিক্ষুকের মতই মারা পড়িলেন।

তার পর ডালাখানি যাহার হাতে পড়িল, তিনিও ইংরাজ, এবং ধনী। কিন্তু ডালাখানি হাতে আসিতেই তিনিও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তিনজন গেল, তার পরের যে লোক ডালার মালিক হইলেন, তিনি আততায়ীর গুলি খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেন।

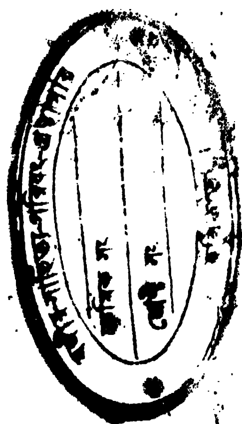
ডালাটি তখনও অবিকৃত রহিয়াছে আর তখনো অনেকের ভাগ্যে দুঃখ আছে, তাই ডালাটি আবার হাতের পর হাত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চতুর্থ মালিকের মৃত্যুর পর ডালাখানি যাঁহার হাতে পড়িল, তিনি বিলাতের একটি ধনী মহিলা। পুরোহিত গৃহিণীর চেহারা সমেত ডালাখানি তাঁহার গৃহে আসিয়া ভরাভর করিতেই মহিলাটী অসুখে পড়িলেন, অসুখে ভুগিতে ভুগিতে শুনিলেন, তাঁহার সর্ব্বস্ব গিয়াছে। পথের ভিখারিণীর মতই তাঁহার অবস্থা।

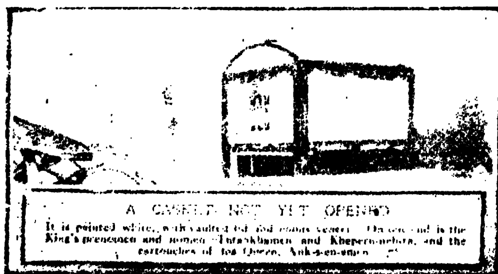
রাজার কৌচ।



কি সুন্দর কারুকার্য্য দেখ।

রাজা-রাণীর নাম লেখা বাক্স।






এটি এখনও খোলা হয় নাই। ইহার একদিকে রাজা তুতান, খেপ্পনেরার ডাক-নাম লিখিত আছে।

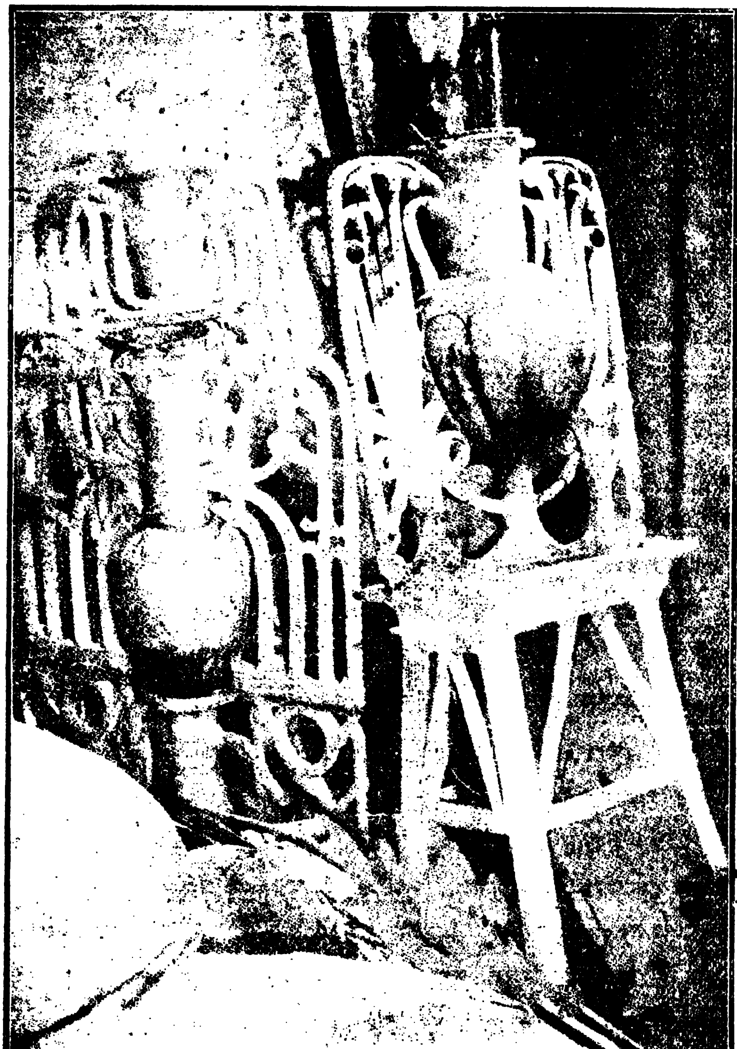
কু-সংস্কার তাঁহারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমরা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে আমরা বিশ্বাস না করিয়া কোন মতেই পারি না। যখন দেখি প্রাচীন মিশরীদের মমি বা তাঁহাদের সমাধি সম্পর্কীয় জিনিষ পত্র যিনিই নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারই অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তখন কু-সংস্কারও আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়।

প্রথমেই বলিয়াছি লর্ড কারনারভান সমাধি খোঁড়া হইতেই মারা যান। তোমরা হয়ত বলিবে এই একটা ঘটনা হইতে ইহা কিছুতেই বলা যায় না যে প্রাচীন মিশরীদের অভিসম্পাতেই লর্ড কারনারভানের মৃত্যু হইয়াছে। একজনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই যে ঐ কার্য্য অভিশপ্ত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। তোমাদের কথা মিথ্যা নয় আবার প্রাচীন মিশরীদের মৃতদেহ নাড়াচাড়ার কাজটিও অভিশপ্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি তোমাদের দুটি প্রমাণিক ঘটনার কথা বলিতেছি—শুন।

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে একটী কফিনের ডালা রক্ষিত আছে; ডালাটি একটি মমির উপরকার ঢাকনা; প্রত্নতাত্বিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন এই ডালাটির নিম্নে তিনহাজার পাঁচশো বৎসরের আগেকার প্রচীন মিশরদেবতা আমেনের মন্দিরের এক পুরোহিত পত্নী সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ডালাটির কারুকার্য্য অতি চমৎকার, তাহার তিনদিকে বিবিধ চিত্র অঙ্কিত, অন্য একদিকে সেই পুরোহিত পত্নীর একটি প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত আছে।

এই ডালাখানি কিরূপে সমাধিতল হইতে মনুষ্য হস্তগত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই, বোধ করি তস্করেরা মিশরের মৃতদেহের সমাধিমধ্যে যে সকল ধনরত্ন রক্ষিত হইত তাহারই লোভে সমাধি খুঁড়িয়াছিল এবং ধনরত্নের সহিত ডালাখানিও আনিয়াছিল। কত হাত ঘুরিয়া জানি না ডালাখানি একজন আরবের

ফুলদান



সমাধির মধ্যে এই কয়েকটি আসবাব পাওয়া গিয়াছিল

# মমির কাণ্ড

## [ প্রাচীন মিসরের সমাধি হইতে প্রাপ্ত চিত্রাবলী সহিত ]

আমার দেশের পাঠক পাঠিকা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ লর্ড কারনাভান কিছুদিন পূর্ব্বে মিশরে সমাধি খুঁড়িয়া মিশরের ভূতপূর্ব্ব অধিপতিদের মৃতদেহ ও তাহাদের সাজ সজ্জা বাহির করিয়াছিলেন। লর্ড কারনাভান বাঁচিয়া

দেবতার মানসিক পাত্র।



এই চিত্রাঙ্কিত পিত্তল, কাংশ নির্ম্মিত পাত্রদ্বয় একটি কক্ষে শিকল দ্বার ঝুলান ছিল। এইপাত্রের মধ্যে দেবতার অর্ঘ্য সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল।

স্তম্ভে অঙ্কিত মূর্ত্তির মস্তক।



রাজা তুতান-খামেনের সমাধির স্তম্ভের উপর এই মূর্ত্তিটি অঙ্কিত আছে।

থাকিলে বোধ করি আরও সন্ধান করিতেন, আরও বহু মৃতদেহ ও রাজকীয় উপাদান বাহির হইত কিন্তু তাহা হয় নাই, লর্ড কারনারভানকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে।

মিশরীদের এই নিয়ম ছিল, তাহারা মানুষের মৃতদেহকে এক অজ্ঞাত উপায়ে সুরক্ষিত করিয়া সমাধিস্থ করিত। এমনই সুরক্ষিত সে উপায় যে হাজার হাজার বৎসর পরে এখনও সমাধিতে সেই মৃতদেহ বা মমি মিশরের নানাস্থানে পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচীন মিশরীরা বোধ করি সেই হাজার বৎসর আগে জানিয়াছিল যে পৃথিবীতে কখনও না-কখনও প্রত্নতাত্ত্বিকের জন্ম হইবে, তাহাদেরই কৌতূহল নিবারণের জন্য সমাধিগুলি খুঁড়িয়া দেখা হইবে এবং একবার যদি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা একটি দ্রব্যেরও সন্ধান পায় তাহা হইলে সমস্ত মিশর খুঁড়িয়া ফেলিয়া মৃতদেহের সমাধি শান্তিভঙ্গ করিবে। তাঁহারা ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন; কেমন করিয়া জানিয়াছিলেন, জানি না, তবে পৃথিবীর ভবিষ্যদ্বংশীয়গণকে সতর্ক করিবার তরে একস্থানে প্রস্তরে লিখিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন, "আমার সমাধিতে হস্তার্পণ করিও না, আমার সুখ নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইলে ভাল হইবে না!" এই অভিসম্পাৎ আজ পর্য্যন্ত যে লোক সমাধিতে হাত দিয়াছে, বা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহারই উপর পড়িয়াছে।

ইংরাজরা এ সকল অভিসম্পাতে ভয় পান না, তাঁহারা ইহা কু-সংস্কার বলিয়া মনে করেন, কু-সংস্কারের বশে কোন কাজ করা বা কোন কাজ হইতে বিরত হওয়া তাঁহারা কাপুরুষতা মনে করেন। তাই নিষেধসত্ত্বেও তাঁহারা প্রাচীন মিশরীদের সমাধি খনন-কার্য্য বন্ধ করেন নাই, এখন সামান্য কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।



# অকৃত্রিম বন্ধুপ্রীতি

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপের অন্তর্গত সিরাকিউস নগরে ডায়োনিমিয়স নামক এক দুর্দ্দান্ত প্রজাপীড়ক নৃপতি বাস করিতেন। সেই সময়ে তথায় ডামন ও পিথিয়াস নামক দুই বন্ধু-বাস করিতেন। ইহাদের দুইজনের মধ্যে বিলক্ষণ বন্ধুতা ছিল। একদা ডায়োনিমিয়াস কোন কারণ বশতঃ ডামনের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।

ডামন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবন দীপ নির্ব্বাপিত হইবার আর বেশী দেরী নাই; সেজন্য তিনি বিনীত ভাবে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ আমার বাড়ী গ্রীসদেশে, আমি এখানকার অধিবাসী নই, মৃত্যুর পূর্ব্বে স্ত্রী পুত্রদিগকে একবার জন্মের মত শেষ দেখা দেখিয়া আসিতে ইচ্ছা করি; আমি পুনরায় নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া উপস্থিত হইব; আপনি কৃপা করিয়া আমার শেষ অভিলাষ পূর্ণ করুন।" নৃপতি ডায়োনিমিয়স উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—"যদি তুমি চলিয়া যাও, তাহা হইলে তোমাকে কি করিয়া পুনরায় ধৃত করিব ও তুমি যে পলাইবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি? তোমার কথায় আমি কিরূপে বিশ্বাস করি?" ডামনের পশ্চাদ্‌ভাগে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু পিথিয়াস দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি নীরবে এতক্ষণ উভয়ের কথোপকথন শুনিতেছিলেন। এক্ষণে রাজার নিকটে আসিয়া করুণ স্বরে বলিলেন—"মহারাজ আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে ডামনকে বিদায় দিতে পারেন, ডামন মিথ্যা কথা কাহাকে বলে তাহা জানেন না। যতদিন ডামন ফিরিয়া না আসেন ততদিন আমাকে জামিন স্বরূপ কারাগারে বন্দী করিয়া রাখুন, যদি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে আপনি আমার প্রাণ

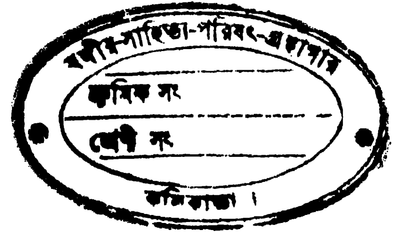
লইবেন।” পিথিয়াসের করুণা মাখা কথা শুনিয়া রাজা ডায়োনিমিয়স কোন রূপেই তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, তিনি ডামনকে বিদায় দিলেন।

ক্রমে ডামনের মৃত্যু-দিন ঘনাইয়া আসিল। কিন্তু ডামন আসিলেন না। যথা সময়ে ডামনের জন্য পিথিয়াস কারাগৃহ হইতে বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। শত শত লোক এই ব্যাপার দর্শন করিবার জন্য সেখানে ছুটিয়া আসিল, সমাগত লোকেরা ডামনের বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। নৃপতি ডায়োনিমিয়স বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন—“পিথিয়াস, তোমার বন্ধু কোথায়? তুমি কি মনে করিয়া ডামনের প্রতিজ্ঞা বিশ্বাস করিয়াছিলে? তুমি কি ভাবিয়াছিলে যে সে অন্যের জীবন অপেক্ষা অন্য কাহারও জীবন রক্ষা করিতে সমুৎসুক? হা দুর্ভাগ্য পিথিয়স, এই দেখ বন্ধুত্বের পরিণাম।” পিথিয়াস রাজার কথা শুনিয়া হাসিমুখে কহিলেন, “এঅতি অসম্ভব কথা! ডামন কখনও বিশ্বাস ঘাতক বা প্রতারক নহে; আমি তাঁহার অন্তর জানি, তাহার পক্ষে প্রবঞ্চনা করা অসম্ভব। নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে, নচেৎ বহু পূর্ব্বেই তিনি আসিয়া উপস্থিত হইতেন।” পিথিয়াসের কথা শেষ হইতে না হইতেই দূর হইতে—মারিও না—মারিও না, আমি আসিয়াছি। এরূপ একটা চীৎকার ধ্বনি শোনা গেল। সকলে উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া দেখিল যে ডামন অশ্বপৃষ্ঠে চড়িয়া অতি দ্রুত বেগে আসিতেছেন। ডামন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার বন্ধু পিথিয়াসকে আলিঙ্গন করিয়া বলিতেছেন—“ভাই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! তোমায় মরিতে হইবে না।” রাজা ডায়োনিমিয়স এই দুই বন্ধুর অকৃত্রিম বন্ধুতা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন

না, তিনি তৎক্ষণাৎ ডামনের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া দিলেন, এবং মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব দেখিয়া আমি অতিশয় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার প্রার্থনা তোমরা আমাকেও তোমাদের একজন বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর। যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য থাকিবে, যতদিন পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধু-প্রীতি ইতিহাসের বুকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শ্রীসুধাংশুশেখর গুপ্ত।

---




## চাট্‌নি।

### ডাক্তার ও রোগী।

রোগী (কাতরস্বরে)। ডাক্তার বাবু, আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না, শীঘ্রই এর একটা ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তার। না, আর বেশীদিন সহ্য করিতে হইবে না, আমি তাহারই একটা ভাল স্থায়ী রকমের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

ডাক্তারের কথা শুনিয়া রোগীর ত চক্ষু স্থির!

### প্রভু ও ভৃত্য

প্রভু (সরোষে পদাঘাত করিয়া) শালা শূয়রকা বাচ্চা, তোম্ হিঁয়াসে নিকাল্ যাও।

ভৃত্য—(করজোড়ে) হুজুর আপনি বাপ্ মা, সব্ই বল্‌তে পারেন।

## রুটীওয়ালা ও ধনী।

ধনী—ওহে, তোমার এই রুটিটার দাম কত ?

রুটিওয়ালা—আজ্ঞে, চার আনা।

ধনী—এ-দেশে কি রুটির এতই অভাব যে একটা রুটি চার আনায় বিক্রী হয় ?

রুটিওয়ালা—আজ্ঞে রুটির ত অভাব নাই তবে আপনার মত ধনী ক্রেতার খুবই অভাব!

## শিক্ষক ও ছাত্র।

শিক্ষক ( জনৈক ছাত্রকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে ) হতভাগা গাধাছেলে, ধেড়ে হয়ে উঠেছিস্ তবু একটা আঁকও শুদ্ধ করিয়া করতে পারিস্ না। তোর মত বয়সে ত স্যার আশুতোষ পাটীগণিতখানাই শেষ করে ফেলেছিলেন!

ছাত্র—( বেত্রাঘাতের স্থানে হস্তমর্দ্দন করিতে করিতে ) আর আপনার মত বয়সে ত বোধ হয় তিনি হাইকোটের বিচার পতিই হয়ে ছিলেন।

উত্তর শুনিয়া শিক্ষকমহাশয় আর কিছু বলিলেন না।

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ।

---

# মুলোছাঁই।

কোকর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাস ক'রত! তার পাঁচ মেয়ে। ব্রাহ্মণীর আবার শীগ্‌গির ছেলে হবে! একদিন সকাল বেলা, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ব'ল্লে "আমি কিছুদিনের জন্যে জগন্নাথপুর যাচ্ছি, ফিরে এসে যদি দেখি ছেলে হ'য়েছে, তাহ'লে ভাল, আর যদি মেয়ে হয়, তো তোমাদের দুজনকেই মেরে

ফেলবো"। ব্রাহ্মণ চ'লে যাবার কিছুদিন পরে ব্রাহ্মণীর একটী মেয়ে হ'লো। ব্রাহ্মণী তো ভয়ে সারা! সে দাইকে বল্লে, যে "তুমি মেয়েটাকে নিয়ে যাও," কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হ'ল না! শেষকালে কিছু টাকা দিতে সে মেয়েকে নিতে রাজী হ'ল। রাস্তায় যেতে যেতে দাই মনে মনে ভাবলে, 'মেয়েটাকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে আর কি হবে, তা'র চে'য়ে এই পাশের মুলোবনে রেখে দিয়ে আসি।' এই ভেবে সে মেয়েটাকে বনের মধ্যে রেখে দিয়ে চ'লে গেলো।

এখন সেই মুলোবনের ভিতর দিয়ে সেই দেশের নূতন রাজা শিকার কর্‌তে যাচ্ছিলেন, যেতে যেতে তিনি একটী ছোট ছেলের কান্না শুন্‌তে পেয়ে তাঁর একজন লোককে ব'ল্লেন, "দেখতো কোথায় ছেলে কাঁদ্‌ছে।" লোকটী তখুনি ছুটে গিয়ে দেখে এসে ব'ল্লে যে "মুলোবনের মধ্যে একটী সুন্দর মেয়ে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদছে।" রাজার শুনেই দয়া হ'ল, তিনি মেয়েটীকে তাঁর কাছে আন্‌তে হুকুম ক'র্‌লেন। রাজার হুকুম শুনে অম্‌নি তাকে আন্‌তে লোক ছুট্‌ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মেয়েটীকে রাজার কাছে এনে হাজির ক'র্‌লে। সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়েটী দেখে রাজার খুব পছন্দ হ'ল, তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

মুলোবনে প'ড়েছিল ব'লে রাজা তার নাম দিলেন, মুলোছাঁই। মুলোছাঁই ক্রমশঃ বড় হতে লাগল। রাজা একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন "আমি সাম্‌নের আষাঢ় মাসেই মুলোছাঁইকে বিয়ে ক'রবো। আর আমি তিনমাসের জন্যে ভ্রমণে যাচ্ছি, তুমি ভট্‌চার্য্যি ম'শায়কে ডেকে দিন ঠিক করে সব উদ্যোগ করে রাখবে আমি বিদেশ থেকে এসেই বিয়ে করব।" "যে আজ্ঞে" বলে মন্ত্রী চ'লে গেল।

রাজা বিদেশ ভ্রমণে লোকজন নিয়ে বেরোলেন। এদিকেও বাড়ীতে মহা ধুমধাম প'ড়ে গেল। রাজার বিয়ে! এতো আর যে সে লোকের বিয়ে নয়!

তখুনি ভট্‌চার্য্যি মহাশয়কে ডেকে বিয়ের দিন ঠিক হ'য়ে গেল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিমন্ত্রণ পত্র ছেপে এল, এবং দেশে বিদেশে রাজা রাজাড়াদের সব নিমন্ত্রন হ'তে লাগল। রাজার বিয়ে হ'চ্ছে শুনে দেশশুদ্ধ লোক তো আনন্দে নেচে উঠ্‌ল! এমনি ক'রে দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল এবং রাজাও বাড়ীতে ফিরে এলেন। বলা ভাল, রাজার আর এক রাণী ছিল, তাঁর নাম বড় রাণী।

আজ রাজার বাড়ীতে খুব ধুমধাম! চারিদিকে লুচি মণ্ডার ছড়াছড়ি। ছেলে বুড়ো সবাই আহ্লাদে আট্‌খানা। আজ রাজার বিয়ে। নবোৎখানায় নবোৎ বাজছে, ফুল-চন্দনের গন্ধে চারিদিক ভরে উঠেছে। দেশ বিদেশ থেকে রাজা রাজড়ারা, জরির পোষাক এবং হীরে-মুক্তোর গয়না প'রে সভা আলো ক'রে ব'সে আছেন, যথা সময়ে শুভলগ্ন-যোগে মুলোছাঁইয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে হ'য়ে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন বড়রাণীর দিদিমা রাজার ওখানে বেড়াতে এ৲। সে মূলোছাঁইকে দেখে বড়রাণীকে জিগ্‌গেস ক'র্‌লে যে, "ও কে?" বড়রাণী, মুলোছাঁইকে কুড়িয়ে পাওয়া এবং রাজার সঙ্গে তার বিয়ের কথা সব বল্লেন। বড়রাণীর দিদিমা তো সব শুনে রেগে উঠ্‌লেন এবং বড়রাণীর সঙ্গে, মুলোছাঁইকে সে গ্রাম থেকে সরিয়ে ফেল্‌বার পরামর্শ ক'র্‌তে লাগলেন। ঠিক তার পর দিন দুপর বেলা, রোদ্‌ ঝাঁ ঝাঁ ক'র্‌ছে, এমন সময় বড়রাণীর দিদিমা পুতুলওলী সেজে রাজার বাড়ির ভিতর ঢুকে চিৎকার করে ডাক্‌তে লাগল "পুতুল নেবে গো, পুতুল নেবে?" মুলোছাঁই শুনতে পেয়ে ছুট্রে এসে ব'ল্লে "দাঁড়াও, আমি কিন্‌ব।" একথা বলে যেম্‌নি পিছন ফিরে পুতুল দেখতে গেছে অমনি বড়রাণীর দিদিমা পিছন দিক্‌ থেকে একমুঠো ধুলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে মুলোছাঁইয়ের গায়ে ফেলে দিল; দেবামাত্র সে বেড়াল হয়ে গেল। বড়রাণীর দিদিমার পাল্‌কি আগে থেকেই সেখানে ঠিক করা ছিল, সে তাড়াতাড়ি মুলোছাঁইকে নিয়ে তাতে উঠে পড়ল।

পাল্কী করে যেতে যেতে কিছুদূরে একটা নদী দেখতে পেলে। মুলোছাঁইকে আবার মানুষ করে সেই নদীর কাছে নিয়ে গিয়ে ডুব দিতে বল্লে। ডুব দেবা মাত্র তার সব রূপ চলে গেল। তার পর কিছুদূরে আর একটা নদী দেখতে পেলে, আবার তাতে মুলোছাঁইকে ডুব দিতে বল্লে এবং ডুব দিতেই তার সব চুল উঠে গেল! এইরকমে একে একে তার রূপ, চুল সব গেল! তারপর মুলোছাঁইকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল। বাড়ীতে গিয়ে মুলোছাঁইকে ভুলাইবার জন্যে কটা ঝুম্‌ঝুমি কিনে দিলে! মুলোছাই আর কি করে? সেই ঝুমঝুমি কটী নিয়ে বাজাত আর গান করত ঃ—

"আমি ছিলুম্ রাজ-রাণী শুন, ঝুমঝুমি,
(আমি) পাঁচসের দুধের ক্ষীর খেতুম, শুন ঝুমঝুমি,
আমি শুতুম সোনার খাটে, শুন ঝুমঝুমি,
আমার নাম "মুলোছাঁই," শুন ঝুমঝুমি।"

এদিকে রাজা শীকারে গিয়েছিলেন, বাড়ীতে ফিরে এসে মুলোছাঁইকে না দেখতে পেয়ে বড়রাণীকে জিগ্‌গেস্ করলেন যে "ছোটরাণী কোথা?" বড়রাণী বল্লেন "এই ত ছিল, বোধ হয় তার নিজের ঘরে আছে!" রাজা বল্লেন "না ঘরে তো নেই! এই আমি দেখে আসছি!" বড়রাণী আশ্চর্য্যের ভাব দেখিয়ে বল্লেন, "অ্যাঁ! এরই মধ্যে তবে কোথায় গেল?" চারি দিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল! মুলোছাঁইকে খোঁজবার জন্যে রাজা নানাদিকে লোক পাঠালেন এবং নিজেও খুঁজতে বেরোলেন। নানাদেশ খুঁজে খুঁজেও যখন রাজা তার কোন সন্ধানই করতে পারলেন না, তখন মনের দুঃখে বাড়ীর দিকে ফিরলেন। বাড়ী আসতে রাস্তায় বড়রাণীর দিদিমার বাড়ী পড়ল। তিনি ভাবলেন যে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, দু'দিন এখানে জিরিয়ে তার পর বাড়ী যাবো'খন বলে তিনি

শ্বশুর বাড়ীতেই নামলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন যে একটী মেয়ে দেউড়িতে বসে ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে আর গাইছে :—

"আমি ছিলুম রাজার রাণী, শুন ঝুমঝুমি—ইত্যাদি

তার গান শুনে রাজার মুলোছাঁই বলে মনে হল বটে কিন্তু তাঁর সন্দেহও হতে লাগল।

রাজা এসেছেন খবর পেয়ে বড়রাণীর দিদিমা ছুটে এসে খাতির করে বসাল এবং বড়রাণীর ও বাড়ীর সব খবর জিগ্‌গেস করে তাঁর জন্যে জলখাবার আনতে গেল। জলখাবার এনে রাজাকে খেতে দিল। রাজা খাবার একটু খেয়ে আর সব মুলোছাঁইকে দিয়ে দিলেন। বড়রাণীর দিদিমা রাজার জন্যে যেই পাণ আনতে উঠে গেছেন, অমনি ছোটরাণী রাজার কাণে কাণে ব'ল্লে, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না? আমি যে 'মুলোছাঁই।' চল; এখুনি আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।" রাজা তখুনি নিজের পাল্কীতে মুলোছাঁইকে চড়িয়ে এবং নিজেও তাতে চ'ড়ে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লেন। মুলোছাঁই তার পুতুল কেনা, গায়ে ধুলো ফেল্‌তেই বেড়াল হওয়া, নদীতে চান ক'রে রূপ, চুল যাওয়া, তার পর আবার মানুষ হওয়া, সব কথাই রাজাকে ব'ল্লে। এইসব শুনে রাজা আবার মুলোছাঁইকে সেই নদী দুটিতে চান করাতেই ক্রমে ক্রমে তার রূপ, চুল আবার সব ফিরে এল। তার পর রাজা বাড়ীতে গিয়ে সব চাকরদের হুকুম দিলেন যে, বড়রাণী যেই ঢেঁকিতে ধান ভান্‌তে যাবে অমনি তাকে ঢেঁকির নীচে ফেলে পিষে ফেল্‌বে।" এ দিকে বড়রাণীকে গিয়ে ব'ল্লেন যে "তোমাকে আজ ধান ভান্‌তে হবে।" বড়রাণী যেমনি ঢেঁকিতে ধান ভান্‌তে গেছে, আর ওম্‌নি রাজার লোকেরা বড়রাণীকে ঢেঁকির নীচে ফেলে পিষে দিলে। তার পর রাজা বড়রাণীর মৃতদেহটা ভারে করে তার দিদিমার বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। বড়রাণীর

দিদিমা রাজার বাড়ী থেকে ভার এসেছে শুনে ছুটে এসে দেখে, যে রাজার লোকেরা সব চলে গেছে, শুধু ভারেতে কাপড় ঢাকা কি জিনিষ এবং তার উপরে একটা চিঠি রয়েছে। চিঠিটা খুলে প'ড়ে দেখ্‌লে যে, তাতে লেখা আছে "যেমন কর্ম্ম—তেমন ফল" এবং ভারের কাপড়টা খুলে দেখ্‌লে যে তার ভিতর বড়রাণীর মৃতদেহ! তখন সে সব বুঝ্‌তে পেরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল!

শ্রীঅমিতাসুন্দরী দেবী।

(—সাত বছরের মেয়ে—)





# প্রার্থনা।

আমারে দিয়েছ, প্রভু, আনন্দ প্রচুর,
সকল অভাব মোর করিবারে দূর।
পিতার আদর আর জননীর স্নেহে—
ভাই, বোন, সাথী ল'য়ে রোগহীন দেহে
দিন যায় হেসে খেলে আরামে কৌতুকে—
কোন দুঃখ নাহি মোর, আছি কত সুখে।
চিরদিন এমনি, হে, ভাল যেন থাকি,
তুমি আছ, ভালবাস, মনে যেন রাখি।
যে আমার মন্দ করে অপরাধ তার
অকপটে যেন আমি ক্ষমি বার বার।
সকলের প্রিয় হই, পাপ নাহি করি
সত্য সার করি বাক্য বলিতে না ডরি।
ঘুচাইতে পারি যেন দুঃখীর দুর্গতি,
সবারে বাসিতে ভাল দিও, দেব, মতি।

শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# লর্ড কর্ণারভন্

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ বোধ হয় শুনেছ মিশরের রাজা তুতান্খামেনের কবর আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু কে করেছে ও কেমন করে আবিষ্কৃত হয়েছে তা তোমরা বোধ হয় জান না। মিশরের লোকেরা তাদের মৃতদেহ একরকম ঔষধ লাগিয়ে তাকে অবিকৃত রাখত। একে মমী ফিকেশন্ বলে। এতদ্বারা তাদের দেহ শত সহস্র বছরে ও পচত না। কেন তাহাদের দেহ মমী করত্ তা তোমরা জান কি ? তাদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর কা বলিয়া একরকম আত্মা আছে সেই কা'এর জন্যে অবিকৃত রাখত্ নিজেদের দেহগুলিকে মমী করে। রাজারা মাটীর তলায় ঘর করে তাতে নিজেদের মমী ও তার ব্যবহার্য্য জিনিষগুলি রাখ্বার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু এসব মিশর যখন হাজার বছর আগে সভ্যতার আলোক পেয়েছিল, সেই সময়ের পরে মিশরের অধঃপতন সময়ে সেই সব কবরগুলো দস্যুদের দ্বারা লুঠ হয়ে যায়; বহুমূল্যধনরত্নাদির লোভে। তাদের মধ্যে তিনটা রক্ষা পেয়েছিল রাজা তথ্মেস্, রাণী খেঙ্ক্ষেরা ও মিশর সভ্যতার শেষ রাজা তুতুন্খামেনের। এই তিনের শেষ রাজার কবর লক্সর ( Luxor ) গ্রামে দুজন ইংরাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে আবিষ্কৃত হয়ে পৃথিবীর সভ্যদেশবাসীদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে দু-চার হাজার বছর আগে যখন সেই সব সভ্যদেশে নরখাদক অসভ্যদের বাস ছিল, তখনই মিশর সভ্যতার আলোক পেয়েছিল। এই দুজনের নাম লর্ড কর্ণারভন্ ও মিঃ হাউয়ার্ড কাটার। এঁদের আটবছর পরিশ্রমের ফলে মিশরের শেষ ফ্যারাও অর্থাৎ রাজার কবর বহুমূল্য রত্নাদির সঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই সব রত্নগুলো এখন পাওয়া যায় না। প্রায় সবই সোণা রূপোর ও

সুন্দর কাজ করা কিন্তু মাটির নীচের এই কবর আবিষ্কারের ফলে দূষিত বাষ্পে মিঃ হাইয়ার্ড্ কার্টার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ও কোন বিষাক্ত কীট দংশনে লর্ড কর্ণারভনকে তাঁর আটবছর প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল পাওয়ার চার মাস পরেই এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে। গত ৫ই এপ্রিল রাত দুটোর সময়ে কায়রো নগরে এই কর্ম্মবীরের মৃত্যু হয়েছে। ১৯শে মার্চ্চ কীট-দংশনে তাঁর রক্ত দূষিত হয় ও ২৯শে মার্চ্চ তাহা নিউমোনিয়ায় দাঁড়ায়। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি জ্ঞান হারান নি। লর্ড কর্ণারভন্ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি পঞ্চম আর্ল্। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ইনি লর্ড কার্ণারভন্ উপাধি পান। এঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র ও উত্তরাধিকারী হচ্চেন লর্ড পরচেষ্টার। যারা কোল্কাতায় ডিসেম্বর মাসে পোলো খেলা দেখেছ তাঁরা বোধ হয়, এঁকে দেখছ। এ বছর এজ্রা কাপ্ পেয়েছে সপ্তম হুসার্স, ইনি এদেরই কাপ্তেন্। ১৯২২ খৃষ্টাদের গোড়াতেও লোকে তাঁর নাম জানা আবশ্যক বোধ করত না, আর মৃত্যুর চারমাস আগে লর্ড কর্ণারভন্ এমন এক অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন যাতে তিনি লোকের মনে অমর হয়ে থাক্‌বেন। সুখের বিষয় হাউয়ার্ড্ কার্টার সুস্থ হচ্ছেন। তিনি শীঘ্রই মিশরে আবার আসছেন। পারি ত, পরে তোমাদের তুতান্‌খামেনের কবর কেমন করে আবিষ্কৃত হল—তা বল্‌ব।

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়।



# ইউরোপে কেন শান্তি হয় না?

ভার্সেলিসের সন্ধি অনুসারে জর্ম্মনী রাইন নদীর ধারে সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের মোতায়েন সৈন্যদলের সকল খরচা বহন করতে রাজী হয়েছিল। আমেরিকাও রাইন নদীর ধারে এক সৈন্যদল মোতায়েন রেখেছিল। ঐ সব সৈন্যদলের নাম—army of occupation. ফরাসীরা রূঢ় প্রদেশ আক্রমণ ও দখল করাতে মার্কিন গবর্ণমেণ্ট নিজেদের সৈন্য সরাইয়া লইয়াছেন। সৈন্য রাখাতে তাঁদের ঐ পর্য্যন্ত ২৫ কোটী ডলার বা ৮০কোটী টাকা খরচ পড়েছে। কথা ছিল জর্ম্মনী ক্ষতি পূরণ বাবদ যে টাকা দিবে তাহা হইতে ঐ খরচ শোধ হইবে। সম্মিলিত শক্তিপক্ষ তাঁদের army of occupationএর জন্য যা খরচ করেছেন, তার সবই ঘরে তুলেছেন কিন্তু মার্কিণের ঘরে আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও উঠে নাই। সম্প্রতি এই নিয়ে কথা উঠাতে, সম্মিলিত শক্তিবর্গ প্রস্তাব করেন, ভাই মার্কিণ, যুদ্ধের সময় তুমি জর্ম্মনীর যে সব জাহাজ ধরে রেখেছিলে, তাদের দাম তোমার খরচের বিল থেকে বাদ দাও।

মার্কিণ বেণের জাত; জবাব দিয়েছে—দাদা, সেটি হবে না। তোমরা নিজেদের বেলায় ত কই, তোমরা যে সব জাহাজ ধরেছিলে, তোমাদের খরচা থেকে তার দাম বাদ দাও নি—বরং খরচটা কড়ায় গণ্ডায় টাকায় পয়সায় আদায় করে নিয়েছ। নিজেদের বেলায় আঁটাসুটী, আমার বেলায় দাঁত কপাটী হলে চলবে কেন দাদা? আমার নগদ খরচ হয়েছে —নগদে শোধ চাই—অন্যকোন কিছুর বাবদ দিয়ে কাটান টাটান চলবে না। তবে হ্যাঁ, একেবারে দিতে বলছি না, ক্রমে ক্রমে কিস্তিতে কিস্তিতে পার, আমার আপত্তি নেই।"

বেগতিক দেখে, সম্মিলিত শক্তিবর্গ নাকি রাজী হয়েছেন, বলেছেন

জর্ম্মনীর কাছ থেকে যে ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় হবে, তাই থেকে মার্কিণকে বছরে ২ কোটি করে শোধ দেওয়া যাবে। তাঁরা যে টাকাটা হজম করেছেন তা থেকে তা হলে আর কিছু উগরাচ্ছেন না!

বলা বাহুল্য যুদ্ধের সময় শক্তিবর্গ যে জাহাজ গুলো ধরেছিলেন সে গুলো তাঁরা জার্ম্মনীর কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের মধ্যে ধরে নিয়েছেন। আমেরিকা ত আর ক্ষতিপূরণ থেকে কোন টাকা পায় নি, কাজেই তাদের ন্যায্য খরচের এক পয়সাও ছাড়তে রাজী নয়। ধারেরও না।

শ্রীধানি লঙ্কা।

---

## "মহাসমরে ভারতসেনা।"

বিগত ইউরোপের মহাসমরে আমাদের ভারতসৈন্যের বীরত্বের অনেক কথাই শুনিয়া থাকিবে। আজ আমি তোমাদিগকে আর একটি গল্প বলিব। গল্পটি এই ঃ—

১৯১৫ সালের শীতকালে একদিন ফরাসী ও ইংরেজ সৈনিকেরা বেলজিয়মের দক্ষিণদিকে একটি গ্রাম অবরোধ করিয়া দেখিতে পাইল যে জার্ম্মান-সেনা সম্মুখস্থ একটা বন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল, তবুও কোন পক্ষেরই হার জিত হইল না।

ক্রমে রাত্রি হইলে যুদ্ধ স্থগিত রহিল এবং উভয় পক্ষের সৈন্যগণ নিজ নিজ শিবিরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সমস্তদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তাহাদের শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল অতি শীঘ্রই সৈন্যেরা সকলেই ঘুমাইয়া পড়িল

জার্ম্মান সেনাপতি নৈশ আক্রমণের আশঙ্কায় বনের চারিদিকে তাঁহার শান্ত্রী-দিগকে পাহারায় নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শিবিরের ভিতরে বসিয়া একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী সেনাপতি কথোপকথন করিতেছেন!

ফরাসীসেনাপতি—নৈশ আক্রমণ বোধহয় সুবিধাজনক হইবে না, আপনার কি মনে হয়?

ইংরেজ সেনাপতি—কেন হইবে না? আমি এইমাত্র সংবাদ পাইলাম যে একদল ভারত সেনা আমাদিগকে সাহায্য করিতে আসিতেছে। তাহারা আসিলে অতি সহজেই বনটি দখল করা যাইবে।

ফরাসীসেনাপতি—ভারতসৈন্য অগ্রসর হইলে শত্রু পক্ষের শান্ত্রীদের নিকট নিশ্চয়ই ধরা পড়িয়া যাইবে।

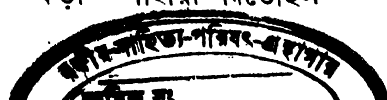
এই সময়ে সংবাদ আসিল যে ভারত সৈন্য আসিয়াছে ও যে কোন কাজ করিতেই তাহারা প্রস্তুত আছে।

তখন ইংরেজ সেনাপতি হাসিয়া তাঁহার ফরাসী বন্ধুকে বলিলেন, "এখন আমি আপনার নিকট এক শোভ্রিন্ (Sovereign) বাজী রাখিয়া বলিতে পারি যে ভারত-সেনা শত্রুপক্ষের শান্ত্রীদিগকে অতি সহজেই বিতাড়িত করিতে পারিবে।"

ফরাসী সেনাপতি—আমি ও বাজী রাখিলাম যে তাহারা কিছুতেই পারিবে না।

ইংরেজ সেনাপতি—আচ্ছা, দেখা যাউক্।

গভীর নিশিথে, কতিপয় ভারতসৈন্য শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িল সর্ব্বত্রই গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে, জার্ম্মান সৈন্যেরা সকলেই নিদ্রিত কেবল শান্ত্রীরা শিবিরের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া খুব "কড়া" পাহারা দিতেছিল



ফরাসী সেনাপতি তাঁহার ইংরেজ বন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উৎসুক নেত্রে অন্ধকারের ভিতরে বনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়াও কিছুই দেখিতে কিংবা শুনিতে পাইলেন না। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে "গুড়ুম গুড়ুম" করিয়া কয়েকটি বন্দুকের শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি আর্ত্তনাদ শুনা গেল। কিন্তু পরে সব নিস্তব্ধ।

ফরাসী সেনাপতি তখন তাঁহার বন্ধুর কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি ভারত সৈন্য অকৃতকার্য্য হইল?"

ইংরেজ সেনাপতি—কিছুকাল পরে সকলই জানিতে পারিব। বোধহয় আমিই বাজী জিতিয়াছি।

অনতি কাল পরেই দেখা গেল যে তাহারা ফিরিয়া আসিতেছে, প্রত্যেক দুই জনে কি যেন একটা কি বহন করিয়া আনিতেছে।

ফরাসী সেনাপতি ইংরেজ সেনাপতিকে বলিলেন,—ঐ দেখুন তাহারা পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে ও তাহাদের আহতদিগকে বহন করিয়া আনিতেছে।" কিন্তু তাহারা নিকটবর্ত্তী হইতে দেখা গেল, তাহারা ত্রিশ জন জার্ম্মান শান্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় বাঁধিয়া আনিতেছে। তাহারা এমন সুকৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া আনিয়াছে যে নিদ্রিত জার্ম্মান সৈনিকেরা ইহা জানিতে ও পারে নাই।

ফরাসী সেনাপতি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিশ্রুত বাজী ইংরেজ বন্ধুকে প্রদান করিলেন।

ঐ রাত্রিতেই ইংরেজ ও ফরাসীরা অতি সহজেই জার্ম্মান দিগকে পরাজিত করিয়া সেই বন দখল করিল।

আমাদের ভারত সেনা এরূপ বহু বীরত্বের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দানে ইংরেজ



ও মিত্র পক্ষের সৈন্যদিগকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছেন। বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অনেক ভারতসৈন্য অনেক পুরস্কার ও প্রাপ্ত হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া ক্রশ ( Victoria Cross ) নামক একটি পুরস্কার এতদিন কেবল ব্রিটিশ সৈনিকেরাই পাইতে পারিত কিন্তু বিগত দিল্লী দরবারের সময় আমাদের সদাশয় সম্রাট ঘোষণা করেন যে ইহা ভারত সেনা ও পাইতে পারিবে এবং গত মহাসমরে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া কতিপয় ভারত সৈনিককে বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ এই বিজয় চিহ্ন নিজ হস্তে পরাইয়া দিয়াছেন।

শ্রী অমূল্যচন্দ্র ঘোষ।

---

# উত্তম মধ্যম ও অধম।

( ১ )

১। যে তোমার অপকার ও অনিষ্ট করে, তোমার সহিত শত্রুতা করে, তুমি যদি তাহার সহিত সদ্ব্যবহার কর, তাহার হিত কর, তোমার ঘোরতর শত্রুকেও যদি ভাই বলিয়া আদর করিতে পার তবে তুমি উত্তম বলিয়া পরিচিত হইবে। অনিষ্টকারীর উপকার করার নামই উত্তম নীতি।

২। যে তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করে ও তোমার উপকার করে প্রতিদানে তুমিও যদি তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার কর, তাহার উপকার কর তবে মধ্যম বলিয়া পরিচিত হইবে। উপকারীর উপকার করার নাম মধ্যম নীতি।

৩ যে তোমার উপকার করে ও তোমার সহিত ভালব্যবহার করে

তাহার সহিত যদি তুমি অসদ্ব্যবহার কর, তবে তুমি অধম বলিয়া গণ্য হইবে উপকারীর অপকার করাকে অধম নীতি বলে।

( ২ )

১। যে বালক অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাহার পাঠ শিখিতে পারে এবং অনেকদিন মনে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহাকে—উত্তম বালক বলা যায়।

২। যে বালকের পাঠ আয়ত্ত করিতে অধিক সময় আবশ্যক হয় এবং ভুলিতেও অধিক সময় লাগে, সে মধ্যম বালক বলিয়া পরিচিত।

৩। যে বালকের পাঠ আয়ত্ত করিতে অনেক সময়—দরকার হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যেই ভুলিয়া যায় তাহাকে অধম বালক বলা যায়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

## শ্রমের ধন।

এক দরিদ্রা বিধবা রমণীর দুইটী পুত্র ছিল, তাহারা কাঠ কাটিয়া বাজারে বিক্রয় করিত, এবং তাহাদ্বারা অতি কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদিন অপরাহ্নে নিকটবর্ত্তী বন হইতে তাহারা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতেছিল, জননীর মাথায় একবোঝা কাঠ ছিল এবং প্রত্যেক পুত্রের মাথায়ই কতকগুলি কাঠ আটি বাঁধিয়া বোঝাই করিয়া দিয়াছিল, এই ভাবে তিন জনে তিন বোঝা কাঠ বহন করিয়া আনিতেছিল।

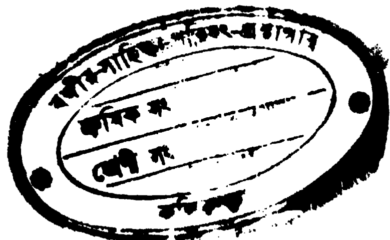
কিয়দ্দূর আসিয়া তাহারা দেখিতে পাইল, একজন মস্ত বড় ধনী সওদাগর নগর হইতে সেই পথে আসিতেছে। সওদাগর নিকটে আসিলে তাহারা

সওদাগরের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিল, কিন্তু সওদাগর ঐ বিধবা রমণীকে বলিলেন ঃ—"তোমার ভিক্ষা করিয়া খাইবার আবশ্যক নাই, তোমার পুত্র দুইটীকে আমার নিকট দাও, আমি অত্যল্প কাল মধ্যে ইহাদিগকে কি প্রকারে জ্বালানী কাঠ ও খড় দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত হইতে পারে সে বিষয় শিখাইয়া দিব।"

রমণী মনে করিল, সওদাগর তাহার সহিত কৌতুক করিতেছে, কিন্তু সওদাগর অতীব আগ্রহের সহিত বলিল যে, সে ইহার উপায় নিশ্চয়ই করিয়া দিতে পারিবে। তৎপর রমণী সওদাগরের কথায় সম্মত হইল ; সওদাগর পুত্র দুইটীকে তাহার সঙ্গে নিয়া গেলেন, বৃদ্ধা জননী কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

সওদাগর পুত্র দুইটীকে নিজ বাড়ীতে নিয়া বেত, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ঝুড়ি প্রভৃতি নির্ম্মান করিবার শিল্প বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। দুই বৎসরের মধ্যে বিধবার পুত্র দুইটী এই কারিগরি কার্য্যে অতিশয় নিপুণ হইয়া পড়িল, দুই বৎসর পরে সওদাগর তাহাদিগকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, উহারা দুই ভাই অনেকদিন পর জননীর সাক্ষাৎ লাভ করিল। তাহারা ঘরে বসিয়া নানাবিধ মনোহর ও মূল্যবান ঝুড়ি নির্ম্মাণ করিয়া সেই সওদাগরের নিকট বিক্রয় করিতে লাগিল, এবং এই ব্যবসায় দ্বারা তাহারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিল। সওদাগরের কথাই কার্য্যে পরিণত হইল।

---



# গোলাপী আতর।

জগতে যত রকমের পুষ্প আছে তন্মধ্যে গোলাপই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। গোলাপফুল পুষ্পের রাজা বলিয়া অভিহিত হয়। অনেক ফুল আছে যাহাদের গন্ধ অতি সুন্দর কিন্তু দেখিতে তেমন সুশ্রী নয়, আবার কোন কোন ফুল দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহাদের গন্ধ একেবারেই নাই। দেখিতে সুন্দর সুগন্ধযুক্ত ফুল অতি বিরল; পলাশ ফুল দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু তাহার মোটেই গন্ধ নাই। কিন্তু গোলাপ ফুল দেখিতেও যেমন সুন্দর ইহার গন্ধও তেমনি অতুলনীয়।

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় গোলাপ ফুল জন্মিয়া থাকে। বিলাতের সকল বাগানেই গোলাপ ফুলের গাছ আছে। গোলাপ ফুল অনেক রকমের আছে। সাদা, লাল, গোলাপী, প্রভৃতি বহুবর্ণের গোলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। গোলাপের গাছে অনেক কাঁটা আছে। গোলাপ ফুল হইতেই গোলাপ জল গোলাপ নির্য্যাস, গোলাপী আতর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মুসলমান রাজত্বকালে মোগল শাসনের সময় জাহাঙ্গীর নামে একজন রাজা দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ভারত শাসন করিতে ছিলেন। জাহাঙ্গীরের মহিষীর নাম ছিল নূরজাহান বা 'জগতের আলো'। এই রাজদম্পতী বড়ই বিলাসপরায়ণ ছিলেন। নূরজাহান স্নানের সময় জল সুগন্ধ করিবার জন্য স্নানের জলে গোলাপফুল ছড়াইয়া রাখিতেন, এবং সেই গোলাপগন্ধযুক্ত জলে স্নান করিতেন। একদিন তিনি স্নান করিয়া আসিবার পর ঐ গোলাপ ফুলগুলি স্নানাগারেই পড়িয়া থাকে, এই ভাবে প্রায় দুই তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্নানাগারে গোলাপ ফুলগুলি পড়িয়া রহিল। দৈবাৎ একদিন রাণী

দেখিতে পাইলেন যে স্নানাগারে জলের উপরিভাগে একপ্রকার তৈল ভাসিতেছে। তিনি স্বীয় রুমাল দ্বারা ঐ তৈলাক্ত জল উঠাইয়া আঘ্রাণ লইয়া দেখিলেন ইহাতে অতি মনোহর গন্ধ রহিয়াছে। তিনি অতঃপর ঐ তৈলাক্ত পদার্থটীকে "জাহাঙ্গীরের আতর" নামে অভিহিত করিলেন। এই দেশে ইহা আতর নামে প্রসিদ্ধ। ইউরোপীয়গণ ইহাকে "অটো" (Otto) বলিয়া থাকেন।

এইরূপে ভারতবর্ষেই সর্ব্বপ্রথম গোলাপী আতরের সৃষ্টি হয়। গোলাপ ফুল হইতে গোলাপজল প্রস্তুত করা যায়,কতকগুলি সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল একটী পাত্রের ভিতর ফেলিয়া অল্প পরিমাণে জলের সহিত পাত্রটিকে উত্তাপ দিলেই উহার ভিতর বাষ্প জমিতে থাকে। ঐ পাত্রের সহিত একটি নল দ্বারা অপর একটি শীতল পাত্রে যোগ করিয়া দিলে উক্ত নলের ভিতর দিয়া বাষ্প-রাশি শীতল পাত্রে প্রবেশ করে। শীতল পাত্রটীকেও আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে। ঐ বাষ্পরাশিই শীতল পাত্রে আসিয়া জলে পরিণত হয়, ইহাকেই গোলাপ জল বলা হয়।

এই গোলাপ জল হইতে আবার গোলাপী আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে গোলাপ জলকে একটী প্রশস্ত পাত্রে কয়েকদিবস রাখিয়া, পাত্রটী অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। রাত্রিতে জলের উপরিভাগে তৈল ভাসিয়া উঠে। এই তৈলাক্ত দ্রব্যটী অতি সতর্কতার সহিত উঠাইয়া লইলেই গোলাপী আতর পাওয়া যায়। ইহা বড়ই মূল্যবান পদার্থ, এক তোলা আতর প্রস্তুত করিতে বহুপরিমাণ গোলাপ ফুলের আবশ্যক হয়।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

———

# খুচরো খবর।

১২২৬ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় সাতশ বছর আগেও ইংলণ্ডের কাচের জিনিষ প্রস্তুত হইত এরূপ নজীর পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম ইংরাজী ডাক-টিকিটের রং ছিল কালো।

মিশর দেশে বিভিন্ন আকারের ৭৫টি পিরামিড আছে। তার মধ্যে একটি ৪৮১ ফুট উচ্চ।

মাছিদের পরমায়ু প্রায় পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত।

রুইমাছকে দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

১৯১৯ হইতে ১৯২৩ সন পর্য্যন্ত কনষ্টান্টিনোপলে সৈন্য প্রভৃতি রাখিবার বাবদ ইংলণ্ডের দুই কোটি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

হাতী প্রতিদিন আড়াই মণ খড় ভক্ষণ করিতে পারে।

তিমিমাছ প্রায়ই বাত রোগে আক্রান্ত হয়।

বহু বৎসর পূর্ব্বে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি প্রাসাদতুল্য বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। সম্প্রতি ঐ বাড়ীখানা মাত্র এক শত টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

ভিনিস সহরটি আশীটি দ্বীপ ও চারশো সেতুর উপরে স্থাপিত।

কথা কহিবার সময়ে মানুষের চুয়াল্লিশটি বিভিন্ন মাংসপেশী সঞ্চালিত হয়।

ইংরেজী ভাষায় এমন বিশ হাজার শব্দ আছে যাহার উৎপত্তি ফরাসী ভাষা হইতে।

১০০১ সনে বেলুনে চড়িয়া গগন-পর্য্যটকেরা ৩৫১০০ ফুট উচ্চে উঠিয়াছিল। আর আজকাল এরোপ্লেনে চড়িয়াও ৩৪০০০ ফিটের উপরে অদ্যাপিও কেহ উঠিতে পারে নাই।

গত যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে ৯,৪৯৬,৩৭০ লোক সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৯৪৬,৬২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৫৩ সনে প্রথম নিউইয়র্ক সহরে লিফ্‌ট যন্ত্র প্রদর্শিত হয়।

---

## খবরাখবর।

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত, তাহা জানিতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছা হয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত লোকের তুলনায় আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কত ইহা জানিতে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা জগতের বিভিন্ন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির একটি তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। সব চেয়ে শিক্ষিত লোক বেশী আছেন, চারটি দেশে ইংলণ্ড, আমেরিকা, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে। এই দেশগুলিতে একশত জনের মধ্যে কেবল একটি লোক অশিক্ষিত, বাকী নিরানব্বই জনই শিক্ষাপ্রাপ্ত। অষ্ট্রীয়ায় শতকরা একানব্বই, হল্যাণ্ডে শতকরা নব্বই, বেলজিয়মে অষ্টআশি আয়ারল্যাণ্ডে একাত্তর, ইতালীতে ছাপান্ন, রাশিয়ায় পঁচিশ আর আমাদের ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র পাঁচটি লোক শিক্ষিত। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পৃথিবীর মধ্যে আমাদের দেশের লোকই সব চেয়ে বেশী অশিক্ষিত। পৃথিবীর লোক যখন এই তালিকা দেখে তখন কি ভাবে বল ত?

* * * * * *

আমাদের দেশে শিক্ষাকার্য্যে প্রত্যেক লোক পিছু বার্ষিক কত খরচ করা হয় জান? মাত্র একটি আনা, চারিটি পয়সা। আমেরিকার প্রত্যেক লোকের

শিক্ষার জন্য তথাকার সরকার বারো টাকা ব্যয় করেন। আমেরিকার লোক যে শিক্ষা বিষয়ে অগ্রণী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

* * * * *

তোমরা সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার নাম শুনিয়াছ। আগে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা বিলাতে বসিত ; যাঁহারা সেই পরীক্ষা দিতেন, তাঁহাদের বিলাতে গিয়া পড়িতে হইত। গত বৎসর হইতে এই পরীক্ষা ভারতেই বসিতেছে। এই পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র উত্তীর্ণ হন, গবর্ণমেণ্টের বড় বড় চাক্‌রী পাইতে তাঁহাদের কোনই বেগ পাইতে হয় না। তোমরা সচরাচর দেখিবে যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ, প্রভৃতি যত উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী প্রায় সকলের নামের পশ্চাতে একটি করিয়া I. C. S. লেখা আছে। I. C. S. এর আসল নাম হইতেছে Indian Civil Service ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিস। এই পরীক্ষার উপর দেশের কত ছেলেদের যে লোভ পড়ে, তাহার সংখ্যা নাই। অনেকের ভাগ্যেই এই পরীক্ষা দেওয়া ঘটিত না, কারণ বিলাতে থাকিয়া পড়িতে যে খরচ হয় সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে তাহা সহজ সাধ্য নয়। এখন সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা এখানে গৃহীত হইলেও বিলাতে গিয়া কতকগুলি নূতন করিয়া শিক্ষা পাইতে হয় তাহাও অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। তবে বড় লোকের ছেলেদের পক্ষে সে ব্যয়টা বেশী না ও হইতে পারে।

* * * *

এই বৎসর এলাহাবাদে I. C. S. পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেনঃ—বালকৃষ্ণ আয়ার ( মাদ্রাজ ) শৈবালকুমার গুপ্ত ( বাঙ্গালা ) এস্ বসু (বাঙ্গালা) রঘুবর দয়াল ( যুক্ত প্রদেশ ) বিষ্ণু সহায় ( যুক্তপ্রদেশ ) বালকৃষ্ণ পিলাই ( মাদ্রাজ ) জগদীশ্বর নিগম ( যুক্ত প্রদেশ ) জে, এম তালুকদার ( বাঙ্গালা ) বি সি মুখোপাধ্যায় ( বাঙ্গালা। )

ব্রিটিস সাম্রাজ্যের প্রধান ছিলেন বোনার ল। অতি অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি এই মহা সম্মানের পদ পাইয়াছিলেন কিন্তু বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে অধিকদিন সম্মান-ভোগ লিখেন নাই, ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া তাঁহাকে মহাসম্মানীয় পদও ত্যাগ করিতে হইল। মিঃ বোনার ল'র কার্য্যকালে বিলাতের অনেকগুলি কর কমিয়া গিয়াছিল, তাহাতে বিলাতের জনসাধারণ তাঁহার খুবই পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিল। বিলাতে শ্রমিকদের এখন খুবই প্রতিপত্তি, তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া কোন কাজ করা যায় না, করিলেও ফল হয় না। তাই যখন মিঃ বোনার ল পদত্যাগ করিলেন, তখন যদিও লর্ড সভার অন্যতম প্রধান সভ্য লর্ড কার্জ্জনই প্রধান মন্ত্রীর পদ পাইবেন বলিয়া গুজব রটিল— শ্রমিকরা বিরুদ্ধমত প্রচার করিতে লাগিল! তাহারা বলিল যে, হাউস্ অব লর্ডসে তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই, সেখানে তাহাদের পক্ষ লইয়া লড়িতে পারে এমন লোক একজনের থাকা দরকার, তাই তাহারা সকলে একবাক্যে মিঃ ষ্ট্যানলি বলডউইনকে প্রধান মন্ত্রী করিতে চাহিল।

সম্রাট্ রাজা পঞ্চম জর্জ্জ শ্রমিক দলের মত জানিতে পারিয়া সেই দিনই অপরাহ্নে মিঃ ষ্ট্যানলি বলড্উইনকে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকেই প্রধান অমাত্যের পদে নিযুক্ত করিলেন। লর্ড কার্জ্জনের আর প্রধান মন্ত্রী হওয়া হইল না।

মিঃ ষ্ট্যানলি বলড্উইন একজন পাদ্রীর পৌত্র; তাঁহার পিতা একজন প্রসিদ্ধ লৌহ ব্যবসায়ী ছিলেন। মিঃ বলডউইন নিজেও লোহার কারখানা, কয়লার খনি, গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালক ছিলেন। ১৯০৮ সালে মিঃ বলডউইন পার্লামেণ্ট সভায় সভ্যের পদ পান; ১৯০৭সালে লয়েড জর্জ্জ যখন প্রধান মন্ত্রী, তখন তাঁহাকে এক মন্ত্রীর

পদ দেওয়া হয়; তারপর ১৯২১সালে বলডউইন বোর্ড অব ট্রেডের ( ব্যবসায় সমিতির ) সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। লয়েড জর্জ্জের পর মিঃ বোনার ল যখন প্রধান মন্ত্রী হন তখন মিঃ বলড্উইনকে তিনি একেবারে অর্থ সচিবের পদে অভিষিক্ত করেন। অর্থ সচিবের পদ পাইয়াই তিনি এমন কতকগুলি কাজ করেন, যাহাতে সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হয়। গত মহাযুদ্ধের ক্ষতি পূরণ লইয়া ব্রিটনের মার্কিনের সহিত মনকষাকষি চলিতেছিল, বলড্উইন তাহা মিটাইয়া একটা সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর এই বৎসরেই তিনি লোকের আয়কর কমাইয়া দেন, চা-প্রভৃতির উপর গবর্ণমেণ্টের যে ট্যাক্স ছিল, তাহাও কমাইয়া সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছিলেন।

ইহাঁর বয়স এক্ষণে ৫৫ বৎসর। ৫৫ বৎসর বয়স শুনিয়া তোমরা যেন তাঁহাকে বৃদ্ধ ভাবিও না। বিলাতের লোকের কাছে ৫৫ বৎসর বয়স, এমন কিছু বেশী নয়। আমাদের ভারতবর্ষ—বাঙ্গালা নয় যে ৫৫ বছর বয়সে লাঠি ধরিয়া কুঁজা হইয়া কোন গতিকে সেখানের লোককে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। বিলাতের লোকের এই বয়স প্রায়ই জীবনের মধ্যাহ্ন কাল, অস্তের বিলম্ব অনেক।

* * * *

বাজেট্ ( Budget ) কাহাকে বলে তোমরা জান কি? বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবকে ইংরাজীতে বাজেট বলে। তবে বছর কাটিয়া গেলে সারা বছরের যে হিসাব নিকাশ হয়, তাহা বাজেট নহে, বছর আসিবার আগেই বড় বড় প্রতিষ্ঠান আগামী বছরের মোটামুটি একটা আয় ব্যয়ের হিসাব করিয়া রাখেন তাহাকে বাজেট বলে। গবর্ণমেণ্ট বাজেট করেন, মিউনিসি-প্যালিটি বাজেট করেন, বড় বড় ব্যবসায়ীরা ও বাজেট করেন। বাজেট করার

উদ্দেশ্য যে সারা বছর ধরিয়া সেই অনুপাতেই খরচ করা হইবে ; এরূপ হিসাব করিয়া না রাখিলে শেষ কালে হয়ত বছর কাটিয়া গেলে দেখা গেল, বিস্তর টাকা বেশী খরচা হইয়া গিয়াছে। যাহাতে এরূপ না হয় সেই জন্যই প্রথম হইতে একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া রাখা হয়।

* * * *

এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির বর্ত্তমান ১৯২৩।২৪ সালের বাজেটে মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে যত স্কুল, মেয়ে হাসপাতাল, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসালয় আছে সকলগুলিতে চরকা প্রচলনের জন্য অর্থসাহায্য করা হইবে বলিয়া একটা থোক্ খরচা ধরা হইয়াছে। স্কুলের ছেলেরা যাহাতে চরকা কাটা শিখিয়া সূতা প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার শিক্ষা বিদ্যালয় হইতে দেওয়া উচিত। চরকার উপকারিতা যে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরাও ক্রমশঃ বুঝিতেছেন, ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই। হয়ত শীঘ্রই বাঙ্গলা দেশেও এইরূপ হইতে দেখা যাইবে।

* * * *

চরকার প্রতি কাহারো বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, থাকা উচিৎ ও নয়। চরকা মানুষকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলে। চরকার সাহায্যে সূতা কাটিয়া তাঁতে কাপড় বুনিয়া আমরা নিজ নিজ ব্যবহার যোগ্য কাপড় সংগ্রহ করিতে পারি। ইহাতে খরচ ও যেমন কম হয়, আপন হাতে বা আপন ঘরে প্রস্তুত কাপড় পরিতে আনন্দও হয় তেমনি প্রচুর। আর একটা বিশেষ কথা, পাতলা পাতলা কাপড় জামা পরিয়া বাবু সাজিবার সখ কমিয়া মোটাভাত মোটা কাপড়েই লোকে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে। আমাদের দেশে, আমাদের ঘরে যে মোটা ভাত ও মোটা কাপড় উৎপন্ন হয় তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!"

ইহাই আমাদের প্রত্যেকের মূলমন্ত্র হওয়া উচিৎ।

* * * *

অনেক ছেলে মেয়ে ছেলে বুদ্ধির বশে অথবা ছেলে খেলা করিয়া যে ডাক টিকিট একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আবার ব্যবহার করে শুনিতে পাই। হয়ত টিকিট-টায় ডাকের ছাপ পড়ে নাই, পড়িলেও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই—ছেলেরা সেই টিকিটখানাকে কাজে লাগাইয়া সামান্য কয়টা পয়সা বাঁচাইয়া আনন্দলাভ করে। কিন্তু এরূপ করা অন্যায়, পাপ! একবারের বেশী ব্যবহার করা নিয়ম নাই। ছাপ না পড়িলেও টিকিটখানা দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা অনুচিত। ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি আদৌ ভালো নহে, যে ফাঁকি দিতে চায় সে নিজেই ফাঁকে পড়ে আর জাল জুয়াচুরি করা কাহারই উচিৎ নহে।

সেদিন একটী লোক এই কাজ করিয়া ধরা পড়িয়া আদালতের বিচারে এক বছরের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ পাইয়াছে। সামান্য কয়টা পয়সার জন্য দেখ ত একবার!

* * * *

বিলাতের উনআশী বছরের একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোক বায়স্কোপে চর্লি চ্যাপলিনের হাসির ফিল্ম দেখিতে দেখিতে হাসিতে হাসিতে মারা পড়িয়াছেন। হাসিতে হাসিতে মৃত্যু বোধ হয় জগতে এই প্রথম হইল! এই ফিল্মটী যাহাতে এদেশে না আসে তাহারই ব্যবস্থা করা উচিৎ কি বল?

* * * *

ইংলণ্ডের রয়ডন নামক স্থানে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এক নগরপাল

মৃত্যুকালে ১০০ পাউণ্ড রাখিয়া উইল করিয়া যায় যে সে দেশে ঐ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর চারিটি কনেকে যৌতুক দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর যে সকল বিবাহ হইবে তাহার মধ্যে চারিজন কনেকে বাছিয়া ঐ যৌতুক দেওয়া হইবে। যে কনে বয়সে সব চেয়ে ছোট, যে কনে সকলের বড়, যে কনে সব চেয়ে ঢেঙ্গা এবং সব চেয়ে বেঁটে—হইবে তাহাদের চারিজনকে যৌতুক দেওয়া হইবে এই জন্য গির্জায় বিবাহ—ক্রিয়া সম্পন্ন হইলেই প্রত্যেক কনের মাপ লওয়া হয়; তাহাদের পায়ের জুতা ও চুলের বেণী খুলিতে হয়। তার পর বৎসরের শেষে স্থানীয় পাদরী হিসাবনিকাশ করিয়া যাহাদের যোগ্য মনে করেন—তাহাদিগকেই ঐ যৌতুক দেওয়া হয়! কি মজা!

* * * *

১৫ পনের বৎসর বয়স্ক এক বালক সেদিন একটি সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা খুবই দুঃসাহসিকতার কাজ; কিন্তু ইহার ভিতরেও বালকের যথেষ্ট মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বালকের একটি পঙ্গু ভগিনী আছে; তাহার অস্ত্রোপচার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু এই অস্ত্রোপচার বড়ই ব্যয়সাধ্য বলিয়া এতদিন তাহা হইয়া উঠে নাই। বালক ইহার জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে নানা উপায়ের অনুসন্ধান করিতেছিল। শেষে সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া সে ৫০ পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থাৎ সাড়ে শত টাকা বাজী জিতিয়াছে। শুধু পীড়িতা ভগিনীর চিকিৎসার জন্যই বালক প্রাণের মায়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়া এমন অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিল—ইহাই তাহার মহত্ত্ব। বালকের এই অপূর্ব্ব মহত্ত্বের কথা শুনিয়া একজন ডাক্তার বিনা পয়সায় তাহার ভগিনীর চিকিৎসা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বীরত্ব এবং মহত্ত্ব উভয়ই প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই।

# চিত্র পরিচয়।

## সার হুবার্ট ভন হারকোমার, সি-ভি ও, আর এ।

## ( ১৮-৯-১৯১৪ )

### দুঃসময়

এই চিত্রটির চিত্রকর যিনি তাঁর ভূমিষ্ঠের কালে তাঁহার পিতা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন "এই বালক আমার বিশেষ বন্ধু ও একজন চিত্রকর হইবে।" এ কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছিল। হারকোমার চিত্রকর ত হইয়া ছিলেনই তাঁহাদের পরিবার যখন দুঃখে দারিদ্রে অবসাদ গ্রস্থ, তখন হারকোমারই চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া পরিবার মধ্যে শান্তি ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছিলেন।

১৩বছর বয়সের সময় হারকোমার সাউদাম্পটনের চিত্র স্কুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, সেই বছরই প্রতিযোগিতায় একটি পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে বৃদ্ধ হারকোমার পুত্রকে লইয়া জার্ম্মেনীত ফিরিয়া আসেন, পুত্র এই সময়ে কয়েক মাস একজন প্রোফেসরের কাছে কাজ করেন। ১৮৬৬ সালে আবার তাঁহারা ইংলণ্ডে আসেন, হারকোমার সাউথ কেনসিংটনে আবার শিক্ষা আরম্ভ করেন। কিন্তু অধিকদিন শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁহার অদৃষ্টে জুটে নাই, সংসার চালাইবার জন্য তিনি নিজে একটি ছোট-খাট শিল্প বিদ্যালয় খুলিয়াছিলেন। তার তিনবৎসর পরে হারকোমার ডাণ্ডি গ্যালারীতে প্রথম চিত্র প্রেরণ করেন, সেই বৎসরই তিনি ইংলণ্ডের রাজধানীতে আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছিলেন।

হারকোমার চিত্রকর ছিলেন, সেই সঙ্গে শিল্পজ্ঞান ছিল তাঁহার অসাধারণ। তিনি সকল রকম চিত্র ত আঁকিতেনই, তা ছাড়া, তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর, বাদক, নাট্যকার ও অভিনেতা।

এই চিত্রখানি মনোযোগসহ দেখিলে বুঝিবে দুঃসময়ে মানুষের দেহ মনের মধ্য হইতে কি করুণ সুরই না বাজিয়া উঠে। চিত্র-অঙ্কিত মানুষগুলিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, শিল্পী তাঁহাদের প্রাণ দিয়া দেখিয়াছেন, প্রাণ দিয়া আঁকিয়াছেন। ঐ-যে পুরুষ, দুঃখে দুর্দ্দশায় পড়িয়াও যে অসীমের দিকে চাহিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছে, আর পদনিম্নে অপগণ্ড শিশুসহ নারী চিরদূর্ব্বলা নারী—বেদনার ভারে দুঃখের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলেই মনে হয়, জগদ্বীশ্বর! কেন তুমি দুঃখীকে গড়িয়াছিলে দয়াময়! সবাই কেন জগতে সুখী হইল না?

ফ্রান্‌স হলস্ (১৫৮৩-১৬৬৬)

## সুরের হাওয়া

বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী রেমব্রাণ্ড জন্মিবার বিশবৎসর পূর্ব্বে হলস্ জন্মগ্রহণ করেন এবং তৎকালীন সমস্ত শিল্পীকে স্বীয় প্রতিভাবলে পরাজিত করিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

এই শিল্পীর সম্বন্ধে কথিত আছে তিনি অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়াও অত্যন্ত ভালমানুষ হইয়া বড়ই দুঃখে পড়িয়াছিলেন, তবুও তিনি বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই কাল কাটাইয়াছেন। ইহার শেষ জীবনে সহরের মুরুব্বি লোকেরা তাঁহার সমস্ত খরচ বহন করিত, এমন দুর্দ্দশায় তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল।

ছবিখানি দেখ—সুরের হাওয়ায় পশুরাজ সিংহ ইন্দুরকে পর্য্যন্ত মুগ্ধ করিয়া টানিয়া আনিয়াছে। হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া সবাই একই মোহে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার অঙ্গুলি স্পর্শে সুর বাজিতেছিল ক্রমে সে নিজেও মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এত দুঃখ-দুর্দ্দশার জীবন যাপন করিয়াও চিত্রে কি আনন্দময় দৃশ্যই না দেখাইয়াছেন, সাধারণ মানুষ বোধ করি এতটা কল্পনা করিতেও পারিত না!

যেন তাঁহার মধ্যেও—সুরের হাওয়া চলে পবন বেয়ে
সুরের আলো ফেলে ভুবন ছেয়ে—
তাই তিনি এমন ছবি আঁকিতে পারিয়াছেন।



# ধাঁধার উত্তর।

## গত মাসের ধাঁধার উত্তর ঃ—

১। জামরুল। ২। আছাড়। ৩। প্রদীপ। ৪। ঘড়ী। ৫। পাশা।

নিম্নলিখিত গ্রাহক গ্রাহিকাগণ জ্যৈষ্ঠের ধাঁধার উত্তর দিতে পারিয়াছেন ঃ—

কুমারী স্নেহলতা সেন, কলিকাতা; সুকুমার মুখোপাধ্যায়, শিয়াখালা; কালীকমল লাহিড়ী, জৌনপুর; সুরেশপ্রসন্ন রায়, খুড়দা রোড; রসময় দাস, নবিগঞ্জ; অনিলকুমার গোস্বামী, নবদ্বীপ; নিতীশচন্দ্র মল্লিক; আর্য্যকুমার গুপ্ত, প্রভাতকুমার গুপ্ত; ক্ষিতীশচন্দ্র মল্লিক, কলিকাতা; লালমোহন ও লক্ষ্মীকান্ত মুখোপাধ্যায়; ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগলকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়; বৈদ্যবাটি বালক-সমিতির সভ্যগণ; শ্রীহরিদাস রায়, ধানবাদ; সন্তোষকুমার গুপ্ত, জেমসেদপুর; কানাইলাল মুখোপাধ্যায় (টুনু) পাটনা; বিজয়া দেবী, পাটনা; সত্যপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাজসাহী, ঘোড়ামারা; উমাদেবী, পাটনা; অরুণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, বিহার-শরিফ্; সমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, লক্ষ্ণৌ; প্রভাতকুমার সেন, বিহার-সরিফ; চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরিয়া; দেবদত্ত বসু, বাজে শিবপুর, হাওড়া; সতীশচন্দ্র মল্লিক, ভবানীপুর; সুধাংশুশেখর গুপ্ত, ঢাকা; সুনীলচন্দ্র নিয়োগী, উল্টাডিঙ্গী; অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভ্যাবলা; ফণীন্দ্রচন্দ্র সান্ন্যাল, উল্লাপাড়া; শচীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা; দীনেশচন্দ্র গুপ্ত, উয়ারী, ঢাকা, দুর্গাবতী দেবী ভ্যাবলা; সুধীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ রায়, বেহলা; সুধীরকুমার কর, কুমিল্লা; অমিয়ভূষণ সেনগুপ্ত, শিলচর; হাসিরাণী মিত্র, কলিকাতা; সাবিত্রীবালা রায়, কলিকাতা; শচীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; প্রতিভাবালা দেব, বড়লিখা; প্রবুদ্ধ সমিতির বালক সভ্যগণ, সেনহাটী; রবীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; মায়াময়ী মজুমদার, কলিকাতা; হরেন্দ্রমোহন শেঠ, কলিকাতা; রামকৃষ্ণ মজুমদার, অমূল্যকুমার রায়, টিপারা; আবদাস সামাদ খাঁ চৌধুরী, সাতক্ষীরা; মনোময় বন্দ্যোপাধ্যায়, টিটাগড়;

কুমারী বেলা বসু, মুঞ্জুলিকা পালিত, বেতুড় জাতীয় বিদ্যালয়; কুমারী বীণাপাণি রায়, দিনহাটা; এরসাদ আলি চৌধুরী, দিনাজপুর; মীনারাণী দাসগুপ্তা, বিহার-সরিফ; বিজয়গোপাল দত্ত, অজয় গোপাল রায়, সাতক্ষীরা; শান্তি দেবী পাটনা; অজিতকুমার সিংহ রায়, মান্দড়া; বলাইকৃষ্ণ গোল, হুগলী; সুকুমার মুখোপাধ্যায়, বলাগড়; অন্নপূর্ণ সেন, ইতিনা; মহীতোষকুমার পাল, কৃষ্ণনগর; পরিমলবালা বসু; সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম; সোণামুখী জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ; ইন্দ্রনাথ শর্ম্মা, সরেঙ্গঘাট; চিত্তরঞ্জন সিংহ, শিলচর; বারিবালা দেবী, বর্দ্ধমান; বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ, ঝাউকুঠি, ভাগলপুর; বিজনরাণী রায়, চট্টগ্রাম; ভূপেন্দ্রনাথ ঘটক, কানপুর; মুকুন্দলাল গোস্বামী, কলিকাতা; শচীরাণী দেবী, রাজনন্দগাঁও; নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় চোধুরী, ঢাকা; চন্দ্রবিলাস মুখোপাধ্যায়, ঢালগ্রাম; বিমলাবালা সেন ও রবীন্দ্রকুমার সেন, দামোদর; সলিলকুমার মিত্র, কলিকাতা; সরোজপ্রতিমা বসু, চন্দননগর; ভাবলার তিনটি Banerjee; শৈলেন্দ্রনাথ গুপ্ত, হাওড়া; সুষমা চৌধুরী, কলিকাতা; বেলা দত্ত, খানখানাপুর; নির্ম্মলাবালা ঘোষ, ঢাকা; উষা মিত্র নীলিমাসুন্দরী বড়ুয়া, গৌরীপুর, শচীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা; অনুসূয়া দেবী রামনগর (বেনারস ষ্টেট্) অজিতকুমার মিত্র; কানাইলাল মুখোপাধ্যায়, টালা; সলীলচন্দ্র সেন, সাতক্ষীরা; মঙ্গলচরণ গাঙ্গুলী, গোরক্ষপুর; অজয়নাথ রায় চৌধুরী, কলিকাতা; দেবেশচন্দ্র মুন্সী, টুন্ডু; সুকুমার মিত্র, কাশী; নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত, পুরী; নিবারণচন্দ্র দত্ত, কলিকাতা; নীলিমারাণী ঘোষ, গোরক্ষপুর; সুধীন্দ্রকুমার বসাক, কলিকাতা; হিমাংশুভূষণ গাঙ্গুলী, ভট্টপুর; লীলাবতী দেবী, তেলিরবাগ; কুমারী বিভাবতী মুস্তফী, সিমলা; বিনয়েন্দ্রনাথ দাশ; ভবানী রায়, বগুড়া; বিধুভূষণ শীল, কলিকাতা; সুনীলচন্দ্র নিয়োগী, কলিকাতা; সত্যেন্দ্রনাথ বসু টালিগঞ্জ; রবীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, পোরজনা; বটকৃষ্ণ সাহা ও যতীন্দ্রনাথ আঢ্য, আলিপুর; ব্রজেশচন্দ্র গুহ, কুমিল্লা; অমরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য্য, ভবানীপুর; রাজেন্দ্রনাথ সরকার, বাতিয়াখালি; শৈলবালা দেবী; মহম্মদ এজাহার মণ্ডল, ভ্যাবলা।

---



রূপ
সৌন্দর্য্য
ও
লাবণ্য
বর্দ্ধনে

বেঙ্গল পার্ফিউমারীর

তুষারীভূত সৌন্দর্য্যদ্রব্য

# ═ ॥ হিমানী ॥ ═

নিদাঘের স্নিগ্ধ সুগন্ধি অঙ্গরাগ পদ্ম পত্রের ন্যায় শীতল স্পর্শ ও সন্তাপহারক, ব্রণ মেছেতা নাশক, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুষ্টিকারক— কান্তি বিবর্দ্ধক।

— বিশেষ দ্রষ্টব্য —

'হিমানী'র অনেক নকল বেরিয়েছে কেনবার সময় একটু দেখে নেবেন। আর দেখবেন পুরস্কার কুপনটী ঠিক আছে কিনা। দাম ৶০ আনা।

## শর্ম্মা বানার্জ্জী এণ্ড কোং

৪৩ নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা।

# এস্, কে, বর্ম্মণের

# পেটেণ্ট ঔষধালয়

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার

আপনি কি ব্যবহার করিয়াছেন? কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার **এস্, কে, বর্ম্মণের** স্থবাসিত তরল আল্‌তা "**অলোকা**" বাংলায় যুগান্তর আনিয়াছে। **অলোকার** সুখ্যাতি বাংলার ঘরে ঘরে—কারণ

**অলোকা**—গন্ধে স্থায়ী

**অলোকা**—চাক্‌চিক্যে অদ্বিতীয়

**অলোকার** মধ্যে সোণার আভা লুকাইয়া থাকে।

মূল্য কিন্তু ॥০ আট আনা মাত্র। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

ডাক্তার—**এস্, কে, বর্ম্মণ**

৫ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।




## "কুপন"




ডাক্তার—**এস্, কে, বর্ম্মণ,**

৫ নং তারাচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট,

সিন্দুরিয়াপটী, কলিকাতা।

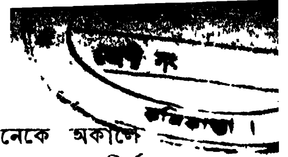
মহাশয়,

পত্রবাহক দ্বারা আপনার কুপন পাঠাইলাম। এক শিশি **অলোকা** তরল আল্‌তা বিনামূল্যে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ডাকযোগে লইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে ডাক মাশুল ও রেজেষ্ট্রী খরচ বাবদ ।০ চারি আনার টিকিট অগ্রিম পাঠাইতে হইবে।

নাম :—

ঠিকানা :—





পল্লীগ্রামে, অগণিত ব্যক্তি কত কষ্টভোগ করিতেছে, অনেকে অকালে জীবন হারাইতেছে, কত লোক উপর্য্যুপরি ম্যালেরিয়া আক্রমণে জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় জীবন্মৃত হইয়া প্রাণধারণ করিয়া আছে মাত্র :—

সেই কারণ অনেক দিন যাবৎ এই ভয়ানক জ্বররোগের একটি উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ মহোপকারী ঔষধ আবিষ্কার করাইবার চেষ্টায় থাকিয়া অবশেষে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি।

কয়েক বৎসর ধরিয়া অসংখ্য নানাভাবের জ্বরগ্রস্ত রোগীদিগকে এই মহৌষধ সেবন করাইয়া চূড়ান্ত পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে।

মফঃস্বলের সকল প্রধান স্থানে, বিশেষতঃ যথায় ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ অধিক, তথায় এই মহৌষধ বিক্রয়ার্থ রাখিবার বিপুল আয়োজন করা গিয়াছে।

## ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে এজেণ্ট লইব।

পত্র লিখিলে কমিশনের নিয়মাদি সম্বন্ধীয় অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইবেন।

মূল্য ছোট বোতল ১৲ ও বড় বোতল ১॥০ দেড় টাকা।
" ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা। " ডাঃ মাঃ ৮৵০ আনা।

## এই মহৌষধ

প্রত্যহ শতাবধি রোগীকে আমাদিগের ৭৭ নং বেণিয়াটোলাস্থ বাটী হইতে বিতরণ করিয়া আসিতেছি। এতদ্ব্যতীত আমাদিগের ঘুঘুডাঙ্গার বাগান বাটী হইতে অসংখ্য রোগীকে প্রতি রবিবার ঔষধ বিতরণ করা যাইতেছে।

## ঔষধের ফলাফল দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

অত্যল্পকাল মধ্যে আমাদিগের এই মহৌষধ ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা ঔষধের আর কি উৎকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

**মফঃস্বল হইতে প্রতিনিয়ত ভূরি ভূরি প্রশংসাপত্র ও আরোগ্য সমাচার আসিতেছে।**

---

১২০।১২১ নং খেঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, চিনাবাজার, কলিকাতা।

# পৃথিবীর ইতিহাস
## চিত্রে ও গল্পে

নিম্নলিখিত বইগুলি প্রকাশিত হইয়াছে
( ৬০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে )

১। ইংলণ্ড

২। বৈদিক ভারত

৩। গ্রীস

৪। ব্রহ্মদেশ

৫। জাপান

প্রতি সংখ্যা ১৲ টাকা।



# পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে

## গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী।

পোষ্টেজ বাবদ ২৲ দুই টাকা পাঠাইলেই মাসিক গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। মাসিক গ্রাহকদের প্রতি মাসে যে কয় সংখ্যা প্রকাশিত হইবে তাহা ভি, পি, ডাকে ঐ কয়খানির মূল্য ১৲ হিসাবে ধার্য্য করিয়া পাঠান হইবে। গ্রাহকদের ভি, পি, পোষ্টেজ, প্যাকিং, মনিঅর্ডার প্রভৃতি চার্জ্জ বাবদ আর কিছু লাগিবে না। ঘরে বসিয়া পুস্তক মূল্যেই তাহারা বই পাইবেন। প্রতি সংখ্যা ভি, পিতে পাঠাইতে হইলে প্রায় ।৶০ অতিরিক্ত লাগে, সে ছয় আনা আমরাই দিয়া দিব মাত্র দুই টাকা পোষ্টেজ বাবদ পাঠাইলে (ছয়খানা বইয়ের পোষ্টেজে তাহা কাটিয়া যাইবে) গ্রাহকেরা ১ খানি বই পোষ্টেজ ফ্রি পাইবেন। নিয়মিত গ্রাহকদের এত সুবিধা আজ পর্য্যন্ত আর কেহ দিতে পারেন নাই এ সুযোগ হারাইবেন না।

আজই গ্রাহক হউন।

## PLAN.

পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে
- সৃষ্টিরহস্য ১০ খণ্ড = Romance of Creation.
- নানাজাতির ইতিহাস ৫০ খণ্ড
  - দেশের ইতিহাস ১৫ খণ্ড
  - বিদেশের ইতিহাস ৩৫ খণ্ড



শিশুপাল বধ।

# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। শ্রাবণ, ১৩৩০

## পারস্য।

সেকালে পারস্য দেশ পৃথিবীর মধ্যে নানা বিষয়েই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। কোথায় গ্রীস? কোথায় মিশর? কোথায় ভারতের সিন্ধুনদ? এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেকালের পারস্য রাজ্যের সীমা। আর সেকালের একজন প্রসিদ্ধ পারস্যের বাদশাহ, মনে করিয়া লও, যদি রাজা দরায়ুসই এখন ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে কি দেখিতেন? দেখিতেন পারস্য এখন অতি ক্ষুদ্র সীমাভুক্ত দেশ। কোথায় মিশর! কোথায় গ্রীস! কোথায় বা সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্য! প্রাচীন পারস্যদেশের তুলনায় বর্ত্তমান পারস্য সাম্রাজ্য অতি নগণ্য—বলিলেও চলে! সেকালের বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বর্ত্তমান পারস্য দেশ শুধু তাহার নামটুকু লইয়া বাঁচিয়া আছে বলিতে হয়।



উপাসনা। (১)

পারস্যের রাজধানী তিহারাণ সহরটী প্রাচীন হইলেও পারস্যের রাজধানী রূপে ইহার খ্যাতি একশত বৎসরের বেশী নহে। তিহারাণ সহরটী পারস্য



উপাসনা।—(২)



উপাসনা ।—(৩)

দেশবাসীর কিন্তু অতিশয় প্রিয়, দেশের বড় ধনী, জমিদার, আমির, ওমরাহ কবি, বৈজ্ঞানিক, সকলেই এই রৌদ্রালোকঝলসিত শান্ত, শীতল সহরটীতে বাস করিতে ভালবাসেন। সহরটী সর্ব্বদাই জনকোলাহলে পরিপূর্ণ। কোথাও ভিস্তিওয়ালা ভিস্তিভরা জল লইয়া গৃহস্থের দরজায় আঘাত করিতেছে, কোথাও অন্ধ ভিখারী পথের মাঝ দিয়া লাঠীতে ভর করিয়া পথিকের নিকট ভিক্ষা চাহিতে চাহিতে ধীর মন্থর গতিতে চলিয়াছে, কোথাও ফলের দোকানে ভিড়



উপাসনা।—(৪)



হাতুড়ে হকিম

জমিয়া গিয়াছে, তোয়ালে ও নানা রং বেরঙের কাপড় কাঁধে করিয়া ফেরী-ওয়ালা পথে পথে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে, কোন মস্‌জিদের বারেন্দায় বসিয়া মৌলভি সুর করিয়া "কোরাণসরিফ" পাঠ করিতেছেন। কোথাও ভাত ও মাংস প্রস্তুত করিয়া হোটেলওয়ালা পথিকের প্রতীক্ষা করিতেছে। কোথাও হাতুড়ে হকিম বা হকিম রমণী কোন রোগীর পৃষ্ঠে চোঙ লাগাইয়া রক্ত-মোক্ষণের চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বত্রই এইরূপ সজীবতা বিদ্যমান।

সেকালে পারস্যে যেমন শুধু জাতীয় ভাষা এবং কোরাণ সরিফ পাঠ শেষ হইলেই শিক্ষা একরূপ শেষ হইত, এখন তাহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখনও সহরের অনেক গণ্যমান্য সুপণ্ডিত মৌলভিগণ প্রাচীন আদর্শানুসরণ করিয়াই শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু নবীন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে সে রীতির বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আরব্য ও পারস্যভাষার সহিত কোন কোন বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষায় ও শিক্ষা দেওয়া হয়; সাধারণতঃ প্রত্যেক সহরেই বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলির অবস্থান একটু বিচিত্র রকমের। হয়ত পথের এক পাশে দোকান, আর অপর দিকে বেত্র হস্তে মৌলভি মহাশয় ছাত্রদিগকে পাঠ্য পুঁথিতে মনঃ সংযোগ করিবার জন্য তাড়না করিতেছেন। আবার এক পাশে মাঠের মাঝখানে একজন ধার্ম্মিক মুসলমান উপাসনায় মননিবেশ করিয়াছেন।

এখানে স্ত্রী শিক্ষারও খুব চলন হইয়াছে; এখানে মেয়েদের বিবাহের বয়সও পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজ ও আমেরিকার অনেক খ্রীষ্টানপাদ্রীরাও পারস্যের প্রধান প্রধান নগরে মিসনারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। এ সব বিদ্যালয়েও যেমন সাহিত্য, অঙ্ক ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি গান বাজনা প্রভৃতি বিবিধ ললিত কলার ও শিক্ষাদান হইয়া থাকে। দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে থাকিতে



পারস্যের জননী ও সন্তানগণ।

একটি মহিলা রগ বুনিতেছেন।



চরকায় সুতা কাটা হইতেছে।

একখানি রগ।

থাকিতে পারস্যের নারী সমাজের যে সবলাতাটুকু হারাইয়া গিয়াছিল, বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা ফিরিয়া আসিতেছে। অই দেখ শিক্ষিতা জননী ফুলের মত শুভ্র ও সন্তান দু'টীকে কেমন সুন্দর ভাবে খেলা দিতেছেন।

পারস্য দেশের কার্পেট অত্যন্ত বিখ্যাত—একথা পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই জানেন। শুধু কার্পেট নয়—রেসম শিল্প ও বস্ত্রাদির জন্যও তাহাদের পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। ঐ দেখ, একটী প্রাচীনা রমণী কেমন করিয়া সূতা কাটিতেছেন। আপনার দেশের বস্ত্রাদির জন্য পারস্যের লোকেরা আজ পর্য্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন নাই, একি কম গৌরবের কথা। তাহারা স্ত্রীও পুরুষ রগ, কার্পেট বস্ত্র ইত্যাদি বয়ন করিয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়েই,' আপনাদের লজ্জা নিবারণ করে।

পারস্য দেশের নগরসমূহের মধ্যে রাজধানী তিহারাণ ও মেসেদ্ প্রধান। মেসেদ্ পারস্যের একটী প্রধান নগর। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকট ইহা একটী প্রধান তীর্থ স্থান। তোমরা আরব্য উপন্যাসের গল্পে যে সুপ্রসিদ্ধ হারুণ-অল-রশিদ রাজার গল্প পড়িয়াছ এই সহরেই তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। এখানকার রেশম, কার্পাস, মখমল এবং কার্পাস অত্যন্ত বিখ্যাত। নিশাখুর, তাব্রিজ, সুলতানাবাদ, হামদান্, বন্দর-আব্বাস, কার্মেন, বোগদাদ্, বুশায়ার, সিরাজ, ইস্পাহান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ও সমৃদ্ধ বন্দর ও নগর।

সিরাজ—পারস্যের একটী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র। গোলাপফুলের জন্য দেশ বিদেশে ইহার খ্যাতি। এখানকার গোলাপি আতরের ন্যায় উৎকৃষ্ট আতর পৃথিবীর আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাদি ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে হাফেজ দুই বিখ্যাত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

# গো-ভূত।

## প্রথম দৃশ্য।

গ্রামের লাইব্রেরী ঘর,—সন্ধ্যাবেলা।

নীলমণি, ননিলাল, গোবর্দ্ধন, রসিক আর শ্যামলাল এই পাঁচজন ছোকরা মিলে একটা লাইব্রেরী তৈরী করেছে। ঘরে আছে,—দুটো আলমারী, তার প্রায় দেড়ভাগ বইয়ে ভর্ত্তি; দুখানা চেয়ার, তার একখানার পেছনের ঠেস্ দেবার কাঠখানা ভাঙা, একখানা তক্তাপোষ আর একখানা তেপেয়ে টেবিল,—একটা কোণ দেওয়ালের দিকে ঠেস্ দিয়ে রাখা।

ননিলাল। দেখ ভাই, আজ অনেকদিন পরে আমরা একসঙ্গে মিলেছি;—আজ আমাদের লাইব্রেরীর জন্মদিন,—যার জন্যে আমাদের অনেক—খাট্‌তে হয়েছে। এই গোবর্দ্ধন কি কম কষ্ট সহ্য করেছে? চাঁদা আদায় কর্‌বার জন্যে—

গোবর্দ্ধন। (বাধাদিয়ে) সে কথা একশ'বার। এগ্রামে কি তেমন 'বুঝদার' লোক আছে? চাঁদা চাইতে গেলে, কোনও বুড়ো চশমা খানা চোখ থেকে খুলে নিয়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকে—তারপর বলে, চাঁদা!—চাঁদা কিসের বাপু, বারোয়ারীর জন্যে নাকি? আমি উত্তর করি, না, লাইব্রেরী জন্যে। তখন বুড়ো মুখ ফিরিয়ে বলে, ওসব 'লাইবেরালি টাইবেরালি' হবে না বাপু। এই রকম করে তো ভাই চাঁদা আদায় কর। যারা দেবে বলে স্বীকার করে,

তারাও যদি নিয়মমত দেয়, তাহলেও সহ্য হয় ; তা' নয় আজ গেলে বলে কাল, কাল গেলে বলে পরশু, এইরকম।

শ্যাম। যাহোক্, আমরা এখন লাইব্রেরীটাকে দাঁড় করিয়েছি, কি বল ?"

রসিক। নিশ্চয়ই, শুধু দাঁড় করানো,—এইবার হাঁটবার উপক্রম কর্‌ছে ; কিছুদিন বাদে আবার দৌড়বে !

ননি। ( দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর ভাবে ) নাহে না, ঠাট্টার কথা নয় ; আমাদের এই চেষ্টা—এটা কি কম গৌরবের কথা ! আমরা এই পঞ্চপাণ্ডব মিলে যখন গীত গোবিন্দের পদাবলী, ভীষণ প্রতিহিংসা, আর মেঘনাদবধ কাব্য—এই তিনখানা বই নিয়ে লাইব্রেরী আরম্ভ করি, তখন কে ভেবেছিল যে সেই লাইব্রেরী আজ একশ' উনপঞ্চাশ খানা বইয়ে পূর্ণ হবে। এ শুধু আমাদের গৌরব নয়,—বাঙ্গালী জাতের গৌরব !

নীলমণি। এটা খুব সত্যি কথা ; কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রামের ছেলেদের এবিষয়ে একটুও চাড় নেই। আজ এমন দিনে সকলের এখানে আসা দরকার—খাওয়া দাওয়া আমোদ করা দরকার, কিন্তু কোথায় কি ?

গোবর্দ্ধন। হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু সেটা নিছক ফাঁক যাবে না ; অন্যরকমে হবে। আজ সুরেন বাবুর মেয়ের বিয়ে—সেখানে তো সকলের নেমন্তন্ন আছে।

নীলমণি। কারসঙ্গে কি—তুমি একটি আস্ত গ, রয়ে, হ্রস্বউ।

রসিক। সেটা বলে তুমি মিছে কষ্ট পেলে। ওর বাবা মা—বুঝে সুজেই—তো ওর নামকরণ করেছিলেন। সুধীরকে যেমন আদর করে 'সু' বলে ডাকে কুমুদকে 'কু' আবার কথ'নো কখনো 'কুমণি' বলে, তোমরাও তেমনি আদর করে ওকে—'বর্দ্ধন' টুকু বাদ দিয়ে ডেকো, তাহলে গালদিয়ে আর মান হানির—মোকদ্দমায় পড়্‌তে হবে না।

গোবর্দ্ধন। মুখ আছে বলে নাও, কাণ আছে শুনে যাই। তা'রপর তোমরা আজ উঠ্‌বে—রাত্তির তো হয়ে এল। সুরেন বাবুর বাড়ীতে বিয়ে জাহির করার অনেক ফুরসুৎ পাবে 'খন।

[ সকলে ওঠ্‌বার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌ল!

শ্যামলাল। ( এদিক ওদিক ঘুরে ) আরে যা—দরজার কুলুপটা গেল কোথায়? এখন কি হবে, সকলে চলে গেলে, দরজা যে খোলা থাক্‌বে!

রসিক। বোধহয় কুকুরে নিয়ে গেছে।

শ্যাম। আরে থাম, থাম। আচ্ছা গোবর্দ্ধন তুমি তো দরজা খুলেছিলে তারপর চাবি-কুলুপ রাখ্‌লে কোথায়?

গোবর্দ্ধন। ( মাথাচুলকিয়ে ) হ্যাঁ,—হ্যাঁ—এইতো—দরজাতেই যেন লাগিয়ে রেখেছিলুম মনে হচ্ছে।

ননিলাল। খুঁজে দেখ না, এদিকে ওদিকে কোথাও পড়ে আছে কি না।

শ্যাম। উঁ-হুঁ—কোথাও নেই।

ননিলাল। তাহ'লে এখন হবে কি?

রসিক। হবে আর কি—দড়িরূপ কুলুপ দ্বারা গেরোরূপ চাবি লাগাও ইতি রূপক-কর্ম্ম-ধারয়, অর্থাৎ যে কোন রূপেই কাজ চালাতে হবে।

শ্যাম। ( হতাশ ভাবে ) কাজে কাজেই; কিন্তু গোবর্দ্ধন তুমি এর জন্য দায়ী—চুরি যদি কিছু যায়—

গোবর্দ্ধন। চুরি, আরে, চোরের এমন সাহস হবে যে এখান থেকে চুরি! তা ছাড়া আমরা নেমন্তন্ন খেয়ে এই পথেই তো ফিরব, তখন না হয় করবে? একটা কুলুপ জোগাড় করে লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

রসিক। নিশ্চয়, গোবর্দ্ধন সাহসী আছে। আমরা কি ডরাই সখা ভিখারী চোরেরে ?

[ লাইব্রেরীর দরজার কড়া দুটোতে দড়ি বেঁধে সকলে চলে গেল ]

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুরেনবসুর বৈঠকখানা। রাত্রি প্রায় বারোটা।

আমাদের পঞ্চপাণ্ডব একদিকে বসে গল্প করছে। খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

গোবর্দ্ধন। ওঃ রাত যে অনেক হয়ে গেল ; সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। ননি তোমার বাড়ী তো ওপাড়ায় একলা যাবে কেমন করে ?

রসিক। ব্যাটা ছেলে একলা আবার কি ? ভূতে ধরে নাকি ?

নীলমণি। আচ্ছা তোমরা ভূতে বিশ্বাস কর ?

গোবর্দ্ধন। (শুষ্কস্বরে) ভূত! হ্যাঁ—তা—না একটু আধটু করি বই কি ?

রসিক। অ্যাঁ—ভূত বিশ্বাস কর ? আরে ছি—কেলেঙ্কোরিয়াস ব্যাপার! এই গো-বর্দ্ধনটা নেহাৎ পাড়া গেঁয়ে ভূত দেখ্ছি।

ননি। একেবারে। ভূত বলে কোনও জিনিস আছে নাকি ? আমি তো জানি ছেলেরা দুষ্টুমি করলে মায়েরা তাদের শাস্ত করবাব জন্যে ভূতপেত্নি জুজুবুড়ির আমদানী করেছে।

শ্যাম। আরে না না অতটা অবিশ্বাস করবার জিনিস নয়! আজকাল আমেরিকাতে এই বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে! ভূতই হোক আর যাই হোক ঐ ধরণের কিছু একটা আছে নিশ্চয়।

গোবৰ্দ্ধন। কিছু একটা কি! ভূত আছে নিশ্চয় আমি নিজের চোখে দেখেছি।

ননি। কোথায় হে কোথায়?

গোবৰ্দ্ধন। কোথায় আবার। আমাদের লাইব্রেরী যে খানটায় তারই কাছাকাছি জায়গায়।

শ্যাম। ওসব এখন থাক্। রাত অনেক হয়ে গেছে। লাইব্রেরীর কথায় একটা কথা মনে পড়্ল। গোবৰ্দ্ধন কুলুপ জোগাড় করেছ! লাইব্রেরীর দরজা খোলা আছে, সেটা ভুলে যাওনি বোধ হয়?

গোবৰ্দ্ধন। হ্যাঁ. কুলুপ তো জোগাড় করেছি। তা তোমরা এত রাত্রে আবার সেদিকে যাবে নাকি?

শ্যাম। যাব না? বাঃ—রাত্রে দরজা খোলা পেয়ে চোরে যদি সব বা'র করে, নিয়ে যায়?

রসিক। ভাই হে আমাকে বর্খাস্ত কর্লে হয় না কারণ একপেট খেয়ে এত দাপাদাপি আমার বরদাস্ত হচ্ছে না।

শ্যাম। তা' হয় না—এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে নেই যে দাদা!

[ সকলে চলে গেল ]

---

## তৃতীয় দৃশ্য।

লাইব্রেরী ঘরের সম্মুখ,—রাত্রি বারোটা।

দরজায় কুলুপ নেই দেখে, একজন ভিন্‌গাঁয়ের ছিঁচকে চোর ঘরের ভেতর ঢুকছে; আর ঠিক সেই সময় গোবৰ্দ্ধন, শ্যামলাল প্রভৃতি সেখানে এসে উপস্থিত

হ'ল। গোবর্দ্ধনের একহাতে কুলুপ চাবি আর এক হাতে কালিপড়া একটা লণ্ঠন।

গোবর্দ্ধন। (দরজার কাছে গেল, তার পর তুই লাফে পেছু হেঁটে এসে) ও বাব্বা—

শ্যাম। কি হে?

গোবর্দ্ধন। ঘরের দরজা যে খোলা! দড়ি বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলুম: কে খুলে ঘরের ভেতর ঢুকেছে।

শ্যাম। (গোবর্দ্ধনের জামা ধরে) তাই না কি?

ননি। আঃ, তোমরা ভারী ভীতু তো? ভূত কখনো দরজা খুলে ঘরে ঢোকে? ভেতরে গিয়ে দেখ্‌লেই হয়। ঘরে কে ঢুকেছে।

রসিক। (একেবারে সকলের পেছনে সরে গিয়ে) সে কথা বলে কষ্ট পেয়ে দরকার কি, নিজেই ঢুকে দেখ না।

ননি। তুমি ও তো দেখতে পার!

রসিক। তা তো পারি, কিন্তু দেখ্‌ব না ইচ্ছে করে। তোমাদের সাহসের বহরটা একবার পরখ করা দরকার।

নীল। যাক্—গোলমালে দরকার নেই। এস সকলে মিলে দেখি—ঘরে কে ঢুকেছে।

গোবর্দ্ধন। সেই সবচেয়ে ভাল কথা।

রসিক। তা হ'লে ভাই লণ্ঠনধারী গোবর—এগিয়ে চল—নইলে অন্ধকারে দেখ্‌তে পাই না যে!

গোবর্দ্ধন। এই নাও লণ্ঠন, তুমি এগোও।

নীল। আঃ—আবার গোলমাল করে। গোবর্দ্ধন ভায়া, লণ্ঠনটা যখন তোমার হাতে আছে তখন তোমারই আগে যাওয়া উচিত।

রসিক। খুব উচিত—তা না হ'লে শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যায়—গরুর ল্যাজটা সাম্‌নে চলে আসে আর চোখ দুটো পেছনে চলে যায়!

[ গোবর্দ্ধন অনিচ্ছা সত্বেও লণ্ঠন হাতে ঘরের ভিতর ঢুক্‌ল। চোর পালাবার পথ বন্ধ দেখে দুটো আলমারীর মাঝখানে অন্ধকার কোণে ধাপাটি মেরে বসে রইল ]

ননি। ও গোবরা লণ্ঠনটা তুলে ধর্‌, কিছু দেখতে পাই না যে!

গোবর্দ্ধন। ( লণ্ঠন চোখের সামনে তুলে ধরে ) এই দেখ না—ভা‹ করে।

রসিক। কই গো গোবর বাবু—ভূত কই?

শ্যাম। কই ভূত?

গোবর্দ্ধন। ( চোরের প্রায় সাম্‌নে লণ্ঠন তুলে ) তাই তো কই ভূত?

( চোর বেগতিক দেখে, লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বল্লে—"এই ভূত" )

গোবর্দ্ধন। ( লণ্ঠন ফেলে দিয়ে ) ওরে বাবারে—ভূ-উ-উ-ত—

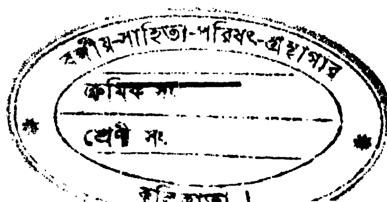
ননি। ও—ও—ও।

শ্যাম। অ্যাঁ—অ্যাঁ—

[ সকলে পরস্পরকে জড়িয়ে ধর্‌ল; চোর সুবিধে দেখে চম্পট দিল ]

রসিক। ( গা ঝাড়া দিয়ে সরে দাঁড়িয়ে ) বাবা—এ শুধু ভূত নয়—গো—ভূত!

শ্রীহরিদাস ঘোষ।



# 'মায়া।'

## ( ১ )

সেই সে কালের কথা বলছি। নারদ মুনির নাম বোধ হয় তোমরা সকলে শুনেছ। মেয়েরা কেউ ভয়ে তাঁর নাম করে না। নাম করবার দরকার হ'লে বলে মুনি "গোঁসাই" আর না হয় বলে, "কুঁদুলে ঠাকুর" তাদের ভয়ের কারণ এই যে যেখানে নারদ ঋষির নাম হয়, সেখানে নাকি খুব ঝগড়াঝাটী হয়। নারদ ছিলেন নারায়ণের সবচেয়ে প্রিয় ভক্ত। পুরাণে তাঁকে ব্রহ্মার মানস পুত্র বলে।

একদিন নারদ ঠাকুর বিষ্ণুলোকে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল রূপ দেখতে গেছেন। তখন একটী ঘরের ভিতর নারায়ণ বিছানায় শুয়ে ছিলেন, আর লক্ষ্মীদেবী তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু একটা হাসি ঠাট্টার কথাও হচ্ছিল। নারদের সেখানে অবারিত দ্বার। একেবারে সেইখানে গিয়ে হাজির হ'লেন, আর তাঁর উদ্দেশ্যও তাই কি না, যে লক্ষ্মীনারায়ণকে এক সঙ্গে দেখবেন, কিন্তু নারদকে আসতে দেখে লক্ষ্মী উঠে গেলেন। নারায়ণ নারদকে আদর ক'রে বসতে বল্লেন। নারদ কিন্তু না বসেই বল্লেন, "ঠাকুর, আমি মায়ামুক্ত উদাসীন ঋষি, আমাকে দেখে মা লজ্জায় এ ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন, এতে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল।" নারায়ণ সে কথায় কাণ না দিয়ে বল্লেন "নারদ, আমি শুয়ে শুয়ে তোমার কথাই ভাবছিলুম, আজ একবার গরুড়ের পিঠে চেপে বেড়াতে যাব ইচ্ছা ক'রেছি, তুমিও সঙ্গে যাবে।" নারদ তো এ কথা শুনে খুব আহ্লাদিত হ'লেন। হবে না কেন, নারদ মুনির ছিল ঘোরাই কাজ, হরিনাম গাইতে এখান সেখান, ধ্রুবলোক, ব্রহ্মলোক, অমরাবতী, কৈলাস ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া

আশা করা আর কোঁদল বাধিয়ে বেড়ানই ছিল তাঁর কাজ। তার ওপর এ আবার স্বয়ং নারায়ণের সঙ্গে গরুড়ের পিঠে চেপে বেড়াতে যাওয়া। তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কল্লেন, "কোথায় যাওয়া যাবে কিছু ঠিক ক'রেছেন না কি ?" নারায়ণ কিন্তু সে কথার ঠিক উত্তর না দিয়ে সাদাসিধে ভাবে বল্লেন "এই মর্ত্ত্যলোক কি ওই বকম কোথাও"। নারদ ঋষি আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে একেবারে গরুড়কে ডেকে আনতে গেলেন, তার পর গরুড় এলে তার পিঠে চেপে দু'জনাতে বেড়াতে বেরুলেন।

( ২ )

গরুড় পাখীর কথা তোমরা বোধ হয় জান। সে এমন উড়তে পারত যে একালের এরোপ্লেন কোথায় লাগে! সে মর্ত্ত্যের দিকে নামতে লাগল। মর্ত্ত্যের ওপর দিয়ে সে উড়ে যেতে লাগল। কত নদ, নদী, পাহাড় পর্ব্বত, কত বন, উপবন, কত নগর, গ্রাম, কত তড়াগাদি পেরিয়ে গেল। তার পর নারায়ণ একটী বনের মধ্যে একটী বৃহৎ পুকুর দেখে সেখানে নামতে ইচ্ছা করলেন। গরুড়ও আস্তে আস্তে সেই পুকুরের কাছে দাঁড়াল। গরুড় সেখানে দাঁড়াতেই তাঁরা দুজন নেমে পড়লেন। তার পর নারায়ণ বল্লেন "নারদ, এর জল বড় সুন্দর দেখছি, এস এখানে স্নান করা যাক্। তুমি আগে স্নান ক'রে নাও, তার পর আমি নাইব এখন। নারদ ঋষিও তাঁর কথা মত আগে স্নান কর্ত্তে নামলেন, তিনি জলে নেমে মাথাটী ডুবিয়েছেন আর নারায়ণও গরুড়ের পিঠে চেপে চম্পট্।

এদিকে নারদ ঋষি পুকুরে ডুব দিয়ে উঠতেই একটী দিব্য সুন্দরী মেয়ে মানুষ হ'য়ে গেলেন, আর তিনি নারায়ণ, বিষ্ণুলোক, গরুড় ইত্যাদি সমস্ত ভুলে গেলেন তিনি উঠে এসে পুকুর পাড়ে কাপড় ছাড়্ছেন ( নারায়ণই যাবার সময়

একখানি কাপড় রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন ) এমন সময় হ'য়েছে কি, সে দেশের যিনি রাজা, তিনি এসেছিলেন মৃগয়া করতে, তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন। তখনকারকালে, এখনকার মত পাঁজিপুঁথি দেখে বিয়ে করা হত না, যার যাকে পছন্দ হত, সে তাকেই মন্ত্র পাঠ ক'রে বে' কত্তে পারত, তখনকার রাজারা এই রকম ক'রে কেউ কেউ একশ টা পর্য্যন্ত বে কত্তেন।

যাক্ তিনি নারীরূপী নারদকে দেখে, তাঁকে বে' করতে মনস্থ কল্লেন। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "হ্যাঁগা তোমার বাড়ী কোথা ? কার মেয়ে ?" নারদ স্ত্রীলোকের স্বরে বললেন ( তখন তাঁর আকৃতি পরিবর্ত্তণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এমন কি কণ্ঠ স্বরও স্ত্রীলোকের মত হ'য়ে গিয়েছিল ) "আমার বাড়ী কোথায় বলতে পাচ্ছিনা, আমার বাপ মা কে তাও জানিনা, এমন কি আমি যে ঘণ্টা খানেক পূর্ব্বে কোথায় ছিলাম, তাও মনে নাই। রাজা বললেন, "তোমার যখন কিছুই মনে নেই এবং তোমার সিঁথিতেও সিঁন্দুর নেই তখন আমাকে বে' ক'রে এই দেশের রাণী হবে এস।" নারদ স্বীকার কল্লেন। তার পর সেই রাজা তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে গিয়ে খুব ধূম ধামের সহিত তাঁকে বে কল্লেন।

( ৩ )

কালে তাঁদের কয়েকটী ছেলে পিলে হ'ল, ছেলে গুলি লেখা পড়া শিখে, অস্ত্রশিক্ষা ক'রে, রাজনীতি শিক্ষা করে বেড়ে উঠতে লাগল। তাঁদের সংসার তখন সুখের সংসার। তাঁরা এই রকমে কিছু দিন বেশ সুখে ঘর কন্না করতে লাগলেন, এমন সময় আর এক দেশের এক রাজা, সেই রাজার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁর রাজত্ব কেড়ে নেবার জন্যে, তাঁর রাজ্যের সীমানার কাছে একটা প্রকাণ্ড মাঠে এসে উপস্থিত হ'লেন। রাজা সেই খপর পেয়ে, সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধের আয়োজন কত্তে ব'লে, স্ত্রীর ( নারদের ) কাছে বিদায় নিতে এলেন। নারদের



মানব সভ্যতার আদি যুগ।

( এ সেই তখনকার ছবি—যখন মানব জীবজন্তু মারিয়া সেই ছালে অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিত ; যখন তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি কতকটা বন্যপশুর মতই ছিল ; যখন তাহারা পাথরের তৈরী ঢাল ব্যবহার করিত ; কোন রকম একটু আচ্ছাদন দিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিত। )

তখন যা কান্না, স্বামীর আর ছেলেদের অমঙ্গল আশঙ্কা ক'রে ! রাজা তাঁকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। খুব যুদ্ধ হ'ল। কিন্তু আমাদের রাজা জিততে পারলেন না, তাঁর ছেলে কয়টীই যুদ্ধে মারা গেল, তিনিও শেষে যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলেন। চরমুখে রাণী ( নারদ ) সেই সব খপর পেলেন, তিনি পাগলিনীর মত, আলুথালু হ'য়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে ছুটলেন এসে তাঁর স্বামী পুত্রের জন্য সে কি বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না ! সেই সময়ে এক ব্রাহ্মণ এসে বল্লেন, "মা, আপনি এই পুষ্করিণীতে স্নান করুন, তা হ'লেই আপনার স্বামীপুত্রদের পরকালে মঙ্গল হবে।" তিনি স্বামী পুত্রের মঙ্গল হবে ভেবে সেই পুকুরে ডুব দিলেন, ডুব দিয়ে উঠতেই তিনি আবার তাঁর পূর্ব্ব দেহ ফিরে পেলেন, তাঁর পূর্ব্বের জ্ঞান ফিরে এল, জল থেকে ডুব দিয়ে উঠেই দেখেন, নারায়ণ পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন, আর গরুড় তাঁর পেছনে বসে রয়েছে। নারদের তখন যা লজ্জা ! নারায়ণকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "প্রভু, এসব কি ? আমার যে সমস্ত মনে হচ্ছে, আমি স্ত্রীলোক হ'য়ে এ দেশের রাজার সঙ্গে বহুবৎসর সংসার কল্লুম।" তখন নারায়ণ বল্লেন, নারদ, "তুমি কি ভুলে গেলে যে মর্ত্ত্যের একশ বচ্ছরে বৈকুণ্ঠের এক ঘণ্টা মময় মাত্র। যাক্, মায়া কি বুঝেছ ? মায়া বোঝাতেই তোমাকে নিয়ে মর্ত্ত্যে এসেছিলুম। এখন বল দেখি তুমি মায়াকে জয় করতে পেরেছ কি না ?" নারদ লজ্জায় চুপ ক'রে রইলেন। তার পর নারদকে বৈকুণ্ঠ ধামে নিয়ে গিয়ে যুগলরূপ তো দেখালেনই, তাছাড়া রাত্রে তাঁর সেখানে খাবার নেমন্তন্নও হ'য়ে গেল। নারদ ঋষি তাইতেই খুসী।

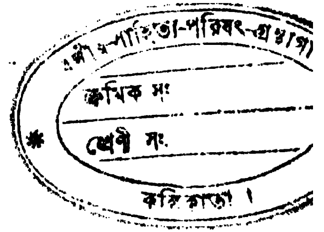
শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়।

———

# বাঙ্গালী বীর।

নদীয়া জেলার দাদুপুর গ্রামের শ্রীমান সমরেন্দ্রনাথ রায় এবার ভারতীয় সামরিক বিভাগ হইতে ২য় শ্রেণীর কাইজার-ই হিন্দ রৌপ্য পদক দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইনি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে যখন ফরাসী ভারত হইতে ফ্রান্সের জন্য সিপাহি প্রেরিত হইতেছিল চন্দননগরের ফরাসি এড-মিষ্ট্রিউর জেনারলের নিকট গমন করিয়া সিপাহি হইয়া রণক্ষেত্রে গমন করিতে চাহেন কিন্তু তিনি ফ্রান্সের প্রজা না হওয়ায় ফরাসি গভর্ণর তাহাকে ফিরাইয়া দেন। কর্ত্তৃপক্ষ ইহাকে রিক্রোং ষ্টাফে রাখিয়া ইহার কার্য্যাবলীতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে সাপ্লাই এণ্ড ট্রানস্পোর্ট কোরে গ্রহণ করিয়া লাহোর টেণীংকলেজে প্রেরণ করেন। সেখানে ইনি পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেন, ও জমাদার পদবীতে উন্নীত হন, এই সময় ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আফগাণিস্থানের যুদ্ধ আরম্ভ হয় (৪র্থ আফগাণযুদ্ধ)। সমরেন্দ্রনাথ পেসোয়ারে প্রেরিত হন ও ২৭৭নং এডভান্স সাপ্লাইবিভাগে ইনচ্চার্জ রূপে ল্যাণ্ডি কোটাল ও জেলালাবাদে গমন করেন। রণক্ষেত্রে নির্ভীক ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন ও অসামান্য কার্য্য-কুশলতা দর্শনে বৃটীশ সরকার এই বাঙ্গালী যুবককে কৈসর—ই—হিন্দ পদক প্রদানে সন্মানিত করিয়াছিল। এপর্য্যন্ত কেহই এই পদক পান নাই, সমরেন্দ্রনাথের বয়স ২২বৎসর মাত্র।

---




# টুকি টাকি।

## ১১২ বছরের লোক।

ভিলা প্লাট নামক এক মার্কিন সহরে অগষ্ট জিনসোন ( Jeansonne ) নামে একজন লোকের সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল ১১২। তাঁর ২৩ পুত্রকন্যা, তন্মধ্যে ১৭জন জীবিত। জ্যেষ্ঠটীর বয়স এই মাত্র ৯৩। তাঁর নাতিপুতি এই মোটে ১৩৭ ( শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ) তার মধ্যে একজনের বয়স মাত্র ৭৬। প্রপৌত্র ও প্র-প্রপৌত্রও বুড়ার বিস্তর আছে কিন্তু তাদের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

---

অনেকেরই ধারণা ক্যানসার বড় পাজী রোগ—কানসার রোগীর সংস্পর্শে আসিলেই বিপদ। এই অমূলক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া শুশ্রূষাকারী বা শুশ্রূষাকারিণী ভয়ে ভয়ে রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া থাকে। এই ভয় শুশ্রূষাকারীর চোখে মুখে এমন প্রস্ফুট হইয়া উঠে যে তাহা দেখিয়া রোগী নিজেও শশব্যস্ত হইয়া পড়ে ও মানসিক অশান্তিভোগ করে। কিন্তু সকলেরই জানিয়া রাখা উচিৎ ক্যানসার ছোঁয়াচে বা সংক্রামক নয়; একজনের সংস্পর্শে আর একজনের ক্যানসার হইবার কোনও ভয় নাই। ক্যানসার সম্বন্ধে আমাদের অনেক জানিতে বাকি থাকিলেও, এটুকুর সম্বন্ধে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ভাল সেবাশুশ্রূষার উপর রোগীর অবস্থা বহুগুণে নির্ভর করে; ভয়যুক্ত

সেবায় আন্তরিকতা থাকে না। আরও এক কথা, ক্যানসার ধাতুগত ব্যাধি নহে বা ইহাতে রক্তের দোষও বুঝায় না। বংশগত ব্যাধিও নহে সুতরাং ক্যানসার হওয়া লজ্জার বা ঘৃণার কথা নহে।

( ২ )

সাধারণ সিগারেটগুলি লম্বায় ২¾ ইঞ্চি; সুতরাং ২৩০৪০ সিগারেটে এক মাইল হইবে। দিনে দশটা করিয়া যাঁহারা ফুঁকেন, তাঁহারা বৎসরে এক ফার্লংএরও বেশী সিগারেট খান; ছয়বৎসর ও এক মাসে এক মাইল সিগারেট খান। যাঁরা দিনে ৪০টী করিয়া খান তাঁহারা ১৮ মাসেই এক মাইল সিগারেট খান।

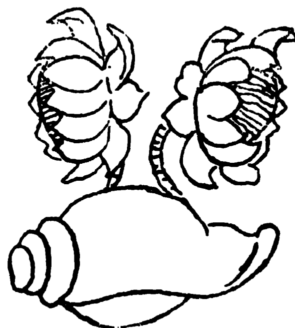
( ৩ )

মার্কিণ ধনকুবের রকফেলারের নাম বোধ হয় সকলেরই পরিচিত। চিকিৎসা শাস্ত্রীয় গবেষণার জন্য ইনি এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন, তাহার নাম Institute of medical research ঐ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নাম ডাক্তার সাইমন ফ্লেক্সনার ( Flexner )। ডাক্তার ফ্লেক্সনার জানাইয়াছেন যে ইনষ্টিটিউটের দুইজন ডাক্তার ইনফ্লুয়েঞ্জার বীজাণু আবিস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই বীজাণু এত ছোট যে বেলে মাটির কলসীর গায়ে যে ছিদ্র আছে তার ভিতর দিয়া ইহারা অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। হাজারগুণ বড় করিলে তবে অনুবীক্ষণে এদের দেখিতে পাওয়া যায়! কি করিয়া ইহাদের প্রসার বন্ধ করা যায়, তাই লইয়া বৈজ্ঞানিকেরা এখন মাথা ঘামাইতেছেন।

( ৪ )

উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণের Hawaii দ্বীপপুঞ্জ নামে যে উপনিবেশ আছে তার প্রধান সহরের নামও হাওয়াই। হাওয়াইতে একটী আগ্নেয়গিরি আছে—উহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। উহার নাম মওনা লোয়া। Mauna loa। মওনা লোয়া ১৪০০০ ফুট উঁচু। উহার অগ্নিগহ্বরের বেড় সাড়ে নয় মাইল; গভীরতা :০০ ফুট। উহা হইতে যত গিরিস্রাব নিঃসৃত হইয়াছে তত আর কোন আগ্নেয়গিরি হইতে হয় নাই। ১৮৮১সালে ইহার পূর্ব্বদিকের পাড় দিয়া লম্বায় ৫০ মাইল ও চওড়ায় তিন মাইল ব্যাপী ফুটন্ত দ্রব ধাতু বাহির হইয়াছিল্। মওনা লোয়া নাকি আবার মাথা ঝাড়া দিতেছে; উহার গহ্বর হইতে প্রভূত ধূম উঠিতেছে। সমগ্র হাওয়াই সহর সেদিন ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। এ সব পুনর্ব্বার গলিতলৌহ প্রস্তর প্রভৃতি উদগীরণের পূর্ব্বাভাস কি না কে জানে?

শ্রীধানি লঙ্কা।



# বাদূড়ের কলঙ্ক।

সেই সত্যকার আমলে একবার কোন বনে পশু পাখীতে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল। কেহ মনে করিবেন না যে গত ইউরোপীয় জর্ম্মান যুদ্ধের মত কামান বন্দুক এয়ারোপ্ল্যান জেপেলিন্ ম্যাসিনগান, টর্পেডো ডুবো জাহাজ প্রভৃতি নিয়া তাহারা যুদ্ধ করিত। সে কালের পশু পাখীরা বর্ত্তমান যোদ্ধাদের মত বীর ছিল না যে মাটির ভিতর পরিখা করিয়া তাহা হইতে গুপ্ত ভাবে যুদ্ধ করিবে এবং সাগর জলে ডুবো সাঁতার দিয়া অথবা আকাশ পথে কামান বন্দুক নিয়া যুদ্ধ করিবে, আর কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে যখন তখন গোলা বর্ষণ করিয়া দেশ গ্রাম জালাইয়া দিবে। সে কালে সম্মুখ যুদ্ধই বীরের যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা জার্ম্মানীর মত কটু নীতি বিশারদ ছিল না যে যখন তখনই শত্রুর প্রতি গোপনে গোপনে কামান ছুড়িবে, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইয়া বাহুবল দ্বারা যুদ্ধ করিত—সে কালের যোদ্ধারা জার্ম্মান যোদ্ধাদের চেয়ে কম বীর ছিল না। তাহারা গোলা বারুদ ব্যতীতও যুদ্ধ করিতে পারিত। যাহা হউক যে কথা বলিতেছি পশু পাখীর যুদ্ধের ফলেই নাকি বাদূড়েরা নিশাচর হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

একদিন সমুদয় পশু ও পাখীতে ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধিল, পশুরা এক দলে আর পাখীরা একদলে ছিল। ইহাদের মধ্যে একটি বাদূড় ছিল, বাদূড়টী প্রথমত কোন পক্ষই অবলম্বন করে নাই। কিন্তু যখন যে দলের জয়ের সম্ভাবনা দেখিত তখন সে সেই দলভুক্ত বলিয়াই পরিচয় দিত। এই ভাবে বিজয় লক্ষ্মীর সাথী স্বরূপ সে একবারে পশুদের দলে একবার পাখীদের দলে যাইয়া যোগদান করিত। তাহাদের যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে ৩।৪ দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

একদিন যুদ্ধে পশুগণ পাখীদিগকে ভয়ানক বেগে আক্রমণ করিল, পাখীরা সে দিন আর সহ্য করিতে না পারিয়া পরাজয় স্বীকার করিল। ইহা দেখিয়া বাদূড় পশুদের দলপতির কাছে গিয়া বলিল, "ওহে ভাই, আমি তোমাদের দলে থাকিব, তোমরা আমার স্বজাতীয়, আমি পাখী নই, আমি একটী পশু। কারণ এই দেখ আমার মস্তক ঠিক পশুর মত, আমি আমার শাবক সন্ততিগণকে বুকের দুধ খাওয়াইয়া বাঁচাই, পাখীরা ত এরূপ পারে না, অতএব আমি পশুদের দলেই থাকিবার উপযুক্ত। আমার চেহারা পশুর মত, আমি তোমাদের দলেই থাকিব।" পশুরা ইহাতে কোন আপত্তি করিল না, বাদূড় পশুদের মধ্যেই রহিল।

এদিকে পাখীরা পরাজিত হইয়াও তাহার পরদিন আবার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, পশুরাও আবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু এই দিন দৈবক্রমে পশুর দল পরাজিত হইল, পাখীদেরই জয় হইল, ইহা দেখিয়া বাদূড় মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইল, পাখীর দলে থাকিলে আজ সে বিজয়ী বীর বলিয়া গৌরব করিত কিন্তু পশুর দলে থাকিয়া পরাজিত হইল, তাহার বড়ই আত্মগ্লানী বোধ হইল।

বাদূড় তখন পাখীদের দলপতির নিকট আসিয়া বলিল, "ওহে ভাই। আমি তোমাদের স্বজাতীয় পাখী, আমি এখন তোমাদের দলেই থাকিব।" কিন্তু পাখীরা তাহাতে সম্মত হইল না, তাহারা বলিল, "তুমি পশুদের দলে থাকিয়া আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছ, তুমি এখন আর আমাদের দলে মিশিতে পারিবে না, তুমি রাজদ্রোহি স্বজাতিদ্রোহি, বিশ্বাস ঘাতক।" বাদূড় অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, "ভাই, আমি আর কখনও দলভ্রষ্ট হইব না, আমি পাখী, অতএব তোমাদের দলেই আমার বাস করা সঙ্গত কারণ—এই দেখ না কেন আমার পাখা আছে, আমি তোমাদের মত উড়িয়া বেড়াই, গাছের ফল খাইয়া জীবণ ধারণ করি, অতএব আমি কেমন করিয়া পশু? পশু কি কখনও উড়িতে

পারে ? দেখ, আমার স্বভাব চরিত্র সব অবিকল পাখীর মত, আমাকে তোমাদের দলে থাকিতে দাও।”

বাদূড়ের এই প্রকার আগ্রহ দেখিয়া পাখীগণ অবশেষে সম্মত হইয়া, তাহাকে দলভুক্ত করিয়া লইল, এদিকে পাখীর দল কর্ত্তৃক পশুগণ পরাজিত হইয়া বড়ই অপমান বোধ করিল, তাহারা আত্ম সম্মান রাখিবার জন্য আরো কতকগুলি পশু আনিয়া দলপুষ্ট করিল এবং পুনরায় পাখীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, এইবার অনেক পাখী হতাহত হইল, এই শেষ যুদ্ধে পশুদেরই জয় হইল। ইহা দেখিয়া বাদূড় আবার পাখীর দল পরিত্যাগ করিয়া পশুদের দলপতির নিকট যাইয়া পূর্ব্বের মত পশু বলিয়া পরিচয় দিল, কিন্তু এবার পশুরা ক্রুদ্ধ হইয়া হতভাগাকে তাড়াইয়া দিল, পাখীরাও আর এই স্বার্থপর বাদূড়কে নিজ দলে গ্রহণ করিল না, বাদূড়ও পশু পাখী উভয় দল কর্ত্তৃক যারপরনাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া লজ্জায় গভীর অরণ্যে পলায়ন করিল, সেই অবধি লজ্জায় আর কাহাকেও মুখ দেখাইল না, সারাদিন বৃক্ষ কোটরে লুক্কায়িত থাকে, রাত্রিতে সমুদয় জীবজন্তু নিদ্রিত হইলে সবার অলক্ষ্যে বাদূড় আহার করিতে বাহির হয়। বাদূড়ের জীবন এই প্রকার কলঙ্ক পূর্ণ বলিয়া কথিত আছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

# কাপড়ের কল।

"বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি"—বলিয়া একটা কথা হয়ত তোমরা অনেকের মুখে শুনিয়া থাকিবে। কিন্তু কাজের বেলা তা' যে কতদূর মানিয়া চলা হয় তা' আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না; দিন দিন কৃষি-কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা যেন দেশের একটা নব্য ভাব-ভঙ্গীব অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশী শিল্প, বাণিজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার কথা মনে হইলে লজ্জায় মাথা নুইয়া আসে। এমন এক সময় ছিল যখন ভারতবর্ষের লোকেরা নিজ পরিশ্রমে নিজেদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরী করিয়া কত সুখসচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দিনের সঙ্গে সঙ্গে সে উৎসাহ, সে উদ্যম কোথায় চলিয়া গিয়াছে—ভাবিলে মনে হয় বুঝিবা আর লুপ্ত গৌরবের উদ্ধার হইল না। ভগবানের কৃপায় কিয়দ্দিন যাবত দেশ-বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া অনেকেরই চোখ একটু ফুটিয়াছে—নূতন ভাবে দেশী শিল্প, কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিরন্ন বাঙ্গালীর মুখে দু'মুঠ অন্ন দিবার চেষ্টা বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে দেখা যাইতেছে। তোমাদের বোধ হয় জানিতে বাকি নাই যে এসবের মূলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি বড় বড় লোক। তাহাদেরই উপদেশে আজ কুলবধূরা পর্য্যন্ত চরকায় সূতা কাটিয়া কাপড় বুনিতেছে। ধানের মত তূলার চাষও যে খুব দরকারী তাহা আর কৃষকদের প্রাণে প্রাণে বুঝিবার বাকি নাই; তারা অন্নবস্ত্রের অভাব মোচনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যে ভাবের বন্যা দেশময় ছুটিয়াছে তাহা শুভ—সন্দেহ নাই।

যাক্ সে কথা। দেশী কাপড়ের প্রচলন ভারতের অনেক স্থানে—বিশেষতঃ

পূর্ব্ববঙ্গে বেশ আদরের জিনিষ বলিয়া এখন মনে করে। কিন্তু আমাদের সারা ভারতবর্ষের কাপড় যোগাইবার ন্যায় ক্ষমতা এখনও হয় নাই। যে দেশ এ কার্য্যে এখন অগ্রণী সে সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা ম্যানচেষ্টার, ম্যাসেচুসেটস্‌এর সুন্দর রঙচঙে কাপড়টী দেখিলেই পরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠ ও দেশী মোটা কাপড়ের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত কর। শুনিলে হয়ত আশ্চর্য্য হইবে যে বিলাতে তূলার বীচি বাছা হ'তে আরম্ভ করিয়া কাপড় তৈরী করা পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার কল দ্বারা হয়—তাই এগুলি বেশ ফুর্‌ফুরে ও মসৃণ দেখায়। বাঙ্গালায় প্রচুর পাটের চাষ হয়; বিলাতী কোম্পানী এ সব পাট কিনিয়া বিলাতে চালান দেয় এবং সেখানে কলদ্বারা কাপড় চট ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আবার আমাদের নিকটে বিক্রি করে। তূলা দ্বারা এর চেয়ে ভাল কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত হয়—তাই আমেরিকা, চীন জাপান, মিশর, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি গরমের দেশে এত কল-কারখানা। একই তূলার চাষে জল-বায়ুর বিভিন্নতার দরুণ কোন স্থানে চারা, কোন স্থানে গুচ্ছ এবং কোথাও বা ছোট গাছ হ'তে দেখা যায়!

দক্ষিণ আমেরিকায় সবচেয়ে ভাল ও মূল্যবান তূলা হয়। বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে চাষীরা বীজ বুনিতে থাকে এবং বছর যাইতে না যাইতে গাছগুলি ফুলফলে সজ্জিত হইয়া হাসিতে থাকে। দু'দিন পর ফুল ঝরিয়া যায় এবং ছোটগুটির মত একটী পদার্থ গাছে থাকে; ইহা পাকিলে ভিতর হইতে ফুর্‌ফুরে তূলা বাহির হয়। আমেরিকায় এত তূলা হয় যে সমস্ত কল-কারখানা তা নিঃশেষ করিতে পারে না, তাই বিদেশে রপ্তানি করে। কিন্তু মিশরের তূলা এমন চমৎকার—গুচ্ছগুলি বেশ লম্বা বলিয়া অতি উৎকৃষ্ট কাপড় হয়—যে তাহা আমেরিকায় খুব বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই তূলা সংগ্রহ করা একটা মজার ব্যাপার;

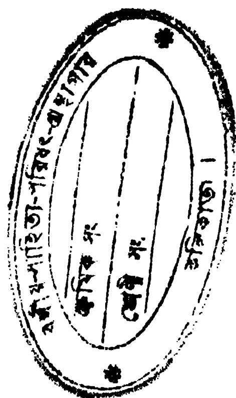
ছেলে বুড়ো সকলে মিলিয়া মনের আনন্দে সারামাঠ ছুটাছুটি করিয়া তূলা তুলিয়া আনে। বীচি বাছা হইলে পর গাঁট বাধিয়া কারখানায় পাঠাইয়া দেয় ;

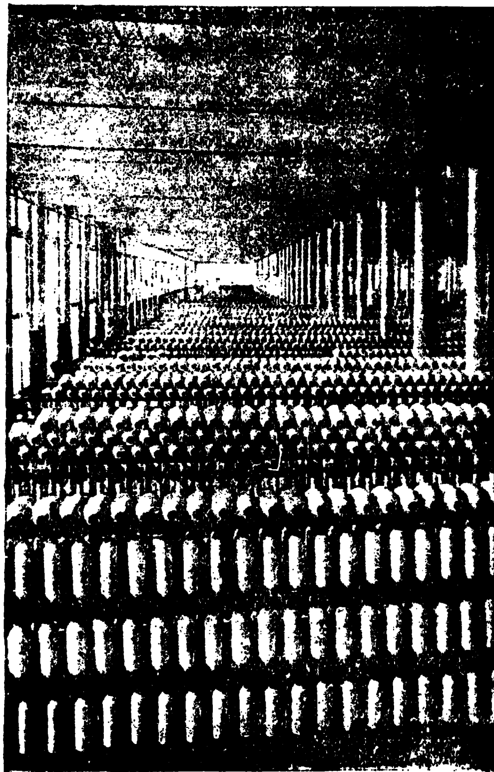


তুলা গাছের ডাল।

তখন কলে এগুলি সামান্য পরিষ্কার করিয়া 'sculcher' এর মধ্যে ফেলিয়া আরও ধবধবে করিয়া নেয়। তারপর দড়ির মত লম্বা লম্বা করিয়া পাশাপাশি রাখে এবং ক্রমে 'ববিন' ( bobbin ) বা ছোট ছোট কাঠের টুক্‌রায় তাহা জড়ান হয়।

বল্‌তে কি বর্ত্তমান সময় যতপ্রকার বড় বড় কারখানার কথা আমরা শুনিতে পাই তন্মধ্যে এই ববিনের শোভাই সবচেয়ে সুন্দর। আকাশের মিটি মিটি তারার ন্যায় অসংখ্য সুতার ঢিপি কলের উপর সাজান রহিয়াছে—দেখিতে আরম্ভ করিলে চোখের পলক পড়ে না, মন টলে না, কেবলই শাদা ধবধবে



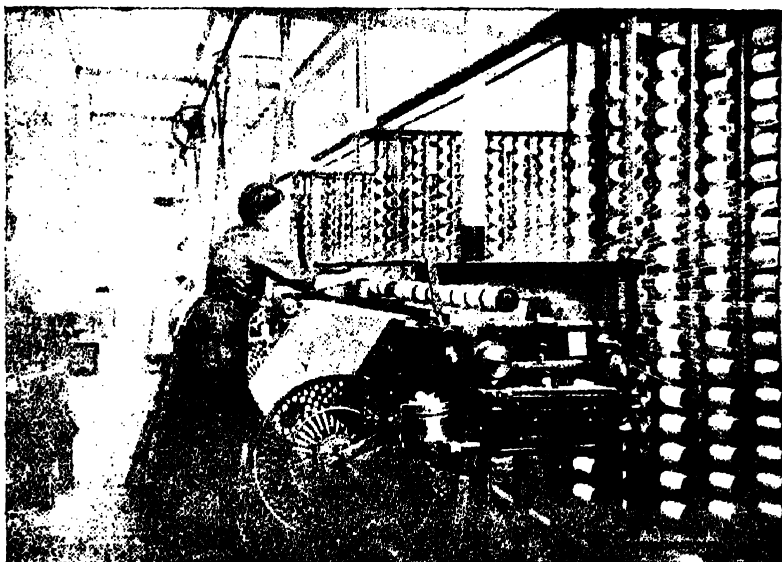


হাজার হাজার সূতার ঢিপি।

সূতার ঢিপি। ভাবিতে বিস্মিত হ'তে হয় যে কি ভাবে ববিন হইতে হাজার হাজার নাল এক সঙ্গে বাহির হইয়া একই ভাবে পাক হইতেছে। তখন সেগুলি spinning muleএর দ্বারা উত্তমরূপে পাক হইয়া সূতায় পরিণত হয়। সূতা হইয়া গেলে সেগুলি ক্রমে আবার কলে জড়ান হয়—একেই আমরা রিলের সূতা বলি। এসব খুটিনাটি কাজ অতি সুন্দর ভাবে কারখানায় সুসম্পন্ন হইতেছে—কোথাও একটু হৈ-চৈ নাই, ঘড়ির কাঁটার মত সব নিয়ম বাঁধা।

তোমরা হয়ত ভাব্‌ছ যে সূতা হতে পারে, কিন্তু এমন সুন্দর রঙ-বেরঙের কাপড় কি ভাবে হয়! সেটা একটা ভারি মজা। ঐ ববিনগুলি স্তরে স্তরে সাজান হ'লে তাহা হ'তে সমস্ত সূতা পাশাপাশি ভাবে বাহির হইয়া বড় একটী রোলারে লুচির ন্যায় বেলিয়া যায়।

তারপর এই রোলার গরম জলের ট্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নীত হয়। সেখান হইতে আবার সূতা বাহির হইয়া ফ্লানেল-জড়ান রোলারের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। কখন বা হাপরের ন্যায় pumper দ্বার সূতা শুকান হয়। জল শুষিয়া গেলে আবার সেগুলি রোলারে জড়াইয়া ফেলে—খুলিলে মনে হয় যেন এক পশলা তুষার পড়িয়া পরিষ্কার ফুর্‌ফুরে একখানি চাদর হইয়া রহিয়াছে। তখন সব কারখানায় আনিয়া তাঁতের উপর চড়াইয়া দেয়। চড়ান —আর বিদ্যুৎবেগে লোহার ছোট বড় রকমারি তক্তা ভোঁ ভোঁ করিয়া চলিতে থাকে। কারখানার ব্যাপার দেখিলে চক্ষু স্থির হইয়া যায়—কাণে তালা লাগে। চল্‌তি অবস্থায় কলে কোনপ্রকার বাজে জিনিষ পড়িলে তার অস্তিত্বও পাওয়া যাইবে না, একেবারে চূরমার। দু'একবার চলন্ত ম্যাসিনে অলক্ষিতে পড়িয়া কয়েকজনের জীবনান্তও হইয়াছে। বোনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁতেব সাম্‌নে একটী রোলার আসিয়া সব কাপড় জড় হয়। তারপর রংএর বাহার দেখে



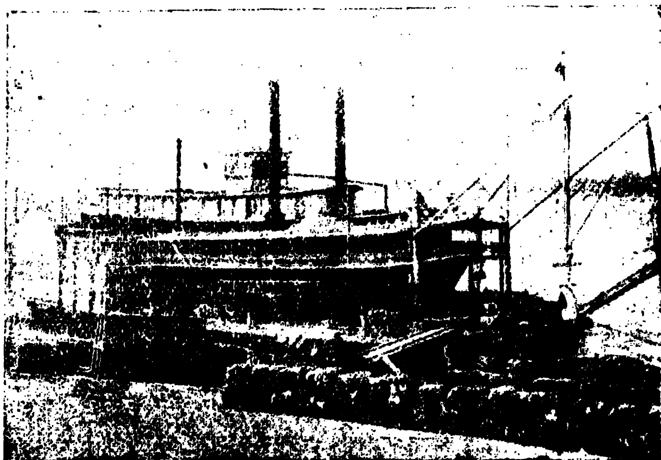
রোলারে লম্বা লম্বা সূতা জড়ান হইতেছে।

কে? লাল, নীল, হলুদ, সবুজ—আরও কত কি রঙের অফুরন্ত নিত্যনূতন ভাজ, 'বন্দে মাতরম্' 'Forget me not' কত কি সব মজাদার পাড়ের বাহার!

নানাভাবেই কাপড়ের রঙ কি পাড়ের রঙ দেওয়া যায়; কখন সুতায় পাকা রং দেওয়া হয়—কখন বা কাপড় বুনিয়া ছাপ দিয়া পাড়ের রঙ দেয়। এরপর ইন্স্পেক্টর আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখে কোন দোষ আছে কিনা; তখন সেগুলি অন্য কারখানায় পাঠান হয় এবং কলে ফেলিয়া চাপ্ দিয়া কাপড়ের গাঁট বানাইয়া ভারতবর্ষ, চীন, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে।

এই ভাবে জাহাজ ভরিয়া আমেরিকা, ইংলণ্ড হইতে কোটী কোটী টাকার কাপড় আমাদের দেশে আসিতেছে এবং আমরা দেশী কাপড়ের উন্নতির একটুকুও চেষ্টা না করিয়া ফুরফুরে কাপড় পরিয়া মনে স্ফুর্ত্তি অনুভব করিতেছি। রূপচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ, যত্ন চেষ্টা ও আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া নীচপথ বাছিয়া লইতেছে।

যা' আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন কল্পনায় আনিতে পারেন নাই—যে কৃষি, শিল্পের অমর্য্যাদার দরুণ সকলেই দুঃখদৈন্যে জড়সড়; সেই দেশী, পুরাতন, মান্ধাতার আমলের তুলাগাছটী ও বুঝি কত শত লোকের অন্ন-সমস্যার, জীবন-যাত্রার পথ সহজ, সরল করিয়া দিত। স্বদেশহিতৈষিতার কথা দূরে থাকুক—পেটের জন্য পরের দুয়ারে হাত পাতিয়াও বিমুখ হইতে হইত না। তাই শিল্প, কৃষির উন্নতি সাধন করিয়া আমাদের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার জন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণ প্রাণপণে খাঁটিতেছেন। অক্লান্ত কর্ম্মী, দেশপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্রের লোকসেবা, দেশসেবার কথা তোমরা বোধ হয় "আমার দেশে" কিছু কিছু জানিতে পার, দেশের দুঃস্থ, গরীব ভাইদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য, গৃহশিল্পের চর্চ্চা করিয়া পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য,



জাহাজে গাঁট উঠিতেছে।

দেশের আশাভরসাস্থল যুবকবৃন্দের স্বাস্থ্য সবল, নিরাময় করিবার জন্য, তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন। চাষাভূষার কর্ত্তব্যজ্ঞান, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্বধর্ম্মপালনই আমাদের আশার আলো, আমাদের অন্নজলের প্রসূতি।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।

পরলোকগত দানবীর ও কর্ম্মবীর

## মিঃ জে, এফ্ ম্যাডান।

জন্ম—১৮৫৬, ২৭শে এপ্রিল ;  মৃত্যু—১৯২৩, ২৮শে জুন।



দেশ বিখ্যাত পার্শী ধনকুবের মিঃ ম্যাডান পরলোক গমন করিয়াছেন। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর এই কর্ম্মবীরের মৃত্যু ঘটিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র স্বকীয় চেষ্টায় কত বৃহৎ হইতে পারে, অতি নগণ্য ব্যক্তি আপন-বলে কত বড় দেশমান্য হইতে পারে, অতি দরিদ্র নিজ চেষ্টায়,পরিশ্রমে ঐশ্বর্য্যের কত মহোজ্জ্বল শীর্ষে উত্থান করিতে পারে, পরলোকগত মিঃ ম্যাডানের জীবন তাহারই উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি বাল্যকালে নগদ চারি টাকা বেতনে কোন পার্শী থিয়েটারের দলে পরিচারকের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, আর মৃত্যুকালে তিনি ধনে-মানে ভারতের আদর্শ-স্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন। জগতের স্বনাম-ধন্য পুরুষসিংহের মধ্যে ম্যাডান যে অন্যতম, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

এই যে তোমরা সহরে পল্লীগ্রামে সর্ব্বত্র বায়স্কোপের কথা শুনিতে পাও, দেখিতে পাও, আমাদের দেশে ইহা প্রথম প্রচলন করেন, মিঃ ম্যাডান। বায়স্কোপ চিত্রগুলি কত দেশের কত খবর কত সামগ্রী আমাদের দেখায়, শিক্ষাদান করে, তাহার ইয়ত্তা নাই; ম্যাডান সাহেবই এদেশে প্রথম বায়স্কোপ আনান।

তাঁহার কর্ম্ম-জীবনারম্ভ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার ভাগ্যকে তিনি নিজ প্রচেষ্টাতেই নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। যৌবনারম্ভে ম্যাডান সাহেব যখন একরকম নিঃস্ব ও নিঃসম্বল তখন মাত্র দুই হাজার টাকা ধার লইয়া কলিকাতার গড়ের মাঠে তাঁবু খাটাইয়া বায়স্কোপ প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। সেই ক্ষুদ্র তাঁবু হইতে কালে ভারতের সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রে তাঁহার তাঁবু-প্রদর্শনী ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। গড়ের-মাঠের ক্ষুদ্র তাঁবুর অধিকারী মিঃ ম্যাডান কালে

বায়স্কোপ জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। এই ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দিতায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীগণের একটা অমূলক ভীতি আছে, ইউরোপীয়গণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয়গণের পরাজয় সুনিশ্চিত। ম্যাডান সাহেবের জীবনী পাঠে সে ভয় ভারতীয়গণের বিদূরিত হওয়াই উচিত।

এই কর্ম্মবীরের জীবনের আর একটি মহৎ দিক ছিল। ম্যাডান সাহেবের মত দানবীর এ-যুগে আমাদের দেশে বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। কত অনাথ আতুর দীন দরিদ্র জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যে ম্যাডান সাহেবের অর্থ সাহায্যে জীবনধারণ করিত, নির্ণয় করা দুরূহ। সংখ্যাহীন দরিদ্রের দল মাসের প্রথম রবিবারটিতে ম্যাডান-সাহেবের ভবনে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তি লইয়া আসিত। এইভাবে তিনি মাসে কত টাকা ব্যয় করিতেন, তাহা তাঁহার আত্মীয়েরাও জানিতেন না। মিঃ ম্যাডান দান করিতেন অকুণ্ঠ হস্তে, অকাতর চিত্তে. কিন্তু হৈ চৈ করিতেন না, ঢাক পিটাইতে চাহিতেন না। দানের উদ্দেশ্য দান—ছাড়া অন্য উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না।

ম্যাডান বাক্য-বীর ছিলেন না; সভাসমিতিতে যাইয়া গলাবাজী করিয়া কাজ করিতেন না; বাক্য ছিল অল্প, কাজ ছিল প্রচুর; গলাবাজিতে তাঁহার স্পৃহা ছিল না, কার্য্যে অপার আনন্দ ছিল। আমাদের দেশের "বাক্যবীর-গণের" সঙ্গেই এই নীরব কর্ম্মীর পার্থক্য এইখানেই।

এদেশে এমন কোন সদনুষ্ঠান ছিল না যে, মিঃ ম্যাডান যেখানে না অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, দানবীর ম্যাডান একদিকে যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি সদ্ব্যয় করিয়া চিরবরেণ্য হইয়া গিয়াছেন।

ম্যাডান-সাহেবের বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। ৬৮ বৎসর বয়স খুব বেশী নয় সত্য কিন্তু বর্ত্তমানকালে ইহার অধিক, পরমায়ু ভারতীয়দিগের কল্পনার বহির্ভূত হইয়াছে। তবে ম্যাডান সাহেবের মত কর্ম্মবীর দানবীর উদ্যোগী পুরুষসিংহ যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন দেশের মঙ্গল বলিয়াই বলিতে হয়, ম্যাডান সাহেবের অকাল মৃত্যু দেশের মহা অনিষ্ট করিয়াছে।

ম্যাডান সাহেবের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ভারতীয়গণ ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলে ম্যাডানের জন্ম এদেশে সার্থক হইবে।

ম্যাডান সাহেব তাঁহার বিধবা, ছয়পুত্র ও এক কন্যাকে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন! জগদীশ্বর এই শোকসন্তপ্ত প্রিয় বক্ষগুলিতে সান্ত্বনা দান করুন; তৎসমীপে আমাদের ইহাই প্রার্থনা। শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

---

## খুচরো খবর।

মেয়েদের এখন আর হাত ঘড়ি পরিবার বাতিক নাই, প্রাচীনকালের ন্যায় ঝুলানো ঘড়ীর উপর তাহাদের ঝোঁক পড়িয়াছে।

* * * *

প্যারিসের মেয়েরা ঠোঁট রঞ্জিত করিবার জন্য যে রঙ ব্যবহার করে তাহার সহিত লেবু প্রভৃতি নানারূপ সুগন্ধি দ্রব্য মিশান হয়।

* * * *

চিনচিনাটীতে দুই জোড়া যমজ বোন আছে। তাহাদের প্রত্যেকেরই যমজ সন্তান জন্মিয়াছে, তাও দুই দুই জোড়া হিসাবে।

* * * *

মানুষের শরীরের উত্তাপ ১৪৮ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যে লোকটির শরীরের তাপ১৪৮ডিগ্রী হইয়াছিল সে আগুনের চুল্লীতে কাজ করিত।

কানেডার এক খনিতে ১০০০ মাইল বিস্তৃত এক সোনার স্তর আবিষ্কার হইয়াছে।

* * * *

ফরাসী দেশে বৈতাড়িত তড়িত প্রবাহের প্রয়োগে আকাশযান চালিত হইয়াছে।

* * * *

গত দুই বৎসর যাবত প্রত্যহ ৩৫০০০ করিয়া মেডেল তৈয়ারী হইতেছে। যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্যদিগের মধ্যে এই সব মেডেল বিতরিত হয়।

* * * *

হাঙ্গেরীর এক ইঞ্জিনীয়ার অতি ক্ষুদ্র এক গ্রামোফোন আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই যন্ত্রটি অনায়াসে কোটের পকেটে রাখা যায়।

* * * *

গত কয়েক বৎসর মধ্যেই আমেরিকা হইতে ভারতে রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়াছে। এ ছাড়া ইউরোপ ও জাপান ত আছেই। স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য কত আন্দোলন হইয়াছে; কিন্তু বৈদেশিক মালের আমদানী কমা দূরের কথা, বাড়িয়াই চলিয়াছে। অদৃষ্ট !!

* * * *

মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্ট একটি ইউরোপীয় বালকের শিক্ষার জন্য ১২৩৲ টাকা খরচ করেন এবং এদেশীয় বালকের জন্য ৫৬৲ টাকা খরচ করা হয়।

* * * *

মান্দ্রাজ প্রদেশে দুহাজার সাতশো একচল্লিশটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। ৩৭৬৭৮১টি বালিকা ঐ সকল বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে।

(শিশির)

———

# খবরাখবর।

## ঘড়ীর অতিবৃদ্ধ পিতামহ

বিলাতের সমারসেট সহরের ওয়েল্‌স্‌ গির্জ্জায় একটী প্রকাণ্ড ঘড়ী আছে। উহা বহুকাল অচল হইয়া ছিল; শীঘ্রই উহাকে মেরামত করিয়া সচল করা হইবে। পৃথিবীতে যত ঘড়ী আছে উহা নাকি বয়সে সকলের বড়। প্রতি ঘণ্টার শেষে ঘড়ীর মধ্য হইতে এক কলের সৈনিক বাহির হইয়া পরশুরামের কুঠারের ন্যায় এক অস্ত্র-দ্বারা ঘণ্টা বাজাইবে ও প্রতি পনর মিনিট অন্তর ঐ সৈনিক পদাঘাতে আর একটা ঘণ্টা বাজাইবে। আবার ঘণ্টায় অশ্বারোহী সৈন্যদল সমর সজ্জা করিয়া মাঝে মাঝে ঘড়ীর মধ্যে সগর্ব্বে শোভাযাত্রা করিয়া দর্শককে বিস্মিত করিয়া দিবে। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে এই ঘড়ী প্রথম অ্যাবট্ লাইট ফুট কর্ত্তৃক গ্ল্যাষ্টন্‌বারী অ্যাবিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে উহা সমারসেটে আনিয়া বসান হয়।—সোনার বাংলা

---

## দ্বিচক্রযানে ভূ-প্রদক্ষিণ।

এ পর্য্যন্ত কেহই বাইসিকেলে চড়িয়া উত্তর বা দক্ষিণ মেরু পরিভ্রমণ করিতে যান নাই। এ কথা এই জন্যই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা স্থান নাই যেখানে বাইসিকেলে চড়িয়া লোকে যাতায়াত করে নাই! দুরারোহ পার্ব্বত্য পথ বা দুর্গম মরু প্রান্তরের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও বাইসিকেল আরোহীরা ভূ-প্রদক্ষিণ করিয়াছে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে এক জন বাইসিকেল আরোহী পৃথিবী পরিভ্রমণ করে। পথে তাহাকে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন পাইতে হয়। এমন কি

তাহাকে বাঘ ভালুকে পর্য্যন্ত তাড়া করিয়াছিল। তারপর আরও অনেকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পৃথিবী ঘুরিতে হইলে ২০ হাজার মাইল ঘুরিতে হয়, ইহাতে তিন বৎসর সময় লাগে। এক জন পৃথিবী পরিভ্রমণকারী বাইসিকেল আরোহী আমেরিকাতে রেলওয়ে লাইন পার হইবার সময় ট্রেণ চাপা পড়িয়াছিল। আর এক জন আরোহী বলিয়াছে যে, সে এমন এক গ্রামের ভিতর দিয়া যাইতেছিল সেখান কার লোকেরা বাইসিকেল আদৌ চোখে দেখে নাই, তাহারা এই যন্ত্রটিকে ভূত প্রেতের আবির্ভাব মনে করিয়া পুরোহিত ডাকাইয়া মন্ত্র তন্ত্র পড়াইয়াছিল।

---

## পৃথিবীর বৃহত্তম সার্কাস

সম্প্রতি ওয়াসিংটন সহরে যে সার্কাসের খেলা হইয়াছে তাহা নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় সার্কাস। এই সার্কাসের মণ্ডপে ১৫০০০ লোকের বসিবার জায়গা আছে। এই সার্কাসে প্রায় ২০০ জন বিদূষক ( clown ) ও ঘোড়া ছাড়া প্রায় ২০০ জানোয়ার ছিল।

---

## বালকের প্রতিভা

শ্রীমান্ ই, আর, হার্ডি ১৪বৎসরের ছেলে, তাহার বাড়ী নিউইয়র্ক সহরে। সে সে দিন তাহার পিতা ও মাতার সহিত লণ্ডনে আসিয়াছে। এই বয়সে বালক হার্ডি নিউইয়র্কের বি-এ পাশ করিয়াছে। সে চৌদ্দটি ভাষায় অনর্গল কথাবার্ত্তা বলিতে পারে। সে বিলাতে এক বৎসর থাকিয়া পড়িবে, পরে পাদরী হইবে।

## লেবুর উপকারিতা

অনেকেই বোধ হয় জানে না যে, কিছুক্ষণ ধরিয়া লেবু গরম করিয়া উহা চাপিলে, সাধারণতঃ যত রস হয়, তাহাপেক্ষা দ্বিগুণ রস হইয়া থাকে। যে লেবু তৎক্ষণাৎ প্রয়োজন নাই, তাহা একটা পাত্রে জল দিয়া তাহার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং পাত্র কোন শীতল স্থানে রাখিলে বেশ টাটকা থাকে।

গলা বেদনা ও গলার ঘা হইলে লেবুর রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে খুবই উপকার হইয়া থাকে। যাঁহারা সঙ্গীত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের গলার এক প্রকার রোগ হইয়া থাকে। একটী ডিম্ব ফেনাইয়া লইয়া তাহাতে এক চামচ লেবুর রস মিশাইয়া তৎক্ষণাৎ সেবন করিলে অনেকটা আরাম বোধ হয়। লেবুর রস গরম জল বা চায়ের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে অনেকের মাথা ধরা আরাম হইয়া যায়। গৃহকার্য্যের জন্য লেবু অমূল্য জিনিষ; বস্ত্রাদিতে কালি লাগিলে সেই দাগের উপর লবণ চাপা দিয়া, তাহার পর লেবুর রস সেই স্থানে দিতে হইবে। উপ-রোক্তরূপ প্রণালীতে একবার যে কালির দাগ না উঠে,তথায় বারবার দিলে দাগ উঠিবেই। গৃহে যদি কেহ রুমাল গেঞ্জী প্রভৃতি শ্বেত বর্ণের বস্ত্রাদি সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করেন, তবে সিদ্ধ করিবার সময়ে একখণ্ড লেবু ঐ পাত্রে ফেলিয়া দিলে বস্ত্রাদি বেশী পরিষ্কার ও সাদা হয়। শ্বেতপ্রস্তর লেবুর রসে ঘসিয়া তাহার পরে সাবান জলে ধুইলে পরিস্কার হইয়া যায়। যে লেবু হইতে রস বাহির করা হইয়াছে, তাহার খোসা লইয়া মুখ ও গাত্র মার্জ্জনা করিলে মুখের চামড়া পরিষ্কার, উজ্জ্বল, ও সাদা হয়, এবং কপালের রেখা বা সঙ্কুচন থাকে না।

---

## অনাথ আশ্রম ভূ-পতিত

কলিকাতার সৈয়দসালি লেনে মুসলমান এতিম খানার গৃহ পতনে য ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে উহা যেমন শোচনীয় তেমনই করুণ। এরূপ ভয়াবহ দুর্ঘটনা কলিকাতাব বাজারে বোধ হয় নূতন। পিতৃহীন, মাতৃহীন, সংসাবে সহায় সম্বলহীন মুসলমান বালক—যাহারা পরের অনুগ্রহে প্রতিপালিত হইয়া মানুষ হইতেছিল এক মুহূর্ত্তে একই সময়ে তাহাদেব ২৪৬টী প্রাণ উড়িয়া গেল, ভবের খেলাসাঙ্গ করিয়া অট্টালিকার ধ্বংস স্তুপের মধ্যে চাপা পড়িয়া গেল। এই যে কাহিনী, চিন্তা কবিলেও শোকে দুঃখে মন প্রাণ বিগলিত হইয়া যায়। আব মনে হয় জগদীশ্বব তোমাব শুভ ইচ্ছাব রহস্য বুঝিবার শক্তি প্রকৃত পক্ষেই মানুষের নাই।

---

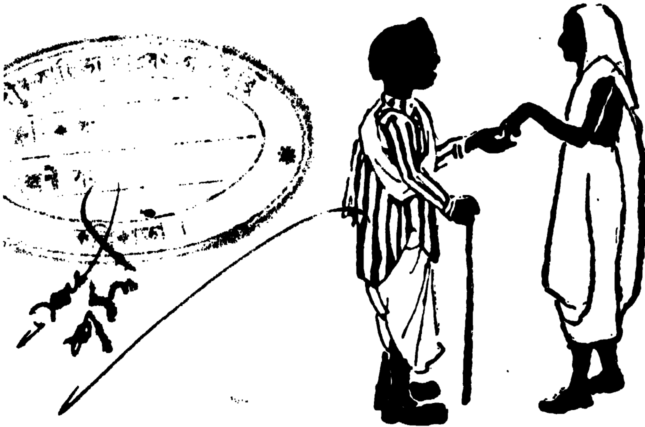
## বাঙ্গালী মহিলার বীরত্ব

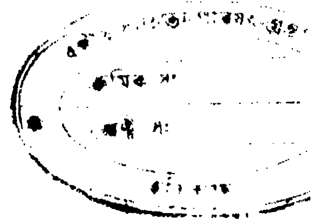
গত ২৬শে জুন কুমারা মিত্র নাম্নী জনৈক বাঙ্গালী মহিলা কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জাব ট্রেণে যাইতেছিলেন। নৈহাটী ষ্টেশন পরিত্যাগ করিবার পর তাঁহার কামরায় যে দুইটী গোরা ছিল তাহারা তাঁহার চশমা খুলিয়া লয় এবং মহিলাটীর ব্যাগ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করে, মহিলাটী বিপদসূচক শিকল ধরিয়া টান দেওয়া মাত্র গোরা দুইটী ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে; মহিলাটীও তাহাদের পিছুপিছু গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলেন। বারাকপুর ক্যান্টনমেণ্ট আদালতে গোরা দুইটীর বিচার হইবে।

---

## বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মভূমি

বঙ্গের বরেণ্য সাহিত্যিক স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মভূমি এ দেশের একটা সাহিত্যিক তীর্থভূমি। চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটির সন্নিহিত কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাই এবার নৈহাটি সাহিত্য সম্মিলনে সমাগত বহু বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী মিছিল করিয়া এই সাহিত্যিকতীর্থ দেখিতে গিয়াছিলেন।





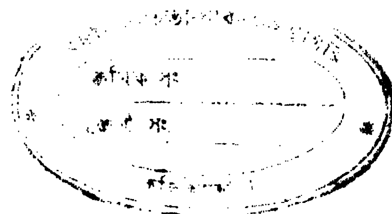
# সূচী।

ভাদ্র—১৩৩০।




কলিকাতা ১৭ নং রাধানাথ বোসের লেনস্থিত বিদ্যোদয় প্রেস হইতে শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।


দি ন্যাশনাল ভ্যারাইটি
স্টোর্স
খাঁটি -
মজবুত -
সস্তা জিনিস
২২০ আপার সার্কুলার রোড,
শ্যামবাজার, কলিকাতা
পৃষ্ঠপোষক
শ্রীযুক্ত এইচ্ এম্ গান্ধি
ডিরেক্টরেট
শ্রীযুক্ত জেঠালাল গান্ধি ও
এন্ ব্যানার্জ্জি
ম্যানেজিং ডিরেকশন
মেসার্স ব্যানার্জ্জি এণ্ড কোং
২৪ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
ধুতি
ও
শাড়ী
১০×৪৪"
২৸০
জোড়া





বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ···এই রাজমুকুট···রাখিয়া গেলাম।

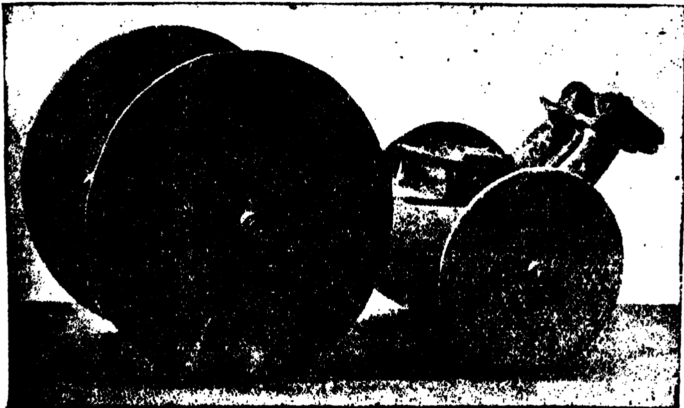
# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। ভাদ্র, ১৩৩০।




## গ্রীস।

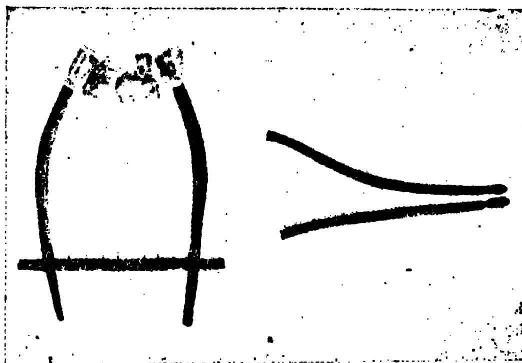
গ্রীস আর সে গ্রীস নাই। এক দিন গ্রীসের সব ছিল। তাহার ভাস্কর্য্য



খেলার গাড়ী।



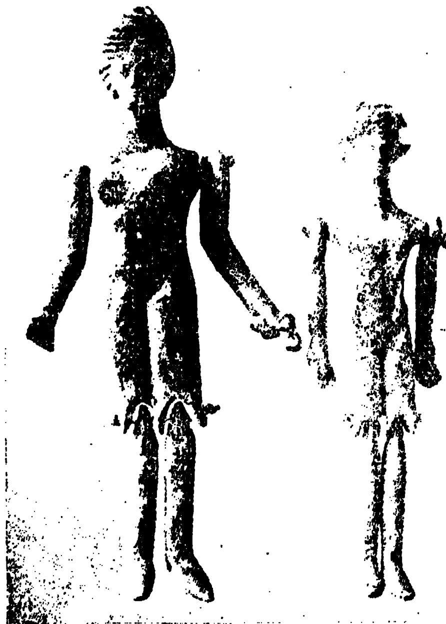
প্রাক্সিতেলিসের খোদিত হার্মিসের মূর্ত্তি



পুরাকালের গ্রীসদেশের বাদ্যযন্ত্র।



সেকালের অস্ত্রচিকিৎসা।



আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গ্রীসদেশের খেলার পুতুল।

আজও তাহা অতুলনীয় হইয়া তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে; তাহার সাহিত্য সম্ভার—কবিগুরু হোমারের অতুল কীর্ত্তি বক্ষে ধরিয়া আজও অমর হইয়া রহিয়াছে; এখনও এসিয়ার, ইউরোপের ব্রহ্মাণ্ডের-প্রতি ঘরে ঈশপের গল্পগাথা শিশুদের মানস রাজ্যের প্রথম খোরাক জোগায়, মহিলা কবি সাপোর মধুর গাথা প্রাচীন গ্রীসের নারী শিক্ষার উচ্চ আদর্শের সাক্ষ্য দিতেছে; তাহার



হোমারের কথকতা।



ঈশপ ও গ্রীক মহিলাগণ।



গ্রীসের মহিলা কবি সাপো।

বীরত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, তাহার মহানুভবতা, সে সবই তাহার অতীত গৌরব; প্রাচীন গ্রীসের সে সভ্যতার ইতিহাস আজও বিংশতি শতাব্দীর অধিবাসীরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া থাকে।

আমোদ প্রমোদে, চেহারায়, বীরত্বে সেকালে গ্রীস নর-নারী আজও জগতে আদর্শ স্থানীয়। কি সুন্দর সুঠাম দেহ, কি অপূর্ব্ব বীরত্ব! নরনারী উভয়ে মিলিয়া এই গ্রীস সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল।

প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস কতকগুলি ক্ষুদ্র নগরের ইতিহাস। এক একটি নগরের অধিবাসীরা আশেপাশের আরও কতকগুলি নগরের উপর তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিত। এই সকল ছোট ছোট নগর—রাজ্যগুলির মধ্যে এথেন্স ও স্পার্টাই ছিল বিশেষ খ্যাত।

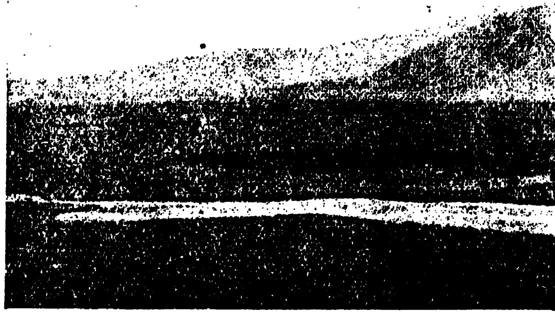
এথেন্স সে যুগে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিলে এই বিংশতি শতাব্দীতে যেরূপ আইনকানুন আছে, অতদিন আগে এথেন্সেও সেইরূপ আইন প্রণয়ন হইয়াছিল। এই আইন প্রণয়ন করিয়া বিশেষ খ্যাত হইয়াছিলেন সোলন তিনি এই আইন প্রণয়ন করিয়া গ্রীসকে শান্তির রাজ্যে প্রতিস্থাপিত করিয়াছিলেন। তোমরা ছবিতে দেখিতে পাইতেছ, সোলন এথেন্সবাসীদের নিকট তাঁহার বিধিব্যবস্থার কথা বলিতেছেন। আইনপ্রণয়নেই শুধু গ্রীসের প্রতিভা প্রকাশ পায় নাই। গ্রীসের প্রবল বিক্রমের সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। যখন পারস্যের বিপুল বাহিনী গ্রীসের দ্বারে হানা দিয়াছিল তখন এক মুষ্টিমেয় এথেন্সবাসীই অসীম বীরত্ব দেখাইয়া তাহাদের জলে স্থলে হটাইয়াছিল। ম্যারাথনের রণক্ষেত্রে এই শক্তিযুদ্ধের পরীক্ষা হইয়াছিল।



গ্রীক রমণীর বল খেলা।



সোলোন এথেন্সবাসীদের নিকট তাঁহার বিধি ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন।



ম্যারাথনের রণক্ষেত্র।

গ্রীসের বীরদের একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে তাহারা দেশ ও দেশমাতাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের চাইতেও বড় করিয়া দেখিতে। এ সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে।

আরিষ্টাইদিস ছিলেন গ্রীসের একজন বিখ্যাত সেনাপতি—সর্ব্বেসর্ব্বা বলিলেই হয়। গ্রীসদেশের একটা নিয়ম ছিল যে, যাহাকে ছয় হাজার লোক পছন্দ করে না তাহাকে নির্ব্বাসনে যাইতে হইত। একবার তিনি গ্রামের একটা পথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন চাষা আসিয়া কহিল,—"মহাশয় এই পত্রখানার উপর আরিষ্টাইডিসের নামটা লিখিয়া দিন ত।" আরিষ্টাইডিস্ উত্তর করিলেন, "বেচারা আরিষ্টাইডিস্ তোমার এমন কি ক্ষতি করিয়াছে যে তুমি তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাও।"

"না আমার কোন ক্ষতি করে নাই বটে, তবে কি জান, দিবারাত 'ধর্ম্মরাজ আরিষ্টাইডিস্' 'ধর্ম্মরাজ আরিষ্টাইডিস্'—শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছি।" আরিষ্টাইডিস্ নিজের নামটা ঐ কাগজে লিখিয়া দিলেন এবং নির্ব্বাসন দণ্ড মাথা পাতিয়া লইলেন।



আরিষ্টাইদিস ও কৃষক।



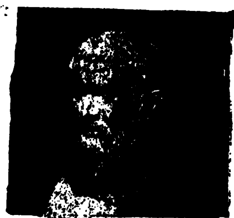
সক্রেটিসের বিষপান।

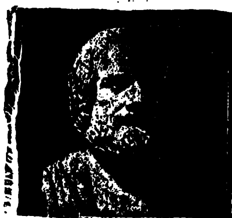
কালে এথেন্সের রণনৈপুণ্য কিছু হ্রাস পাইল। কিন্তু জ্ঞানগরিমায় এথেন্স এ সময়ে সর্ব্বপ্রধান। ঐ যুগেই বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সক্রেটিস্ জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার মত বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু হইলে কি হয়, গ্রীকেরা যে সকল দেবদেবীর



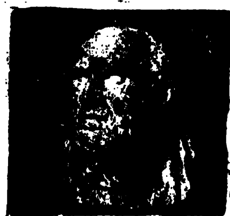
মৃত্যু শয্যায় আলেকজেণ্ডার।











১। থুসি দি দেশ, ২। হোমার, ৩। হিরোদোতাস্, ৪। অ্যাকিলাস্, ৫। সফোক্লিশ, ৬। ইরিপিদেস্, ৭। সোলোন, ৮। পেরিক্লিশ, ৯। আরিষ্টোফেনিস্, ১০। ডায়োজিনিস্, ১১। আলেকজাণ্ডার, ১২। সক্রেটিস।

গ্রীস্।



গ্রীক ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ।



আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক পার্সিপোলিস ধ্বংসের আদেশ প্রত্যাহার।




পুষ্প বিক্রেত্রী ।



তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের বিজয় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি

পূজা করিতেন, সক্রেটিস সে সকল মানিতেন না। তিনি এই অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলেন। বিচারে তাঁহার উপর বিষ পানের আদেশ হইল, তিনি হাসিমুখে সে বিষ পান করিলেন। এইরূপে পৃথিবীর একটি উজ্জ্বলতম রত্নকে মূঢ় দেশবাসী হত্যা করিল।

গ্রীসের গৌরবমুকুট দিগ্বিজয়ী বীর—আলেকজাণ্ডারের কথা না বলিলে সব বলাই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মাসিদনিয়া অধিশ্বর আলেকজাণ্ডার গ্রীসের গৌরবদিনের শেষভাগে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সব নগর রাজ্যগুলিই তাহার বশ্যতা স্বীকার করিল! তখন আশেপাশের রাজ্যগুলি অধিকার করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস! মুষ্টিমেয় গ্রীস সৈন্য লইয়া তিনি পৃথিবী জয় করিয়া আসিলেন। যে রাজ্য জয় করেন সেই রাজ্যেরই সৈন্য লইয়া তিনি অন্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করেন, এমনি করিয়া তিনি রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেন। শেষটা এই দিগ্বিজয়ী বীর আর রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না, অকালে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইল। আলেকজাণ্ডারের পরই গ্রীস রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল।

গ্রীস আর সে গ্রীস নাই। এখন গ্রীস আর দশটা দেশের মতই একটা দেশ—সে নিঃস্বার্থ দেশপ্রীতি, উদার ভাব আর গ্রীসবাসীর নাই। নাই থাকুক, তবু তাঁহার অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু আছে: সেই স্মৃতির সম্মুখে পৃথিবীবাসী আজও তাঁহাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন।

---

# পরিবর্ত্তন।

রাণা কুম্ভ চিতোরের রাজসভায় বসিয়াছেন—মালবরাজ মহম্মদ খিলিজীকে বন্দী অবস্থায় রাজসভায় আনা হইল। রাণা প্রথমেই তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন, বসিবার জন্য আসন দিলেন, বিগত দিনের কথা ভুলিতে বলিলেন।

মহম্মদ খিলিজী বোধ হয় ভাবিতেছিলেন, রাজপুতেরা তাঁহার সহিত ব্যঙ্গ অভিনয় করিতেছেন, নীরবে নতনেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাণা তখন বিবিধ অলঙ্কার সহ ডালা সাজাইয়া খিলিজীর সম্মুখে আনিয়া উপঢৌকন দিয়া তাঁহার সখ্য যাচ্ঞা করিলেন।

খিলিজী ভাবিলেন, যে রাণা যখন তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া এখন মুক্তি দিতেছেন, তখন তাহার জন্য নিশ্চয়ই একটা কিছু পণ দিতে হইবে; জিজ্ঞাসিলেন—মুক্তির কি মূল্য দিতে হইবে মহারাজ?

রাণা হাসিয়া বলিলেন—রাজপুত মুক্তি বেচে না, মালব রাজ! আপনাকে বিনাপণেই মুক্তি দিতেছি। বিনিময়ে যদি পারেন, মালব রাজ, এই অসভ্য বর্ব্বর জাতটাকে একটু আধটু স্নেহ করিবেন।" বলিয়া রাণা মহম্মদ খিলিজীকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন।

তখনকার কালে রাজপুত রাজাগণকে মুসলমান রাজাগণ অসভ্য বর্ব্বর জ্ঞান করিতেন। তাহারা যে শত্রুর সহিত এমন আচরণ করিতে পারে, যাহা তাঁহাদের মত সুসভ্য জাতিও করে কি না সন্দেহ—সে ধারণা ইহাদের ছিলই না; রাজপুতদের সম্বন্ধে এত উচ্চ কল্পনাও বোধ করি তাহারা করিতে



বিনিময়ে যদি পারেন, মালবরাজ এই অসভ্য,··· জাতটাকে···

পারিতেন না। তাই রাণার কথা শুনিয়া মহম্মদ খিলিজী লজ্জা পাইলেন! এত লজ্জা পাইলেন যে তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তিনি কৃতজ্ঞতা পূর্ণ হৃদয়ে আপনার রাজ মুকুট খুলিয়া রাণা কুম্ভের সিংহাসন তলে রাখিয়া দিলেন, বলিলেন—রাণা! আপনি মহৎ! আপনার মহত্ত্বের তুলনা নাই! আপনার তুলনায় আমরা অতি তুচ্ছ। তবু আপনি নিজের মহত্ত্বে আমাকে বন্ধু বলিয়াছেন, সেই বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমার এই রাজমুকুট চিরদিনের জন্য আপনার সভায় রাখিয়া গেলাম। এই মুকুট দেখিলে, আপনার, আপনার ভবিষ্যদ্বংশীয়ের—চিতোরের ভাবী রাণাদের চিরদিন এই খিলিজীর কথা মনে পড়িবে! আমারও শিরোস্ত্রাণ জগতের সর্ব্বোত্তম জাতির রাজসভায় স্থান পাইয়াছে জানিয়া আমিও পরম সুখানুভব করিব।

মহম্মদ খিলিজী চিতোর লুঠিতে আসিয়াছিলেন, চিতোরের সর্ব্বনাশ সাধিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! যখন ফিরিলেন, চিতোরের প্রতি শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে সারা মন ভরিয়া গিয়াছে; চিতোরের রাজবংশের প্রতি সম্মানে দস্যুহৃদয় ফুলিয়া উঠিয়াছে! কোথায় সেই শত্রুভাব, কোথায় ঈর্ষা-বিদ্বেষ! সব মলা ধুইয়া গিয়াছে, যা কিছু আবর্জ্জনা সব ভাসিয়া গিয়াছে, খাঁটী সোণাটুকুই জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে!

মহম্মদ খিলিজীর দুই চক্ষে সহস্র ধারা! বিজয়ীর এই সকরুণ, সশ্রদ্ধ ব্যবহার যত মনে পড়ে তত দুটি নয়নের বারিতে মুখ ভাসিয়া যায়! এই রাজপুত! এত বড় বীর, আবার এত দয়াদ্র´! এত দাম্ভিক, আবার এত কোমল! এত দৃঢ়, আবার এত মৃদু! একটা দেহের ভিতরে এ কি বিরুদ্ধভাব পাশাপাশি অবস্থান করে!

মহম্মদ খিলিজীর পরিবর্ত্তন যে কত দূর হইয়াছিল, তাহা তোমরা এই কথাগুলি হইতেই বুঝিতে পারিবে। তিনি শেষ বয়সে এক ইতিবৃত্ত লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাণা কুম্ভের কথা লিখিতে একস্থানে বলিয়াছেনঃ—

একটা হিংস্র পশু ভালবাসা পাইয়া চিরদিনের হিংস্র স্বভাব ত্যাগ করিয়া ফেলিল! অতি বড় পাষণ্ড নির্দ্দয় রক্তলোলুপ এক দস্যু যাহার ঘরে সিঁধ কাটিয়াছিল, তাহারই এক কণা দয়া পাইয়া পরম সাধু হইয়া গেল!......

মানুষটার এমনই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল! *

---

শিশু সাহিত্যের সুযশঃস্বী লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদার রচিত "রাজস্থানের গল্প" নামক শিশুভোষ সিরিজের "রাণা কুম্ভ—" এর একটি পরিচ্ছেদ। সঃ,আঃ দে।.



# বিদেশী গল্প।

## ভুলো মন

একজন পাদ্রী সাহেব এত অন্যমনস্কস্বভাব ছিলেন, যে তাঁর নামই হয়ে গেছল, "ভুলোমন!"

একবার তিনি খাবার আয়োজন করে অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করেন। অতিথিরা সবাই এসে পড়লে তাদের নিয়ে তিনি বাগানে একটু বেড়াতে গেলেন। ফুলফলের গল্প করতে করতে সকলে তাঁর সঙ্গে এগিয়ে চল্‌ল। বাগানের শেষে একটা খিড়কীর দরজার কাছে এসে তিনি সকলকে বল্‌লেন, "এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেই আপনাদের বাড়ী যাবার সুবিধা হবে। সামনের ফটক দিয়ে আর অনর্থক ঘুরে যাবার দরকার কি!"—ব'লে তিনি দরজা খুলে সকলকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। ভদ্রতার খাতিরে কেউ তাঁকে মনে করিয়ে দিতেও পারলে না যে সেদিন ঐখানেই খাবার কথা ছিল। শুধু বাগান দেখবার জন্যে আসা হয় নি।

## গির্জ্জা ভক্ষণ

হাড্‌ছন উপসাগরের কাছে একবার একটা গির্জ্জা কুকুরেরা খেয়ে ফেলেছিল।

শুন্‌তে খুবই অদ্ভুত, এমন কি অসম্ভবই মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল এই—স্থানীয় এস্কিমোরা তিমি মাছের পাঁজরায় খিলান করে ওপরটা সিন্ধুঘোটকের চামড়া দিয়ে ঢেকে একটা গির্জ্জা তৈয়ারী করেছিল। তারমধ্যে আশিজন লোক স্বচ্ছন্দে বস্‌তে পার্‌ত, আর রীতিমত উপাসনা চল্‌ত।

হঠাৎ একদিন একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত কুকুর সন্ধান পেলে যে জায়গাটা খুবই

লোভনীয়। কাজেই তারা যখন এসে পড়ল, তখন সমস্ত গির্জ্জাটা তাদের পেটে চলে যেতে বেশী দেরী হল না।

## ধৈর্য্যহীন

বিলাতে এক সভায় একজন বক্তা অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা করছিলেন। আড়াইঘণ্টার পরও তাঁর থাম্‌বার কোন সম্ভাবনা না দেখে শ্রোতারা একটির পর একটি সবাই পালিয়ে গেল। বাড়ীর প্রহরী যে, সে শুধু শেষ অবধি থাক্‌বে ভেবেছিল। কিন্তু সেও যখন দেখলে রাত যথেষ্ট হয়েছে, অথচ বক্তৃতা থামাবার কোন চেষ্টা নেই, তখন সে একটুকরো কাগজে একখানি চিঠি লিখে ভদ্রলোকের সামনে টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে এল। তাতে ছিল, "আপনার হয়ে গেলে আলো নিভিয়ে, দরজা বন্ধ করে চাবীটা মাদুরের তলায় রেখে দিয়ে যাবেন!"

## প্রলোভন

একবার এক রাজদূত বার্লিন সহরের গণ্যমান্য লোকদের একটা ভোজ দিয়েছিলেন। খাওয়া যখন বেশ চলেচে, তখন রাজদূতের এক কর্ম্মচারীর নজরে পড়ল প্রুসিয়াস্থ রাজকুমার খবরের কাগজে মুড়ে একটা আস্ত চিংড়ি মাছ সাবধানে পকেটস্থ কর্‌ছেন।

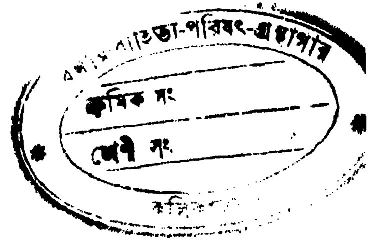
বেশী গোলমাল না করে কর্ম্মচারীটি তাঁর সামনে আচারদানটা নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন, এটাকে ও পকেটে নিন্। চিংড়িমাছটা এর সঙ্গে লাগবে ভালো!"

রাজকুমার কোথায় অপ্রস্তুত হবেন, না ওপর ওলার কাছে কর্ম্মচারীর নামে এক নালিশ জুড়ে দিলেন। যাই হোক্ এই অভদ্রতার জন্যে তাঁর শাস্তির কিছুই ব্যবস্থা হয়নি বরঞ্চ জানাজানি হয়ে যেতে সকলেই মজাটা উপভোগ কর্‌লে।

শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু।

---

# পার্সিয়ুস্।




## ( ১ )

আমাদের দেশ থেকে অনেক দূরে গ্রীস বলে এক দেশ আছে, তোমরা তার নাম শুনে থাকবে, এখন না শুনলেও এর পরে অনেক শুনবে। সেই দেশের লোকেরা কিন্তু সে দেশকে হেলাস বলে আর নিজেদের হেলেন বলে, যেমন আমরা বলি ভারতবর্ষ কিন্তু অন্য দেশের লোক বলে ইণ্ডিয়া।

অনেক—অনেক দিন আগে, এত আগে যে তোমাদের সে কথা বললেও তোমরা তা বুঝতে পারবে না, সেখানে আক্রিসিয়ুস আর প্রীটুস বলে দুই যমজ ভাই রাজত্ব করত, তাদের অভাব কিছুরই ছিলনা, সবুজ মাঠ, ফলের বাগান, গরু, ঘোড়া সবই ছিল, তবু তারা দুঃখী ছিল কেন জান? তারা জন্মে অবধি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত, দুজনেই চেষ্টা করত অপরকে ঠকিয়ে নিজে সমস্ত রাজত্বটা ভোগ করতে।

এক সময়ে সুযোগ পেয়ে আক্রিসিয়ুস প্রীটুসকে দিলে তাড়িয়ে, প্রীটুসও একচক্ষু দানবদের দেশে গিয়ে সেখানকার রাজকন্যাকে বিয়ে করে, সেই দেশের লোককে সঙ্গে করে ফিরে এল। তারপর দুজনে খুব যুদ্ধ বাধল। অনেক মারামারির পর কেউ যখন কাউকে হারাতে পারল না তখন তারা দুজনে ভাব করল। আক্রিসিয়ুস নিলে আর্গস সহর আর অর্দ্ধেক রাজত্ব আর প্রীটুস নিলে টাইরিনস্ আর বাকী অর্দ্ধেক। প্রীটুসের শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা টাইরিন্‌সের চারধারে এমন এক মজবুত পাঁচিল তৈরি করলে যে সে এতদিন বাদেও সমস্তটা ভাঙ্গে নি।

এদিকে কিছু দিন বাদে আক্রিসিয়ুসের রাজ্যে এক দৈববাণী হল যে "তুমি যেমন তোমার আত্মীয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করেছ, তেমনি তোমার আত্মীয়ই তার প্রতিফল দেবে, তোমার মেয়ে জামাইয়ের যে ছেলে হবে, তারই হাতে তুমি মরবে, স্বর্গের দেবতারা এই হুকুম করেছেন, কাজেই তা সত্যি হবেই।"

আক্রিসিয়ুস লোকটা ছিল ভারি পাজী, কোথায় এই কথা শুনে ভয় পেয়ে শুধরে যাবে, না আরও বেশী বদমাইসি আরম্ভ করলে। সে তার মেয়েকে মাটির নীচে লোহার তৈরী এক ঘরের মধ্যে পুরে রেখে দিলে, যাতে একটি মাছি পর্য্যন্ত তার কাছে যেতে না পারে। এই ব্যবস্থা করে সে মনে করলে যে সে ভারি চালাক, ভগবানকে খুব ফাঁকি দিলে।

কিন্তু ভগবানের ফল, কিছুদিন বাদেই রাজার কাছে খবর এল যে তাঁর মেয়ের একটি ছেলে হয়েছে। রাজা তা শুনে চটে মটে আগুন। তার পর কি করলে জান, একটা ভেলার মধ্যে ডানেই আর তার ছেলেকে বসিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে!

তখন উত্তরের পাহাড় থেকে হাওয়া সমুদ্রের দিকে বয়ে যাচ্ছিল, সেই হাওয়ার মুখে ভেলা ঢেউয়ের উপর নাচতে নাচতে ভেসে চল্‌ল। ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে যারা দেখলে সকলের চ'খেই জল এল কেবল রাজার মনে একটুও মায়া হ'ল না।

তারা ভেসে চল্‌ল; ছেলেটি মায়ের বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়ল, মায়ের চোখে ঘুম নেই—কেবলই কাঁদতে লাগল আর ছেলেটি যাতে জেগে না ওঠে সেই জন্য গুণ গুণ করে ঘুম পাড়ানী গান গাইতে লাগল। দেখতে দেখতে তারা অনেক দূর চলে গেল; সেখানে আর কিছু দেখা যায় না, শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র; আর মাথার উপর আকাশ আর চার পাশে বাতাস, কিন্তু তখন সমুদ্র ছিল শান্ত,

আকাশ ছিল নীল আর হাওয়া বইতেছিল খুব আস্তে ঝির্ ঝির্ করে কেননা সেই সময়ই ছিল হালসিয়নি আর সীক্স পাখীর ডিম পাড়ার সময়।

হালসিয়নি কে জান না বুঝি ? সে ছিল এক পরী, সাগর বেলা আর বায়ুর মেয়ে সে, সীক্স বলে এক নাবিককে বিয়ে করেছিল। তারা দুজনে দুজনকে খুব ভাল বাসত আর তাদের মত সুখী আর কেউ ছিল না। একদিন হল কি সীক্সের জাহাজ গেল ডুবে তখন হালসিয়নি সমুদ্রের তীরে ঝিনুক কুড়াচ্ছিল ; সে তাড়াতাড়ি সীক্সের কাছে গিয়ে তাকে বাঁচাবার আগেই সীক্স তলিয়ে গেল। আহা! তখন হালসিয়নির কি দুঃখ, সে যদি পারত ত নিশ্চয়ই ডুবে মরত, কিন্তু সে ছিল পরী, সে অমর। শেষকালে তার দুঃখ দেখে স্বর্গের দেবতাদের দয়া হল, তাঁরা তাদের দুজনকেই পাখী করে দিলেন আর তারা যখন ডিম পাড়ার জন্য বাসা বাঁধে, তখন সমুদ্র খুব ঠাণ্ডা থাকে।

রাত্রি গেল, দিন এল, ডানেইর ভেলা ভেসেই চলেছে, কোথাও ডাঙ্গার চিহ্ন নেই ; শুধু জল আর জল, ডানেই বেচারা ত কেঁদে কেঁদে আর ক্ষিদের চোটে আধমরা, কি ভাগ্যি ছেলেটা ঘুমুতেই লাগল। এইরকম করে আর একটা রাত্রি গেল, আর একটা দিন এল, ডানেই শেষ কালে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, মাথার উপর চেয়েই দেখে এক খাড়া পাহাড়, সন্ধ্যার সূর্য্যের আলোতে একেবারে সিঁদুর মাখা মত দেখাচ্ছে, আর তারই কোলে এসে সমুদ্রের ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে, আর সাদা সাদা ফেণা চারিদিকে ছিটকে যাচ্ছে। আর সেই ঢেউর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভেলাও পাথরের ওপর আছাড় খেয়ে মরমর হয়ে উঠছে। ডানেই ত ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠল।

তার চীৎকার শুনে পাহাড়ের উপর একজন লোক এসে দাঁড়াল। তার গায়ে একটা মোটা জামা আর মাথায় একটা শোলার টুপি, হাতে একটা মাছ ধরবার বর্শা আর কাঁধে এক মাছধরা জাল। কিন্তু ডানেই তাকে দেখেই বুঝল যে সে সাধারণ লোক নয়, তার লম্বা বীরপুরুষের মত চেহারা, তার চাল চলন, তার সোনালি রংয়ের চুল ও দাড়ি, আর তার সঙ্গের দুই চাকর, সব দেখেই ডানেই বুঝলে যে সে কোন বড় ঘরওয়ানার লোক, কিন্তু ডানেই এত কথা ভাববার আগেই সেই লোকটি এক লাফে নীচে নেমে এমন লক্ষ্য করে তার জালখানা ভেলার উপর ফেললে যে সেই ভেলা শুদ্ধ ডানেই আর তার ছেলেকে ডাঙ্গার উপর টেনে তুললে। তারপর ডানেইকে জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাঁগা বাছা, তুমি কোনদেশের লোক আর এমন অবস্থায় পড়লেই বা কি করে? তোমাকে দেখে ত বাছা কোন রাজকন্যা বলে মনে হয়, আর তোমার ওই চাঁদের মতন ছেলেটিও ত বাছা সাধারণ ঘরের নয়"।

ডানেই কিন্তু ফোঁপাতে ফোঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে "আগে বলুন যে আমি এ কোথায় এলুম, আর আপনিই বা কে?"

তখন সেই লোকটি বললে "এটি হচ্ছে সেরিফস্ দ্বীপ আর এখানকার রাজা হচ্ছেন পলিডেক্টিস, আমি তার ভাই, আমার নাম ডিক্টিস কিন্তু আমি মাছ ধরতে খুব ভালবাসি বলে লোকে আমাকে জেলে ডিক্টিস্ বলে ডাকে।"

তখন ডানেই তার পায়ের উপর পড়ে দুই পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "আমরা বড় অভাগা, আপনি আমাদের উপর দয়া করুন, আপনি আমাকে আপনার বাড়ীতে ঝি করেও অন্ততঃ রেখে দিন, যদিও একসময় আমি রাজকন্যা ছিলুম আর আমার এই ছেলেটিও সাধারণ ঘরের নয়। আমি বসে বসে আপনার খাব না, আমি এমন বুনতে পারি—"

ডিক্‌টিস্‌ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল "দেখ মা, আমি বুড় হয়েছি, মাথার চুল আমার পেকে গেল, কিন্তু আমার ঘর আলো করতে একটিও ছেলে পিলে নেই। তুমি আমার সঙ্গে চল, তুমি মা আজ থেকে আমার মেয়ে আর এই ছেলেটি আমার নাতি।"

অনেকক্ষণ বাদে এইবার ডানেই একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। উঃ সেই ভেলার সময়টা যেন আর ফুরাতে চাইছিল না। ডানেই যেন এই ক' দিনেই একেবারে বুড়ী হয়ে পড়েছে।

তার পর প্রায় পনের বৎসর কেটে গিয়েছে, সেই যে খোকাটি মায়ের সঙ্গে ভেলায় চড়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সেরিফস দ্বীপে এসে পৌঁছেছিল সে এখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে, সে ইতিমধ্যেই নাবিক হয়ে জাহাজে চড়ে অনেক দেশ ঘুরে টুরে এসেছে। ছেলেটির যদিও পনের বৎসর মাত্র বয়েস হয়েছে, সে এরি মধ্যে মাথায় সেরিফস দ্বীপের সব লোকের চেয়ে লম্বা হয়েছে, আর কি দৌড়ান, কি খেলায়, কি কুস্তিতে, কি গান বাজনায়, মানুষের উপযুক্ত যা কিছু কাজ, সারা সেরিফাস দ্বীপে তার মত কেউই কর্ত্তে পারত না। এবং ডিক্‌টিস তাকে এমন করে গড়ে তুলেছিল যে তার স্বভাবটিও ছিল ভারী মিষ্ট, এদিকে যেমন সাহসী, তেমনি ভদ্র। এই সব দেখে শুনে সেরিফসের লোক তাকে দেবপুত্র বলে ডাকত, যদিও তার মায়ের দেওয়া নাম ছিল পার্সিয়ুস।

এই সময় একবার পার্সিয়ুস এক জাহাজের সঙ্গে সামোস দ্বীপে গেছে, আর এদিকে তার মায়ের ভারী এক বিপদ হল। তোমাদের মনে আছে বোধ হয় যে ডিক্‌টিসের ভাই পলিডেক্‌টিস ছিল সেরিফসের রাজা। এই রাজামশাইটি কিন্তু ডিক্‌টিসের মত ভাল লোক ছিলেন না। লোকটা ভারী পাজী। তিনি ডানেইকে দেখে বিয়ে করবার জন্য খাপ্পা, কিন্তু ডানেই তাতে

রাণীই হল না, কেননা একেত সে রাজাকে ভাল বাসত না তার উপর অমন চাঁদপানা ছেলে থাকতে তার বিয়ের দরকারই বা কি? রাজা কিন্তু ভারী চটে গেল, আর যেই পার্সিয়ুস চলে গেছ অমনি ডানেইকে জোর করে ধরে এনে বললে "তুই যদি না আমার রাণী হবি ত দাসী হ।" ডানেইর বড় কষ্টে দিন যেতে লাগল, তাকে সমস্ত দিন খাটতে হত, গলায় আবার একটা লোহার শিকল, আবার কাজ না করতে পারলেই মার।

পার্সিয়ুস এদিকে সামোসে এসে নেমেছে, সে মায়ের খবর কিছুই জানে না, বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে সকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে এক বনের ধারে গিয়ে পড়ল। তার পর ক্লান্ত হয়ে এক্ক গাছের ঠাণ্ডা ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এক ভারী অদ্ভুত স্বপন দেখল।

সে স্বপন দেখলে যে বনের মধ্যে দিয়ে তার দিকে একটি মহিলা আসছেন। তিনি মানুষের চেয়ে ঢের বেশী ঢেঙ্গা আর ভারী সুন্দর দেখতে তাঁর চোখ দুটি, টানা টানা যেন জ্বল জ্বল করছে, অথচ তার মধ্যে ভারী মোলায়েম ভাব। তাঁর মাথায় এক মানোয়ারি টুপি হাতে এক বর্শা, আর তাঁর কাঁধের উপর একখানা ছাগলের চামড়ার উপর একখানি আয়নার মত ঝকঝকে ঢাল। তিনি এসে পার্সিয়ুসকে দেখতে লাগলেন; পার্সিয়ুস দেখলে যে তাঁর পলকও পড়ে না আর চোখের তারাও নড়ে না, আর তার মনে হতে লাগল তাঁর সেই চোখের দৃষ্টি যেন বাইরের চামড়া ফুঁড়ে একেবারে মনের মধ্যে পর্য্যন্ত দেখতে পাচ্ছে, সে জীবনে যা কিছু করেছিল বা করবে বলে ভেবেছিল সে সব কিছুই যেন তাঁর কাছে চাপা থাকছে না। পার্সিয়ুস তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না, চোখ নামিয়ে নিল, তার কাণের মূল পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

তার পর সেই মহিলাটি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তাঁর গলার আওয়াজটি বাঁশীর মত মিষ্টি )

পার্সিয়ুস তুমি আমার একটা কাজ করবে" ? পার্সিয়ুস জিজ্ঞাসা করলে "আপনি কে ? আমার নামই বা জানলেন কি করে ?"

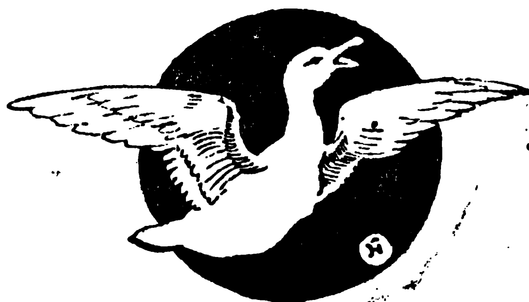
তিনি বললেন "আমার নাম প্যালাস আথিনি এবং আমি সকলকার মনের খবর বলতে পারি। যাদের মন মাটির মত নির্জীব আমি তাদের কাছে থাকি না। হতে পারে তারাও সুখী,তারা বেশ খায় দায় মোটা হয়, যেমন ছাগল ভেড়াও খায় দায় মোটা হয়, তার পর মরে গেল, ফুরিয়ে গেল, আর তাদের নামও পৃথিবীতে কেউ করে না। কিন্তু যাদের মনে আগুনের মত তেজ আছে আমি তাদের সেই আগুনকে আরও জ্বালিয়ে দিই। যাদের মানুষ হবার ক্ষমতা আছে আমি তাদের আরও ক্ষমতা দিই, এরাও সুখী কিন্তু মাটির মানুষদের মত নয়। আমি তাদের নতুন নতুন রাস্তায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াই, তারা হাজার হাজার বিপদের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে, তাদের প্রত্যেক হাত রাক্ষস আর দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগুতে থাকে,তাদের মধ্যে কত জন তোমার মত এই কাঁচা বয়সেই এই সব দেবতা মানুষের শত্রুর হাতে মারা যায়, আবার কেউ কেউ এই সমস্ত শত্রুকে নষ্ট করে, পথের বাধা জয় করে বেড়ায়, পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাদের খাতির করে, তাদের গুণের কথা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের কাছে গল্প করে। তবে তার পর যে তাদের কি হয় তা এক ভগবান ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন বল এদের মধ্যে তোমার কাকে বেশী সুখী মনে হয় ?"

তখন পার্সিয়ুস বলে উঠল "যে পৃথিবীতে সুনাম করবার চেষ্টা করে মরাও ভাল ; জন্তু জানোয়ারের মত শুধু খেয়ে পেট মোটা করা আর পৃথিবীতে কারুর কোন কাজে না আসা ভাল নয়"।

পার্শিয়ুসের কথা শুনে দেবী খিল খিল করে হেসে উঠিলেন আর বললেন "দেখ দেখি পার্সিয়ুস্ এই রকম একটি ভীষণ রাক্ষসীকে মারবার তোমার সাহস হয়?" এই বলে তিনি সেই আয়নার মত ঢালখানা তুলে ধরলেন আর তার মধ্যে একখানি সুন্দর মুখ ফুটে উঠল যে তার দিকে তাকিয়েই পার্শিয়ুসের পা থেকে মাথা অবধি শিউরে উঠল। মুখখানি একটি সুন্দর মেয়ে মানুষের কিন্তু তার মুখ মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে, তার কপাল অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁচকান তার ঠোঁট দুটা সাপের ঠোঁটের মত পাতলা তার মাথার চুলের বদলে ছোট ছোট সাপের গাঁদি তাদের ফণা বার কচ্ছে আর তার মাথার দুপাশে দুখানা চিলের ডানার মত ডানা আর বুকের মাঝখানে বড় বড় পিতলের নখওলা থাবা ঠিক বাঘের থাবার মতন।

পার্সিয়ুস সেই দিক থেকে খানিকক্ষণ আর চোখ ফেরাতে পারল না, তার পর বলে উঠল, উঃ পৃথিবীতে যদি এমন বিভীষিকা কিছু থাকে ত তাকে মারা এক খুব ভাল কাজ, একে আমি কোথায় পাব বলুন? (ক্রমশঃ)

শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র।



# দুই ভাই।

## ( গল্প )

পরেশ বাবুর দুই ছেলে, তাদের নাম হচ্ছে হরিশ আর সতীশ। হরিশ বড় সতীশ ছোট! হরিশ যেমন বোকা সতীশ তেমনই বদমাইস্। এই দু'ভায়ের কাণ্ড তোমাদের কিছু বল্‌বো! একটু শোন ঃ—

আমরা হরিশের সঙ্গেই পড়্‌তুম! একদিন হরিশ ট্রানশ্লেসন্ এর ঘণ্টায় মাষ্টার মশাইকে জিগ্‌গেস কল্লে—"স্যার My head মানে কি ?" মাষ্টার মশাই বল্লেন—My head মানে আমার মাথা।" পরদিন হরিশের বাবা যখন আফিস যাচ্ছিলেন তখন শুনতে পেলেন,"হরিশ পড়িতেছে—My head মানে স্যারের মাথা।" তার বাপ তা শুনে বল্লেন—"ওরে গাধা ওর মানে আমার মাথা"। এই বলে তিনি আফিস চলে গেলেন। বুদ্ধিমান ছেলে ভাব্‌লো-কি রকম My head মানে স্যার বল্লেন আমার মাথা" বাবা ও বল্লেন—আমার মাথা এখন কার মাথা বলি! যা' হ'ক' সে শেষে My head মানে "বাবার মাথা" মুখস্থ করে স্কুলে গেল।

পরদিন স্কুলে পড়া বল্‌বার সময় মাষ্টার মশাই হরিশকে জিজ্ঞাস কল্লেন— My head মানে কি ? হরিশ বল্লে—My head মানে বাবার মাথা" মাষ্টার মশাই ' বল্লেন—-বাবার মাথা কিরে ? বল আমার মাথা।" হরিশ ভাব্‌লে এখন কি করি, কার মাথা বলি দু'জনই আমার গুরুজন, কার কথা রাখি ? তারপর সে ভেবে বল্লে—My head মানে স্কুলে আমার মাষ্টার মশাইর মাথা, বাড়ীতে বাবার মাথা।"

মাষ্টার মশাই ও আমরা সবাই ত হেসেই আকুল। তারপর তিনি হরেন কে জিজ্ঞাসা কল্লেন—My head মানে কি ?" হরেন বল্লে—My head মানে

আমার মাথা। তারপর হরিশকে বল্লেন "তা' হলে ওর মানে কি হলো? সে বল্লে—"হরেনের মাথা।" হরেন বল্লে—কি? আমারমাথা? দেখ্‌বি? বলে সে হরিশকে একটা থাব্‌ড়া মারলো। সে হতভম্ব হয়ে রইলো মাষ্টার মশাই কতই বোঝালেন কিন্তু হরিশ my head মানে কার মাথা, তা ঠিক কর্‌তে পার্‌লো না।

এই গেল এক ভাইয়ের; আর এক ভাইয়ের কথা শোন:—

কল্‌কাতায় অনেক উড়ে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ নিজেকে একজন বড় গণৎকার বলে জাহির ক'রে বেড়ায় তোমরা তা দেখেছ বোধ হয়। একদিন আমরা সবাই খেলা কর্‌ছি (তার মধ্যে সতীশ ও ছিল) ও মারামারি কর্‌ছি এমন সময় একজন এই রকম উড়ে গণৎকার আমাদের কাছে এলো ও বল্লো—"বাবু আমি গণৎকার, আমি লোকের মনের কথা ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারি। তা' শুনে সতীশ তাড়াতাড়ি বল্লো—"ঠাকুর আমার হাতটা দেখ না।" তখন সেই গণৎকার গম্ভীর হয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো—"এ বাবু বড় হ'লে উকিল হবে, কিন্তু বাবু তুমি বড় বদমাইস—(কারণ একটু আগেই সে সতীশকে সতোনের সঙ্গে মারামারি কর্‌তে দেখেছিল)—"উড়ে এমন ভাবে বল্‌ছে এমন সময়ে সতীশ তার গালে সজোরে থাবড়া মারল। উড়েটী হতভম্ব হয়ে বল্লো—মারিলে বাবু—

সতীশ অম্লান বদনে উত্তর কর্‌লো—"ঠাকুর তুমি কি রকম গণৎকার? এই বল্লে যে পরের মনের কথা বুঝতে পার, আমি ত অনেকক্ষণ হতে ভাবছি যে তোমায় মার্‌বো; তুমি যখন গণৎকার তখন তোমার আগেই ত সাবধান হওয়া উচিৎ ছিল—

উড়ে আর একটি ও কথা না কয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল, আমরাও তার এইকাণ্ড দেখে অবাক্‌।

দু'জনের কাণ্ড শুন্‌লে ত? এখন তবে আসি। শ্রীসুকুমার মুখোপাধ্যায়।

# মিথ্যাবাদী।

সকাল বেলায় ফুলবাগানে, শেয়াল ঢুক্‌ল, দেখ্‌তে পেয়ে,
ছুট্‌ল দীনু, সঙ্গে তারি ছুট্‌ল ছেলে, ছুট্‌ল মেয়ে।
সাম্‌নে গিয়ে, বাগিয়ে লাঠি, বল্‌লে, 'তুমি ভয় রাখো না?
এ-সব পাড়ায় ঢুকলে তোর, ধেইকিনাগড় মার দোব না।'
শেয়াল বল্‌লে 'কপাল আমার, কি কুক্ষণেই জন্মেছিলুম!
এমন কেমন হ'ল, আমি—কার মনে কি কষ্ট দিলুম?
সবাই বলে, দূর হয়ে যা, সবাই তাড়ায়, সবাই মারে!
ভালো হবার সুযোগ পেলে ভালো হ'তে কে-ইনা পারে?
'সবাই পারে, সবাই পারে!'
চোখের জলে ভিজ্‌ল দীনু, বললে 'আহা, আয় বাছারে!
শেষটা তাকে আদর ক'রে, বল্‌লে 'আমার লক্ষ্মী-সোণা!
থাক্‌বে কাছে, চাক্‌রি তোমার, হুক্কাহুয়ার ঘণ্টা গোণা।
যা খাবে তাই খেতে দিব, হাঁসগুল সব আগ্‌লে রেখো।
বুদ্ধি তোমার খুবত আছে, একটু এবার বিদ্যে শেখো!'
বল্‌লে শেয়াল ভক্তিভরে 'পায়ের ধূলো দাও গো মাথায়!
তোমার কথা রাখ্‌ব লিখে ইতিহাসের পাতায় পাতায়!'
ওমা, তারই দুদিন পরে
হাঁসের ঘরটা শূন্য ক'রে শেয়ালভায়া ফিরল ঘরে!

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু।

---

# রাজার আদেশ।

এক রাজা তাহার রাজ্যমধ্যে এই মর্ম্মে একনিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে রাজ বাড়ীর সম্মুখের রাজপথ দিয়া রাজার অনুমতি ব্যতীত কেহ যদি ঘোড়া দৌড়াইয়া গমন করে তবে তাহার পঞ্চাশটাকা জরিমানা দিতে হইবে। রাজ্যের সর্ব্বত্র এই আদেশ প্রচারিত হইল। রাজা কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন তাহারা দিবা রাত্রি পাহারা দিবে এবং যদি কাহাকেও ঐ পথ দিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইতে দেখে, তবে তৎক্ষণাৎ রাজ সমীপে আনয়ন করিবে, এই হইল রাজার আদেশ।

রাজাজ্ঞা প্রচারিত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন প্রভাতে একটী অশ্বারোহীকে অশ্বপৃষ্ঠে ঐ পথ দিয়া যাইতে দেখা গেল। রাজ প্রহরীগণ অনতিবিলম্বে রাজাদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল। অশ্বারোহীকে তাহার অশ্বসহ রাজদরবারে উপস্থিত করা হইল।

রাজা বিচারে বসিলেন, রাজসভা লোকে লোকারণ্য; রাজা অশ্বারোহীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জানেন না যে ঐ পথ দিয়া ঘোড়া দৌড়াইয়া গেলে ৫০৲ জরিমানা দিতে হয়? আপনি রাজাজ্ঞা অমান্য করার অপরাধে অপরাধী, আমি আইন অনুসারে আপনার ৫০৲ জরিমানা করিলাম।

অশ্বারোহী বলিল "মহারাজ! আমি আপনার আদেশ অবগত আছি জরিমানার কারণও আমি জানি। কিন্তু তথাপি আমি অপরাধী নহি। আমার জরিমানা হইতে পারে না, কারণ আমার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আজ আমাকে এই পথ দিয়া যাইতে হইয়াছে এবং আমি জানি অশ্বারোহণে গেলে আপনি আমার জারিমানা করিবেন, তাই আমি অশ্বারোহণে যাই নাই। আপনি

পরীক্ষা করিয়া দেখুন আমি ঘোড়ীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতে ছিলাম। ঘোড়ায় চড়িয়া গেলে জরিমানা দিতে হইবে অথচ ঐ পথ দিয়া না গেলে কাজ হয় না এই জন্য আমি ঘোড়ীর পৃষ্ঠে যাইতে ছিলাম। অতএব মহারাজের আদেশ অমান্য আমি করি নাই, এবং প্রার্থনা করি আমাকে মুক্তিদান করিতে আপনার অমত হইবে না !”

ন্যায় পরায়ণ রাজা মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন, অশ্বারোহীর দণ্ড হইতে পারে না। অশ্বারোহী বিনাদণ্ডে মুক্ত হইয়া ঘোড়ীরপৃষ্ঠে সেই পথ দিয়াই চলিয়া গেল।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।



# একটি কথা।

তোমরা যদি একখানি পাঁজী খুলিয়া দেখ, দেখিবে যে প্রত্যেক দিনের বার তারিখ, সূর্য্যোদয়, ক্ষণ কাল প্রভৃতির সঙ্গে আরও অনেক জিনিষ লেখা থাকে। তন্মধ্যে কোন্ দিন কোন্ বস্তু খাইতে নাই, তাহারও উল্লেখ থাকে। এককালে আমাদের দেশে এই নিয়ম ছিল যে প্রায় সকলেই পাঁজীর নির্দ্দেশমত আহারাদি করিত; এখনও অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে দেখা যায় যে বাড়ীর কর্ত্তা বা কর্ত্রী প্রত্যুষ হইতেই পাঁজী দেখিয়া সেদিন কোন্ জিনিষ খাইতে নাই, তাহা গৃহস্থকে জানাইয়া দেন; সেদিন সেই নিয়মেই রন্ধনাদি হইয়া থাকে।

পাঁজীতে কোন্ দিন কি খাইতে নাই, তাহা লেখা থাকে বটে কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু খাইলে যে কি হয়, তাহা পাঁজীতে লেখা থাকে না। লেখা না থাকার দরুণ অনেকে নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করে এবং তখনি তখনি অপকার অনুভব না করিতে পারিয়া পঞ্জিকার আদেশ অমান্যও করিয়া থাকে। কিন্তু এরূপ করা সঙ্গত নয়। একদিনেই হয়ত অপকার জানা যাইতে না-ও পারে কিন্তু উপর্য্যুপরি অমান্য করিলে শরীর কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না।

আমরা কোন্ দিন কি বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ ও খাইলে কি ফল হয়, তাহার একটি তালিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। তালিকাটি 'বিনটিয়া জ্ঞান সাধন মঠ' হইতে যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী মহাশয় পাঠাইয়া দিয়াছেন। তোমাদের জ্ঞাতার্থ তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আশা করি তোমরা ইহা পাঠ করিবে ও মন দিয়া ব্রহ্মচারীর আদেশ পালন করিবে।

## তিথি ভেদে নিম্নলিখিত দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রতিপদে | কুষ্মাণ্ড | খাইলে | ব্রণাদি রোগ জন্মে। |
| দ্বিতীয়াতে | বৃহতি | ” | অর্ব্বুদ রোগ হয়। |
| তৃতীয়াতে | পটল | ” | বাত রক্ত হয়। |
| চতুর্থীতে | মূলা | ” | আমবাত হয়। |
| পঞ্চমীতে | বেল | ” | পিত্ত সম্বন্ধীয় ব্যাধি জন্মে। |
| ষষ্ঠীতে | নিম | ” | গলগণ্ড ইত্যাদি হয়। |
| সপ্তমীতে | তাল | ” | রক্ত পিত্ত হয়। |
| অষ্টমীতে | নারিকেল | ” | অজীর্ণ হয়। |
| নবমীতে | লাউ | ” | বাত শ্লেষ্মা হয়। |
| দশমীতে | কল্‌মি শাক | ” | অম্ল পিত্ত হয়। |
| একাদশীতে | শিম | ” | জ্বর হয়। |
| দ্বাদশীতে | পূঁই শাক | ” | যক্ষ্মা কাশ হয়। |
| ত্রয়োদশীতে | বেগুণ | ” | কুণ্ড রোগ চুলকনা ইত্যাদি হয়। |
| চতুর্দ্দশীতে | মাস কলাই | ” | অতিসার কি উদরাময় হয়। |
| পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় | মাংস | ” | শ্লেষ্মা জনিত পীড়া জন্মে। |

রাত্রিতে শাক ও পাতা জাতীয় জিনিষ খাওয়া উচিৎ নয়, পিত্ত কুপিত হয়।

আমাদের আর্য্যঋষিগণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াই খাদ্য সম্বন্ধে নানারূপ নিষেধ বাক্য দ্বারা ঐ তিথিতে ইহা খাইবে না অমুক দিন ইহা খাইবে না বলিয়া গিয়াছেন; আপনারাও যে দিন যে জিনিষ খাওয়া নিষেধ বলিয়া গিয়াছেন তাহা খাইয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন কম বেশী কিছু শরীর অসুস্থ হইয়াছে।

কুনালার্ণব তন্ত্রের অনুবাদক হাইকোর্টের জজ মাননীয় মিঃ উড্‌রফ সাহেব বাহাদুরও নিজে অনেক বিষয় পরীক্ষা করিয়া হিন্দু শাস্ত্র অক্ষরে অক্ষরে সত্য ও স্বাস্থ্যের প্রধান উপায় বলিয়া খবরের কাগজে একবার লিখিয়াছিলেন।

আমেরিকার কোন ডাক্তার ত্রয়োদশীতে বেগুণ খাওয়া নিষেধ দেখিয়া একটী বেগুণ ত্রয়োদশী যেই আরম্ভ হইয়াছে তখনি কাটিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখিয়াছেন, বেগুণের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকা জন্মিতেছে ও মরিতেছে এবং ত্রয়োদশী তিথি যেই শেষ হইয়া গিয়াছে আর কোন পোকার চিহ্নও নাই এরূপ নিষিদ্ধ বাক্যগুলি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের বিশেষ অনিষ্টকারী তাহাতে সন্দেহ নাই।”

---

# এক মিনিটের ক’টি গল্প।

## বড় চোর ও ছোট চোর।

একটি ছোট ছেলে একটা কুয়োর ধারে বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইরা কাঁদিতেছিল। ভোর বেলা সেই পথ দিয়া এক চোর এক বড় লোকের বাড়ীতে সিঁধ কাটিয়া চুরি করিয়া ফিরিতেছিল। ছেলেটীকে কাঁদিতে দেখিয়া চোর তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসিল—এই ছোঁড়া, এখানে বসে কাঁদছিস কেন? ছেলেটি ফুঁপইেতে ফুপাইতে কহিল—ওগো আমার সোনার বালাটা কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছে গো। চোর ভাবিল, সোনার বালা, তাইত! দাঁড়া তুলে দিচ্ছি—বলিয়া চোর পিঠের বোঁচকাটি নামাইয়া কুয়োর মধ্যে নামিয়া পড়িল। যখন অনেক খানি নামিয়াছে—ছেলেটি বোঁচকাটি লইয়া দে চম্পট।

## উত্তম রচনা।

একটি মেয়ে স্কুলের পরীক্ষা বসিয়াছে। সব-চেয়ে বুদ্ধিমতী বালিকার নাম, শেফালিকা। সে কেমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারে, তোমরা যদি শোন ত অবাক হইয়া যাইবে। তবু তার বয়স এই মোটে এগার। সেবার "অশ্ব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইবে, শেফালিকা লিখিল, অশ্ব একটি প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ জন্তু, তাহার চারকোণে চারিটী পা আছে।"

---

## উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

এক ভারি কৃপণ বামুণ একটি আধলার খই কিনিয়া আনিতেছিল, পথে ভীষণ ঝড়। ব্রাহ্মণ গায়ের কাপড় সামলায় না খৈ সামলায়! খৈগুলা উড়িতে লাগিল; ব্রাহ্মণ দেখিল এই সুযোগ খৈগুলি যদি ঈশ্বরের কাজে লাগাতে পারা যায় তবে বেশ হয়; খৈ উড়িতেছে ব্রাহ্মণ চোখ বুজিয়া (চোখ চাহিয়া অপচয় দেখিতে পারিবে না) বলিতে লাগিল—উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ, উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

---

## হয় তুই—নয় মুই!

এক পেটুক দাদা-ঠাকুর ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইয়া ভারি খুসী। ছোট ভাইকে ডাকিয়া দাদা-ঠাকুর বলিলেন—দেখ্ ভজা হয় তুই গরুর জাব দে আমি ফলারে যাই, নয় ত মুই ফলারে যাই, তুই গরুর জাব দে! যা করবি—দুয়ের একটা কর।

---

## দর্জ্জিপাড়া চন্দ্র।

ছোট ছেলে বাপের কাছে বসিয়া "বঙ্গবাসীর" পাশের খবর পড়িতেছিল। পড়িতে পড়িতে দেখিল, প্রথম বিভাগে একটি লোক পাশ করিয়াছে তার নাম নবদ্বীপচন্দ্র সাহা। বাপকে জিজ্ঞাসিল—বাবা, নবদ্বীপ চন্দ্র নাম হয়? বাবা বলিলেন—হাঁ, হয়। ছেলে বলিল—বাবা ছোট খোকার নাম আমাদের দর্জ্জিপাড়াচন্দ্র রাখব, কেমন?—তাহাদের বাড়ী দর্জ্জিপাড়া তালগাছের কাছেই।

---

## বুড়ীর ঘর।

বুড়ীর ঘরে ভারি বৃষ্টি পড়ে। বুড়ী রোজ আকাশের দিকে চাহিয়া ঝাঁটা উঠাইয়া দেবতাকে গালি পাড়ে। প্রতিবেশীরা বলিল—বুড়ী ঘর সারাস না কেন? বুড়ী চটিয়া গিয়া বলিল—সারাই কখন্ বল ত বাপু! মুখপোড়া দেবতা কি একদিন থাম্‌বে! বর্ষা কাটিয়া গেল, প্রতিবেশীরা পরামর্শ দিল, এই বেলা ঘর সারাইয়া রাখ বুড়ী। বুড়ী বলিল—এখন সারিয়ে কি করব বাছা, আর ত বৃষ্টি পড়ছে না!

---

## শীতলার চাঁদা।

এক ডাক্তারের মা'র কাছে পাড়ার ছেলেরা শীতলা পূজার চাঁদা চাহিতে গিয়াছে, ডাক্তার বাবুর মা বলিলেন—আহা, মা শেতলা করুন, নিতুর আমার রোজগার পাতি হো'ক, মড়ক টড়ক দেখা দিক্, চাঁদা দেব বৈ-কি!

পাড়ার ছেলেরা কিন্তু চাঁদা লইল না, পরেও লইবে না প্রতিজ্ঞা করিল।

---

## বড় গর্ত্ত।

এক বাবু চাকরকে বলিয়াছেন, একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে। চাকর জিজ্ঞাসিল, মাটি যা উঠ্‌বে কোথায় রাখব ? বাবু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—গর্ত্তটা একটু বড় করে কাটবি, যে মাটি উঠবে তাতেই রাখবি। সেই বাবুরই চাকর ত, তাই করিল। তিন দিন তিন রাত গেল গর্ত্ত আর হইল না। বাবু চাকরকে তাড়াইয়া দিলেন।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

---

## "আষাঢ়ে গল্প"

### ( ১ )

সে আজ অনেক দিনের কথা। বিশাখা নদীর তীরে ছোট একখানি কুটির বেঁধে, বাস করত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার ব্রহ্মণীকে নিয়ে ; সংসারে এই দুটি প্রাণী ভিন্ন আর কেউ ছিল না। ব্রাহ্মণটী ছিল খুব সরল প্রকৃতির লোক মনের মধ্যে কোনও গোল ছিল না। দিনের মধ্যে একবার কোনও রকমে কষ্টে-সৃষ্টে উদর পূর্ত্তি করতে পারলেই তার সমস্ত ভাবনা দূর হয়ে যেত। সকাল বেলা উঠে নিজের পূজার জন্য ফুল তুলে আর গ্রামের দু একটি যজমান ঘরে পূজা করে এসে, ব্রাহ্মণ আপনার মনে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, যেখানে ছোট ছেলেরা খেলা কর্‌ছে বা কেউ নদীর ধারে বসে মাছ ধরছে। দোষই হোক্ আর গুণই হোক্, ব্রাহ্মণ বেশ নিজের মনে শ্লোক রচনা করত। অবশ্য সে শ্লোকের পনের আনা হত, তার গৃহিনীর সুখ্যাতি করে।

তাই বলে অন্য সময় যে তার কথার মিলের অভাব হত, তা মোটেই নয়। হয়ত কোনও ছেলে কারুর বাগান থেকে আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে ছু এক ঘা আহার করে, চোখের জলে ভাস্‌তে ভাসতে বাড়ী আসছে, তাই দেখে ব্রাহ্মণের মুখে অমনি কথার মিল এসে জুট্‌ত,

খেতে গিয়ে, চুরি করে আম মেরে ঢিল
খেয়ে এল, একজন পেট ভরে কিল।'

এম্‌নি ভাবে একটা কিছু উপলক্ষ্য পেলেই ব্রাহ্মণের মুখে, শ্লোকের ছড়াছাড়ি হত। গৃহিণীটী তার মোটের ওপর ভালই ছিল, কিন্তু টাকার অভাবে মধ্যে মধ্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে, ব্রাহ্মণকে টাকার জন্য যখন তাগাদা দিত, তখন তার স্বভাবটা যে বেশ মোলায়েম আর প্রীতিকর হত না, তা বলাই বাহুল্য। তার পর যখন পাড়ার অন্য মেয়েদের হাতে নতুন ধরণের চুড়ি, গলায় নতুন ধরণের হার প্রভৃতি চোখে পড়ত, তখন নিজের ছু গাছি শাঁখা পরা হাতের দিকে চেয়ে, ব্রাহ্মণীর বুক কান্নায় ভরে যেত, আর একটু বেশ রাগতভাবেই ব্রাহ্মণকে ছু কথা শুনিয়ে দিবার লোভ সে সম্বরণ করতে পারত না। ব্রাহ্মণ কিন্তু তার সেই হাসি মুখেই ব্রহ্মণীর দুর্দ্দান্ত রাগ, নির্ব্বিবাদে হজম করে ফেলত। কখনও বা একটা শ্লোক রচনা করে, একটু উচ্চস্বরে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত,

লক্ষ্মী এমন, আমার মত গিন্নী ঘরে যার,
টাকা পয়সা, গয়না গাঁটি, কিসের অভাব তার!"

ব্রাহ্মণীর মুখে আবার হাসি ফুটে উঠত। ব্রাহ্মণ যেন কিছুই লক্ষ্য করেনি এমনি ভাবে ঘরের বাইরে চলে যেত।

এমনি ভাবে কতদিন যায়। তারপর একদিন রাজ্যের শেষ সীমায়,

ব্রাহ্মণের কুটিরের কাছেও সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, রাজ বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় হবে; রাজপুত্রের বিদ্যারম্ভ—তাই রাজ্য মধ্যে যত পণ্ডিত আছেন তাঁদের নিয়ে এক মস্ত সভা হবে।

রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সভা এমন কতদিন হয়েছে। ব্রাহ্মণ কখনও পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে, সেই বড় রাজ প্রাসাদের মধ্যে বিদায়ের দান গ্রহণ করবার জন্য যায় নি। এবার কিন্তু ব্রাহ্মণী নাছোড় বন্দা, যে ব্রাহ্মণকে রাজবাড়ীর সভায় যেতেই হবে। একে ব্রাহ্মণ, তাতে অমন 'কথার মিল করে', শ্লোক রচনা করতে পারে,—এগুণের সমাদর কি রাজা ছাড়া আর কেউ করতে পারে? একবার রাজার কাছে একটা ভাল শ্লোক রচনা করতে পারলে, একটা রাজবৃত্তি পাওয়া যাবে আর অন্নবস্ত্রের অভাব থাকবে না। এই সব নানা রকম ভেবে ব্রাহ্মণী ত ব্রাহ্মণকে যাবার জন্য বিশেষ করে বলতে লাগল। ব্রাহ্মণ উত্তরে এক শ্লোক রচনা করে বল্‌ল,

রাজবাড়ীতে যাবার নামে ভয়েই কাঁপে বুক,
চাইনে আমি ধন দৌলত, চাইনে এমন সুখ।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। রাজবাড়ীতে যাওয়া মনে করে, আর ভাবনায় অস্থির হয়ে, দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বে ও, ব্রাহ্মণ ক্ষুন্নমনে বেরিয়ে পড়ল, রাজবাড়ী যাবার উদ্দেশে।

( ২ )

পথে চল্‌তে চল্‌তে ব্রাহ্মণ ভাবছে, রাজার কাছে কি শ্লোক রচনা করে শোনাব! রাজার খুব স্তুতিগান করে তুষ্ট করব না অন্য ভাবে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণের বিদায় দান নিয়ে ঘরে ফিরব। শ্লোক রচনা করে, রাজার সামনে রাজসভায় দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করার আনন্দও তার কম হচ্ছিল না কিন্তু

আবার সেই রাজরাড়ীর মস্ত সভা, প্রকাণ্ড ঘর শান্ত্রী পাহারার কথা যে সব সে শুনেছিল, তাই মনে করে' ভয়ে শিউরে উঠতে লাগল। তারপর অনেকদূর পথ এসে, নগরের মধ্যে যখন পৌঁছোল, তখন অনেকটা মনের বল সঞ্চয় করে, ব্রাহ্মণ ঠিক করল্, শ্লোক রচনা করতেই হবে, তবে রাজার স্তুতিগান করে দরকার নেই, কেন না, সকলেই ত স্তুতিপাঠ করবে, বরং কার্য্য ক্ষেত্রে একটা কিছু উপলক্ষ্য করে, তৎক্ষণাৎ একটা শ্লোক রচনা করলেই চল্‌বে। এই স্থির করে ব্রাহ্মণ পৌঁছোল, রাজরাড়ীর সামনে।

মস্ত বড় রাজপুরী। লোকজন, গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতিতে রাজবাড়ীর সামনে স্থান আর মোটেই নেই। সাতমহলা বাড়ীর ওপর নানা রঙের নিশান, বাতাসে উড়ছে, হাতী, ঘোড়া, উট গাড়ী সব নানা রকম সুন্দর সুন্দর সাজ দিয়ে সাজান হয়েছে। নানারকমের বাজনা চারিদিকে বাজছে। পথে ঘাটে লোকের মুখে কেবল আনন্দধ্বনি; উৎসবের উল্লাস ধ্বনিতে আকাশ বাতাস একেবারে ভরে গিয়েছে।

এই রকম অবস্থার মধ্যে এসে পড়ায় পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ একটু যেন কেমন হতভম্ব হয়ে পড়ল। রাজার কাছে গিয়ে কি ভাবে কি শ্লোক রচনা করবে তা তার কিছুতেই বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠল না। ভাবনায় অস্থির হয়ে ধীরে ধীরে চলবার সময় হঠাৎ তার পায়ে একটা কিসের আঘাত লাগল। আঘাতটা মোটেই গুরুতর হয়নি তবু জিনিষটা কি দেখবার জন্য সেটা তুলে ধরতেই দেখতে পাওয়া গেল একখানা ঘোড়ার ক্ষুর। অন্যমনস্কে সেই ক্ষুরখানা হাতে করেই অন্য সকলের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ রাজসভায় হাজির হল। সেখানের আসবাব পত্র সভাসদ্‌দের বেশভূষা বন্দী চারণদের গান অভ্যাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে মনোহর রাজস্তুতি, চারিদিকে যমদূতের মত শান্ত্রী পাহারা

এই সব লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণের রাজসভায় শ্লোক আবৃত্তি করার আর ভরসা মোটেই রইল না। ধীরে ধীরে রাজ সভা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ব্রাহ্মণ সেই মহলের অন্য একপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়ে স্বস্তির হয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, অনেকটা শান্ত হল। রাজপুরীর সেখানটা একেবারে নির্জ্জন, আশে পাশে কোনও শান্ত্রী পাহারা—কিছুই নেই। ক্লান্ত শরীরে সেখানে বসেই ব্রাহ্মণ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে শ্রান্তি দূর হলে পর ব্রাহ্মণ বিদায়ের দান গ্রহণ করবার জন্য উঠে দাঁড়াল। তার হাত থেকে সেই ক্ষুরখানা হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় তার চমক ভাঙ্গল; ক্ষুর খানা দেখে ব্রাহ্মণের মনে পড়ল, কবে তাদের গ্রামের একটি ছেলে, নগরে কি কাজে এসে, এক ঘোড়ার পায়ের আঘাত পেয়ে, একেবারে পঞ্চত্ব লাভ করেছিল। ব্রাহ্মণের মনের মধ্যে শ্লোক রচনা করবার জন্য একটা আগ্রহের সঞ্চার হল। সেটা যে রাজবাড়ী তা খেয়ালই হল না। নিজের বাড়ী মনে করে রাজবাড়ীর দেয়ালের ওপর, সেই ক্ষুর দিয়ে ব্রাহ্মণ একটি শ্লোক লিখে রাখলে,—

ছোট বটে দেখতে এ ক্ষুর খানি,
সামান্য এ নয়কো, মোটেই, জানি।
সুযোগ পেলে, এই ক্ষুরেরি জোরে,
দুঃখী ত ছার, রাজা ও যায় মরে'।"

সেখানে নিজের নাম ধাম আর তারিখ লিখে দিয়ে ক্ষুরখানি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে, ব্রাহ্মণ বিদায়ের সভায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেখান থেকে দান গ্রহণ করে, কালক্ষেপ না করেই, ব্রাহ্মণ নিজের ঘরের দিকে চল্‌ল।

রাজপুরীতে সেই উৎসবের দিন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মন্ত্রীর গুপ্তমন্ত্রনাগারে

গুপ্ত পরামর্শ চলতে লাগল। রাজাকে কোনও রকমে হত্যা করে রাজপুত্রকে সাক্ষী গোপালের মত রেখে মন্ত্রীর রাজ্যভার গ্রহণ করে, রাজা হবার সাধ অনেকদিন হতেই হয়েছিল। অনেক দিন কল্পনা জল্পনা, গুপ্ত মন্ত্রণা করার পর সেই রাত্রে ঠিক হল, যে সেই সপ্তাহের মধ্যেই রাজাকে বধ করতে হবে। রাজপারিষদের মধ্যে যারা এই মন্ত্রণায় যোগ দিয়ে ছিল, তাদের কারো মাথায় রাজার বধের উপায় আবিষ্কৃত হল না। শেষে মন্ত্রীবর নিজেই ঠিক করলেন, যে রাজার প্রধান নাপিতের সাহায্যেই রাজাকে বধ করবার সুবিধা করতে হবে। রাজার ক্ষৌরকার্য্যের সময় নাপিত সহজেই রাজার গলায় তার অস্ত্র বসিয়ে দিতে পারবে। তারপর, তারপর আর কি ? রাজা ত অজ্ঞান হয়ে পড়ে মরবে, আর নাপিতকে অনেক টাকাকড়ি দিয়ে একেবারে কোনও দূর দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। এই ঠিক করে সেদিনের সভা ভঙ্গ হয়ে গেল।

সেদিন প্রভাতে উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে পড়লে পর, রাজা সভা মহলের পাশ দিয়ে অন্য মহলে যাচ্ছিলেন। তাঁর পুরাতন নাপিত ও সেই সময় তাঁর ক্ষৌরকার্য্য করবার জন্য রাজমহলে প্রবেশ করছিল। নাপিতকে অগ্রসর হতে দেখে রাজা সেই মহলেরই একটা নির্জ্জন স্থানে একখানা আসন নিয়ে বসলেন, তাঁর ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করবার জন্য। ক্ষৌর-কার্য্য করবার সময় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, পাথরের দেয়ালে যেন কিসের আঁচড় পড়েছে। একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে তিনি বুঝতে পারলেন কি যেন লেখা রয়েছে। একটু কষ্ট স্বীকার করে চেষ্টা করে তিনি একটু উচ্চ স্বরেই পড়লেন, সেখানে লেখা রয়েছে,

ছোট বটে দেখতে এ ক্ষুর খানি,
সামান্য এ নয়কো মোটেই জানি।

স্থযোগ পেলে এই ক্ষুরেরি জোরে,
দুঃখীত ছার, রাজাও যায় মরে'।

রাজার পড়া শেষ হতে না হতেই নাপিত তাঁর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল—দোহাই মহারাজ, আমি কিছু জানি না।" রাজা ত অবাক্। তিনি মনে করছিলেন, রাজপুরীর শান্ত্রীদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন, তাদের অসাবধনতার ফলেই ত যে—সে এসে দেয়ালটা এমন লিখে বিশ্রী করে দিয়েছে। নাপিতের ওই রকম অবস্থা দেখে রাজা ও কিছুই ঠিক করতে পারেন না। নাপিত অবার বলতে লাগল—'আমি কিছু জানি না মহারাজ! মন্ত্রী মশাই আমায় জোর করে বল্লেন যে, তা না হলে আমায় কেটে ফেলবেন, কুকুরকে দিয়ে খাওয়াবেন। এই রকম আর ও খানিক বললে পর রাজা বুঝলেন, যে, মন্ত্রীর পরামর্শে নাপিত তাঁর গলায় ক্ষুর বসিয়ে দিত। দেয়ালের গায়ের লেখাটি পড়তে নাপিতের ভয় হল যে রাজা বুঝি সব জান্তে পেরেছেন—এবার তাহলে আর নিস্তার নেই। তাই সে অমন ভাবে রাজার পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল! যাই হোক্ রাজা সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। রাজা ভাবলেন ওই লেখাটি নিশ্চয়ই কোনও দেবতা দয়া করে, তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য লিখে রেখে গেছেন। রাজা সেই লেখাটি ভাল করে দেখবার জন্য কাছে গিয়ে দেখলেন যে, যে সেটি লিখেছিল, তার নাম ধাম সমস্তই দেওয়া রয়েছে। যার লেখার জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন রাজা তার উদ্দেশে আর ভগবানের উদ্দেশে অসংখ্য প্রণাম আর ধন্যবাদ জানালেন। আর যে লিখেছিল তার সন্ধানে লোক পাঠালেন, বলে দিলেন যেন তাকে বিশেষ যত্ন করে রাজবাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। কোতোয়াল, শান্ত্রী পাহারা হাতী ঘোড়া নিয়ে চলল, ব্রাহ্মণকে রাজপুরীতে সসম্মানে নিয়ে আস্তে।

রাজসভাতে পৌঁছাতেই রাজা তাকে প্রণাম করে, হাত ধরে এনে নিজের পাশে বসালেন। ব্রাহ্মণও আশস্ত হয়ে কেমন করে সব ঘটেছিল সমস্তই রাজার কাছে প্রকাশ করল। রাজা পরম সমাদর জানিয়ে ব্রাহ্মণকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করবার অঙ্গীকার করলেন।

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়।

---

## খবরাখবর।

### পৃথিবীর বড় ধনী।

আগে তোমাদের একবার বলিয়াছি যে সুবিখ্যাত মোটরগাড়ী নির্ম্মাতা নিঃ হেনরি ফোর্ড সব চেয়ে বড় ধনী। যুক্ত রাজ্যের কোষাগারের সেক্রেটারী মিঃ এড্রু মেলনও একজন বড় ধনী। এই সব কোটীপতি লোকদের কত টাকা আছে, তাহার সঠিক খবর বলা কঠিন। তবে ব্যক্তিগতভাবে ন্যূন পক্ষে ২ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ত্রিশ কোটি টাকা আছে, এমন লোকদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল এবং তাঁহাদের কি পরিমাণ টাকা আছে, তাহারও একটা আনুমানিক হিসাব দিতেছি :—

মিঃ হেনরি ফোর্ড ১১ কোটি পাউণ্ড ; মিঃ জন ডি রকফেলার ১০ কোটি পাউণ্ড ; ডিউক অফ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ৩ কোটি পাউণ্ড ; মিঃ এণ্ড্রু মেলন ৩ কোটি পাউণ্ড ; সার বোসিল জহরফ ২কোটি পাউণ্ড ; মিঃ হুগো ষ্টাইন্‌স্ ২কোটি পাউণ্ড মিঃ পার্সি রকফেলার ২ কোটি পাউণ্ড, ব্যারণ ইওয়াসফি ২ কোটি পাউণ্ড ;

বরদার গাইকোয়ার ২ কোটি পাউণ্ড। ইহা ছাড়া, তামাক ব্যবসায়ী মিঃ জে, বি, ডিউক, নিউইয়র্ক ফাষ্ট ন্যাশনেল ব্যাঙ্কের মালিক জর্জ্জ এফ বেকার এবং কাঠগোলার মালিক টি, বি, ওয়াকার এবং ভারতের তিন জনদেশীয় রাজারও ২ কোটি পাউণ্ডের সম্পত্তি আছে।

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, যে, ধনী লোকের সংখ্যা আমেরিকাতেই বেশী। ভারতের ঐশ্বর্য্যশালী লোকদের মধ্যে একমাত্র বরোদার মহারাজ বড় ধনী। জার্ম্মাণীর ধনী একমাত্র হুগো ষ্টাইনস্ এবং ক্ষুদ্র জাপানে ব্যারণ মিস্থুই ও ব্যারন ইওয়াসাফি এই দুইজন ধনশালী পুরুষ। ইউরোপের রথচাইল্ড পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ ৫ হইতে ১০ পাউণ্ড কোটি এবং এষ্টর পরিবারের সম্পত্তির ২ কোটির অধিক কিন্তু ইহাদের এজমালি সম্পত্তি বলিয়া উপরোক্ত তালিকায় তাঁহাদের নাম নাই।

মিঃ হেনরি ফোর্ডের মত ধনী জগতে জন্মায় নাই। তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। সম্পত্তির মূল্য ধরিলে ৪৮ কোটি পাউণ্ড হইবে। প্রতি মিনিটে তাঁহার আয় ৪৫ পাউণ্ড বা ৬৭৫ টাকা। প্রাচীন গ্রীসের ধনী ক্রুসাস নাকি ডেলফি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান কণিয়াছিলেন। জন ডি রক-ফেলার সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠানের জন্য এ পর্য্যন্ত ১০ কোটি পাউণ্ড দান করিয়াছেন। একটি জিনিষের কারবার করিয়া কেহ এত বড় ধনী হইতে পারে নাই। ডিউক অফ ওয়েষ্ট মিনিষ্টার বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক। ইংলণ্ডে তিনিই বড় ধনী। জাপানে উপরোক্ত ধনশালী ব্যক্তিরা বড় সওদাগর—তাঁহাদের মহাজনী ও জাহাজের কারবার আছে।

বরোদার মহারাজার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ করা কঠিন। তাঁহার যে সকল হীরক আছে, তাহার মূল্যই হইবে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া তাঁহার

যে জড়োয়া চন্দ্রাতপ আছে, তাহার মূল্য লোকে বলে ৪৫ লক্ষ টাকা। তাঁহার রাজপ্রাসাদের সিংহ দরজায় যে স্বর্ণ নির্ম্মিত কামান আছে, তাহার ওজন নাকি ৫ মণ।

নূতন কামান।

আমেরিকার অগডেন সহর নিবাসী মিঃ জেঃ জে, এম, ব্রাউনিং এক প্রকার নূতন কামান আবিস্কার করিয়াছেন। এই কামানের বিশেষত্ব এই যে, জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষে অর্থাৎ এরোপ্লেনে চড়াইয়া ও এই কামানে ১২০ গুলি ছোড়া যায়। সাত মাইল দূর পর্য্যন্ত এই কামানের গুলি পৌঁছিতে পারে।

নূতন আবিষ্কার—

বিলাতের রেডিও কোম্পানী একটী বিচিত্র আবিষ্ক্রিয়ার ঘোষণা করিতেছেন। তারহীন তাড়িতবার্ত্তার যন্ত্রের সঙ্গে তাঁহাদের আবিষ্কৃত ":টলিভিশান" যন্ত্র জুড়িয়া দিলে হাজার হাজার মাইল দূরে বসিয়া বক্তা অথবা গায়কের বক্তৃতা কিম্বা গান শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের চেহারাও দেখা যাইবে। ছবিগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বর্ণে একখানি পুরু কাচের উপর প্রতিফলিত হয়। সুদূর প্রবাসে বসিয়া এই কলের বলে আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গসুখভোগ করা চলিবে। ধন্য বিজ্ঞান!

বালিকার কৃতিত্ব।

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় 'কুমারী শান্তি অধিকারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বালিকাটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়ের কন্যা। তাঁহার প্রথমা কন্যা শ্রীমতী আশাও ঐরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"প্রবাসী"

সাঁতার।

চুনার হইতে সন্তরণ করিয়া কাশী যাইবার একটী প্রতিযোগিতা হইয়া গিয়াছে। চুনার হইতে কাশী পনের মাইল দূরে। আশুতোষ দত্ত প্রথম ও বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় হইয়াছেন।

মানুষের জীবন রক্ষায় কুকুর।

বিলাতের এক কুকুর সংরক্ষণ সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে কয়েকটী কুকুরের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে। প্রভুর বাড়ীতে আগুন লাগিলে "বেল" নামে এক কুকুর চীৎকার করিয়া প্রভু ও প্রভু পত্নীকে জাগাইয়া দেয়। আট বৎসরের এক বালক নদীতে ডুবিয়া মরিতেছিল, এমন সময় 'টাইগার' নামে এক কুকুর ঐ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করে। একটা ষাঁড় এক কৃষককে গুঁতাইয়া মারিবার উপক্রম করিলে 'টস' নামক এক কুকুর তাহাকে অপঘাত মৃতু হইতে বাঁচায়। রাত্রিতে আগুন লাগিলে নিদ্রিত প্রভুপত্নীর হাত আচড়াইয়া 'প্যাডী' নামক এক কুকুর তাঁহাকে জাগ্রত করে। প্রভুপত্নীকে একটা গরু রাগিয়া আক্রমণ করিলে 'গ্লেন' নামক একটি কুকুর এক লম্ফে তাহার কাণ ও পা কামড়াইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। নদীর চোরা বালিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া প্রভু যখন মৃতপ্রায় তখন "লাকি প্রিন্স" নামক কুকুর একগাছি দড়ী লইয়া তাঁহার কাছে যায় ও তাহারই সাহায্যে তাঁহাকে নদীগর্ভ হইতে টানিয়া উদ্ধার করে।

খাদ্যে রুচিভেদ।

বিহার ও যুক্তপ্রদেশের লোকদিগকে বাঙ্গালীরা ছাতুখোর বলিয়া ঠাট্টা করে, আবার তাহারা বাঙ্গালীদিগকে মাছমাংস খায় বলিয়া ঠাট্টা করে। ইংরাজেরা ফরাসীদিগকে ব্যাঙখোর ( Frog-eaters ) বলিয়া ঠাট্টা করে, ফরাসীরাও

ইংরাজকে গোখাদক ( Beef-eaters ) বলিয়া পরিহাস করে। দেশ ও জাতি ভেদে আহারের পার্থক্য জন্মে—শীতপ্রধান দেশের লোকেরা মাংসপ্রিয় হইয়া থাকে। ইউরোপের লোকেরা "ব্যাঙ্গের ছাতা" পরম পরিতোষ সহকারে খাইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্গের ছাতা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা উহা খায় না। এমন কি জংলী পাহাড়ীয়ারা পর্য্যন্ত না। ভারতবর্ষে যে সব শ্বেতাঙ্গ আছে, তাহারা ব্যাঙ্গের ছাতার পরম ভক্ত। ব্যাঙ্গের ছাতা উদ্ভিদ্ জাতীয় জিনিষ—সাহেবদের উহা প্রিয় খাদ্য, তাই পাহাড়ীয়ারা উহা সংগ্রহ করিয়া বেচিতে আনে। বিলাতেও দস্তুরমত ছাতার ব্যবসা হয়। এদেশের লোকের বিশ্বাস যে ব্যাঙ্গের ছাতা বিষাক্ত জিনিষ, এই অনুমান মিথ্যা নয়। কোন কোন ব্যাঙ্গের ছাতায় প্রকৃতই বিষ আছে। সুতরাং ছাতা ভাল কি মন্দ,বিষাক্ত কি নির্দ্দোষ, তাহা পরীক্ষা করিয়া পাক করা হয়। অভিজ্ঞ পাচকেরা ইহা দেখিলেই চিনিতে পারে। কলিকাতার বাজারেও ব্যাঙ্গের ছাতা বিক্রয় হয় এবং সাহেব পাড়ায় উহার যথেষ্ট আদর।

---

## খুচরো খবর।

সমুদ্রের প্রতি বর্গ মাইলে বার কোটি মাছ আছে।

* * * *

এক ক্রোড়পতি একটী কফিনের জন্যে তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন।

* * * *

লণ্ডন সহরে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ২২ খানার উপরে, আর সাপ্তাহিক পত্রের সংখ্যা ৫০ খানার উপর।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেনে আয়র্লণ্ড হইতে ৯২৩,০০০টি গরু আমদানী করা হইয়াছে।

* * * *

বিলাতে গড়পড়তায় প্রত্যেক ৪৭ জন লোকের একটি টেলিফোঁ আছে। আর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যেক ৮ জন লোক পিছু একটি টেলিফোঁ আছে।

* * * *

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই জুলাই তারিখে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া মেরিকে বিবাহ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস এডওয়ার্ড এলবার্ড ক্রিশ্চিয়ান জর্জ্জ এণ্ড্রু পেট্রিক ডেভিড ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

* * * *

এক খণ্ড হীরক জিভে লাইলে উহা যেমন ঠাণ্ডা লাগে, এক খণ্ড কাচ বা কাগজ তেমন লাগে না।

* * * *

অপেল নামক রত্ন যখন প্রথম মাটী হইতে তোলা হয়, তখন উহা এত নরম থাকে যে উহা টানিয়া বাড়ান যায়।

* * * *

লণ্ডনের কোন কোন দোকানে এক প্রকার কল রাখা হয়, যাহার ভিতর ভাড়ার মাশুল ফেলিয়া দিলেই রেল গাড়ী মোটরের টিকেট পাওয়া যায়।

* * ঙ *

অষ্ট্রিয়ার ক্রিকেট খেলা প্রতিযোগিতায় ভিক্টোরিয়া সহরের খেলোয়াড়েরা ১৪০৯ বার দৌড়িয়েছে। এর চেয়ে বেশী দৌড় এ পর্য্যন্ত আর কোন ক্রিকেট ম্যাচে হয় নাই।

* * * *

প্রায় ছ' বছরে জিরাফ পূর্ণাঙ্গ হয়। গরু ও মানুষ এর অর্দ্ধেক সময়ে পূর্ণাঙ্গ পায়। কিন্তু মার্কিণ মুলুকেব এক জাতের ঝিঝিপোকা ডিম হইতে ফুটিয়া পূর্ণাঙ্গ পাইতে ১৭ বৎসর নেয়।

* * * *

একজন কেকাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে ময়ূরের আয়ূ-পরিমাণ ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত হইতে পারে।

* * * *

একজন বড় লোক বলিয়াছিলেন, "গরীবেরাই সুখী!" আবার গরীব বলে,বড়লোক সুখী। দু'জনের কথাই সত্য। কেন না সুখ সধনতা বা নির্ধনতার উপর নিভর করে না। সুখ তারই, যে তাকে সৃষ্টি করে। ধনে সুখ কেনা যায় না, দারিদ্র্য তাকে কেড়ে নিতেও পারে না।

* * * *

মাছের দেহে কাণের মত যন্ত্র আছে। তবু তারা শব্দ শুনিতে পায় না; জলের চাপ তারা অনুভব করিতে পারে।

## পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে।

পৃথিবীর ইতিহাস সিরিজের আর তিনখানি বহি বাহির হইয়াছে, ব্রহ্ম, জাপান ও গ্রীস। এই সিরিজের প্রথম দুইখানি পুস্তক,—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্তের ইংলণ্ড ও রায় বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের বৈদিক ভারত বাংলা দেশের ছেলে মেয়েদের ও অভিভাবকদের প্রীত করিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। ঐ বহিগুলির বিক্রয়াধিক্য তাহার আর এক প্রমাণ। পৃথিবীর ইতিহাসের এই তিনখণ্ডও ছেলে মেয়েদের আনন্দ ও শিক্ষাদান করিবে, তাহাতে আমাদের একটুও সন্দেহ নাই। পৃথিবীর ইতিহাস সিরিজের বহি গুলি এমন সরস গল্পের ও ছবির মধ্য দিয়া লিখিত ও সজ্জিত করা হইয়াছে যে ছেলে মেয়েরা অসার গল্প পুস্তক ফেলিয়া এগুলি পড়িবার আগ্রহে অধীর হইবে। ছবি, ছাপা, বাঁধাই সমস্ত সুদৃশ্য, দাম পূর্ব্ববৎ—এক টাকা করিয়া!

---

## সংশোধন।

এ একখানি ছেলেদের নাটক। নাটক খানি পড়িতে যেমন মিষ্ট, অভিনয় তেমনি সহজ। বহিখানি তোমাদের পরিচিত লেখক বিজয় রত্ন বাবুর লেখা; তাঁহার লেখা ছেলে-মেয়েদের বহিগুলি সকলের প্রিয়। এই নাটক খানি বাংলা দেশের বহু স্কুলে ছেলেদের দ্বারা অভিনীত হইয়াছে। শুধু বাংলা দেশে নয়, বাংলার বাহিরে যেখানে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে আছে সেখানেই সংশোধন আদর পাইয়াছে। এবারকার ছাপা, কাগজ সবই সুন্দর করা হইয়াছে, দাম ছ'আনা।

---

## গোপাল ভাঁড়ের আজগুবি গল্প ঃ

বিজয়রত্ন বাবু তোমাদের জন্য একখানি হাসির বহি লিখিতেছেন। সেখানির আগাগোড়া কেবল হাসি। হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ফুলিয়া উঠিবে। আবার সেই বহির ছবি আঁকিতেছেন, আমাদের প্রসিদ্ধ-চিত্রকর সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়। যেমন হাসির গল্প, তেমনি হাসির ছবি। শীঘ্রই বাহির হইবে।

---

## আদিম জগৎ, প্রাচীন জগৎ ও বর্ত্তমান জগৎ

এই নামের তিন খানি ঐতিহাসিক বহি ছাপা হইতেছে, অসংখ্য ছাবিতে শোভিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ইহাতে একেবারে প্রথম অবস্থার জগতের কথা, পুরাকালের ও এখনকার কালের সমস্ত কথা সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে।

---

# জানাজানি বিভাগ।

## জ্যৈষ্ঠ মাসের "আমার দেশের" জানাজানির উত্তর।

১। লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের কন্যা। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার বাসস্থান ছিল। ভাস্করাচার্য্য একজন সুদক্ষ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্যোতিষী ছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের রচিত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থ জগৎ বিখ্যাত। কথিত আছে উক্ত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থের পাটিগণিত সম্বন্ধীয় প্রথম অধ্যায়টী লীলাবতীর রচনা, এই জন্য ঐ গণিতের প্রক্রিয়াগুলি "লীলাবতীর নিয়ম" বলিয়া প্রসিদ্ধ, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ভাস্করাচার্য্য নিজেই উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন এবং তদীয় কন্যার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টীর নাম "লীলাবতী" রাখিয়া গিয়াছেন। মোট কথা লীলাবতী গণিত শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। কটক—কটক জিলা।

৩। সূর্য্যমামা আমাদের সকলেরই মামা।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

## নূতন প্রশ্ন।

১। খনা কে ছিলেন? তাঁহার জন্মস্থান কোথায় ছিল ও কেন তাঁহার নাম এত প্রসিদ্ধ?—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল।

২। অনেক প্রবীন লোক স্নানের আগে শরীরে তৈলমর্দ্দন করিবার পূর্ব্বে অগ্রে তিনবার মাটিতে তেল ছিটাইয়া দেন, কেন?

—শ্রীকিরণ কুমার সাহা।

৩। বাঁশের ফুল হইলে লোকে দোষের মনে করে কেন ?

—শ্রীকানাই লাল মুখোপাধ্যায়।

৪। আকাশ প্রদীপ দেয় কেন ? —শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সরকার।

৫। শঙ্করাচার্য্যের পরিচয় কি ? —শ্রীঅন্নপূর্ণা সেন।

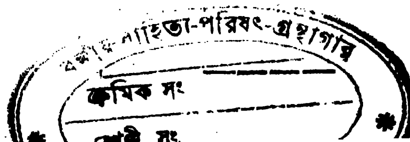
অধিকাংশ গ্রাহক গ্রাহিকাই গত জ্যৈষ্ঠের জানাজানি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন দেখিয়া প্রীত হইলাম। সঃ

---

# নূতন ধাঁধা।

আমার দেশে ছেলে মেয়েদের লিখিত গল্প কবিতা, প্রবন্ধ এ সকলই প্রচুর পরিমাণে আসে সত্য কিন্তু ধাঁধার সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী। তবে দুঃখের বিষয় যত ধাঁধাই পাওয়া যায়, সবই সেই পুরাতন, শোনা, না-হয় অন্য কাগজে বহু পূর্ব্বে প্রকাশিত ধাঁধা পুনরায় প্রেরিত হয়। আমরা বার বার বলিয়াছি, অভিধান দেখিয়া ধাঁধা তৈরী করা খুবই সহজ। ইহাতে ভাষা জ্ঞানও যেমন বাড়ে, আমোদও সেই সঙ্গে হয়। শোনা বা আগেকার ছাপা ধাঁধা না পাঠাইয়া আমরা ছেলেমেয়েদের এই চেষ্টা করিতে অনুরোধ করি। ধাঁধা ছেলেরা প্রায়ই খেলার বা আমোদ প্রমোদের মত উপভোগ করে সত্য কিন্তু সেই আমোদের সঙ্গে যাহাতে কিছু কাজও হয়, সে চেষ্টা করা উচিৎ।

আশা করি ভবিষ্যতে অঙ্ক, শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের ধাঁধা রচনায় ছেলে-মেয়েরা মন দিবে।





সিজারের মৃত্যুর পূর্ব্বদিন—সিজার ও কালপূর্ণিয়া

# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। আশ্বিন, ১৩৩০।

## রোম।

রোম সাম্রাজ্য এক সময়ে পৃথিবীর মধ্যে বিশেষ খ্যাতিমান্ ছিল। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস, এক কথায় রোম নগরের ইতিহাস। রোম প্রাচীনকালে সর্ব্ববিষয়ে অতুলনীয় ছিল।

রোমোলাস্ নামে—একজন রাজপুত্র রোম নগর স্থাপন করেন। রোমোলাসের নাম হইতে তাহার প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম হইল রোম। রোম সহরে অনেকগুলি পাহাড় ছিল। রোমোলাস্ নগর রক্ষার জন্য সেই পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ধীরে ধীরে সহর, বাড়ী, ঘরে রোম পূর্ণ হইয়া গেল।

সহর ত তৈরী হইল, কিন্তু লোকজন, বাজার এসব ত দরকার। রোমোলাস এক কৌশল করিলেন, তিনি প্রচার করিলেন যে চোর হউক, ডাকাত হউক, দস্যু



সেবাইন নারীদের অপহরণ।

হউক, যত বড় অপরাধীই হউক না কেন, যে ব্যক্তি আসিয়া তাহার নূতন সহরে বাস করিবে, তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। এইরূপ ঘোষণার ফলে দলে দলে লোক আসিয়া রোম নগরে বাস করিতে লাগিল। তারপর সেবাইন নামক একটা জাতির সুন্দরী মেয়েদের কৌশল করিয়া চুরি করিয়া নগরবাসীদের বিবাহ দিয়া দিলেন। এইভাবে নগরের সৃষ্টি ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইল।

রোমোলাসের পর নুমা, হষ্টিলিয়াস্ প্রভৃতি যখন যিনি রাজা হইলেন, তিনিই রোমনগরের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন। এই ভাবে যতই সময় যাইতে লাগিল ততই রোমান্‌রা চারিদিক্ দিয়া আপনাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ নগরের উন্নতির জন্য, কেহ কৃষির উন্নতির জন্য কেহ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এইভাবে অনেক রাজা দেশের জন্য অনেক ভাল কাজ করিয়া গেলেন।

সে কালে—রোমে দুইটী দল ছিল। সাধারণ শ্রেণীর লোক যাহারা চাষ বাস ও শ্রম-শিল্পের কাজ করিয়া জীবনোপায় করিত, তাহাদের নাম ছিল প্লেবিয়ান্স আর যারা ধনী ও শক্তিশালী ছিলেন তাহারা প্যাট্রিসিয়ান্স নামে অভিহিত হইতেন। এই দুইদলে প্রায়ই কলহ হইত। ধনী ও শক্তিশালী যাঁরা তাঁরা গরীব প্লেবিয়ানদের জব্দ করিতে চেষ্টা করিতেন। রোমের ইতিহাসে এইরূপ কলহ বহুবার হইয়া গিয়াছে।

সেকালের রাজা রাজড়াদের মধ্যে অনেকে খুবই ভাল ছিলেন আবার কেহ কেহ এমন অত্যাচারী ছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাসেই অমন অত্যাচারী রাজার সন্ধান বড় কম পাওয়া যায়। সারভিয়াস্ নামে একজন রাজার বিরুদ্ধে একবার কয়েকজন লোক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে খুন করিয়া সিনেট সভার সম্মুখস্থ রাস্তায় ফেলিয়া



ট লিয়া বলিলেন—"ঐ শবের উপর দিয়া গাড়ী চালাও।"

দিলেন। রাজা সারভিয়াসের টুলিয়া নামে একটী মেয়ের স্বামীই এই কাজটা করিয়াছিলেন। টুলিয়া যখন শুনিলেন যে তাহার পিতা নিহত হইয়াছেন এবং এমন অন্যায় কাজটা করিয়াছেন তাঁহারই স্বামী, তখন তিনি আনন্দে অধীর হইলেন। এই ত তাহার উপযুক্ত স্বামী! টুলিয়া তাঁহার শকট প্রস্তুত করিতে বলিলেন,--তারপর সাজিয়া গুঁজিয়া স্বামীকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সিনেট সভার অভিমুখে চলিলেন। সিনেটের সম্মুখে তাঁহার পিতার মৃতদেহ পড়িয়াছিল। টুলিয়া শকট চালককে বলিলেন—"ঐ শবের উপর দিয়া গাড়ী চালাও।" চালক তাহাই করিল। কি ভয়ানক ব্যাপার একবার ভাবিয়া দেখ দেখি!

তোমাদের কাছে দুই চারি কথায় রোমের সব কথা বলা ত সম্ভবপর নয়, তাই দেশের কয়েকজনের বড় লোকের কথা বলিতেছি। ব্রুটাশ নামক একজন বীরপুরুষ---তাঁহার দুইটি ছেলে দেশদ্রোহী হইলে পর, তিনি নিজে বিচার করিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন---"আমি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি, তোমরা আমার হতভাগা পুত্র দুইটার প্রাণনাশ কর।" রোম ছিল বীরের দেশ স্বাধীনতার দেশ, তাহারা কি পুরুষ, কি নারী কেহই প্রাণের মায়া মমতা করিত না। একবার আপিয়াস্ নামে এক বিচারপতি অন্যায় করিয়া ভার্জ্জিনিয়াস্ নামক একজন বীরপুরুষের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। মেয়েটির নাম ভার্জ্জিনিয়া, ভার্জ্জিনিয়ার অন্য একটী যুবকের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, সে সকল উপেক্ষা করিয়াও তিনি মেয়েটিকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু এমন অন্যায়কে কে প্রশ্রয় দিতে পারে? কাজেই গোল বাধিল। পাপিষ্ঠ আপিয়াস্ শেষটায় কৌশল করিয়া ভার্জ্জিনিয়া, ভার্জ্জিনিয়াসের কন্যা নয়, অপরের ক্রীতদাসী এইরূপ ছল করিয়া তাহার কল্পিত মনিবের হস্তে অর্পণ করিবার আদেশ দিলেন।

দুর্দ্দান্ত পিশাচ, বিচারকের আদেশ পাইবামাত্র ভার্জ্জিনিয়ার হাত ধরিল। হত-



ব্রুটাস— আমি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছি, তোমরা আমার হতভাগ্য পুত্র দুইটীর প্রাণনাশ কর।



ভাজ্জিনিয়াস্ কহিল, "বৎসে! এই একমাত্র বন্ধু তোমার, যে তোমার মান ও সম্মান বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।"



গলদের আক্রমণ হইতে 'কেপিটল' রক্ষা।

একবার গল নামক একটা জাতি রোম আক্রমণ করিলে কি ভাবে রোমানরা—
দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন দেখ।

ভাগ্য পিতা এই দৃশ্য দেখিয়া পাগলের মত ছুটিয়া যাইয়া তাহার পোষাকের ভিতর হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া বলিলেন—"বৎসে! এই একমাত্র বন্ধু তোমার, যে তোমার মান ও সম্মান বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। পলক মধ্যে পিতা কন্যার বুকের মধ্যে ছুরি বসাইয়া দিলেন!

রোমানদের খ্যাতি প্রতিপত্তি যেমন চারিদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল, তেমন তাহাদের শত্রুসংখ্যাও বাড়িয়া গেল। এ সময়ে নানা জাতীয় লোকের সঙ্গে রোমকদের প্রায়ই যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। সময়ে সময়ে রোম শত্রুর হাতে পড়িয়া ধ্বংস হয় হয় এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। সে সকল দুঃসময়ে যাহারা দেশ রক্ষা করিয়া রোমের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে করিওলেনাস এবং ক্যামিলাস ছিলেন সর্ব্ব প্রধান। এখানে কোরিওলেনাসের কথা বলিতেছি।

একবার ভলসিয়ান্ নামক একটা জাতির সঙ্গে রোমান্দের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধের নেতা ছিলেন করিওলেনাস্। রোমান্রা প্রাণের দায়ে যুদ্ধে হার মানিয়া পিছু ছুটিতে আরম্ভ করিলে তিনি সদর্পে অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি উচু করিয়া ধরিয়া রোমান সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"কাপুরুষ ছাড়া কে কবে রণ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে?" সৈন্যেরা ফিরিল—শত্রু পরাজিত হইল।

করিওলেনাস ছিলেন প্যাট্রিসিয়ান, তিনি প্লেবিয়ানসদিগকে একেবারেই দেখিতে পারিতেন না। একবার রোমে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রোমানদের সাহায্যের জন্য গ্রীক্রা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য পাঠাইলেন। করিওলেনাস্—কোনরূপেই প্লেবিয়ানস্দিগকে তাহার কোন ভাগ দিতে রাজি হইলেন না। ফলে প্লেবিয়ানস্রা ক্ষেপিয়া গেল, বিচারে করিওলেনাস্ অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। তিনি বিপদ বুঝিয়া—রোম ত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন এবং রোমের চির শত্রু ভলসিয়ানদের পক্ষ লইলেন। ভলসিয়ান সৈন্যদল লইয়া করিওলেনাস্—প্লেবিয়ানস্-

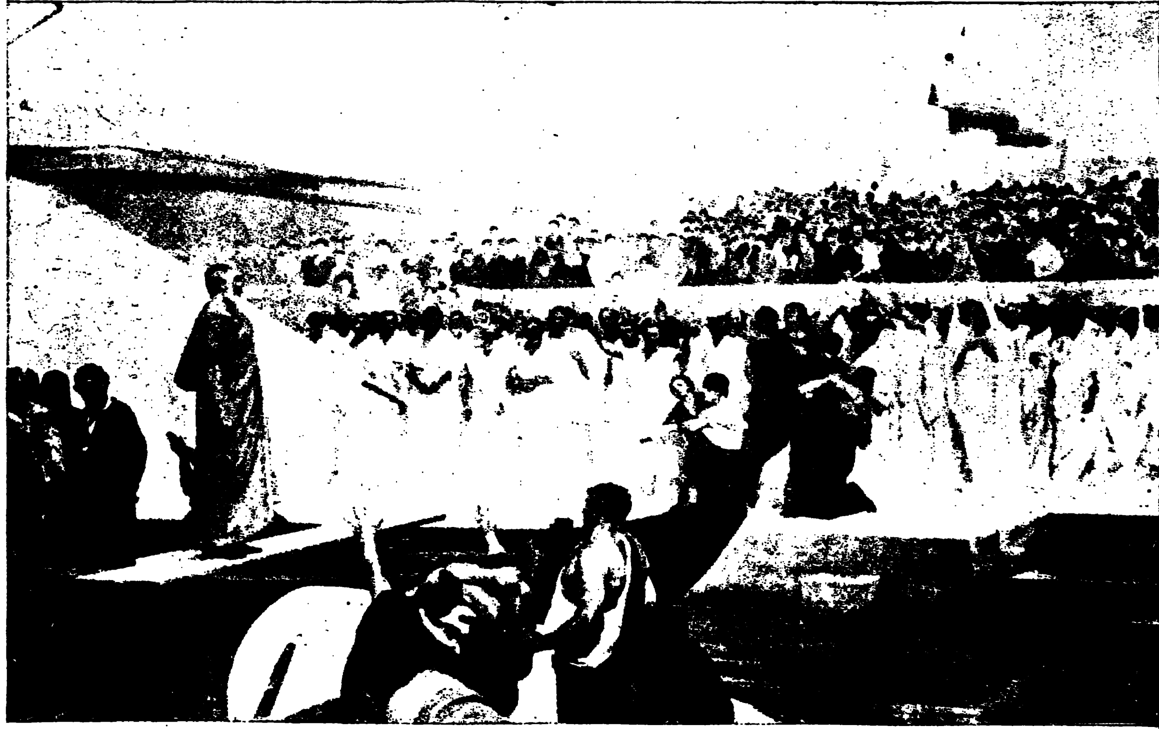


বিভেন্দাস কহিলেন— "মা, তুমি তোমাকে রক্ষা করিলে বটে, কিন্তু তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ করিলে।"

দের ঘর বাড়ী জ্বালাইয়া ক্ষেত খামার নাশ করিয়া অতি দ্রুত রোমের দিকে অগ্রসর হইলেন। রোমের অল্পদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এখন যদি করিওলে-নাসের সঙ্গে একটা মিট্ মাট না হয়, তাহা হইলে রোমের পতন যে অবধারিত! একে একে নগরবাসী জনসাধারণ, মন্দিরের পুরোহিত সকলেই তাঁহার নিকট গিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন—কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ করিওলেনাস্ বলিলেন—"আমি কোনমতেই রেহাই দিব না।" অবশেষে নগরবাসীরা প্রমাদ গণিলেন, তাঁহারা করিওলেনাসের জননী ও স্ত্রীকে শিশুসন্তানসহ তাঁহার শিবিরে প্রেরণ করিলেন। জননী ও পত্নী দুইজনে নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট রোমের রক্ষার জন্য মিনতি করিলে—তিনি করুণ কণ্ঠে বলিলেন—"মা, তুমি রোমকে রক্ষা করিলে বটে কিন্তু তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশ করিলে।" কথা সত্য হইয়াছিল। প্রকাশ্য রাজপথে একদল ভলসিয়ান্ তাঁহাকে বধ করিল।

রোমানদের সময়ে গ্রীক্ ও কার্থেজেরও যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সব যুদ্ধে কার্থেজের হ্যানিবল, রোমের রেগুলাস্ প্রভৃতি বীরগণের অনেক কথা জানিতে পারি। কেমন করিয়া দেশকে ভালবাসিতে হয়, সে যুগের রোমক বীরগণ নানা-ভাবে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

এইবার রোমের আর একজন প্রধান ব্যক্তির কথা বলিতেছি। ইঁহার নাম কায়াস্ জুলিয়াস্ সিজার। সিজার যেমন ছিলেন বীর, তেমনি ছিলেন জ্ঞানী, পণ্ডিত এবং সর্ব্ববিষয়ে মহানুভব ব্যক্তি। সিজার রোমের সাধারণ তন্ত্র লোপ করিয়া রোমের সম্রাট হইয়াছিলেন। সিজারের দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হওয়াটা অনেক রোমানের পছন্দ হইল না। কাজেই একদল লোক ষড়যন্ত্র করিয়া স্থির করিলেন যে "সিজারকে সাবাড় করিয়া ফেলাই ভাল।" একদিন সিনেট সভায় সিজার উপস্থিত ছিলেন, এমন সময়ে একজন ষড়যন্ত্রকারী তাঁহার হাতে একখানা

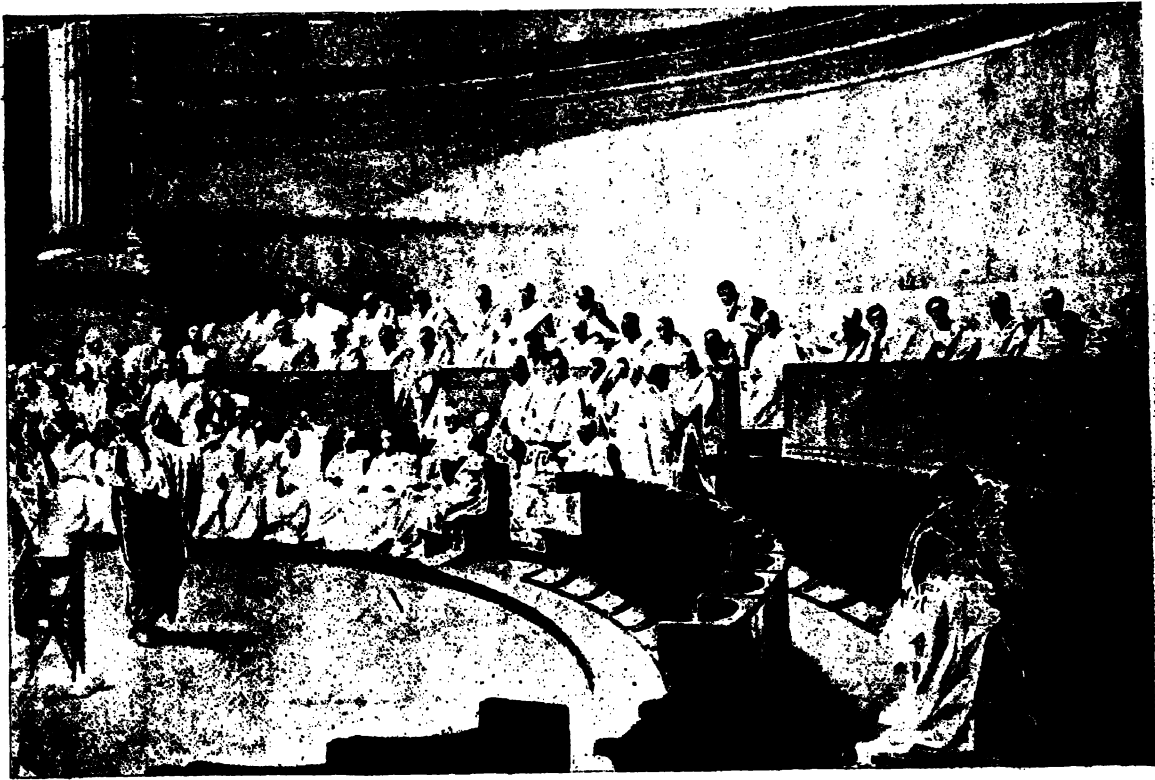


রেগুলাসের কার্থেজে প্রত্যাবর্ত্তন।



রোমান রণপদ্ধতি—টেষ্টুডু।

সেকালে রোমানরা কি ভাবে সৈন্য সজ্জা করিতেন, এখানে তাহা দেখান হইয়াছে।



রোমানদের সিনেট সভা—এখানে তাহাদের সভাসমিতি বসিত।

কাগজ দিয়া বলিলেন—"আপনি এ কাগজখানি পড়ে দেখুন।" সিরাজ যখন কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিলেন তখন পশ্চাৎ হইতে একজন তাহার গলায়, পিঠে সর্ব্বত্র ছোরার আঘাত করিলেন। সিজার হত্যাকারীদের মধ্যে তাঁহার বন্ধু ব্রুটাস্‌কে দেখিয়া মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন—"ব্রুটাস্, তুমিও।"

সিজারের স্ত্রী কালপারনিয়া স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন তাঁহার বাহুপাশে আবদ্ধ সিজারকে কে যেন হত্যা করিয়াছে,এজন্য তিনি স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"কাল তুমি সিনেট সভায় যাইতে পারিবে না।" সিজার হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"মৃত্যু যেখানে চির নিশ্চিত, সেখানে তাহাকে ভয় করিয়া কোথায় পালাইব বল!"

সিজারের পর ধীরে ধীরে রোমে রাজশক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ কেহ খুবই ভাল রাজা ছিলেন, আবার কেহ কেহ ছিলেন ভয়ানক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী। নিষ্ঠুরতায় ক্যালিগুলা, ক্লডিয়াস্ এবং নিরো তিনজনই ছিলেন প্রধান। ক্যালিগুলা একবার রাজ্যের বড় বড় লোকদের নিমন্ত্রণ করিলেন। অতিথিরা সব আমোদ প্রমোদ করিতেছেন এমন সময় সম্রাট বলিলেন—"আপনাদের মাথাগুলি কাটিয়া ফেলিলে কি চমৎকারই না হইত!"

নিরোর কথা শোন। তিনি কি রকম আমোদ ভালবাসিতেন তাহা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। একবার তাঁহার খেয়াল হইল—রোমনগরে আগুন লাগাইয়া দেখিবেন, কেমন দেখায়! নগরের একদিকে আগুন লাগিয়া লোকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, কিন্তু নিরোর মহানন্দ! তিনি ছাতে বসিয়া মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। এ সব অত্যাচারী সম্রাটদের নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়া প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল।

দেড় হাজার বৎসরেরও উপর রোম পৃথিবীর মধ্যে বিজয় গৌরবে দণ্ডায়মান ছিল। একদিকে যেমন বীরত্বে ও শৌর্য্যে বীর্য্যে রোমের প্রভুত্ব বিস্তৃতি লাভ



রোমের প্রাচীন চিত্র।—পম্পি

করিয়াছিল, তেমনি কবি, নাট্যকার, বক্তা ও শিল্পিগণের অভ্যুদয়ে রোম বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সে কালে ভারো, লুক্রেশিয়াস্, ভার্জ্জিল, হোরেশ, কাযুলাস্ প্রভৃতির নাম চির-স্মরণীয়। চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য, বাস্তু-শিল্প এ সকল বিষয়ে রোমানরা প্রভূত উন্নতি করিয়াছিলেন। রোম সাম্রাজ্য এজন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।



সেটার্ণ।

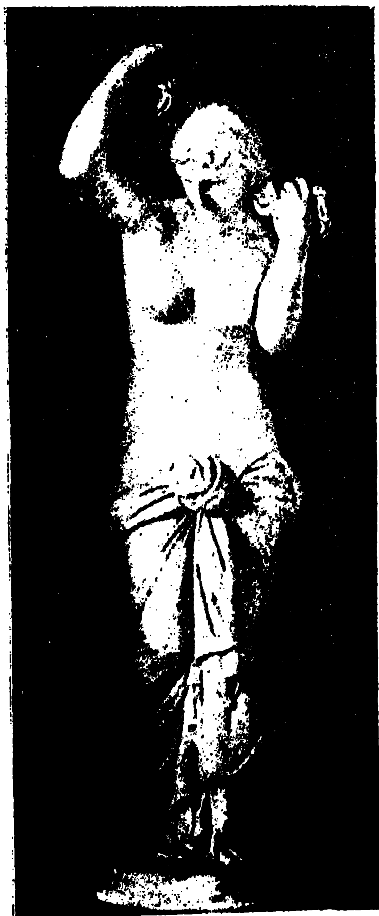


মারকিউরী দেবতা।



জুপিটার।

রোমের দেবতা।



ভেনাস।



ডায়েনা

রোমের দেবতা।



সিরিস্—কৃষিদেবী।



বেকাস্।



বসন্তোৎসব। রোম।



রোমের বিখ্যাত—ভেস্টাদেবীর মন্দিরের সেবিকাগণ।

রঙ্গালয় ও অভিনয় ব্যাপারেও রোমকেরা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। রোমজাতির নাট্যকারগণের মধ্যে শিলার নাম অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিবে।

রোমানদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন দুই একটী কথা শোন। প্রাচীন যুগে তাহারা যে কত দেবদেবীর পূজা করিতেন তাহার সীমা সংখ্যা ছিল না। ভেনাস্, ডায়েনা, সিরিস্, বেকাস্, কত কি! প্রতি গিরি, বন, পর্ব্বত, নদী, নির্ঝর উপত্যকায় এক একজন দেব বা দেবী অধিষ্ঠিত আছেন বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন।

ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপর রোমানরা অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেন। সে অত্যাচার যে কি ভীষণ ছিল তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। অবশেষে কিন্তু চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে—খৃষ্টান ধর্ম্মই দেশমধ্যে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

রোমানরা যেমন বীরের জাতি ছিলেন তেমনি তাহাদের ক্রীড়া-কৌতুকও ছিল অতি বড় ভীষণ। যেখানে ক্রীড়া-কৌতুক হইত, তাহার নাম হইয়াছিল 'কলো-সিয়াম্।" আশী হাজার লোক একসঙ্গে বসিয়া ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে পারিতেন। সিংহের সহিত ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ এবং সিংহে সিংহে লড়াই চলিত।

পুস্তক সংগ্রহ, পাঠাগার স্থাপন এ সকল সে যুগের সম্ভ্রান্ত রোমানদের ফ্যাসানের মধ্যে ছিল। বসন্ত উৎসব তাহাদের একটি প্রধান উৎসব ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন রোমের শুধু স্মৃতি আছে, গৌরব আর নাই। এমন সকল প্রাচীন জাতিরই হইয়াছে।

---



৺সুকুমার রায় চৌধুরী।

# শোক সংবাদ

ছেলেমেয়েদের আর একখানি মাসিক আছে, নাম—সন্দেশ। তোমরা সন্দেশের নাম নিশ্চয় শুনিয়াছ। এই মাসিকখানি অল্প দিনের মধ্যেই ছেলেমেয়ে-মহলে খুব আদর পাইয়াছিল, ক্রমে ইহা অন্য সমস্ত মাসিকের শীর্ষস্থানও অধিকার করিতে পারিয়াছিল। এই কাগজখানির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী; কয়েক বৎসর উপেন্দ্র কিশোর রায় সন্দেশ সম্পাদনা করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন, তখন কাগজের ভার পড়িয়াছিল স্বর্গীয় উপেন্দ্র কিশোরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় চৌধুরীর উপর। সুকুমার পিতার পুত্র, পিতার যোগ্যতা পুত্র অর্জ্জন করিয়া দক্ষতার সহিত কাগজখানি চালাইয়াছিলেন। সুকুমারের বয়স বেশী হয় নাই, মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। এই বয়সে তিনি সাহিত্যে বিশেষ করিয়া শিশুসাহিত্যে যে প্রতিভার বিকাশ দেখাইয়াছিলেন, তাহা যথার্থই বিস্ময়কর। ছেলেদের ছড়া, কবিতা গল্পে তাঁহার রসে-ভরা মধুর হাতের সন্ধান যে পাইয়াছে, সেই জানে কি সুন্দর, কি মধুর কি অনাড়ম্বর ও খোলা লেখা তাঁহার ছিল। এই শিশু-প্রাণ লেখক শুধু যে লেখাই শিশুদের উপহার দিয়াছিলেন, তা নয়, হাসির ছবি, রঙ্গ-ছবি আঁকিয়াও তিনি ছেলেমেয়েদের মনো-রঞ্জন করিতেন। সেগুলিরও মধ্যে তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশ পাইত।

এমন শিশু-সুহৃদ, শিশুসাহিত্যের এমন যশঃস্বী লেখককে কেন যে ভগবান অকালে শিশুদের নিকট হইতে সরাইয়া লইলেন জানি-না, তবে মনে হয় তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলেদের শিক্ষার বিষয়ে অনেক নূতন নূতন জিনিষ দিতে পারিতেন। সুকুমারের সরল আত্মা স্বর্গে তৃপ্তিতে থাকুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

# খাদ্যের গুণাগুণ

এক মহা যুদ্ধের ভিতর মারামারি কাটাকাটির মাঝখানে এক মহা তথ্য আবিস্কৃত হইয়াছিল।

যুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলিয়াছিল। দুই পক্ষের হত আহত স্তূপিকৃত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়াছিল। তাহারই মধ্য দিয়া প্রাণপাত পরিশ্রমে শুশ্রূষাকারিণীরা আহতদের বহিয়া লইয়া হাসপাতালে ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সেখানে যে কি করুণ মর্ম্মন্তুদ দৃশ্য, আহত মুমূর্ষুদের সে কি গোঙরাণি, দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় করুণাময় ঈশ্বরের এ কি বিচার! এই যুদ্ধের সার্থকতা কি ?—এই বীভৎস দৃশ্য সংঘটিত করিয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে।

বিনা উদ্দেশ্যে পরমেশ্বরের কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। আহতদের মরণান্তকর অবস্থার ভিতর দিয়াই বিশ্বপিতার কল্যাণকর এক মহাসত্য আবিষ্কৃত হইল।

সেই যুদ্ধেই এক সেনানীর পেটে গুলি লাগিয়া পেটের সম্মুখের দিকটা উড়িয়া গিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে রোগীকে বাঁচান দায় হইয়া পড়ে, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসার পর দেখা গেল রোগী বাচিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, রোগীর পেটের উপরের দিকটায় চামড়ার খোলসটা উঠিয়া যাওয়ায় পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতি সব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতে লাগিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! পেটের ভিতরকার যন্ত্রপাতির চলাচল, গতি দেখিবার সুবিধা এমন ভাবে ডাক্তারদের আর বড় হয় নাই। ডাক্তারেরা-বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণায় লাগিয়া গেলেন।

টপ করিয়া একখণ্ড রুটি মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিলে, তাহার পর সে রুটির কি অবস্থা হয়, কোথায় কেমন করিয়া যায় তাহা আমাদের জানিবার উপায় ছিল না।

কিন্তু ঐ সৈনিকের পেটের ভিতরের যন্ত্রপাতি ছিল অনাবৃত, তাই ঐ সব যন্ত্রপাতির চলাচল ডাক্তারেরা নিবিষ্ট মনে দেখিতে লাগিলেন। রুটিখানি যাইয়া ত পেটের মধ্যে পহুঁছিল, তাহার পর তাহার কি অবস্থা হয়, ঐ রুটিখানি হজম করিতে কত সময় লাগে,এই সবই তখন ডাক্তারেরা দেখিয়া বুঝিল। শুধুই কি রুটী, যত রকমের খাবার আছে সব ঐ সৈনিককে দিয়া খাওয়াইয়া প্রত্যেক রকমের খাবার হজম করিতে কত সময় লাগে ডাক্তারেরা দেখিয়া শুনিয়া তাহার একটা নির্ঘণ্ট তৈরী করিয়া ফেলিল। তবে তোমরা একটা জিনিষ মনে রাখিও, এই নির্ঘণ্টটা তৈরী হইয়াছিল সেই সৈনিকের হজমশক্তি দেখিয়া। তোমার, আমার, সকলের হজমশক্তি আর কিছু এক নয়। সে সৈনিকের হজমশক্তি ছিল খুব ভাল,তাই কোন একটা খাবার সে সৈনিকের যদি তিন ঘণ্টা হজম করিতে লাগিত, তোমার আমার হয়ত সেই খাবারটাই হজম করিতে ৫ঘণ্টা লাগিয়া যাইবে। তবে কোন জিনিষ কি সময়ে হজম করা যায়, তাহারই একটা তুলনা মূলক পরিচয় পাওয়া যায়।

জল বায়ু না হইলে যেমন মানুষ বাচিয়া থাকিতে পারে না, খাদ্য না হইলেও তেমনি মানুষের বাচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের শরীরটি যেন একটি ইঞ্জিন। ইঞ্জিন চালাইবার জন্য যেমন অনবরত কয়লার দরকার হয়। আমাদেরও শরীর কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য, বাঁচিবার জন্য, অনবরত খাদ্যের দরকার হয়, ইঞ্জিনে অল্প কয়লা দিলে তাহা যেমন অধিককাল চলে না, যথোপযুক্ত খাদ্যের সরবরাহ না পাইলে শরীর তেমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

এই খাদ্যের ভাল মন্দের উপর শরীরের স্বাস্থ্য, সুখ, সৌন্দর্য্য সব নির্ভর করে। তবে খাদ্যের ভাল মন্দের বিচার আস্বাদন দ্বারা স্থির হয় না, কিরূপ খাদ্য স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিরূপ খাদ্য শরীরের কোন্ অবস্থায় উপযোগী এই বিচারের উপরেই খাদ্যের ভালমন্দ নির্ভর করে। আমাদের কথাবার্ত্তা, অঙ্গাদি চালনা, নিশ্বাস

প্রশ্বাস গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে শরীরের ক্ষয় হইতেছে,এই ক্ষয় পূরণ হয় খাদ্য গ্রহণের দ্বারা। তবে শুধু খাদ্য গ্রহণ করিলেই হইবে না, এমন খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সহজে হজম হইয়া রক্তে পরিণত হয়।

আমাদের শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে বিভিন্ন উপাদানের খাদ্যের আবশ্যক হয়, কোনটি বা আমিষ জাতীয়, কোনটি বা স্নেহ জাতীয়, কোনটি বা শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয়, কোনটি বা লবণ জাতীয়, কোনটি বা জলীয় উপাদানে গঠিত। আমাদের প্রত্যহ এমন সব খাদ্য আহার করিতে হইবে, যাহাতে এই সব উপাদানই শরীরের প্রয়োজন মত বর্ত্তমান থাকে। কোন জাতীয় উপাদান কত পরিমাণ শরীরের পক্ষে দরকার তাহার বিচার করিয়া আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়, তবে সাধারণতঃ দেশ ও আচারানুমোদিত খাদ্যই গ্রহণ করা শ্রেয়। এদেশের এবং অন্য দেশের আচারানুমোদিত খাদ্যের সংমিশ্রণে অনেককেই পরে অনুতাপ করিতে হয়। সাহেবরা মাছ মাংস সাধারণতঃ বেশীই আহার করে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচুর কাচা ও সিদ্ধ তরকারী, ফলমূলও গ্রহণ করে, আমাদের দেশে অনেকে সাহেবদের অনুকরণে মাংস প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, কিন্তু তরকারী, ফলমূল সেই অনুযায়ী আহার করেন না। ফল দাঁড়ায় কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সব উপাদান গুলিই দুগ্ধের মধ্যে বর্ত্তমান। এমন একদিন ছিল যখন প্রত্যেক ভারতবাসীই অন্যান্য খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ খাইতে পাইত, কাজেই শাক সব্জীর উপর সাধারণতঃ ভারতবাসীর জীবন নির্ভর করিলেও খাদ্যের সহিত দুগ্ধের সংমিশ্রণে আবশ্যকীয় কোন উপাদানেরই অভাব শরীরে হইত না। কিন্তু আজকাল ভারতবাসী দুগ্ধ আর বড় একটা চোখে দেখিতে পায় না, কাজেই ভারতবাসীর খাদ্যের মধ্যে আমিষ ও স্নেহ জাতীয়

মৎস্য, মাংস, ছানা, দাল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি খাদ্যের যথেষ্ট প্রচলন হওয়া দরকার।

আমরা উপরে যে সকল উপাদানের নাম করিয়াছি, তাহা ব্যতীতও আরও কতকগুলি উপাদান আছে যাহাকে আমরা ভাইটামিন” বলি। দুগ্ধ, ডিম্ব, মৎস্য এই সব পদার্থে ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আহার্য্যে ভাইটামিনের অভাব হইলে রিকেট্‌স্, স্কার্ভি, বেরি বেরি প্রভৃতি রোগ হয়। চাউল মাজিবার সময়, রন্ধনের সময় খাদ্যের ভাইটামিন অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং শরীর সংরক্ষণের জন্য খাদ্যের মধ্যে কিছু কাচা দ্রব্য মন্দ নয়। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা উচিত। আমাদের পিতা, পিতামহ যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন, সাধরণতঃ আমাদের সেই সব খাদ্যই গ্রহণ করা উচিত, তাহা অপেক্ষা বেশী পরিবর্ত্তন অনেক সময়েই শরীরে সহ্য হয় না। পরিশ্রমানুযায়ী পরিমিত আহার সকলের করা উচিত সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই খাদ্য বিচারের কথা বলিতে বলিতে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। জগত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মেটস্‌নিকফ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, দধিতে যে ল্যাকটক এসিড বীজাণু আছে তাহা যন্ত্রের মধ্যস্থ অনিষ্টকারী বীজাণুদের নষ্ট করিয়া ফেলে, কাজেই নিয়মিত যাঁহারা দধি ব্যবহার করেন তাঁহারা দীর্ঘকাল নিরোগ হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। দুষ্ট বীজাণুদের নষ্ট করিতে দধি বিশেষ উপযোগী, তাহারপর ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, এখানে আশা করি দধির উপকারিতা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

আর্য্যঋষিগণ আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা “বিরুদ্ধাহার” সর্ব্বসময়ে সর্ব্বকালে দোষনীয় বলিয়া গিয়াছেন। মাংস ও

দুগ্ধ এক সময়ে গ্রহণ করা এক রকম বিষ খাওয়ার সামিল—তোমরা কখনই মাংস ও দুগ্ধ এক সময়ে গ্রহণ করিও না।

আজকাল বাজার ভেজাল খাদ্য দ্রব্যে ছাইয়া গিয়াছে। ভেজাল দ্রব্য খাওয়াও যা বিষ খাওয়াও তাই। বরং না খাইয়া কৃশ হওয়া ভাল, তথাপি ভেজাল দ্রব্য খাইয়া চিরকালের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করা ভাল নয়। আহার্য্য দ্রব্যগুলি যাহাতে খাঁটি হয় তাহার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেজাল দ্রব্যের এত অধিক প্রচলন না হইলে সহরের অর্দ্ধেক রোগ লোপ পাইত।

দেহ যন্ত্রের মধ্যে খাদ্য কিরূপে পরিপাক হয় আমরা দেহযন্ত্রে তাহা বলিয়াছি। পরিপাক না হইলে মাংস,ডিম্বের মত সারবান আহার্য্যও শরীরে বিষবৎ কার্য্য করে; আবার সামান্য ফলমূলও পরিপাক করিতে পারিলে শরীরকে স্বাস্থ্যবান করিতে বিশেষ সাহায্য করে। কি খাদ্য কাহার কিরূপ সহ্য হয় সে সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম থাকিতে পারে না। আমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত অন্যের পক্ষে হয়ত তাহাই অনুপযুক্ত। প্রত্যেককেই নিজে বিচার করিতে হইবে, কোন খাদ্য তাহার সহে,কোন খাদ্য তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল।

খাদ্য সম্বন্ধে আর্য্যঋষি ধ্বন্বন্তরিকল্প মহর্ষি চরক লিখিয়া গিয়াছেন,

"মাত্রাশী স্যাৎ। আহার মাত্রা পুনরগ্নি বলাপেক্ষিণী
যাবদ্ধ্যস্যাশনমশিত মনুপহত্য প্রকৃতিং যথাকালং
জরাং গচ্ছতি তাবদস্য মাত্রাপ্রমাণং বেদিতব্যম্ভবতি।"

পরিমিত আহার করিবে। কিন্তু তাহার মাত্রা অগ্নিবল সাপেক্ষ। যতদূর আহার্য্য বিনা আয়াসে যথাকালে জীর্ণ হইবে তাহাই খাদ্যের মাত্রা।

---

# সুবর্ণ-সন্ধানে।

'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হিতৎ'—কথাটা নিছক সত্য। সোণা হেন রত্নের কদর যে দিন হ'তে লোকে বুঝিয়াছে, সে দিন হ'তে যে কত লক্ষ লক্ষ লোক সে সন্ধানে বাহির হইয়াছে, তার খোঁজ কে রাখে? পাহাড়, পর্ব্বত, সাগর, গহ্বর, পাতি পাতি করিয়া খুঁজিয়া কত সন্ধানীর জীবনান্ত হইয়াছে—আবার কত জন হয়ত কমলার আশীর্ব্বাদে জীবনের গতি চিরদিনের মত ফিরাইয়া, একেবারে ধন-কুবের সাজিয়া বসিয়াছে। সোণার সন্ধান, বল্‌তে গেলে ভাগ্যপরীক্ষা—তাই সখ করিয়া ছোট বড় অনেকেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। একবার একটা খনির সন্ধান পাইলেই পৃথিবীর নানা দেশ হ'তে দলে দলে লোক মাতিয়া উঠে ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সোণার উদ্দেশে সুদূর দেশ-দেশান্তরে যাত্রা করে। এ উপলক্ষে অনেক নূতন নূতন স্থান, এমন কি নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কার হইয়াছে। হয়ত সোণার খোঁজ করিতে করিতে দুর্গম অরণ্যানীর ভিতরও লোকজন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া ঠিক সহরের মত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তোমরা শুনিলে বিস্মিত হ'বে যে আফ্রিকা প্রভৃতি বড় বড় মহাদেশ পর্য্যন্ত এভাবে, সন্ধানের ফলে, আবিষ্কার হইয়াছে।

সোণা পৃথিবীর বুকে লুকান আছে। জলে, স্থলে, শৈল-শিখরে, উম্মুক্ত-প্রান্তরে—সকল জায়গায়ই সোণা পাওয়া যায়। কিন্তু এ বহুমূল্য জিনিষটীর যে কি ভাবে উৎপত্তি, তা' কেহ বল্‌তে পারে না। মানুষ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে পৃথিবীর নানা স্থানে খনির সন্ধান পাইয়াছে; কয়লা, লোহা প্রভৃতির ন্যায় সোণাও খনি হ'তে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া আনা হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও খনি আছে; দক্ষিণ-ভারতের 'কোলোর সোণার খনি'র নাম হয়ত তোমরা শুনিয়া

থাকিবে। সেখানে প্রকাণ্ড মাঠের নানাস্থানে গর্ত্ত করিয়া সোণা পাওয়া যাইতেছে।



খনির দৃশ্য।

এই সেদিন কানেডার এক খনিতে ১০০ মাইল বিস্তৃত এক প্রকাণ্ড সোণার স্তর আবিষ্কার হইয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখ যে এক একটা খনির খোঁজ করিতে পারিলে বড় লোক হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত অনন্ত রত্নের আকর—গিরিশৃঙ্গে নানারূপ গৈরিকাদি ধাতুর সঙ্গে সোণাও নাকি পাওয়া যায়। সেখানে অনেক প্রস্রবণ হ'তে গলিত ধাতুর সঙ্গে সোণা, লোহা, তামা প্রভৃতি পদার্থ বাহির হয়। কিন্তু সেটা বরফের দেশ—জমাটশীতের মধ্যে থাকিয়া সোণা উদ্ধার করিয়া আনা বড়ই কষ্টকর ব্যাপার। তোমরা বোধ হয় জান যে কিছুদিন হ'ল হিমালয়ের চূড়ায় আরোহণ (**Everest Expedition**) করিবার জন্য একদল সাহসী লোক প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, এই দুঃসাহসিক উদ্যমের গোড়ায়—আবিষ্কারের ইচ্ছা। কি জানি দুর্গম গিরিশৃঙ্গে কত বহুমূল্য পদার্থ লুকান থাকিতে পারে; তা' ছাড়া নূতন দেশ দেখিয়া প্রাণের আকাঙ্খা মিটান এবং জ্ঞানার্জ্জনও একটা কারণ বটে।

খৃঃ উনবিংশ শতাব্দীতে অনেক অনুসন্ধান (exploration) করিতে করিতে আফ্রিকায় সোণার খোঁজ পাওয়া গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার একটী প্রদেশে(Transvaal) সোণার প্রকাণ্ড খনি। সেখান হ'তে এবং কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হ'তে বহু সোণা দেশ-বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। ব্রিটিস্ কলোম্বিয়ার ক্যারিবো জিলা সোণার জন্য প্রসিদ্ধ। ট্রান্সভ্যালে যে সোণা মিলে তা' উদ্ধার করা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার, কি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, তা না দেখিলে বুঝান কঠিন। কাফ্রিরা কিন্তু এ কার্য্যে বেশ অভ্যস্ত—সাহেবদের হুকুম মাথা পাতিয়া লইয়া নেংটী পরিয়া কাজে লাগিয়া যায়। সেখানে পাহাড়ের গায় সুড়ঙ্গ কাটিয়া লোকজনের চলাফেরার জন্য রাস্তা তৈরী হইয়াছে; সুড়ঙ্গ দিয়া চল্‌তে চল্‌তে সোণার কোন রকম চিহ্ন পাইলেই সেখানটা পাতি পাতি করিয়া অনুসন্ধান করিতে থাকে। যেটুকু পাওয়া যায় তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করিয়া পরে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া দ্বারা তা' অন্য ধাতুর মিশ্রণ হ'তে পৃথক করিয়া খাঁটি সোণার অংশটুকু মাত্র লওয়া হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোটী কোটী টাকার যে সোণা উদ্ধার হইয়াছে তার অধিকাংশই খণিজ-সোণা।

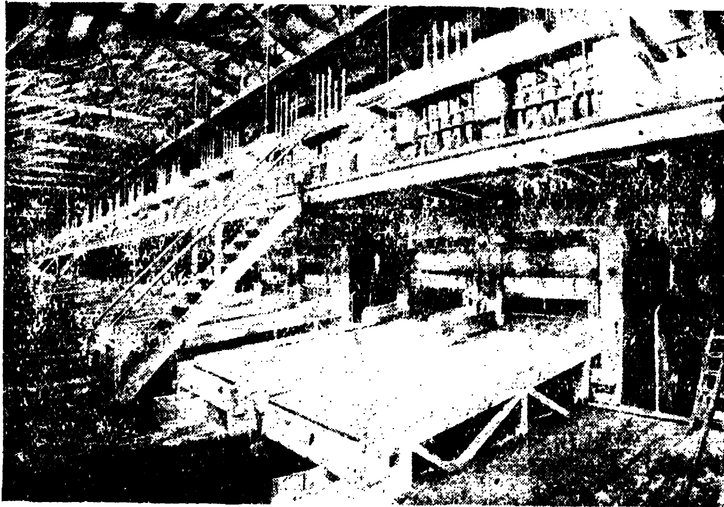
আবার সমতল ক্ষেত্রে মাটী খনন করিতে করিতে এক মাইল, দেড় মাইল নীচ পর্য্যন্ত সন্ধানীরা চলিয়া যায়। গভীর অন্ধকারের ভিতর, সাহসে বুক বাঁধিয়া তারা দিন রাত পরিশ্রম করিয়া সোণা তুলিয়া আনে। আজকাল আফ্রিকা ও আমেরিকার খনিগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে; তা'তে ঝড়-বাদলের সময়েও কাজকর্ম্মের অসুবিধা হয় না—আলোর রোসনাই জ্বালিয়া ইচ্ছামত সব কাজকর্ম্ম হয়। খনির উপরেই কল-কব্জা খাটান একটী অত্যুচ্চ কল-ঘর আছে, সেখান হ'তে এক অদ্ভুত কায়দায় মাল-মসলা, জিনিষপত্র সহ সন্ধানীদের একেবারে খনিতে নামাইয়া দেয় এবং সোণা



পাতি পাতি করিয়া সোনা খুজিতেছে।

সংগ্রহ করা হ'লে আবার উপরে নিয়ে আসে। মাটি ও অন্য ধাতু-মিশ্রিত সোণার খণ্ড (ore) উপরে আনিয়া তাহা মেসিনে পরিষ্কার করা হয়। পরে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এসিড্‌ ইত্যাদি দ্বারা তা'শুদ্ধ করিয়া খাঁটি সোণায় পরিণত করা হয়। এর একটী নূতন উপায় বাহির হইয়াছে। এখন দক্ষিণআফ্রিকায় সকল খনিতেই সেভাবে সোণা পৃথক করে। সংগৃহীত ভেজাল সোণা বড় বড় চৌবাচ্চা ভরিয়া রাখিলে পর তাতে একটা বিষাক্ত রাসায়ণিক পদার্থ (Potassium cyanide) মিশান হয়; ফলে সমস্ত কৃত্রিম সোণা ও অন্যান্য ধাতু হইতে খাঁটি—নিছক—সোণা পৃথক হইয়া আসে। তখন সোণা এত শক্ত থাকে যে তাহা ব্যবহারোপযোগী হয় না। আমরা যে সোণা দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করি সে অবস্থা প্রাপ্ত হ'তে আরও দু' তিনটী

প্রক্রিয়ার দরকার। খণিজ সোণা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিলে পর, মেসিনে ফেলিয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া পাউডারে পরিণত করা হয়। Stamping machineএর মস্ত মস্ত লোহার তক্তা এমন বিদ্যুতবেগে চলিতে থাকে যে—এক একটা পাত মিনিটে ৯০ বার ঘুরিয়া আসে—অতি অল্প সময়ের মধ্যে সোণার পিণ্ড গুলি ছাতু ছাতু হইয়া যায়। গুঁড়া হ'লে সেগুলি হ'তে যেন অফুরন্ত রঙের আভা ফুটিয়া বাহির হ'তে থাকে—রামধনুর রকমারি রঙের ন্যায় কেবলই ঝিক্‌মিক্‌ করে।



চল্‌তি কলে ফেলিয়া সোনা গুঁড়া করা হইতেছে।

গরমের দেশে সোণার তাল nugget মিলে। এ তাল কিন্তু তোমাদের ভাদ্রমাসের তাল নয়। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ায় সন্ধানীরা ঘুরিতে ঘুরিতে 'ব্যালাবেট' নামক স্থানে একটা সোণার তাল পাইয়াছে—নাম "ওয়েলকম্‌ ন্যাগেট।" সাধারণতঃ সমতলক্ষেত্রে,

মাঠে-ময়দানে, তাল-সোণা মিলে; পাহাড় কিম্বা খনিগর্ভে পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

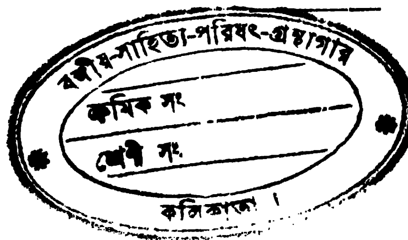
নদী কি সমুদ্র-গর্ভে যে সোণা লুক্কায়িত থাকে তা' উদ্ধার করা যে কিরূপ দুঃসাধ্য তা' তোমরাই বুঝিতে পার। নদীর যে সব স্থানে ভাঁটার পর চড় পড়িয়া থাকে, সেখানে সময় সময় বালুকণার সহিত সোণার কণা মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ভূ-তত্ত্ববিদগণ সমুদ্রের উপকূলে, চড়া-জায়গার এমন কি নদীতটের আশে-পাশের রাস্তাঘাটে, বালুর সহিত মেশান সোণা বাহির করিয়াছেন। তোমরা শুনিলে অবাক হ'বে যে কিছুদিন যাবৎ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিকটে যে সমুদ্র আছে তাতে স্রোতের সঙ্গে সোণা ভাসিয়া আসে এবং অনেক দরিদ্র পরিবার এই স্রোতের জল হ'তে ঝাঁঝড় দিয়া সোণার কণা উঠাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তাই ছেলে বুড়ো সকলকেই ঝাঁঝড় হাতে জলের ধারে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এক সময়ে নাকি ব্রহ্মদেশের নদীর জলে প্রচুর সোণা পাওয়া যাইত; তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ব্রহ্মদেশের নাম দিয়াছিলেন—'সুবর্ণ-ভূমি' বা সোণার দেশ। এখনও পল্লিগ্রামের লোকদের ধারণা যে ব্রহ্মদেশে সোণা রূপার অফুরন্ত ভাণ্ডার—সেখানে গাছে মুক্তা ফলে, নদীর জলে সোণা জ্বলে। সমুদ্রের অতল তলে যে সোণা আছে তা' ডুবরীরা মুক্তার সঙ্গেও মাঝে মাঝে পাইয়া থাকে; ঝাঁকায় ঝাঁকায় শুক্তির সঙ্গে হয়ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোণার টুক্‌রা, কিম্বা কণা চলিয়া আসে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় আড়াল হ'তে মিটমিটে আভা একটু-আধটু ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু প্রায়ই মুক্তার সঙ্গে সোণা পাওয়া যায় না।

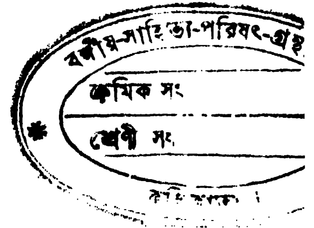
তাল প্রমাণ উঁচু পাহাড়ের চূড়া হ'তে সোণা আনিতে হ'লে অনেক সময় মাটি সমেত পাহাড়ের একটা খণ্ড কাটিয়া আনিতে হয়; পরে রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে খাঁটি সোণা আলাদা করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা চলে।

শৈল-শিখরে সোণা মিলে বটে---কিন্তু কাঁচা সোণা জলে, স্থলে, মাঠে, ঘাটে, সোণা ফলিলেও সোণা প্রস্তুত করিবার প্রণালী আজ পর্য্যন্ত কোন অপ-রসায়নবিৎ (alchemist) আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় বড় ভূ-তত্ত্ব--বিৎগণ বিজ্ঞানের সাহায্যেখণির সন্ধানের অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে নিছক সোণা প্রস্তুত করিবার সৌভাগ্য কাহারও হইল না।

সোণার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রদেশের কাহিনী, এমন কি আবিষ্কারও বিজড়িত। বলতে কি আফ্রিকা মহাদেশটী সোণার অনুসন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধানীদের চোখে পড়িয়াছিল (explored, but not discovered); এর পূর্ব্বে আফ্রিকা একটী অজানা দেশ ছিল---সে মুলুকের কেহ কোন খোঁজ-খবর রাখিত না।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী।






# সাইগোর বীরত্ব।

( জাপানী উপকথা )

কথায় বলে সব পারা যায়, কিন্তু রাজার সঙ্গে শত্রুতা ক'রে দেশে বাস করা চলে না। ওরিবেসিমার ঠিক তাই হয়েছিল। ওরিবেসিমা মস্ত বড় একজন সামুরাই যোদ্ধা ছিল, কিন্তু দেশের রাজা হোজো তাকাতোকি তার পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। বেচারা ওরিবেসিমা! তার বিশেষ কোন দোষ ছিল না, কিন্তু তাহ'লে কি হবে, একদিন রাজার কাছ থেকে হুকুম এল—"ওকি দ্বীপে ওরিবেসিমার চির-নির্ব্বাসন।'

সাইগো ছিল, ওরিবেসিমার একমাত্র ছেলে ;—আঠারো বছর তার বয়স, কিন্তু কি সুঠাম সুন্দর তার চেহারা, আর তেমনি পিতৃভক্ত সে। রাজার দেওয়া শাস্তি মাথায় নিয়ে, যখন ওরিবেসিমা দেশ ছেড়ে চলে গেল, তখন সাইগোর কান্না দেখলে পাথর ও বোধহয় ফেটে যেত। উপায়হীন সাইগো, কি কর্‌বে সে—নীরবে কেঁদেই দিন কাটাতে লাগল। পৃথিবীতে তার একমাত্র ভালবাসার জায়গায় শূন্য পড়ে রইল।

আর পারা যায় না। সাইগো একদিন ঠিক কর্‌ল যে সে তার বাপের কাছে যাবে। সে শুনেছিল যে ওকিদ্বীপে তার বাবাকে নির্ব্বাসিত করা হয়েছে; ওকিদ্বীপ কোথায় সে তো জানে না। তা নাই বা জানল। তার শরীরে যে শক্তি আর বুকে যে সাহস আছে, তাই দিয়ে সে পথ চিনে নিবে। আর বেশীর ভাগ ছিল, তার সাঁতার দেবার আসাধারণ ক্ষমতা; ডুবুরীরাও বোধহয় ও

রকম সাঁতার দিতে পারে না। শুধু জলের উপরে নয়, জলের নীচেও সে মাছের মত সাঁতার দিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে কত রঙ বেরঙের শামুক কুড়িয়ে এনে সকলকে আশ্চর্য্য করে দিত।

তখনো ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি—রাতে ফোটা হাস্নুহানার দুএকটী সবে মাত্র ঝরে পড়েছে—এমন সময়ে সাইগো যাকিছু ছিল তাই পাথেয় নিয়ে সেই অজানা দেশের উদ্দেশে বা'র হয়ে পড়ল। কতদেশ ঘুরল—কত নদী পাহাড়ের গা ঘেঁসো কত গ্রাম, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, সাইগো চলতে লাগ্‌ল। একদিন পথে যেতে যেতে দূরে সমুদ্রের অস্পষ্ট গর্জ্জন, ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে তার কাণে এসে পৌঁছিল। তার প্রাণে উৎসাহের ঢেউ লাগ্‌ল সে তার অবসন্ন দেহটাকে প্রাণপণে টান্‌তে টান্‌তে সমুদ্রের ধারে এনে ফেল্‌ল। সে কি সুন্দর দৃশ্য। সূর্য্য অস্ত গেছে—কিন্তু আকাশ, বাতাস জল সব যেন লালিমায় ভরে দিয়ে গেছে। সাইগো সেখেনে এসে বসে পড়ল—ঢেউটির পর ঢেউ এসে তার পায়ের নীচে আছ্‌ড়ে পড়তে লাগ্‌ল। তার চমক ভাঙল যখন সন্ধ্যার আঁধার তার পাখা দিয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। সাইগো উঠে দাঁড়াল। একটু দূরে একজন মাঝি নৌকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সাইগো তাদের কাছে গিয়ে বল্‌ল—তোমরা দয়া করে আমাকে ওকিদ্বীপ পৌঁছে দিতে পার—আমার বাবা সেখানে নির্ব্বাসিত হয়েছেন।" মাঝিরা কিছুক্ষণ তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল তারপর বল্‌ল—তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ বাপু—। পাগল হয়েছ না কি? বাপরে সেখানে কাউকে নিয়ে যাবার হুকুম নেই। সে কি রকম দূর। সকাল হলেই দেখতে পাবে দূরে ওকিদ্বীপ ধোঁয়ার মত দেখা যাচ্ছে। সাইগো আরো দুচারজন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল, কত কাকুতি মিনতি কর্‌ল, কিন্তু কেউ তার উপর দয়া কর্‌ল না। শেষে হতাশ হয়ে সাইগো একটা গাছের

তলায় শুয়ে পড়ল। ঘুমের পরী যেন অপেক্ষা করে ছিলেন ;—সাইগো শোবা-মাত্র, তার শ্রান্ত চোখের পাতায় ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিলেন।

সাইগো কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলেন, তা জানে না। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল ; সে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে তখনো রাত আছে। অকাশের গায়ে মেঘের চঞ্চল শিশুগুলি দৌড়াদৌড়ি করে কেবলি চাঁদ বুড়ির চোখ ধরেছে—আবার ছেড়ে দিচ্ছে। সাইগো উঠে দাঁড়াল্ সে মনে মনে একটা সঙ্কল্প করে নিয়েছিল। পা টিপে টিপে সে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল ;—সব নিঝুম কেবল ঢেউগুলোর শব্দ জানিয়ে দিচ্ছিল যে, তারা জেগে আছে। ছোট্ট একখানা ডিঙ্গি বালির ওপর আড় করা ছিল। কাছে গিয়ে সাইগো দেখ্‌ল যে তার মালিক কেউ নেই। ধীরে ধীরে ডিঙ্গীখানা টেনে নিয়ে জলে নামালো। তারপর দুহাত জোর করে সমুদ্রের দেবতাকে প্রণাম করে বাপের উদ্দেশে ডিঙ্গী ছেড়ে দিল। ঢেউটির পর ঢেউ এসে তার ছোট্ট ডিঙ্গিকে নাচাতে নাচাতে সেই অকুল সমুদ্রের কোথায় নিয়ে ফেল্‌ল, সাইগো বুঝতে পার্‌ল না।

সকাল বেলায় যখন সূর্য্য তার সোণার আলো দিয়ে পৃথিবীকে নাইয়ে দিলেন, তখন সাইগো দেখ্‌ল যে সে একটা দ্বীপের কাছে এসে পড়েছে। সাইগো ডিঙ্গি ছেড়ে দ্বীপের ওপর উঠে এল। বেশ সুন্দর দ্বীপটী—কিন্তু সাইগো একটী প্রাণীকে ও দেখ্‌তে পেল না। হঠাৎ তার মনে হ'ল যেন সমুদ্রের গর্জ্জনের ভেতর দিয়ে একটা করুণ কান্নার শব্দ তার কাণে এসে পৌঁছিল। সে চারিদিক চাইতে লাগ্‌ল, একটু পরে দেখ্‌তে পেল গাছের আড়ালে দুটি সাদা মূর্ত্তি। কাছে গিয়ে দেখ্‌ল, একটি সুন্দরী মেয়ে কাঁদছে আর একজন বুড়ো তাকে সমুদ্রের কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে। দুজনেরই পোষাক সাদা কাপড়ের সাইগো প্রথমে বুঝতে পার্‌ল না, কি ব্যাপার। তারপর যখন সেই

বুড়ো মেয়েটিকে কিনারায় এনে, গভীর সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দেবার উদ্যোগ কর্‌ল, তখন সে আর স্থির থাক্‌তে না পেরে, তীরের মত বেগে দৌড়ে গিয়ে বুড়োর হাত দুটো চেপে ধর্‌ল। বুড়োর চোখ থেকে ও জল পড়ছিল,—সাইগো আগে তা লক্ষ্য করে নি। বুড়ো তার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বল্‌ল,—"তুমি বোধহয় এখানে নতুন এসেছ—তা না হলে আমাকে এরকম ভাবে বাধা দিতে আস্‌তে না। আমি এদ্বীপের পুরোহিত—একাজ নিজের ইচ্ছেতে কর্‌ছি না—আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে। য়ুফুনেন্সুসী বলে এক শয়তান এই সমুদ্রের তলায় থাকে। তার জন্যে প্রত্যেক বছর, এমন দিনে একটি করে কুমার কিংবা কুমারী জলে ফেলে দিতে হয়। আর তা না দিলে, য়ুফুনেন্সুসী রেগে গিয়ে, ঝড়ের স্মৃষ্টি করে, তাতে এ দ্বীপের অনেক নৌকা মারা পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রাণও নষ্ট হয়। কাজেই প্রত্যেক বৎসর এই নিষ্ঠুর কাজ কর্‌তে হয়; আর পুরোহিত বলে, আমার ওপরই এই কাজের ভার পড়েছে।" বলে পুরোহিত কেঁদে ফেল্‌ল।

সাইগো—মন দিয়ে সব কথা শুন্‌ল। তারপর পুরোহিতের হাত ধরে বল্‌ল—দেখুন দুঃখ সব জায়গায় আছে। এই মেয়েটিকে—ছেড়ে দিন; তার বদলে আমি য়ুফুনেন্সুসীর কাছে নিজেকে বলি দেব। আমার দুঃখের শেষ নেই, তাই মর্‌তেও আমার দুঃখ নেই। আমি ওরিবেসিমা সামুরাইয়ের ছেলে। আমি খুজঁতে বেরিয়েছিলুম কোথায় তাঁকে নির্ব্বাসন রাখা হয়েছে, কিন্তু বা'র কর্‌তে পার্‌লুম না। আমি এই চিঠিখানা রেখে গেলুম,—পারেন তো আমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

তারপর সাইগো আর কোনও কথা না বলে গায়ের জামাটা খুলে ফেল্‌ল, আর তার ভেতর থেকে ছোট চকচকে একখানা ছোরা বার করে, দাঁতে চেপে ধরে,

সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীল জল উছ্‌লে উঠ্‌ল তারপর আবার ঢেউএর উপর ঢেউ গর্জ্জন করে যেতে লাগ্‌ল। পুরোহিত আর মেয়েটী অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সাইগো যেরকম সুন্দর সাঁতার দিতে জান্‌ত, তাতে সমুদ্রের তলার দিকে ডুবে যেতে তার কোনও কষ্টই বোধ হল না। সমুদ্রের তলায় পৌঁছে, সাইগো দেখ্‌তে পেল, তার সাম্‌নে একটা গুহা আর তার চারিদিকে কেমন একটা আলোর জ্যোতিঃ বার। সেই আলোতে সাইগোর চোখ পড়্‌ল, গুহার কালো মত কি একটা মূর্ত্তির ওপর। যে ভাব্‌ল যে এই বুঝি য়ুফুনেন্নুসী; কিন্তু একটু কাছে গিয়েই, সে তার ভুল বুঝ্‌তে পার্‌ল। সেটা আর কিছু নয়, একটা কাঠের প্রতিমূর্ত্তি—আবার অন্য কারও নয়, স্বয়ং রাজা হেজো তাকাতোকির। বিদ্যুতের মত সাইগোর মনে পড়ল যে, এই হেজো তাকাতোকিই তার বাবাকে নির্ব্বাসন দিয়েছে, আর অমনি তার ইচ্ছে হইল,—মূর্ত্তিটাকে ভেঙে, চুরে, গুড়িয়ে দেয়। কিন্তু তাতে লাভ কি,—বরং এটাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে রাজা খুসী হতে পারেন,—তার বাবার নির্ব্বাসন দণ্ডও মাপ হয়ে যেতে পারে। এই সব ভেবে সাইগো কাঠের মূর্ত্তিটাকে টেনে এনে নিজের কোমর বন্ধ খুলে, পিঠের সঙ্গে বেঁধে ফেলবার উদ্যোগ কর্‌তে লাগ্‌ল। মূর্ত্তিটা ভারী ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু জলের ভেতর সাইগো তার ভার খুব অল্পই বোধ কর্‌তে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে, সেই গুহার ভেতর থেকে এক অদ্ভুত জীব বার হয়ে এল; দেখতে সাপের মত কিন্তু চারখানা ছোট ছোট পা আছে; তার গায়ের ভেতর থেকে যেন আলোর ছটা বেরুচ্ছে, আর চোখ দুটো ঠিক আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।' সাইগো দেখবামাত্র বুঝতে পার্‌ল এই সেই য়ুফুনেন্নুসী।

য়ুফুনেনুসী শিকার সাম্‌নে দেখে, হাঁ করে আস্তে আস্তে এগোতে লাগ্‌ল; সাইগোও ছোরাখানা বাগিয়ে ধরে, তার আক্রমণের অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। যখন প্রায় কাছে এসে পড়েছে তখন সাইগো চকিতের মত পাশে সরে গিয়ে, দুষ্টু রাক্ষসের চোখে ছোরা বসিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার গলাতেও আঘাত কর্‌ল। য়ুফুনেনুসী প্রথমে অন্ধ হয়ে, তারপর ঐ রকম ভীষণ আঘাত খেয়ে ইহলীলা সাঙ্গ কর্‌ল। সাইগো সেই মূর্ত্তিটা পিঠে বেঁধে জলের ওপর উঠে পড়্‌ল।

এদিকে সেই পুরোহিত আর মেয়েটি সাইগোকে জলের মধ্যে অদৃশ্য হতে দেখে তার আত্মার জন্যে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা কর্‌তে লাগ্‌ল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তারা হঠাৎ দেখ্‌তে পেল যে, কি একটা জলের ভেতর থেকে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। মেয়েটী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—'দেখুন, এযে সেই ছেলেটী—তার পিঠে আবার কি বাঁধা রয়েছে!' পুরোহিত দেখ্‌ল, সত্যিই তো তাই। সে তখনি চেঁচামেচি করে অনেক লোক জমা কর্‌ল। তাদের সাহায্য পেয়ে সাইগো আধমরা অবস্থায় ডাঙ্গায় উঠে এল।

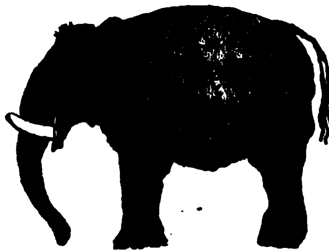
একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাইগো যখন চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ল, তখন সকলে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাকে ব্যস্ত করে তুল্‌ল। সে কাঠের মূর্ত্তিটা পিঠ থেকে খুলে ফেলে, সব ব্যাপার খুলে বল্‌ল। সেই দিনই রাজা তাকাতোকির কাছে সেই মূর্ত্তিটা নিয়ে লোক গেল। রাজা তাকাতোকি সত্যিই এক রোগে ভুগ্‌ছিলেন—কোনও রকমেই আরাম হতে পার্‌ছিলেন না। মূর্ত্তিটা জল থেকে তোল্‌বার পর থেকেই, তিনি আশ্চর্য্য রকমে ভাল হয়ে উঠ্‌লেন। তারপর সেই কাঠের মূর্ত্তি দেখে আর তার বিবরণ শুনে, সহজেই বুঝতে পার্‌লেন যে কোনও লোক তাঁকে তুক্‌ করে রেখেছিল। আবার যখন শুন্‌লেন যে তাঁর পরমশত্রু ওরিবেসিমার ছেলেই তাঁর এই উপকার করেছে তখন তিনি হুকুম দিলেন—

'ওরিবেসিমাকে মুক্ত করে দাও, আর তার ছেলেকে পাঁচ হাজার ইয়েন্ পুরস্কার দাও।'

তারপর—সাইগোর বীরত্বের কথা দেশে দেশে রটে গেল; ওরিবেসিমা দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে সাইগোকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কত সুন্দরী মেয়ে তখন সাইগোকে স্বামী বলে বরণ করতে চাইল; কিন্তু দ্বীপের সেই মেয়েটীকে সাইগো পছন্দ করেছিল। একদিন বসন্তের আরম্ভে, চারদিকে যখন নতুন জীবনের সাড়া পড়ে গেছে—তেমনি দিনে তাদের দুটী প্রাণ এক হয়ে নতুন জীবনের সূত্রপাত হ'ল। রাজা তাকাতোকি নিজে এসে তাদের আশীর্ব্বাদ করে গেলেন।

শ্রীহরিদাস ঘোষ।

---



# আমাদের দেশের দুরবস্থা।

আমাদের দেশের এত অবনতির কারণ কি? আমাদের দেশ এত দরিদ্র কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। আমার দেশের সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাগণ বড় হইলে এই কথার উত্তর জানিতে ও বুঝিতে পারিবে। আজ মাত্র সংক্ষেপে তোমাদিগকে এ সম্বন্ধে ২।৪টা কথা বলিব। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থার তুলনায় আমাদের দেশ অতি দরিদ্র। প্রথমতঃ, আমাদের দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে আমাদের দেশে শতকরা প্রায় দশজন লোকে মাত্র লেখাপড়া জানে; বাকী ৯০ জন লোকই অশিক্ষিত। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ২।৩ জনের অধিক লেখাপড়া জানে না। আর বিলাত প্রভৃতি দেশের হিসাবে দেখা যায় তথায় শতকরা প্রায় ৯৮ জন লোকই শিক্ষিত সেই সকল দেশে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি কম। সে দেশে স্ত্রীলোকেরাও লেখাপড়া জানে। আমেরিকায় নিরক্ষর লোক নাই, তথাকার সকলেই অল্প বিস্তর লেখাপড়া জানে। শিক্ষায়ও স্থান গরিমায় আজকাল আমেরিকাই পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আমেরিকায় দিন দিন বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইতেছে— যে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এমন দিন হয়ত আসিবে যখন বিজ্ঞানের বলে জগতে কোন কার্য্যই অসম্ভব থাকিবে না। দেশের লোক লেখাপড়া না জানিলে, অশিক্ষিত হইলে সে দেশ উন্নত হইতে পারে না। আমাদের দেশের অবনতির দ্বিতীয় কারণ পরাধীনতা। আমাদের দেশে কাহারও স্বাধীনতা নাই, আমরা পর মুখাপেক্ষি। স্বাবলম্বন ব্যতীত জগতে কেহই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আমরা প্রত্যেক কার্য্যে পরাধীন; আমাদের আত্ম-নির্ভরতা নাই। তোমরা

হয়ত বলিবে আমাদের দেশে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছেলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ হইতেছে, শতকরা ৮০।৮৫ জন পাশ করিতেছে অতএব আমাদের দেশকে অশিক্ষিত বলা যায় কি প্রকারে ? কিন্তু তোমরা মনে রাখিবে যে পরীক্ষা পাশ করিলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। অপর দেশের শিক্ষার সহিত আমাদের দেশের শিক্ষার অনেক পার্থক্য আছে। আমরা আত্ম-নির্ভরতা বা স্বাবলম্বন শিক্ষা পাই না, আমরা যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকি তাহা দ্বারা আত্ম-নির্ভর—হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা চলে না। আমাদের শিক্ষা আমাদিগকে পর মুখাপেক্ষি হইতে বাধ্য করিয়া লয়। আমরা পরের দাসত্ব না করিয়া আত্মাবলম্বন করিতে পারি না। এ দেশের শিক্ষাই আমাদিগকে পরাধীন করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা বৈদেশিক রাজার অধীনে—কাজেই আমাদের অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। আমাদের দেশের অধিবাসীরা অত্যন্ত কর ভারে প্রপীড়িত। আমরা যাহাদের অধীনে তাহারা আমাদের উপর কঠোর কর বসাইয়া আমাদের অর্থ লইয়া যান ! তারপর আমাদের দেশে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহা বিদেশী বণিকেরা স্বল্প মূল্যে খরিদ করিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি আমাদের দেশে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া আমাদের অর্থও অধিক পরিমাণে লইয়া গিয়া থাকে। ব্যবসায় বানিজ্যের হিসাবে আমাদের দেশের বড়ই অবনতি। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য সকল দ্রব্যই বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। আমাদের দেশের সকলেই চাকুরী প্রিয়, তাহারা পরাধীন হইয়া চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে কাজেই জাতীয় এবং দেশীয় শিল্প-ব্যবসায় ও বানিজ্যের প্রতি কাহারও মনোযোগ নাই। এই পরাধিনতাই আমাদের দেশের অবনতির ও দারিদ্রতার প্রধান কারণ। তৃতীয়তঃ আমাদের দেশে বেকার (কর্ম্মহীন) লোকের সংখ্যাও কম নয়। এত অলস ও কর্ম্মহীন লোক অপর কোন দেশে নাই, পরিশ্রম না

করিলে কোনদেশে কাহারও খাওয়া জুটে না, কিন্তু আমাদের দেশে অনেক লোক ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে; এদেশে অন্ধ, আতুর, বোবা, খঞ্জ, প্রভৃতি নিঃসহায় লোকেরা ত ভিক্ষা করেই কিন্তু তাহা ব্যতীত, অসংখ্য যোয়ান মদ্দ কর্ম্মঠ পুরুষ ও স্ত্রীলোক অলসের মত দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল অক্ষম লোক, আতুর অন্ধ, কার্য্য করিতে পারে না তাহাদের জন্য তেমন উপযোগী আশ্রয়স্থান নাই, অন্যান্য দেশে আতুরাশ্রম ও অনাথ আশ্রম প্রভৃতি আশ্রয়ে নিরাশ্রয় ও অক্ষম লোকদিগের বসবাসের সুব্যবস্থা থাকে, তাহাদের ঘুরিয়া ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হয় না। এই সকল আশ্রমের অভাবে বা অপ্রচুরতা বশতঃ ঐ প্রকার নিরাশ্রয় লোকদের ভিক্ষা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত যাহারা কাজ কর্ম্ম করিতে সক্ষম সেই প্রকার বহুলোক অলসের মত ভিক্ষা করে। আমাদের দেশের অধিবাসীরা ভিক্ষাদানকে ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কাজেই ভিক্ষুকেরা কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিয়া বঞ্চিত হয় না। এক হিসাবে আমাদের দেশ এই ভিক্ষুকদিগকে অন্যায় প্রশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন, অন্যান্য দেশে কার্য্যক্ষম ব্যক্তিরা ভিক্ষা পায় না। কাজ কর্ম্ম করিয়া খাইতে হয়। আমাদের দেশের মত বৈরাগী ও ভিক্ষুকের দল অপর দেশে নাই। সেই সকল দেশে ছোট বড় ইতর ভদ্র সকলকেই খাটিয়া খাইতে হয়। আমেরিকায় কেহ কাহাকেও ভিক্ষা দেয় না, কার্য্য করিলে পারিশ্রমিক দেয়। একজন আমেরিকা পর্য্যটক বলিয়াছেন যে একদা আমেরিকার কোন গৃহস্থের বাড়ীতে তিনি আহার্য্য প্রার্থনা করিলে, গৃহস্থ তাহাকে তাহার ঘরের টেবিল সাজাইতে আদেশ করেন, তিনিও গৃহস্থের টেবিল সাজাইয়া রাখিলেন, টেবিল সাজান হইলে গৃহস্থ তাহাকে আহার্য্য দান করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আরো অনেকস্থানে কার্য্য করিয়া তদ্বিনিময়ে আহার্য্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে দেশে কার্য্যক্ষম লোকের ভিক্ষা মিলে না,

এমন কি অন্ধ আতুর প্রভৃতির মধ্যেও এমন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে যে তদ্দারা তাহারাও অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষার ফলে তথায় অন্ধও শিল্প-কার্য্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে, অলসের মত কেহই তথায় বসিয়া থাকে না। আমাদের দেশের মত এই প্রকার বেকার সমস্যা অপর দেশে নাই বলিয়াই তাহারা ঐশ্বর্য্যশালী ও উন্নত।

সেই দেশে কেহ বি, এ, পাশ করিয়াও কুলীগিরী করিতে লজ্জিত বা অসম্মান মনে করে না; আর আমাদের দেশে একটু লেখাপড়া শিখিলেই তাহারা জাতীয় ব্যবসায় করিতে পর্য্যন্ত লজ্জাবোধ ও অপমান বোধ করে। আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদিগকে "বাবু" ও আত্মম্ভরী করিয়া গঠিত করে; আর সেই দেশের শিক্ষা তাহাদিগকে আত্ম-নির্ভর হইতে শিক্ষা দেয়। আমরা দেখিতে পাই আমাদের দেশের একজন কৃষকের বা কর্ম্মকারের পুত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিলে বা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিলে আর পৈত্রিক ব্যবসায় করিতে পারে না। তাহাতে লজ্জাও অপমান বোধ করে; তাহারা তখন চাকুরী করিতে যায়। ।কন্তু আমেরিকা ও অন্যান্য সভ্য দেশে তাহা হয় না, তথায় কৃষকের পুত্র এম, এ, পাশ করিলেও কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করে না,কারণ সে সকল দেশে সকলেই শিক্ষিত, তাহারা শিক্ষা হিসাবে কার্য্য নির্ব্বাচন করেন না, কিন্তু এদেশে প্রায় পনর আনা লোক অশিক্ষিত কাজেই যাহারা সামান্য লেখা পড়া শিখে তাহারা আর জাতীয় বা দেশীয় ব্যবসা করিতে পারে না, উহাতে লজ্জা বোধ করে। এই জন্য আমাদের দেশে কৃষকেরা 'চিরদিনই কৃষক থাকিয়া গেল আর বাবুরা বাবুই রহিল। অতএব দেখা যাইতেছে শিক্ষাই আমাদের উন্নতি অবনতির পথ প্রদর্শক।

আমাদের দেশের অবনতির আর এক কারণ আমাদের সততার অভাব। আমাদের দেশের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের বিশ্বাস নাই,

ব্যবসায়ীরা সর্ব্বদাই প্রবঞ্চণা প্রতারণা করিয়া থাকে। নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সততার লেশমাত্র নাই, এই সকল শিক্ষার অভাব। বাজারে এক জিনিষ ক্রয় করিতে গেলে দোকানদার তাহার মূল্য আসল মূল্য অপেক্ষা চতুর্গুণ চাহিয়া বসে, পরে ক্রেতা দরাদরি করিয়া মূল্য কমাইয়া জিনিষ খরিদ করে, আর দোকানদারগণ খারাপ দ্রব্য ভাল বলিয়া সর্ব্বদাই গ্রাহকদিগকে ঠকাইয়া থাকে। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদের সহিত জিনিষের মূল্য লইয়া যেমন দরাদরি হয় কোন সভ্য দেশেই তাহা হয় না। একজন সাহেবের দোকানে যাও দেখিবে প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত মূল্য তালিকা গাঁথা আছে কোন দরদাম করিতে হইবে না, জিনিষগুলিও সাচ্চা পাইবে। আমাদের দেশীয় দোকানদারগণ মিথ্যা কথা বলিয়া যাহাতে অধিক মূল্য আদায় করিতে পারে সে চেষ্টায়ই সর্ব্বদা রত। এই সকল ব্যবহার আমাদের নৈতিক অবনতির পরিচায়ক। আমাদের দেশে কাহারও প্রতি কাহারও বিশ্বাস নাই, সর্ব্বত্রই বিশ্বাসঘাতকতা দৃষ্ট হয়, বিলাতে একজনে অপরের নিকট মনিঅডারে টাকা পাঠাইলে তাহার প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে জ্ঞাপকের দস্তখত করিতে হয় না। বিলাতী মনিঅডার ফারমে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য কোন স্থানই নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে বিশ্বাস করিয়া থাকে; অসদুপায়ে কেহ কাহাকে প্রতারিত করিতে চায় না। যে দেশের লোক নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষায় অবনত সে দেশ কখনও উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না।

আমাদের দেশের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। এদেশ অত্যন্ত দরিদ্র। নিম্নশ্রেণীর লোকদের অনেকের দুই বেলা সমানে আহারও জুটে না; কত লোক উপবাসেও দিন যাপন করে। জগতের তুলনায় বর্ত্তমানে আমাদের দেশের মত দুরবস্থা অন্য কোন দেশের নাই। এখন আর আমাদের দেশের সেই সুখের দিন নাই, এমন এক সময় ছিল যখন সুখ ঐশ্বর্য্যে, ধনরত্নে, জ্ঞানবুদ্ধিতে আমাদের দেশ

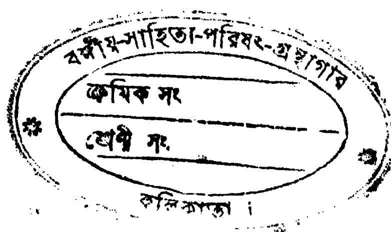
জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু কালপ্রভাবে সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন চারিদিকেই কেবল অন্নসমস্যা অর্থসমস্যা ও হাহাকার ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। বেকার লোকের সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইয়া দেশকে অলস করিয়া তুলিয়াছে। উল্লিখিত অভাবগুলি দূরীভূত না হইলে এদেশের উন্নতির আশা কম।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

---

ভাদ্রের আমার দেশের শেষ পৃষ্ঠা সংখ্যা গিয়াছে ৪১২, সেই অনুযায়ী আশ্বিনের পৃষ্ঠা সংখ্যা আরম্ভ হইবে ৪১৩ হইতে এবং শেষ হইবে ৪৬২ পৃষ্ঠায় কিন্তু ছাপার ভুলে সবই গোলমাল হইয়া গিয়াছে। পাঠকগণ যদি নিজেরা কালিতে এই ভুল-গুলি সংশোধন করিয়া লন তবেই আমাদের ত্রুটীর কতকটা প্রতিকার হয়। কার্ত্তিক সংখ্যা ৪৬৩ পৃষ্ঠা হইতে আরম্ভ হইবে।

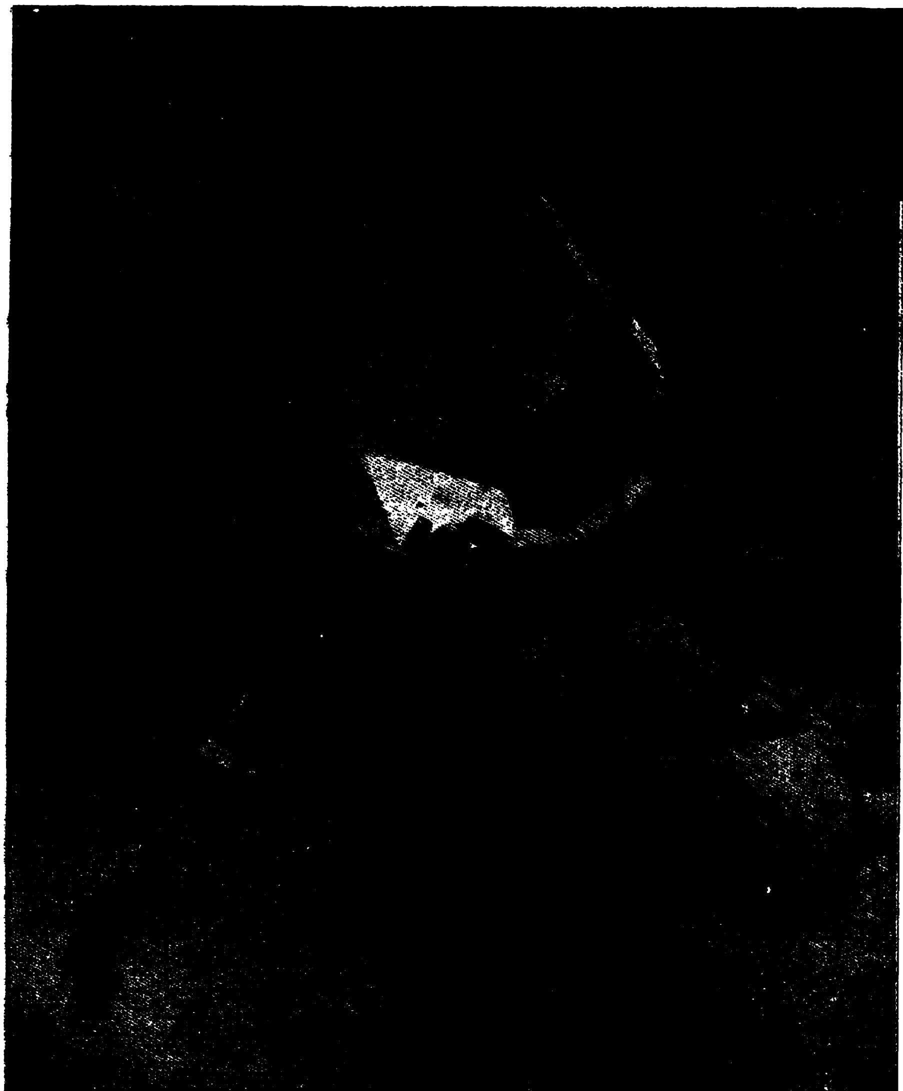
সম্পাদক




আশ্বিন সংখ্যায় ধাঁধাঁ কিম্বা তাহার উত্তর গেল না—কার্ত্তিক সংখ্যায় যাইবে। কার্ত্তিক সংখ্যা ৺পূজার পূর্ব্বেই ডাকে দেওয়া হইবে।

ছাপাখানার নানা গোলযোগে আশ্বিন সংখ্যা পাঠাইতে দেরী হইয়া গেল। আশা করি গ্রাহকেরা ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

অতঃপর "আমার দেশ" আমাদের নিজেদের ছাপাখানায় ছাপা হইবে—সুতরাং আশা করি, অনেক ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারিব।



# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা । কার্ত্তিক, ১৩৩০ ।

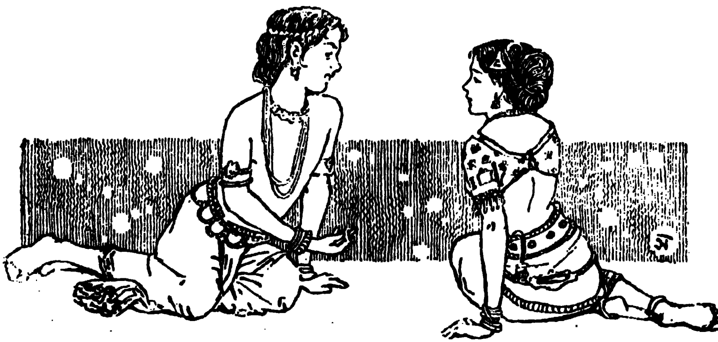
## 'পূজোয়' ছেলের আবদার ।

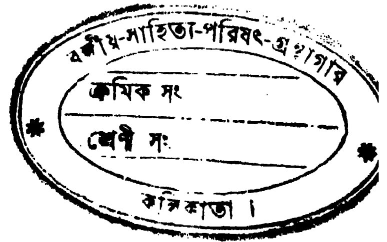
এবার বাবা 'পূজোয়'— আমার
একটি কথা শুন্‌তে হবে—
আমার নতুন পোষাক 'টোষাক'
কিছুই নাহি কিন্‌তে হবে ।
আমার দেশের গরীব দুঃখী
আছে যত খোঁড়া কানা—
পেট্‌টা ভরে' পায় না খেতে
পরে' থাকে মলিন 'ট্যানা'—
যাদের বাবা কেউ দেখে না,
কয়না দুটো আশার কথা—
বিরস মুখে চ'খের জলে
বইছে কেবল মনের ব্যথা ।
বড় লোকের দোরে গেলে
পায় যাহারা তিরস্কার,
গালাগালি ঝাঁটা লাথি
নিত্য যাদের পুরস্কার—
আমাদেরি ঘরে বাবা
ডেক' তাদের আদর করে'
পূজোর সময়—কয়েকটা দিন—
খাইয়ে দিও পেট্‌টা ভরে' ।

মোটা সোটা মিলের কাপড়
তাদের' বাবা কিনে দিও—
তাদের বাবা চখের জলটি
নিজের হাতে মুছে নিও।
অল্প পেলেই তুষ্ট তারা
আদর করে মাথায় লবে—
জগদম্বার বরে বাবা
আমাদের না অভাব হবে।

ভেবে দেখ দেখি বাবা
হবে তাদের কি আহ্লাদ ?
পরাণ খুলে দু'হাত তুলে
কর্‌বে কত আশীর্ব্বাদ।
'পূজোর' সময় আমরা বাবা
খাব দাব পর্‌ব সুখে—
আর গরীব দুখী ভাইগুলি সব
থাক্‌বে বিরস মলিন মুখে!

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।






# ভেন্‌ডিক্

গেইনস্‌বরো নামে ইংলণ্ডের একজন প্রধান চিত্রশিল্পী ছিলেন ; তিনি মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া বলিয়াছেন—"আমরা সকলেই স্বর্গে যাইব—সেখানে ভেন্‌ডিকের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হইবে।" এই ভেন্‌ডিক্ কে ছিলেন তোমরা জান কি ? তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর। সেই কবে তিনশত বৎসর আগে ভেন্‌ডিক্ জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু আজও তাঁহার নাম কেহ ভোলে নাই। ভেন্‌ডিকের চিত্র পৃথিবীর সকলের কাছেই আদরণীয়।

ভেন্‌ডিকের জীবনের বেশী ভাগটা ইংলণ্ডে কাটিয়াছিল ; এমন কি সেখানে মরিলেও কিন্তু জাতিতে তিনি ইংরেজ ছিলেন না। ভেন্‌ডিক্ ছিলেন বেল্‌জিয়ান্। ১৫৯৯ খৃঃঅঃ ২২শে মার্চ্চ এন্‌টোয়ার্প নগরে ভেন্‌ডিকের জন্ম হয়। ভেন্‌ডিকের বাপ মস্ত বড় ধনী সওদাগর ছিলেন। জগতের অধিকাংশ শিল্পীর জীবনেই দুঃখ দৈন্যের সহিত লড়াই করিতে হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে ভেন্‌ডিকের বাল্যে বা যৌবনে দুঃখ দারিদ্রের সহিত সংগ্রাম করিতে হয় নাই। ছেলেবেলা হইতেই বালকের মন চিত্র শিল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অতি শৈশবেই তাহার বিকাশও হইয়াছিল। শৈশবে সহরের একজন বিখ্যাত চিত্র শিল্পীর তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ভেন্‌ডিক্ সে যুগের রুবেন্‌স নামক একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের কাছে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। রুবেনসের নাম তখন লোকের মুখে মুখে। ইতালি হইতে তিনি চিত্র শিক্ষা শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। ভেন্‌ডিক্ এহেন বিখ্যাত শিল্পীর শিষ্য হইয়া ধন্য জ্ঞান করিলেন। রুবেনস্ এই তরুণ শিষ্যের নৈপুণ্য দেখিয়া

বিস্মিত হইয়াছিলেন—তাঁহার আদর্শ, তাঁহার রঙ ফলান—ভেন্‌ডিক্‌ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিখিয়া ফেলিল। রুবেন সংকীর্ণমনা ছিলেন না, তিনি আনন্দে গদ গদ হইয়া—শিষ্যকে বলিলেন—"তুমি ইতালিতে যাও, চিত্র শিল্পীদের আদর্শ মহাপুরুষগণের চিত্রগুলির আলোচনা করিয়া আইস।"

ভেন্‌ডিকের সে সময়ে ইতালি যাওয়া হইল না। রুবেনসের কাছেই শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এন্‌টোয়ার্প নগরের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি এণ্টোয়ার্প শিল্প পারিষদের একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার পর বৎসর সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে 'ক্রুশে বিদ্ধ যীশুর' একখানা ছবি আঁকিয়া সেখানকার একটা গীর্জ্জায় উপহার দিলেন।

এ সময়ে ভেন্‌ডিকের বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। তাঁহার যশের কথা চারিদিকেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। এ যুগে ইংলণ্ডে শিল্পীদের বড় আদর ছিল। রাজা যেমন চিত্রের আদর করিতেন, শিল্প ভালবাসিতেন, তেমনি পৃথিবীর কোন দেশে কোনও শিল্পীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি শুনিলে, তাঁহাকেও অর্থের দ্বারাই হউক বা অন্য কোনরূপ সম্মান বা প্রতিপত্তির লোভ দেখাইয়াই হউক, ইংলণ্ডে লইয়া আসিতেন। রাজার ন্যায়—দেশের বড় লোকেরাও শিল্পীগণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন।

টমাস্ নামে একজন বড় জমিদার অত্যন্ত চিত্রানুরাগী ছিলেন। তাহার নিযুক্ত লোকেরা কোন্ দেশে কে বেশ বড় নামজাদা শিল্পী আছেন—নানা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সংবাদটা তাঁহাকে জানাইতেন। বেলজিয়াম হইতে তাঁহার একজন অনুচর পত্র লিখিল—"এখানে ভেন্‌ডিক্‌ নামে একজন তরুণ শিল্পী আছে। বেশ নাম করিয়াছে। তার গুরু রুবেন্‌সের চেয়ে সে কম প্রতিভাশালী একথা আমার মনে হয় না। তবে ভেন্‌ডিকের অবস্থা বেশ ভাল,সে যেদেশ ছাড়িয়া আসিবে তা মনে হয়না।

অসম্ভব কিন্তু সম্ভব হইয়া গেল। সেবৎসর রুবেনস্ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন,ইংরেজেরা তাঁহার যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছে, এ সংবাদ শুনিয়া তরুণ-শিল্পী ভেন্‌ডিকের মনেও ইংলণ্ড যাইবার বাসনা বলবতী হইল। ভেন্‌ডিক ইংলণ্ডে আসিলেন। প্রথম জেমস্ তখন ইংলণ্ডের রাজা। তিনি ভেন্‌ডিকের বেতন ধার্য্য করিলেন—বৎসরে একশত পাউণ্ড। ভেন্‌ডিকের এদেশে মন টিঁকিল না, তিনমাস পরে আট মাসের ছুটি লইয়া দেশে চলিয়া গেলেন। আট মাস কাটিয়া গেল শিল্পী আর ফিরিলেন না। ভেন্‌ডিক—এই সুযোগে ইতালি চলিয়া গেলেন। ইতালী যাইবার পূর্ব্বে গুরু রুবেন্সকে একখানা চিত্র উপহার দিয়া গেলেন।

ইতালি যাইবার পথে বেল্‌জিয়ানের বহু নগরের মধ্য দিয়া গেলেন। যে নগরে যে সকল চিত্রশালা ছিল—যেখানে যিনি বিখ্যাত শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহাদের সকলের সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন। এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে ইতালি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই— তাঁহার টাকার অনটন হইল, সেই অভাব পূরণের জন্য তাঁহার—মানুষের প্রতিমূর্ত্তি আঁকিতে হইয়াছিল।

ইতালিতে কি ভাবে তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল, সেখানে তিনি কি করিয়াছিলেন, সে সব কথার বিস্তারিত পরিচয়ের কোনও প্রয়োজন নাই। সাত বৎসরকাল নানাদেশে ঘুরিয়া তিনি আবার ইংলণ্ডে আসিলেন! এ সময়ে চার্লস্‌ষ্টুয়ার্ট ইংলণ্ডের রাজা—তিনি ভেন্‌ডিককে একেবারেই আমল দিলেন না! অভিমানী শিল্পীর মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তিনি আবার দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন কেমন খেয়াল হইল, ভেন্‌ডিক্ ঘোড়ায় চড়িয়া—ফ্রাঞ্জ হালস্ নামক বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র-শালায় যাইয়া তাহাকে বলিলেন—"মহাশয়! আমার প্রতিমূর্ত্তি আঁকিয়া দিন।" হাল্‌স—দুই ঘণ্টার মধ্যেই ভেন্‌ডিকের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিলেন। হাল্‌স্ কিন্তু আগন্তুক কে তাহা জানিতেন না।

ভেন্‌ডিক বলিয়া উঠিলেন—"প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা দেখিতেছি বড় সহজ, আমায় একবার রঙ ও তুলিটা দিন্ ত, আমি চেষ্টা করিয়া দেখি।"

দুই ঘণ্টা সময়ও লাগিল না। ভেন্‌ডিক হাল্‌সের ছবি আঁকিয়া ফেলিলেন। কি স্বাভাবিক! কি সুন্দর রঙের বাহাদুরী একেবারে যেন জীবন্ত ছবি। এইবার দুইজনের পরিচয় হইয়া গেল। দুইজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল।

ভেন্‌ডিক—প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে যাইয়া হাত আঁকিতে খুব মনোযোগ দিতেন। তাঁহার আঁকা প্রত্যেক ছবিতেই এই বিশিষ্টতা দেখিতে পাইবে। সমালোচকেরাও বলেন যে তাহার ন্যায় হাত আঁকিতে কেহ পারিতেন না। একবার ভেন্‌ডিক্ একজন সুন্দরী স্ত্রীলোকের ছবি আঁকিতেছেন। রমণী বলিলেন—"আমার মুখের চাইতেও দেখিতেছি আপনি আমার হাত আঁকিতে বেশী সময় দিতেছেন, কেন বলুন ত?" ভেন্‌ডিক্ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি যে হাত দিয়ে আমাকে বেশ একটা বড় রকমের পুরস্কার দিবেন, সে জন্য হাত দু'খানা খুব যত্ন করিয়া আঁকিতেছি।"

ভেন্‌ডিক—সাধারণতঃ খুব তাড়াতাড়ি কাজ করিতেন না, বেশ ধীরে আস্তে কাজ করিয়া যাইতেন। কাহারও ছবি আঁকিতে হইলে তাহাকে ন্যূন পক্ষেও চৌদ্দ পনের বার বসাইতেন। তাঁহার আঁকা নিকোলাস্ লাইনার্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের চিত্রের কথাটা---রাজা চার্লসের কাণে পৌঁছিল। চার্লস পণ করিলেন যত টাকাই লাগুক না কেন এই শিল্পীকে ইংলণ্ডে আনিতেই হইবে। চার্লস পণ রক্ষা করিলেন। ১৬৩২খৃঃ অঃ তৃতীয়বার ভেন্‌ডিক ইংলণ্ডে আসিলেন।

চার্লস চিত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সভায় অনেক শিল্পী ছিলেন। তাঁহার কাছে ভেন্‌ডিককেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইল। চার্লস তাঁহাকে রাজ-চিত্রকর নিযুক্ত করিলেন—দু'খানা বাড়ী দিলেন এবং উপযুক্ত বিত্তের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভেন্‌ডিক এদেশেই বিবাহ করিলেন।

তাঁহার নাম ও যশের ধারা যখন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সে সময়ে তিনি একে একে রাজা, রাণী, এবং রাজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের অনেকগুলি ছবি আঁকিলেন।

দেশদ্রোহী রাজা চার্লসের চিত্র—এক নূতন ভাবে তাঁহার শিল্পী-বন্ধুর তুলির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। রাজার কাজ করিয়াই যে তাঁহার সময় যাইত তাহা নহে---কত লোক যে তাঁহার দ্বারা চিত্র অঙ্কিত করাইয়া লইয়াছে,তাহার সংখ্যা করা যায়না।

রাজ প্রাসাদের ভোজনাগারটি চিত্রিত করিবার জন্য রাজা ভেন্‌ডিকের উপর ভার দিলেন। ভেন্‌ডিক এই কাজটির জন্য আট লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক চাহিলেন। কিন্তু টাকা কোথায় ? টাকাও সংগ্রহ হইল না—কাজও হইল না।

এদিকে চার্লসের অত্যাচারে ও অবিচারে দেশের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। দেশের স্বাধীনতা, রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, রাজশক্তি অস্তমিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ভেন্‌ডিকের আশা ভরসাও বিলুপ্ত হইল।

ভেন্‌ডিকের এদেশে অর্থাভাবে সময় সময় ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। রাজকোষে টাকা নাই সময় মত বেতন পাইতেন না, অথচ খাওয়া দাওয়া বিলাস সবই চলিত ! গায়ক ও বাদ্যকরদিগকে তিনি বেতন দিয়া রাখিতেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার সমুদয় আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল। এসময়ে কোথায় অভাব ঘুচাইবার জন্য একটু বেশী পরিশ্রম করিয়া চিত্রের দর বাড়াইয়া দিবেন, তাহা না করিয়া কি উপায়ে সোণা তৈয়ারী করা যাইতে পারে সে খেয়ালে মাতিয়া রহিলেন। মানুষ অভাবে পড়িলে কত রকম দুর্ব্বলতাই না আসে।

রাজা চার্লসের সহিত তাঁহার সত্য সত্যই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হইয়াছিল। বিদ্রোহী প্রজার আক্রমণের ভয় তুচ্ছ করিয়াও চার্লস নৌকায় চড়িয়া বন্ধু ভেন্‌ডিকের চিত্রশালায় আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। চার্লসের শত দোষের মধ্যেও এইরূপ অকৃত্রিম শিল্পানুরাগ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

চার্লসের •শোচনীয় মৃত্যুর আট বৎসর পর ১৬৪১খৃঃ অঃ ভেন্‌ডিকের মৃত্যু হইল। গেইনসবোরোর ভবিষ্যদ্বাণী বোধ হয় সফল হইয়াছে স্বর্গে তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন। ভেন্‌ডিকের-অগণিত চিত্র পৃথিবীতে নানাস্থানে এখনও বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ভেন্‌ডিক মানুষটি চলিয়া গিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার নাম কি কেহ ভুলিয়াছে ?

---

# দুই বন্ধু।

ভেন্‌ডিক ছিলেন একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রকর। তাঁহার অদ্ভুত এই চিত্রে—সরল শিশুর প্রিয়তম বন্ধু—দুইটি কুকুরের ছবি। শিশু—তাহার বন্ধু দুইটাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে! শিশুর মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে—সে যেন তাহার বন্ধু দুইটাকে কি বলিতেছিল, তাহারাও বন্ধুর কথা বুঝিয়া—ঊর্দ্ধমুখে তাহার দিকে চাহিয়া নীরব দৃষ্টিতে কত কি কহিতেছে! ছবিটির মধ্যে একটি ভাব বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি দেখিলেই মনে হয় শিশুটি জানে কুকুর দুইটির যে শুধু সঙ্গীই নয়, প্রভুও বটে, কুকুরেরাও যে সে সংবাদটা ভালরকমই জানে তাহা তাহাদের নাক, চোখ, মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

————

# ভেন্‌ডিক্

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ভেন্‌ডিকের প্রতিমূর্ত্তি শিল্পীর মুখে চোখে প্রতিভায় উজ্জ্বল দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুখখানি যেন সরলতামাখা, চোখ দুটিতে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিহিত রহিয়াছে। কি সুন্দর মুখ, কি সুন্দর আঁকা হাত। কি সুন্দর কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুলগুলি। চিত্রটি দেখিলেই মনে হয় চিত্রকর আমাদের সম্মুখে জলজ্যান্ত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এইখানেই চিত্রকরের তুলির সার্থকতা। ইংলণ্ডের রাজা চার্লসের ইনি বেতনভোগী চিত্রকর ছিলেন। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে ইঁহার নিপুণতা ছিল - অসাধারণ।

---

# লিওনার্ডো ডি ভিন্সী

পৃথিবীতে এমন এক একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন যাঁহাদের শক্তি ও ক্ষমতা, যাঁহাদের দৃষ্টি, আশা ও আকাঙ্ক্ষা শুধু একদিকেই বদ্ধ থাকে না, সমস্ত জগত জুড়িয়া যাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র, জ্ঞানভাণ্ডারের সকল বিভাগে যাঁহাদের অপ্রতিহত আধিপত্য; এমনই একজন ক্ষণজন্মা পুরুষসিংহের কথা তোমাদের আজ বলিতেছি। কম বেশী চারিশত বৎসর হইল লিউনার্ডো ডি ভিন্সী ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন, ইত্যবসরে দুর্জ্জয় কালের গহ্বরে তাঁহার যাহা কিছু কৃত কার্য্য সব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কার্য্য না থাকিলেও তাঁহার স্মৃতি আছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, ইঞ্জিনীয়ার, দার্শনিক, কবি, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও কার্য্য দেখিয়া জগত স্তম্ভিত হইয়াছিল, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, গৌরব করিবার মত তাহার কোন বস্তুই আজ আমাদের নাই—সকলই কালের গহ্বরে লুপ্ত হইয়াছে। নাই থাকুক, তথাপি তাঁহার স্মৃতি আছে, সেই অসামান্য প্রতিভাবান পুরুষের কার্য্যাবলির যে ইতিহাস তাহা ত লোপ পাইবার নহে, তাঁহার শক্তির তাঁহার মেধার পরিচয় এক কথায় দিতে হইলে বলিতে হয়—"অদ্ভুত!"

চিত্র প্রেমিক রাস্কিন (Ruskin) দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, কলকারখানা লইয়াই লিউনার্ডো জীবনটা কাটাইয়াছেন, তাই তার রচিত ছবি একখানাও আজ আমাদের নাই। ইঞ্জিনিয়াররা দুঃখ করেন, এত বড় প্রতিভা কিনা শুধু ছবি আকিয়া সময় নষ্ট করিয়াছে, ততক্ষণ যন্ত্রপাতি কলকারখানার কত উন্নতিই না তিনি করিতে পারিতেন। ভাস্কর যিনি, তিনি দুঃখ করেন, লিউনার্ডো কেন পাথর ও

পিতলের উপর খোদাই করিয়াই না সমস্ত জীবনটা কাটাইলেন। বৈজ্ঞানিক, সঙ্গীত বিশারদ সবারই হিংসা হয় লিওনার্ডো কেন একা তাঁহাদেরই রহিলেন না। এমনিই ছিল তাঁহার অসামান্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা! যে চারুশিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে তাহার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ অদ্ভুত---অপূর্ব্ব, এমনটি আর পৃথিবীতে বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

১৪৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে নাকি নবযুগ আরম্ভ হয়—ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন। মধ্যযুগের আচার, পদ্ধতি, রীতি, নীতির পরিবর্ত্তন, কলকারখানা প্রভৃতি নানারূপ আবিষ্কারের প্রবর্ত্তন এই সময় হইতেই হয়। এই সন্ধিক্ষণেই লিওনার্ডোর জন্ম হইয়াছিল। লিওনার্ডো হইয়াছিলেন নবযুগের অগ্রদূত।

অতি শৈশবেই তাহার অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠশালায় তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীরা ত তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া অবাক্। যখন তাহারা খেলাধূলায় ব্যস্ত, তখন সেই অবসরে, তিনি গণিত ও সঙ্গীত বিদ্যাটা আয়ত্ব করিয়া ফেলিলেন।

১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা তাঁহাকে এণ্ড্রিয়ে ভেরোসিয়োর ( Andrea verrocchio ) চিত্র-শিল্পাগারে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। এখানে কিছুদিনের মধ্যেই শিষ্য গুরুকে ছাপাইয়া উঠিলেন। ভেরোসিয়োরও বুঝিতে বাকি রহিল না, কতবড় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকেই না তিনি শিষ্যরূপে পাইয়াছেন। অতঃপর আর গুরুশিষ্যের ভেদ ছিল না, গুরুশিষ্য উভয়ে মিলিয়া একই ছবি আঁকিতেন! এমনই একখানি ছবি আজও আছে। লিওনার্ডের আঁকার এমনি বিশেষত্ব যে বিশেষজ্ঞরা সে ছবি দেখিলেই বলিয়া দিতে পারেন কোন অংশ লিওনার্ডোর আঁকা, কোন অংশইবা তাঁহার গুরুর আঁকা।

তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে কুড়ি বৎসর বয়সে লিওনার্ডো গুরুর ধরা বাঁধা

শিক্ষার হাত এড়াইয়া ফ্লোরেন্স নগরের একজন স্বাধীন শিল্পীরূপে পরিচিত হইলেন। এবয়সে তাঁহার আঁকা ছবি, মূর্ত্তি, পরিকল্পনা বড় বড় শিল্পীদিগকেও অবাক্ করিয়া দিয়াছিল। নিপুণ ভাস্কর, প্রতিভাশালী চিত্রকররূপে তখনই সর্ব্বত্র তাঁহার আদর হইয়াছিল।

লিওনার্ডো কেবল কি শিল্পী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী। বিজ্ঞানের নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়াও তিনি ধন্য হইয়াছিলেন। বাস্তু শিল্পে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। বাঁশী বাজাইতে গান গাহিতে ও রচনা করিতেও তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। একদিকে কবিতা ও কল্পনাচিত্র ও ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত ও বাদ্য—আবার অন্যদিকে দেখ—যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, লড়াই, ও দুর্গ রক্ষার নিপুণতায়ও লিওনার্ডের তুলনা মিলে না!

চিত্রকরদের মধ্যে—কেহই লিওনার্ডের পূর্ব্বে, মানুষের মানসিক প্রবৃত্তিগুলির অভিব্যক্তি চিত্রে ফুটাইতে পারেন নাই। পাপ ও পুণ্যের চিত্র, পাপী ও সাধু ব্যক্তির মানস চিত্র মুখে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তি ছিল তাঁহার অসাধারণ। তাঁহার চিত্র ও মূর্ত্তিগুলির ইহাই একটা বিশেষত্ব। এজন্য তিনি—স্বভাবের ভিতর হইতেই আদর্শ খুঁজিয়া লইতেন।

একবার একটা মঠের একজন পুরোহিত তাঁহাকে মঠের কাজ করিবার ভার দেন। মঠের গায়ে চিত্র আঁকিবার ও মূর্ত্তি গড়িবার ভার পড়িল। দিনের পর দিন যাইতে লাগিল—কাজ শেষ হয় না। পুরোহিত মহাশয় ত রাগিয়া অস্থির। তিনি একদিন লিওনার্ডোকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি এভাবে কতকালে আমার কাজ শেষ করিবে?"

"কেন মহাশয়! আমি ত রোজ দু'ঘণ্টা করিয়া কাজ করি।"

"তবেই হইয়াছে আর কি, একশো বছরেও কাজ শেষ হবে না দেখিতেছি।"

লিওনার্ডো হাসিয়া বলিলেন—'কাজ প্রায় শেষ হয়েছে, কেবল দু'টো মূর্ত্তির মাথা আঁকা বাকী রহিয়াছে।'

'বটে! মাথা আঁকতে এতদিন লাগে?'

"জুদা আর ইস্কারিওতের মাথাটা হয় নি, দেখুন আমি আজ ক'মাস ধরে ক্রমাগত দুষ্ট, চোর, বদমায়েসদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াও মনের মত আদর্শ পাইতেছি না। কিন্তু আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার মনে হয় আপনার মুখের আদর্শে যদি মূর্ত্তি দু'টোর মুখ শেষ করে ফেলি, তা হলেই ঠিক্ হবে।" পুরোহিত মহাশয়ের ত চক্ষু স্থির। তিনি আর একটী কথাও বলিলেন না!

লিওনার্ডো কথায় ও কাজে এক ছিলেন। তিনি ঐ মঠের পুরোহিতের মুখের আদর্শেই মূর্ত্তি দু'টির মুখ আঁকিয়া ফেলিলেন। চিত্রের সমজ্দার বড় বড় শিল্পী-গণ বলেন যে লিওনার্ডের আঁকা ছবির মধ্যে এ দু'টার তুলনা মেলা ভার।

মাইকেল এঞ্জেলো—লিওনার্ডের অপেক্ষা বয়সে বিশ বৎসরের ছোট ছিলেন। লিওনার্ডের এঞ্জেলোর প্রতি একটা বিদ্বেষ ছিল। অনেকবার দু'জনের মধ্যে প্রতিযোগিতাও চলিয়াছে। মাইকেল এঞ্জেলোর খোদিত ডেভিডেরমূর্ত্তি জগদ্বিখ্যাত। যে পাথরে এই বিরাট মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, সে বিরাট মর্ম্মর প্রস্তর খণ্ড বহুকাল অমনি পড়িয়াছিল। অনেক ভাস্কর পাথরখানাকে খুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কেহই সফলকাম হন নাই। ঐ পাথরখানা অযত্নে একশো বছর পড়িয়াছিল। দেশের শাসন কর্ত্তা লিওনার্ডো ও এঞ্জেলো এই দু'জনকেই পাথরখানার দ্বারা একটী মূর্ত্তি গড়িতে অনুরোধ করিলেন। লিওনার্ডো বলিলেন—"এ পাথর দিয়ে কাজ চলিবে না, পাথরখানাকে নানাভাবে খোদাই করে দফা সেরে ফেলেছে, আমি এ পাথর কেটে মূর্ত্তি গড়তে পারবো না।"

তরুণ শিল্পী এঞ্জেলো পরম উৎসাহের সহিত কাজের ভার লইয়া ডেভিডের

অমর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। এখানে এঞ্জেলোর কাছে লিওনার্ডোকে হার মানিতে হইল।

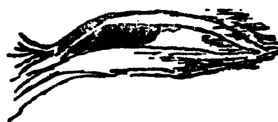
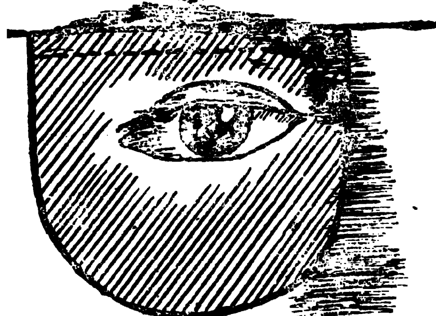
লিওনার্ডো এই তরুণ শিল্পীর উপর ভয়ানক চটিয়া গেলেন। আর একটী প্রতি-যোগিতার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্লোরেন্সের ম্যাজিষ্ট্রেট সহরের সভা গৃহটি চিত্র ও মূর্ত্তিদ্বারা শোভন সজ্জায় সজ্জিত করিবার জন্য—এঞ্জেলো এবং লিও-নার্ডো দু'জনকেই আহ্বান করিলেন। পিসার যুদ্ধ—আঁকিবার বিষয় স্থির হইল। কক্ষটির অর্দ্ধেক আঁকিবার ভার পাইলেন লিওনার্ডো আর বাকী অর্দ্ধেকের ভার পড়িল এঞ্জেলোর উপর। লিওনার্ডো বুঝিলেন—এঞ্জেলো ডেভিডের মূর্ত্তি খোদিত করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিয়াছে বটে, এইবার সে পরাজয়ের শোধ লইতে হইবে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিলেও বুঝি দুই পক্ষ এমন সতর্ক হইয়া লড়াই করেন না। লিওনার্ডোর চিন্তা হইল—যেমন করিয়া পারি এঞ্জেলোকে হারাইতে হইবে, এঞ্জেলো ভাবিলেন বুড়োকে এবারও হারাইয়া দিতে হইবে।"

দুইজনে দুইটী বিষয় লইয়া আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। এঞ্জেলো মানুষের দেহের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুস্পষ্ট ও নিঁখুতভাবে আঁকিবার জন্য---জলের মধ্যে সৈন্যগণের উলঙ্গমূর্ত্তি আঁকিলেন। লিওনার্ডো—আঁকিলেন—ফ্লোরেন্সের বীর সৈনিকেরা অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুসৈন্য হটাইয়া দিতেছে। লিওনার্ডোর অঙ্কিত সৈনিকের মুখে যে সাহস, দৃঢ়তা ও নির্ভীকভাবটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা অতুলনীয়। দুই বৎসরকাল লিউনার্ডো বেশ পরিশ্রমের সহিত ছবি আঁকিলেন, কিন্তু পরে তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, বুঝিলেন তিনি যে চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি অব-লম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকা চলিতে পারে না, কাজেই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হইল—এঞ্জেলো তাঁহার কাজ শেষ করিলেন।

লিওনার্ডোর অঙ্কিত চিত্র মধ্যে জগদ্বিখ্যাত চিত্র হইতেছে 'মোনা লিসা।'


হ'লে

রাগ হ'লে

দুঃখ হ'লে

আনন্দ হ'লে

চোখের অসুখ
হ'লে কিন্তু :
নেত্রামৃত
এক শিশি
এক টাকা


সি কে সেন
এণ্ড কোং
লিমিটেড্
তারের ঠিকানা :
টেলিফোন নং :
২৭১৫ কলি :
২৯ নং, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফ্লোরেন্সের---'ফ্রেঙ্কেস্কো গিডকোস্ত্রোর তৃতীয় স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তি। এ চিত্র পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব চিত্র—সর্ব্বজন প্রশংসিত ও সর্ব্বজন সমাদৃত। এই ছবি দেখিবার জন্য লক্ষলক্ষ ব্যক্তি শতশত বর্ষকাল ক্রমাগত ফরাসীর রাজধানী প্যারিনগরে আসিয়াছিলেন। চিত্রকর মোনালিসার এ ছবিখানা আঁকিতে চারি বৎসরকাল অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাজ করিয়াছিলেন। যে হাসিটুকু চিত্রিত ছবির মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য—মোনালিসার মনে যাহাতে কোনরূপ অপ্রফুল্লভাব না আসে সে জন্য একজন লোক অনবরত বাঁশী বাজাইতেন কিংবা গান করিতেন। এইরূপ ধৈর্য্য ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত লিওনার্ডা এই ছবি আঁকিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত এই ছবিখানা পৃথিবীর সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। যুগে যুগে বংশপরম্পরাগতভাবে এই ছবি দেখিয়া জগৎবাসী শিল্পীর অপূর্ব্ব নিপুণতার বিজয় সঙ্গীত গাহিতেছে।

ফরাসীদেশের রাজার নিমন্ত্রণে লিওনার্ডা সেখানে একটী অট্টালিকার চিত্র আঁকিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! আর তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল না—১৫১৯ খৃঃ অঃ ২রা মে তারিখে সেখানেই বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীর মৃত্যু হইল।

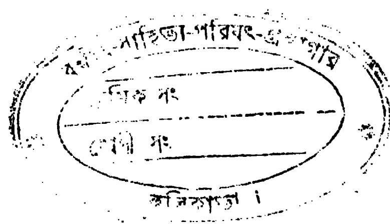
লিওনার্ডা একাধারে সব ছিলেন। কবি, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ, বাস্তুকলাবিদ্, কারিগর এবং সাহিত্য রসিক। শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার আদর্শ লইয়া এখনও গ্রন্থ রচিত হইতেছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিত্রের আদর্শের মূলে যে তাঁহার অমর প্রতিভা এখনও নদীর স্রোতধারার ন্যায় চারি শতাব্দীর মধ্যে সমভাবে প্রবহমানা—তাহা কাহারও সাধ্য নাই যে অস্বীকার করিতে পারে!

---

# লিওনার্ডো।

লিওনার্ডো ডি ভিন্সি ছিলেন একজন বিখ্যাত শিল্পী। ছবি আঁকিতে, মূর্ত্তি গড়িতে সব বিষয়েই ছিল তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। লিউনার্ডোর চেহারার ভিতর হইতে একটা প্রতিভার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার চোখে কেমন দীপ্তি, উন্নতনাসা, ও ললাটের কুঞ্চিত রেখার ভিতর—দৃঢ়তার ও ধৈর্য্যের ছবি কেমন প্রস্ফুট রহিয়াছে। একদিকে যেমন—কলালক্ষ্মীর দিকে তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগের চিহ্ন তাহার প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিফলিত হইয়াছে, তেমনি আবার একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—তাঁহার চরিত্রের ভিতর চঞ্চলতাও বিদ্যমান ছিল।

— — —



## লিওনার্ডার অঙ্কিত যীশুর মূর্ত্তি।

লিওনার্ডার অঙ্কিত যীশুর এই প্রতিমূর্ত্তিখানি অতুলনীয়। পাঁচ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে তবু যীশুর এই প্রতিমূর্ত্তিখানি বিশ্ববাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও সেবার ভাব জাগাইয়া দিতেছে। ইতালীর অন্তঃর্গত মিলান নগরের ব্রেরা প্রাসাদে এইখানি রক্ষিত আছে। যীশুর অযত্ন বিন্যস্ত দীর্ঘ কেশ স্কন্ধে ও বাহুতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রশান্ত ললাট, উন্নত নাসা ও ঠোঁট দু'খানির মাঝখানে বিমল হাসির রেখা আধ ফোঁটা ফুলের মত অর্দ্ধ বিকশিত। সংসারের দুঃখ দৈন্য, হাহাকার ও পাপীর মর্ম্মভেদী যাতনা দূর করিবার জন্য ত্যাগের এক মহান্ আদর্শ— বিদ্যমান। ধৈর্য্য, সেবা, দয়া, দাক্ষিণ্য প্রভৃতি প্রত্যেকটি সদ্‌গুণরাজি জীবন্তভাবে যীশুর এই মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত। এ মূর্ত্তি এ মুখ পৃথিবীর নহে—স্বর্গের।

———

# যোদ্ধার প্রতিকৃতি।

এই চিত্রখানাও লিওনার্ডোর অঙ্কিত। যোদ্ধার জীবন বৈচিত্র্যময়। যোদ্ধার জীবনে—ধৈর্য্য, সাহসিকতা, আশা ও নিরাশার বিচিত্র দোলাদুলি, বিজয়ের গৌরবানন্দ—মৃত্যুর যন্ত্রণাকাতর আহত সৈনিকের করুণ আর্ত্তনাদে নির্ভীকভাবে—অশ্বপৃষ্ঠে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুকে আক্রমণের জন্য ব্যাকুলভাবে অগ্রসর হওয়া—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। লিওনার্ডোর চিত্রিত এই মুখখানির ভিতরে—যোদ্ধৃ জীবনের বৈচিত্র্য ভাবগুলি পরিস্ফুট--ঐই মুখখানি, ঐই চক্ষু হইতে যেন যোদ্ধার বাণী যির্গত হইতেছে—

"আগে চল্ আগে চল ভাই।
পড়ে থাকা পিছে—মরে থাকা মিছে
—আগে চল্, আগে চল্ ভাই।"

———



# মোনালিসা।

লিওনার্ডোর আকা চিত্রগুলির মধ্যে—মোনালিসার চিত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মোনালিসা—নাম্নী একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতিমূর্ত্তি। চারি বৎসর অসাধারণ পরিশ্রম ও ধৈর্য্য সহকারে তিনি এই ছবিটি আকিয়াছিলেন। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত চিত্রিত মুখের ঐ ভুবন ভুলান হাসিটুকু দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোকেরা তীর্থযাত্রীর ন্যায় আসিত। কত কবি, চিত্রকর, ও নাট্যকার তাহাদের রচিত কবিতার, চিত্রে ও নাটকে ইহার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই চিত্রখানি চারবার অপহৃত হইয়াছিল—চিত্রিত মুখের নয়নের অই শান্ত দৃষ্টি, অই মধুর ভুবন ভুলান হাসিটুকু—কতজনকে কারাগারের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়াও অপহরণ করিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

———.…

# বিকালের বাদ্‌লা

অন্যায়, বিকালেতে, নামিল এ বাদ্‌লা ;
এখন কি ঘর মাঝে, যায় থাকা একলা ?
জানিনা বিধাতার, কিবা এই ফন্দী,—
ঘরে ঘরে ছেলেদের, করে রেখে বন্দী।
দোসর নেই কেউ, লাগে একা মন্দ,
ছুটোছুটি, আজকে, একেবারে বন্ধ !
কড়কড় বাজ ডাকে, চমকায় বিদ্যুৎ ;
বিকালেতে বৃষ্টি, সকলি অদ্ভুত।
খেলা ধূলা বন্ধ, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি,
মেঘলা থম্ থম, এক অনাসৃষ্টি !

( ২ )

মেঘলা বড় আজ, ঘোর ঘটা আকাশে,
বৃষ্টির কণা ছোটে, জোর বহা বাতাসে।
বটগাছ কাঁদছে, আমাদের দুঃখে গো,
খেলিবে কে, তার তলে, আজ হাসি মুখে গো।
ঝড় জোর বইছে, বৃষ্টির সঙ্গে ;—
পথেতে কে চলে ওই, নেই বাস অঙ্গে !
বর্ষাটা বিশ্রী,—শুধু জল ঝরবে,
রাস্তা,—ঘাট সব,—শুধু জলে ভরবে !
খেলা ধূলা বন্ধ,—ঝম ঝম বৃষ্টি,
মেঘলা থম্ থম্—একি অনাসৃষ্টি,

( ৩ )

ছেলেদের খেলবার, হয় নাকো জটলা,
ঘরে বসে দুখে কাঁদে, রাম শ্যাম পটলা।
একলাটি হবে হায়! ঘর মাঝে থাক্‌তে,
বৃষ্টি কেউ থাময়ে, পারে নাকি রাখতে?
ইস্কুল যেতে দেখ, আকাশটা ফর্সা,—
সে সময় একদিনো, নামে না ত বর্ষা!
অসময়, বিকালেতে, বাদ্‌লা এ মাৎলো,
খেলা নেই, দুখ ভার, হৃদয়েতে নাম্‌লো।
খেলা ধুলা বন্ধ ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি,
মেঘলা থম্‌থম্‌, একি অনাসৃষ্টি!

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়।

——:——

শীতকাল। এক ভদ্রলোক বড় নিদ্রালু। উঠতে তাঁর রোজই বেলা হয়। একদিন তিনি তাঁর চাকরকে ডেকে বলে দিলেন—"ওরে কাল আমায় খুব সকাল সকাল উঠিয়ে দিস—বিশেষ কাজ আছে।"

সুধু ডেকে দিলে তাঁর ঘুম ভাঙলেও তিনি ত বিছানা ছাড়িবেন না—কাজেই তাঁকে ঠেলে তোলাতে হবে—কি উপায় করা যায়—ছোকরা ভাবনায় পড়িল।

পরদিন প্রত্যুষেই দরজায় ঘন ঘন করধ্বনি শুনিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তীব্রকণ্ঠে তিনি হাঁকিলেন—"কি চাই?"

"আজ্ঞে, আপনার নামে এক জরুরী তার এসেছে।"

তার? এসময়ে! তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলিতেই সেই ছোকরা তাঁর হাতে এক মোড়ক দিল। দিয়াই সেস্থান থেকে চম্পট।

ভদ্রলোক মোড়ক খুলিতেই এক টুকরা কাগজ পেলেন—তাতে লেখা রয়েছে—"মশাই, উঠবার সময় হয়েছে!"

----

# গালিলিওর প্রস্তরমূর্ত্তি

গালিলিওর নাম কে না জানে? কালের কি বিচিত্র গতি! যে গালিলিও জীবদ্দশায় সঙ্কীর্ণমনা খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকদের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ও সহ্য করিয়াছেন, এমন কি রাজদণ্ডে অবধি দণ্ডিত হইয়াছিলেন, আজ সেই গালিলিওর সম্মানে, একজন খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজকের চেষ্টায়, জন্মস্থান পাইসা নগরীতেই, ইঁহার এক প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। এই ধর্ম্মযাজক মহোদয়ের নাম Cardinal Maffi ইনি নিজেও একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত। ষোড়শ শতাব্দীতে গালিলিও নিজের মতবাদের জন্য বিগ্রহভোগ করিতেছিলেন, এই প্রস্তরমূর্ত্তি তাহার আংশিক ক্ষতিপূরণস্বরূপ হইবে।

গালিলিও ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী দেশের পাইসা নগরকে চিরঅমর করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাশেষ করিয়া পঁচিশ বর্ষ বয়সে ইনি পাইসা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হন। গণিত ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

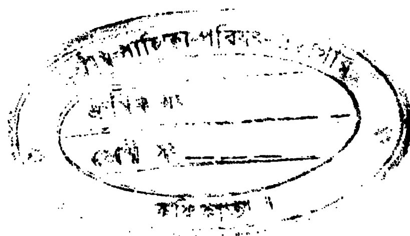


রাধিকার রাখালবেশ ।

কুড়ি বৎসর বয়সে পাইসাতে কাথিড্রাল গির্জ্জায় একটি দীপাধারকে দুলিতে দেখিয়া, ইনি পেণ্ডুলাম বা পরিগোলকের সমগতিত্ব আবিষ্কার করেন। ইনিই দুরবীক্ষণযন্ত্র উদ্ভাবন করেন—যাহা হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অসীম উপকার হইয়াছে। পাশ্চাত্যজগতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন ও কোপার্ণিকাসের মত যে সূর্য্যই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র তাহা উৎসাহের সহিত প্রচার করেন।

গালিলিওর সময়কার পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে একটা একমণি জিনিষের চেয়ে একটা দশমণি জিনিষ দশগুণ আগে মাটিতে পড়ে। কিন্তু গালিলিও পাইসার বিখাত তির্য্যক স্তম্ভের উপর উঠিয়া একটা দশমণি ও একটা একশমণি লৌহ-গোলককে একসঙ্গে ফেলিয়া দিয়া তাঁহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে না দুটোই একসঙ্গে ভূচুম্বন করে। ধর্ম্মধ্বজী পণ্ডিতরা তখন তাঁহার উপর খড়গহস্ত হইয়া উঠিলেন। সূর্য্য কেন্দ্র, পৃথিবী—ও অন্যান্য গ্রহ তাহার চারিদিকে ঘুরিতেছে—এ মত প্রচার করাতে সেই সকল ধর্ম্মযাজক প্রভুরা ক্ষেপিয়া উঠিলেন—গালিলিওর মত বাইবেল—বিরুদ্ধ ও গালিলিও ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। কারাবাসেই ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। এক ঐ সালেই আইজাক নিউটন নামে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্ব্বিৎ জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীধানি লঙ্কা।



# টুকিটাকি।

ভাষার বৈচিত্র।—পৃথিবীতে ভাষা আছে যে কত রকম তা গুণে শেষ করা যায় না। আবার প্রত্যেক ভাষার কত খুঁটিনাটি নিয়ম। ইংরাজী ভাষায় ত ২৬টি অক্ষর আছে। ফরাসী ভাষায় অক্ষরের সংখ্যা কিন্তু ২৫টি। ঐরকম বল্‌টিক ভাষায় ১৭টী, ইটালীয় ভাষায় ২০টী, লাটিম ও হিব্রু ভাষায় ২৪টী. স্পেন্ দেশী ভাষায় ২৭টী, তুরস্ক ও আরব দেশী ভাষায় ২৮টী, পারশ্যদেশী ভাষায় ৩১টী, রুষীয় ভাষায় ৩৬টী ও সংস্কৃত ভাষায় ৪৪টী অক্ষর আছে। সব চেয়ে বেশী অক্ষর আছে চীনদেশী ভাষায়। তাদের সংখ্যা ২১৪টী!

---

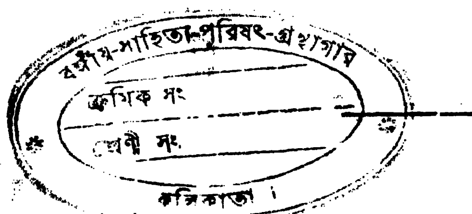
সঠিক জবাব।—আচ্ছা তিনটী অক্ষর নাও A, B, C. এদের উল্‌টে পাল্‌টে রেখে কত রকমে সাজাতে পার বল দেখি? এর উত্তর খুবই সহজ, কারণ ছ রকমের বেশী এদের সাজান যায় না। যথা— A, B, C, A, C, B. B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B. A. এখন বল দেখি ২৪টী অক্ষর নিয়ে তাদের কত রকমে সাজান যেতে পারে? এর উত্তর যেমন সহজ বলে মনে হচ্ছে, আসলে কিন্তু তেমন নয়। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মূলর্ এই প্রশ্নের সঠিক জবাব দিয়াছেন। তাঁর মতে ২৪টী অক্ষর নিয়ে ৬২০৪৪৮৪০১৭৩৩২৩৯৪৩৯৩৬০০০০ বিভিন্ন প্রকারে সাজান যেতে পারে! এ-ত আমাদের ধারণাতেই আস্‌বে না। তবে একটি উপায় করলে একটু আধটু বোঝা যেতে পারে। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের

লোকেরা যদি দিনে ৪০ পাতা করে ঐ সাজান অক্ষর লিখ্তে আরম্ভ করে,তা হলে একশো কোটী বৎসরেও তাদের লেখা শেষ হবে না।

---

স্থিতি বোধ।— ইংরাজীতে যাকে Sense of balance বলে, আকাশে উঠ্লে সেটা ভাল করে অনুভূত হয় না। তাই এরোপ্লেন যখন উড়তে উড়তে একপেশে বা কাৎ হয়ে পড়ে, বিমান চালকেরা তা জানতেই পারে না। কিন্তু এরোপ্লেন যে কোন দিকে চলেছে, তা তারা ঠিক বুঝ্তে পারে। বিমান চালাকেরা প্রায়ই তাদের সঙ্গে এক রকমের যন্ত্র রেখে দেয়; সে দেখে তারা বুঝতে পারে কিরূপ ভাবে বিমান চলেছে। নীচের মাটি দেখেও তারা কতকটা আন্দাজ করে নিতে পারে। এই জন্যে এরা কুয়াশার মধ্য দিয়ে যেতে ভারী ভয় পায়। কারণ কুয়াশার ভিতর দিয়ে যাবার সময় তাদের সমস্ত sense চলে যায় আর কোন দিকে যাচ্ছে তা একেবারেই এক করতে পারে না। একবার একজন চালক কেমন করে হঠাৎ ঘন কুয়াশার মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। কেমন করে সে যাচ্ছে তা না জানতে পারার দরুণ তার বিমান একেবারে উল্টে গেল। চালক কিন্তু নোটেই তা টের পেলে না। তার মাথা নীচের দিকে ঝুলতে লাগল। শেষকালে যখন সে—যেটা দিয়ে তাকে বিমানের সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেখান থেকে এক হ্যাঁচ্কা পেলে আর তার পকেট থেকে কাগজপত্র পড়ে যেতে লাগ্ল, তখন তার হুঁস্ হল, "সত্যি ত আমি ঝুলছি?"

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।



# পার্সিয়ুস।

## ( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

তখন সেই দেবী একটু হেসে বললেন যে "ব্যস্ত হয়ো না, তুমি এখন অত্যন্ত ছেলেমানুষ; একে মারা যার তার কাজ নয়, কেন না এর নাম মেডুসা রাক্ষসী, এ জাতে গর্গন। তুমি এখন দেশে ফিরে যাও সেখানে তোমার অনেক কাজ। আগে মানুষ হও, তার পর তোমাকে আমি এর সন্ধান বলে দেব"। পার্সিয়ুস কি একটা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল, কিন্তু সেই দিন থেকে দিন-রাতের মধ্যে একটুখানি সময়ও সেই স্বপনে দেখা সাপজড়ান মুণ্ডটার কথা সে ভুলতে পারত না। সে তার পর দেশে ফিরে এল।

দেশে ফিরে এসেই তার মায়ের অবস্থা শুনলে। তার পর একেবারে একদৌড়ে রাজার অন্তঃপুরের মাঝখানে। তার সেই চেহারা রাগে থর থর করে কাঁপছে, তার সেই সুন্দর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে দেখে আর সিপাহী শান্ত্রী কেউ বাধা দিতে সাহস করলে না। সে তখন তার মায়ের গলার শেকল দুই হাতে ভেঙ্গে ফেলে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। এমন সময় রাজাবাবু এসে হাজির, পার্সিয়ুস ত তাকে দেখেই হাতের কাছে আর কিছুই না পেয়ে এক জাঁতা তুলে নিয়ে এই মারে কি এই মারে! তার মা তাকে সামলাতে পারে না, এমন সময় ডিক্‌টিস এসে পড়ে তার ভাইকে বাঁচাবার জন্য বলতে তবে সে থামল। রাজা মশাই ত ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলেন, কেন না তোমরা জান যে, যে মন্দ কাজ করে তার কখন সাহস থাকে না।

পার্সিয়ুসরা ত সেখান থেকে বেরিয়ে এল।

তারপর তারা ডিক্‌টিসের পরামর্শে এক বন্দোবস্ত করলে। ডানেইকে সেখানকার

আথিনিদেবীর মন্দিরে রেখে দিলে, সেখানে রাজার কোন ক্ষমতাই চলে না। রাজাও কিছুদিন আর কিছু বল্লে না, এমন ভাবটা দেখালে যেন সে সব ভুলে গিয়েছে, কিন্তু মনে মনে কেবল সুযোগ খুঁজতে লাগল যে কি করে তাকে জব্দ করবে।

অনেকদিন বাদে রাজা এক খুব বড় ভোজ দিলে ; দেশবিদেশ থেকে বড় বড় লোককে নিমন্ত্রণ করলে আর তাতে পার্সিয়ুসকেও নিমন্ত্রণ করলে। নিমন্ত্রণের দিন সকলেই এল, আর তাদের দেশের মত মত সকলেই কিছু কিছু নজর নিয়ে এল। পার্সিয়ুসও গেল কিন্তু তার ত আর কিছুই ছিল না সে আর কি দেবে ? ডিক্‌টিসের কাছ থেকে যে কিছু চেয়ে নেবে তাও পারল না, কেন না কারুর কাছ থেকে কিছু চাইতে তার মাথা কাটা যেত। সে আর কি করে, চুপকরে দরজার পাশে দাড়িয়ে রইল। যারা সব আসছিল, তারা তাকে অমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সব কানাকানি করছিল আর ঠাট্টা তামাসা করছিল, পার্সিয়ুসের কাণের ডগা পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠছিল। রাজাও ত তাই চায়।

শেষকালে যখন সকলে বসেছে, তখন রাজা পার্সিয়ুসকে ডেকে পাঠালে। পার্সিয়ুস আর কি করে, আস্তে আস্তে এসে রাজার সামনে দাঁড়াল। রাজা বল্লে “কি পার্সিয়ুস, আমি কি তোমার রাজা নই যে তুমি আমার জন্য নজর আন নি ?” পার্সিয়ুস ত লজ্জায় ঘাড় হেট করে রইল আর আমতা আমতা করতে লাগল আর চারপাশের লোকেরা খুব ঠাট্টা করতে লাগল, কেউ বল্লে “এসেছেন ত যাকে বলে বানের জলে ভেসে, তা আবার ঠ্যাকার দেখ, রাজার কাছে এসেছেন, নজরের সঙ্গে খোঁজ নেই” ; কেউ বল্লে “ছেলের বাপ যে কে তার ত ঠিক নেই, উনি আবার বলে বেড়ান যে দেবপুত্র”—আরও কত কি ? শেষকালে এমন হল যে একেবারে অসহ্য, তখন পার্সিয়ুস রাগের মাথায় বলে ফেল্‌ল “কি তোমরা নজর নজর করছ, আমি এমন নজর আনতে পারি যে যার কাছে

তোমাদের নজর কিছুই নয়" ! শুনে তারা ত খুব হেসে উঠল। আর, আর ও ঠাট্টা করতে লাগল ; কেউ বল্‌লে "যে ওরে বাবা, তবে আমরা যাব কোথায় ?" কেউ বললে, কি ? কি ? ব্যাপারটা কি ? শুনি না ! এই রকম সব।" রাজা জিজ্ঞাসা করলে যে কি নজর তুমি আনবে" ? পার্শিয়ুস্‌ ত সেই তাদের ঠাট্টা তামাসায় একেবারে পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, তার তখন আর কিছু মনে না আসতে বলে ফেললে, গর্গনের মুণ্ড। সকলেত হেসে উঠল, কিন্তু রাজা এইবারে তার সুযোগ পেলে তাই বলে উঠল "তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার রাজত্ব ছেড়ে চলে যাও ; গর্গনের মুণ্ড নিয়ে একেবারে এ রাজত্বে ঢুকবে, নইলে নয় যাও।"

পার্সিয়ুস্‌ তখন বুঝলে কি জালেই তাকে ফেলেছে। কি করে মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত। একবার যখন বলেছে তখন সে তা করবেই। সে একটি কথাও না বলে সেখানে থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধারে সেই যে খাড়া পাহাড় যেখানে তারা প্রথম এসেছিল সেইখানে গেল, তার পর সেইখানে হাঁটু গেড়ে বসে আকুল হয়ে প্যালাস আথিনিকে ডাকতে লাগল "আমি না বুঝে শুঝে প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছি, কিন্তু তুমি যদি সত্যিই আমাকে দেখা দিয়ে থাক স্বপনে, তবে দেবী আমি যেন মিথ্যাবাদী না হই।" অনেকক্ষণ এই ভাবে প্রার্থনা করার পর সে দেখতে পেলে যে সামনে পরিস্কার আকাশে খুব দূরে একখানা ছোট সাদা মেঘ দেখা দিল, যেন রূপার মত ঝকঝকে। মেঘখানা তার পর ক্রমশঃ কাছে আসতে লাগল, আর এমন জ্বলতে লাগল যে পার্সিয়ুস আর তার দিকে চাইতে পারল না। মেঘখানা এসে এসে একটা দূরের পাহাড়ে লেগে ভেঙ্গে গেল আর তার মধ্যে থেকে আথিনি দেবী এলেন আর তার সঙ্গে একটি ছিপছিপে ছোকরা, তাঁর চোখ দুটা জ্বল জ্বল করছে। তাঁরা তারপর তার দিকে আসতে লাগলেন, পার্সিয়ুস অবাক হয়ে দেখল যে চলবার সময় তাঁদের পাও নড়ে না

আর কাপড় চোপড় ও ওড়ে না, চখের পলক ত পড়েই না। তাঁরা কাছে আসতেই পার্সিয়ুস প্রণাম করলে।

আথিনি দেবি তখন বল্লেন যে পার্শিয়ুস্ তোমার গর্গণকে মারবার সাহস আছে?

পার্সিয়ুস্ বল্লে যে "আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন আপনি যে থেকে আমাকে সামস দ্বাপে স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন, সেই থেকে আমি যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছি, পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোন জিনিষকেই আমি ভয় করব না।"

আথিনি বললেন "এখনও সময় আছে বেশ করে ভেবে দেখ, এর জন্য তোমাকে সাত বৎসর ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে আর একবার গেলে আর ফেরবার উপায় নাই। যদি তোমার মনে একটুও ভয় কখন আসে তাহলে তুমি সেই অচিন দ্বীপে মরবে, কেউ তোমার খবরও পাবে না।"

পার্সিয়ুস বললে "সে ঢের ভাল। এখানে লোকের অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকার চেয়ে আপনি আমায় বলে দিন কি করে তাকে পাব, তাতে যদি মরতে হয় তাও স্বীকার।"

আথিনি তখন একটু হেসে বললেন "তবে শোন ভাল করে, কেন না আমার একটি কথাও ভুলে গেলে একবারে নিশ্চয় মরণ। এখান থেকে তোমাকে বরাবর উত্তরে যেতে হবে একেবারে উত্তর সুমেরু ছাড়িয়ে যেখানে বরফ আর বরফ সেখানে তিন বুড়ি থাকে, তাদের তিনজনের মোট একটা চোখ আর একটা দাঁত। তারা তোমাকে শুকতারার মেয়েদের ঠিকানা বলে দেবে তখন তুমি তাদের কাছে যাবে যেখানে তারা সোনার গাছের চারদিকে নাচছে। তারা তোমাকে সেই গর্গনদের বাড়ী অচিন দ্বীপের ঠিকানা বলে দেবে তখন তুমি সেখানে গিয়ে আমার শত্রু মেডুসাকে মারবে। মেডুসা কে ছিল জান? এক সময় সেও একজন দেবকন্যা ছিল, সে খুব সুন্দর দেখতে ছিল,

কিন্তু তার সেই রূপের গর্ব্বে সে এমন একটা কাজ করলে যে তাতে সূর্য্যদেবও লজ্জায় মুখ ঢাকলে। সেই দিন থেকে তার মাথার চুল সাপ হয়ে গেল, তার হাত চিলের নখের মত হয়ে গেল, সর্ব্বাঙ্গে লোহার আর পেতলের আঁস হল আর তার বুকের মাঝে পেতলের নখওলা বাঘের থাবার নতন থাবা হল, আর চোখ এমন ভয়ানক হল যে যেই তার দিকে চায় সে পাথর হয়ে যায়, আর সেইদিন থেকে তার যে সব ছেলে জন্মায় সকলেই এক এক জন বিকটাকার রাক্ষস হয়। সেই দিন থেকে সে সমুদ্রের দুই মেয়ে গর্গন রাক্ষসীদের সমান হয়ে গেল, আর তাদের সঙ্গেই সেই অচিন দ্বীপে থাকতে লাগল। দেখ তুমি যেন তাদের গায়ে হাতটিও দিও না কেন না তারা অমর। তুমি সুধু মেডুসার মাথাটি কেটে নিয়ে চলে আসবে"।

পার্সিয়ুস বললে "সেত আনবই, কিন্তু তাকে দেখলেই যে পাথর হয়ে যাব।"

তখন আথিনি বললেন "সে ব্যবস্থা আমি করেছি, এই যে আয়নার মত চক্‌চকে ঢাল দেখছ তুমি এরি মধ্যে তার ছায়া দেখে তাকে মারবে তার পর তার মাথাটা নিয়ে এই ছাগলের চামডাটায় জড়াবে, জড়িয়ে নিয়ে আসবে, আর এই যে আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন ইনি হচ্ছেন দেবদূত হার্মিস, তুমি এঁর এই খড়ম জোড়া পরে যাও তাহলে তুমি উড়ে যেতে পারবে, আর এই খড়মের আর একটা গুণ যে এ কখন ভুল পথে চলে না, আর এঁর সঙ্গে এই যে হীরের তরোয়াল, এও নিয়ে যাও, এও স্বর্গীয়; এর এক কোপেই যত শক্ত জিনিষই হোক কেটে যায়।

তখন পার্সিয়ুস সেই গুলা সব নিল। তখন আথিনি বললেন যে "এইবার ওই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল" কিন্তু পার্সিয়ুস ইতস্ততঃ করতে লাগল, শেষকালে বল্লে যে "আমি একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে ঠাকুর দেবতাকে পূজা করে যাব না?"

আথিনি বললে যে "না, মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তোমার মন চঞ্চল

হবে আর ঠাকুরকে আর পূজা দেবার দরকার নেই ; তুমি যদি মেডুসার মাথা আনতে পার ত দেবতার সেই বড় পূজা হবে”।

তখন পার্সিয়ুস সেই পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। নীচের দিকে চেয়েই ত তার মাথা ঘুরে গেল তবু সাহস করে দিলে এক লাফ! ও মা, কোথায় নীচের দিকে পড়ে যাবে, না হাওয়ার ভেসে উড়ে চলতে লাগল। ক্রমশঃ

শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র।

---

# কবি।

[ রঙ্গ-নাট্য ]

[ “আমার দেশ” আফিস। সম্পাদক মহাশয় ও জনৈক কবি আসীন ]

সম্পাদক। মহাশয়ের কি অভিপ্রায়ে আগমন ?

কবি। আজ্ঞে, শুনলেম নাকি আপনার একজন লেখক প্রয়োজন ? তা আপনি যদি চান্ ত' আপনার 'আমার দেশের' শারদীয়া সংখ্যাকে আমার কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ইত্যাদি দানে ধন্য করতে পারি।

স। বেশ তো, আপনার লেখা গ্রহণ যোগ্য হ'লে আমরা ছাপাতে সম্পূর্ণ রাজি আছি।

ক। শুধু ছাপালে কি হবে মশাই ? শুনেছি আপনি কিছু শক্তি-টক্তি রাখেন—তা আমাকে একটা কিছু উপাধি দিতে হবে। কবি-শঙ্কর, বিদ্যাসাগর বিদ্যাভাণ্ডধারী এই রকম একটা কিছু বুঝলেন।

স। সে পরে বিবেচনা করা যাবে, আগে আপনার লেখা পড়ি।

ক। (সাগ্রহে) তা এখন কি দু' একটা কবিতা শুনিয়ে দেব?

স। আমার আর আপত্তি কি?

ক। সত্যই ত আপনি গুণগ্রাহী মানুষ। আপনার আবার আপত্তি। তবে শুনুন—(গম্ভীর ভাবে)—

সকাল বেলায় মুরগী ডাক্‌লে কোঁ কোঁকোঁর কোঁ,
কবিত্বে মোর ঘুরলো মাথা লাট্টুর মত বোঁ।
মুরগী কেমন মধুর ডাকে কোকিলকণ্ঠ বলে যাকে,
সানায়ের মত বাজে যেন পোঁ পোঁ পোঁ পোঁ—
মনটা ওড়ে ডানা মেলে সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ।
কেমন ডাকটা ডাকে মোরগে ভোগায় আমায় কবিত্ব-রোগে
শেষে মুরগী খাবার লোভে পেট করে চোঁ চোঁ

এর বিশেষত্ব কি জানেন মশাই? একটা সামান্য ডাকে কে এমন কবিতা লিখতে পারে? তা' ছাড়া মুরগীর কর্কশ ডাক এক কবি ভিন্ন আর কার ভালো লাগে?

স। সে তো নিশ্চয়ই। (স্বগতঃ)—হ্যাঁ একে একটা উপাধি দেওয়া যেতে পারে। তবে কবিশঙ্কর নয়—কবিশূকর; আর বিদ্যাভাণ্ডধারী না দিয়ে বিদ্যাছাগল।

ক। বলি শুনছেন মশাই? ওই কবিতাটা লিখতে গিয়ে আমার এমন ভাবের ভোড় এসেছিল যে রাঁধবার কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তাই সেদিন ভাত খাওয়াই হ'ল না।

স। বলেন কি? সারাদিন অনাহার!

ক। আজ্ঞে তা কেন ? যখন দেখলুম রাঁধাও হয় নি, মুরগীর নামে পেট চোঁ চোঁ করছে, তখন হোটেলে গিয়ে একটা ফাউল, আর এক ডিস্ কারী আর খান দশেক পুডিং খেয়ে এলেম।

[ সম্পাদকের অবাক হইয়া অবস্থান ]

ক—যাক্ আর একটা শুনুন। এটাতে সামান্য বিষয় নিয়ে কেমন গভীর দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা হয়েছে—দেখুন। :—

চিনা হংস পাড়লে অণ্ড
লণ্ড ভণ্ড হ'ল মন
গণ্ডা গণ্ডা চিন্তা খণ্ড
ছেয়ে ফেল্লে প্রাণের কোণ্।
ভাবলেম আমি এ প্রকাণ্ড
ব্রহ্মাণ্ডটা কাহার কাণ্ড ?
যিনি পাড়লেন এমন ডিম্ব
মহৎ তিনি যিনিই হোন্।

কি মশাই কথাই ক'ন্না যে ? আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন যে ? ( কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া )—তা মশায়, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না। ( একটু দ্বিধা করিয়া ) আচ্ছা বলুন দিকিন্, আমাকে একটা—এই—ইয়ে—এই দেবতা টেবতা বলে মনে হচ্ছে কিনা ?

স। ( স্বগতঃ )—কথাটা হুবহু সত্য। লোকটা ঠিক উপদেবতার মতই আমার স্কন্ধে চেপেছে। কি করে বিদায় করি ?

ক। আচ্ছা একটা আগমনীর গান শুনুন। শারদীয়া সংখ্যার প্রথমে বার করবেন এখন।

এস মা এস মা দুর্গে
অধীনের হৃদি-দুর্গে
করিয়াছি সেথা কত আয়োজন।
হে দেবি তোমারে করিতে ভজন
তুমি দুস্কৃতি—পাঁঠারে করিয়া ভোজন
পাঠাও মা মোরে স্বর্গে
এস মা এস মা পাহাড়িয়া উমা
অধীনের হৃদি-দুর্গে
একবার সেথা এস দশ-ভুজে',
দেখি ও আনন দু'নয়ন বুজে
পারি যেন মাতঃ শ্রীচরণ পূজে
তাড়াতে ইয়ার-বর্গে
ছাড়ি যেন গুলি যাই না গো ভুলি
তাহাদের সংসর্গে।

স। (স্বগতঃ)—নাঃ আর সইতে পারি না। ঠাকুর দেবতার অপমান। ঠাকুরের কাছে কিনা গুলি-ছাড়ার প্রার্থনা! (প্রকাশ্যে) মশায়; ভাল চান ত লম্বা দিন নতুবা রম্ভা খেয়ে বাড়ী ফিরতে হবে। তবু যাচ্ছেন না যে? দরোয়ান, এই দরোয়ান, এই পাগলটাকে ঘাড় ধরে—

ক। যাচ্ছি মশাই, যাচ্ছি আর ঘাড় ধরতে হবে না—

[ সবেগে প্রস্থান ]



মৃত্যুশয্যায় ক্লিওপেট্রা

স। যাক্ আপদ বিদায় হয়েছে। এবার 'আমার দেশে' একটা প্রহসন দেব মনে করেছিলুম। তা এইটেই লিখে দিলেই হ'বে। ( হাসিতে হাসিতে ) আচ্ছা, হাসিয়েছে কিন্তু, যাই সুকুমারবাবুর কাছে তিনিই লিখে দেবেন এখন। আমার আবার সময় নেই। [ প্রস্থান ]

যবনিকা।

# মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা

সে অনেকদিন আগের কথা। মিশরে ক্লিওপেট্রা নামে এক রাণী রাজত্ব করিতেন। ক্লিওপেট্রা নামে, মিশরের আরও অনেক রাণী ছিলেন, আমরা যে ক্লিওপেট্রার কথা বলিতেছি, তিনি মিশরের সপ্তম ক্লিওপেট্রা নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাঁর আগে আরও ছয়জন ক্লিওপেট্রা ছিলেন কিনা! ক্লিওপেট্রা দেখিতে যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি রাজ্য শাসনে ছিল তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল দেশে তাঁহার রূপ গুণের খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল।

ক্লিওপেট্রা যখন মিশরের রাণী, তখন রোম ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্য। রোম, শিক্ষা সভ্যতা ও বীরত্বে সমগ্র জগতে শ্রেষ্ঠ ছিল। মহাবীর সিজার যখন রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা, তখন মিশরে একটা কলহ চলিতেছিল। একদিকে ছিলেন ক্লিওপেট্রা, অপর দিকে ছিলেন তাঁহার ভাই টলেমি। ভাইভগ্নীতে সিংহাসন লইয়া কলহ চলিতেছিল। সিজার দুইজনের বিবাদের মীমাংসা করিতে যাইয়া ক্লিওপেট্রাকেই সিংহাসনে বসাইলেন। ইহার ফলে মিশরিদের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিল, সেই যুদ্ধে টলেমি নিহত হইলেন, মিশর রাজ্য রোমকদের দ্বারা পরাজিত হইল।

কিছুদিন বাদে আবার মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে রোমের কলহ বাধিল। এ সময়ে রোমে অক্টেভিয়াস্ সিজার, এণ্টোনি, ওলোপিডাস্ এ তিন জন ছিলেন সর্ব্বপ্রধান। যে মহাবীর সিজারের কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি—তাঁহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া কয়েকজন লোক প্রকাশ্য সভায় এসময়ে হত্যা করিয়াছিলেন। মহাবীর সিজারের মৃত্যুর পর এই তিনজন রোমের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন।

এদিকে মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রাকে জব্দ করিবার জন্য এণ্টনিও সেদেশে প্রেরিত হইলেন। এণ্টনি কিন্তু মিশর জয় করিতে যাইয়া মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রার মোহে পড়িয়া গেলেন। দেশে ফিরিবার নামটিও করিলেন না। এণ্টনিও, অক্টেভিয়াস সিজারের ভগ্নী অক্টেভিয়াকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মিশরে যাইয়া এণ্টনিওর অক্টেভিয়ার কথা আর মনেও রহিল না। অক্টেভিয়াস সিজার ভগ্নার প্রতি এই অনাদরটা ক্ষমার চক্ষে দেখিলেন না—তিনি এণ্টনিওকে যাইয়া আক্রমণ করিলেন। গ্রীসের পশ্চিমদিকে একৃজিয়ম উপসাগরে অক্টেভিয়াস সিজার ও এণ্টনির মধ্যে ভীষণ নৌযুদ্ধ হইল, এণ্টনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

এণ্টনিওর এই পরাজয়ে প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তাঁহার ন্যায় বীর পুরুষের কিনা আজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। এই অপমান তিনি, আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন—"তুমি আমাকে কাটিয়া ফেল।" ভৃত্য বার বার প্রভুর অনুরোধে তরোয়াল তুলিতে যাইয়াও আর পারিল না; হাত হইতে তরোয়াল খসিয়া পড়িল, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "না প্রভু একাজ আমি পারিব না। এ কথা বলিয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল। এণ্টনিও বীরের মত নিজের জীবন নিজে বলি করিলেন।

ক্লিওপেট্রা যখন একথা শুনিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।

এদিকে অকটেভিয়াস সিজার ত্বয়ারের গোড়ায় আসিয়া হানা দিয়াছেন। ক্লিওপেট্রা সিজার ও এণ্টনিওকে যেন মোহজালে জড়াইতে পারিয়াছিলেন, অক্টেভিয়াস সিজারকে তেমন পারিলেন না। অক্টেভিয়াস রাজপ্রাসাদে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। ক্লিওপেট্রা একেবারে পাগলিনীর মত হইয়া পড়িলেন। ক্লিওপেট্রা বুঝিয়াছিলেন যে অক্টেভিয়াসের হাতে পড়িলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অপমানের জ্বালা সহিতে হইবে। তিনি মৃত্যুর জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া মরিবেন! তাহাই হইল তখন একমাত্র লক্ষ্য।

ঈশ্বর, অভিমানিনা তেজস্বিনী রাজ্ঞীর সহায় হইলেন। ফুলের সাজির মধ্য হইতে একটী ফুল তুলিয়া লইবার সময় সাজির ভিতর একটী বিষাক্ত কীট, দেখিতে পাইলেন। কীটটী দেখিতে ঠিক যেন ছোট একটী সাপ। উহাদিগকে 'নীলনদের কীট' বলিত। এই বিষাক্ত কীটটীকে পাইয়া ক্লিওপেট্রা মরণের সন্ধান পাইলেন। এই কীটের দংশন এমনি বিষাক্ত যে ইহার সামান্য মাত্র দংশনে অতি অল্প সময়ে মানুষের মৃত্যু হয়।

ক্লিওপেট্রার মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি অক্টেভিয়াসকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"অক্টেভিয়াস! মিশরের রাণী রাণীর মতই মরিতে জানে!" ধীরে অতি ধীরে কীটটীকে বক্ষের উপর রাখিলেন। তার পর দেখিতে দেখিতে ক্লিওপেট্রার মৃত্যু হইল। প্রাণ যে মানের তুলনায় কিছুই নহে ক্লিওপেট্রা তাহাই দেখাইয়া গেলেন! অক্টেভিয়াস ক্লিওপেট্রাকে রোমে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কারাকক্ষে আসিয়া দেখিলেন,—খাঁচা পড়িয়া আছে— পাখী পলাইয়াছে!

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

# নূতন ধাঁধা

প্রিয় "হরিণ"-াঙ্ক !

তোমার "পাতা" পেয়েছি। আমি "ঝালগাছের লাল ফল" গেছলুম আমার "বড় বোন"-মা-কে নিয়ে! কাল ফিরেছি। কি সুন্দর দেশ ভাই, ইচ্ছে হয় না যে "চরণের কায" "৮০"। সেই যে কথায় বলে "হেম" "ঝালগাছের লাল ফল"— সে সত্যি। পথে দেখা "দশভূজার বড় ছেলে"র সঙ্গে। তিনি আসছেন, "দেয়াল"-টার থেকে। "সালের অন্য নাম"—সে ছেলে মেয়ে "যতগুলি সমুদ্র"; সবশুদ্ধ "যত নদী"—ততজন লোক। তেমনি মোট-"শূন্য প্রান্তর"-রা। আমাকে খুব—"গানের একটা তাল"-ন করলেন। গাড়ীতে সে রাত্রে তাঁদেরই "বেলুচিস্থানের বে ও স্থান ছাড়া" সব খাওয়া হল। তাঁরা পূজোটা দেখে আবার "চিরাচ্ছাদিত" দেশে গমন করবেন, বল্লেন। তাঁর মেয়ে "চাঁদের হাসি" এবার "চোখ-এ" দেবে, তুমি ত "আবৃত স্থানেই" আছ, তাঁদের সঙ্গে "মাঠের মধ্যে উচু পথ"—আপ করো। তোমার জন্য একটি "সীতা হরণকারী" মূর্ত্তি "চার পয়সা"-য়াছি। "আহ্বানে" 'যাহা হইতে থলে হয়"-াইলে পাছে নষ্ট হইয়া যায়, আমার কাছেই রাখিয়াছি, পরে পাঠাইলেই "চরণের কার্য্য হইয়া যাইবে"! তোমাদের "রামের কনিষ্ঠ পুত্র"-ল দিবে। আমরা ভাল আছি।

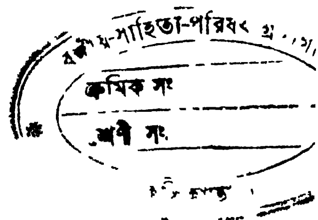
তোমার—

শ্রীজনকসভায় সর্ব্বজনলাঞ্ছনাকারী আকাশবিহারী যাত্রার আখড়ার মস্তকোপরি শোভিত য সঃ

২। মাঝে মাঝে ঘোরে তাহা হরদম ঘোরে না,
অথচ সে চাকা নয় কেউ তাহা বোঝে না।
হাত নাই, ধরে তবু, এ কিরে বিপদপাত,
নিরাশাতে মানুষের পড়ে ঠিক সেথা হাত।
কালা, ধলা দুরকম রং তার ভবে,
নালা তথা দেখা যায় কালা থাকে যবে।
এ হেন জিনিষে ভেঙ্গে পড়ে আকাশের বাজ,
কি নাম তাহার ভাই, বলে ফেল দিকি আজ

---

আকাশেতে উড়ি আমি ভূমিতে না যাই,
মার কোলে থাকি সুখে বাপ কোলে নাই,
রবির কিরণে বাঁচি জ্যোছনায় মরি,
দেব ছাড়া মনুষ্যের পূজা নাহি করি,
শয্যায় শুয়ে যবে থাকি যাবে চেনা,
দাঁড়ান দশায় মোরে কভু দেখিবেনা,
পাঁচটি অক্ষর দিয়ে গাঁথ যদি হার,
পাইবে মূরতি মোর কর নমস্কার।




শ্রীহিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

---

## স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে।

এই বহিখানির জন্য কত বালিকার নিকট হইতে কত চিঠি যে আসিয়াছে তাহার ঠিক নাই তাগিদে তাগিদে আমরা অস্থির হইয়া পড়িতেছিলাম। সকল পত্রে সেই একই কথা "বিজ্ঞান চিত্রে ও গল্পে" পড়িয়া অবধি আমরা "স্বাস্থ্য চিত্রে ও গল্পে" পড়িবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছি। কবে পাইব? কবে বাহির হইবে? "ছেলেদের এই আগ্রহই দেখিতেছিলাম, আর লজ্জানুভব করিতেছিলাম, বহিখানি প্রকাশ করিতে না পারায়! যাক্, এত দিন পরে সে বহি বাহির হইয়াছে। ছবিতে ছবিতে ভরা; গল্পের ত কথাই নাই; আবার সেই গল্পগুলিতে স্বাস্থ্য—সম্বন্ধীয় সকল জ্ঞাতব্য কথাই লিখিত আছে। দাম—১৲ টাকা।

---

## শিল্প কলা চিত্রে ও গল্পে।

"আমার দেশ"-এ যখন শিল্পকলার ছবি ও গল্পগুলি বাহির হইত, তখন অনেকেই মৌখিক এবং পত্রদ্বারা জানিয়াছিলেন যে বিশ্বশিল্পীদের এই ছবিগুলি আমরা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিয়া বাহির করিব কি-না! আমরা তখনই বলিয়াছিলাম যে ছেলেরা যদি এই জিনিষটিকে প্রীতির চক্ষে দেখে, তবে নিশ্চয়ই বাহির করিব। গত কয় মাস "আমার দেশে" "শিল্পকলা চিত্রে ও গল্পে" না থাকায় ছেলেদের পত্রাঘাত করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে এ জিনিষ তাহাদের ভাল লাগিয়াছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই বহু অর্থব্যয়ে বিশ্বের বিখ্যাত শিল্পী-গণের শিল্প-সমূহ একত্রিত করিয়া পুস্তকাকারে বাহির করা গেল। বিশ্ব-শিল্পীগণের সহিত পরিচয়ের এমন সুযোগ আর মিলিবে না। মূল্য—১৷৹ টাকা।

---

## পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে।

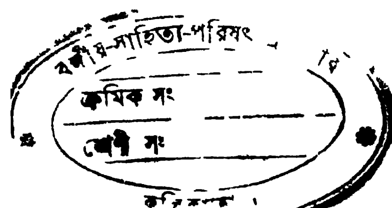
এই সিরিজের আর তিনখানি বহি বাহির হইল। জার্ম্মেনী, মিশর, ইহুদি। প্রত্যেক-খানির মূল্য—১৲ এই সিরিজের আগেকার বহিগুলি—বৈদিক ভারত, ইংলণ্ড, ব্রহ্ম, জাপান, চীন, রোম।

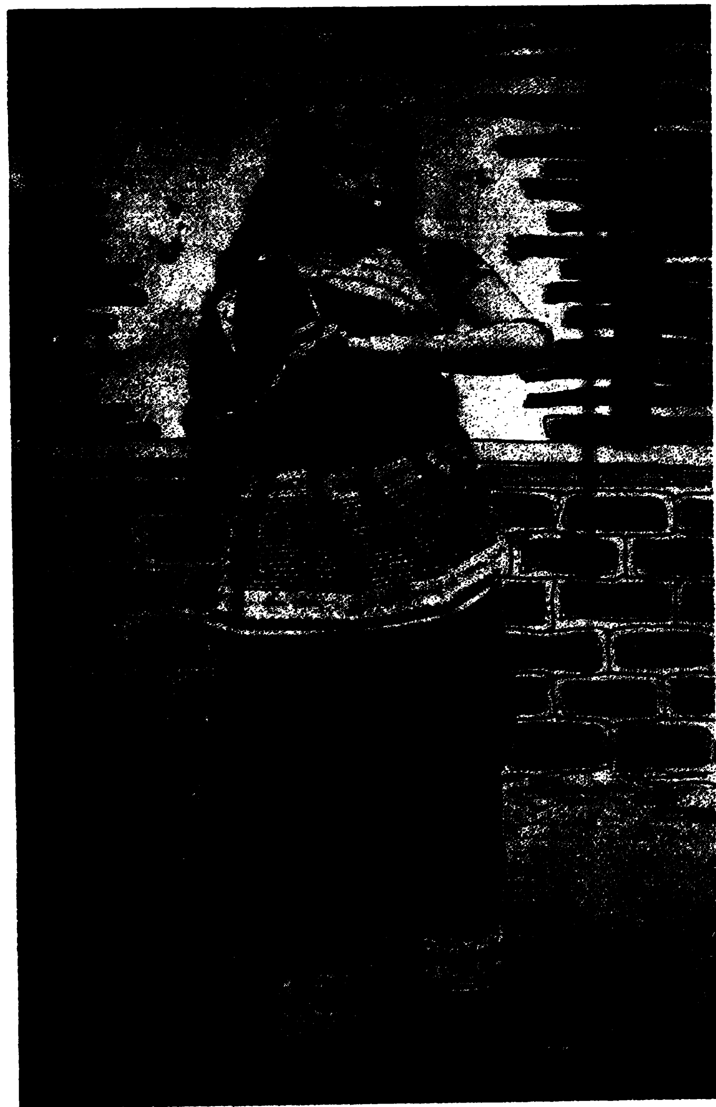
---

## আবোল-তাবোল।

ছেলেদের আবোল-তাবোল ভালবাসে; কারণ তারা নিজেরাই আবোল-তাবোল বকে, যা-তা বলে। এই বহিখানির মধ্যে ছেলেদের মন-মাতান, প্রাণ মজান 'আবোল-তাবোল' বলা আছে। এত ছবি, আবার সবগুলি হাসির, মজার ছবি এক 'আবোল-তাবোলে'ই থাকা সম্ভব। বল্‌তে দুঃখ হয় এমন সুন্দর বহিটি যাঁর লেখা তিনি সম্প্রতি ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছেন। সন্দেশ-সম্পাদক স্বর্গীয় সুকুমার রায় চৌধুরী এই গ্রন্থের রচইতা ও চিত্রকর। আমরা বাঙ্গালা দেশের সব ছেলেমেয়েকে আমরা একখানি করে আবোল-তাবোল কিনে পড়তে অনুরোধ করছি। এমন হাসির হাসির ছড়া, এমন রগড়ের ছবি দেখে তারা লুটিয়ে পড়্‌বে এ নিশ্চিত জানি। বড় আপশোষ এই যে সুকুমারের সুন্দর হাত চিরতরে অদৃশ্য হোল! এ আপশোষ শুধু আমাদের নয়, যারাই আবোল-তাবোল পড়বে, তারাই বল্‌বে। বইখানির দাম, চোদ্দ আনা; "সন্দেশ" কার্য্যালয়ে ৭২নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়।

---





বিষণ্ণ বদন।




৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ, ১৩৩০।

# তীর ও গান।

( Long Fellow )

শূন্যপথে ছুড়্‌নু তীর
পড়্‌ল কোথা নাইক স্থির ;
—কারণ ছুট্‌ল এত দ্রুত
দৃষ্টি আমার পরাভূত।
শূন্যপথে গাইনু গান,
কোথা গেল নাই সন্ধান ?
কাহার দৃষ্টি সূক্ষ্ম এত ?
নইলে গানের পিছু যেত।
বহুদিনের পরে আবার
একদিন পথে যেতে যেতে
দেখ্‌নু আস্ত তীরটী আমার
একটী বটের কোটরেতে ;
এবং বন্ধুর হৃদয় মাঝে
আমার গানটী আগাগোড়া রাজে।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

# সোজাপথ।

রাজার পারিষদ তিনি, রাজসভায় যাচ্ছেন। পথে যেতে দেখতে পেলেন রাস্তার পাশে একটা লোক গর্ত্ত খুঁড়ছে, পরিধানে তার মলিন শতছিন্ন বসন। পারিষদ জিজ্ঞাসা করলো, "হারে বোকা, রাস্তার পাশে গর্ত্ত খুঁড়ছিস, পথের লোক যে পড়ে যেয়ে হাত পা ভাঙ্গবে।" লোকটা একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালে, তারপর একটু হেসে বললে, "আমি গর্ত্ত খুঁড়ছি রাস্তার একপাশে, যারা সোজাপথে চলবে তারা কেউ গর্ত্তে পড়বে না, আর বাঁকা পথে চললে তাকে গর্ত্তে পড়তেই হবে।" পারিষদ উত্তর শুনে ভারি সুখী হলেন, একটা লোক দিয়ে তখনই তাকে নিজের বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

সেই অবধি লোকটি সেই পারিষদের বাড়ীতেই থাকে, তার অন্নবস্ত্রের অভাব নাই, পারিষদ প্রতিকার্য্যে তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। আর এমনই তার সুপরামর্শ যে তার উপদেশানুযায়ী কাজ করে পারিষদ অল্পদিনেই রাজার নজরে পড়ে গেলেন, রাজা তাঁর বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মন্ত্রিত্ব দান করলেন। এতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই, কারণ লোকটিত' আর কেউ নন, ছদ্মবেশী রাজ্যের বিজ্ঞতম সুধী।

যে ছিল একজন সামান্য পারিষদ সে হল রাজার মন্ত্রী, রাজসভায় হুলুস্থুলু পড়ে গেল, কেমন করে এ সম্ভব হল, কোন্ মন্ত্রে লোকটা রাজাকে যাদু করলে! ক্রমে সবাই জানতে পারলে, আর কিছু নয়, লোকটা সেদিন যে পাগলটাকে আশ্রয় দিয়েছে তারই দৌলতে আজ তার এমন প্রতিপত্তি।

কথাটা নূতন মন্ত্রীর কাণেও গেল যে সভাশুদ্ধ লোক এরূপ সন্দেহ করছে, তিনি লোকটাকে সরিয়ে ফেলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

একদিন প্রাতঃকালে মন্ত্রী তাকে ডেকে বললেন, "ওহে, এই চিঠিখানা একবার পৌছে দিয়ে এসত, তোমায় বেশী দূর যেতে হবে না—ঐ মোড়ের মাথায় বাড়ী।"

ছদ্মবেশী সুধী চিঠি নিয়ে বেরুলেন, দু'পা এগুতেই মন্ত্রীপুত্রের সহিত তাঁর সাক্ষাৎ হল। মন্ত্রীপুত্র বললেন, "দেখ, ভাই, আমার বন্ধুর বাড়ী যদি এই চিঠিখানা পৌঁছে দাও। রাজসভা থেকে তলব এসেছে এক্ষুনি না গেলে নয়, অথচ চিঠিখানাও খুব জরুরী আর বাড়ীটাও অনেক দূরে।"

"কিন্তু আপনার বাবা যে আমায় এই চিঠিখানা দিয়েছেন।"

"ও, এত' দু'মিনিটের পথ, ওই নয়! আমি না হয় এক্ষুণি পৌছে দিয়ে রাজসভায় যাচ্ছি।" এই বলে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে, নিজের চিঠিখানা ছদ্মবেশী সুধীর হাতে গুঁজে দিয়ে উত্তরের অপেক্ষা না করে মন্ত্রীপুত্র চলে গেলেন।

ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এসে সুধী যখন মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মন্ত্রীমশায়, আপনার ছেলে কোথায়?" মন্ত্রী তখন তাঁকে দেখে সবিস্ময়ে বললেন, "সে কি! তুমি কেমন করে ফিরে এলে! আমি তোমায় যার কাছে পাঠিয়েছিলেম তার ত' তোমায় আবার ফিরে পাঠাবার কথা ছিল না!"

সুধী ধীরে ধীরে উত্তর করলেন, "আজ্ঞে, সে চিঠি আপনার ছেলে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার নিজের একখানা জরুরী চিঠি পৌঁছে দেবার ভার আমাকে দিয়েছিলেন। আমি এই সেখান হতে ফিরছি।"

মন্ত্রী আকুল হয়ে বললেন, "করেছ কি মুখ! সে চিঠিতে যে আমি

ঘাতককে আদেশ দিয়েছিলাম যে যে লোক আমার চিঠি নিয়ে যাবে তাকেই যেন সে তখনই হত্যা করে। তবে কি, তবে কি আমি পুত্র হত্যা করেছি!"

সুধী শুধুই উত্তর করলেন আমিত পূর্ব্বেই বলেছিলেম সোজাপথের বিপদ নেই, কিন্তু বাঁকা পথে চললে তাকে গর্ত্তে পড়তেই হবে।"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত।

---

# উদ্ভিদের শিকার।

উদ্ভিদের যে একটা প্রাণ আছে, তাহারা যে প্রাকৃতিক সজীবতা, স-প্রাণতার জীবন্ত ছবি—একথা কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকের ধারণায়ই আসে নাই। কখনও কেহ ভাবে নাই যে প্রাণীজগতের ন্যায় গাছ-পালারও একটা সংসার আছে, তাহার হৃদয়ও স্নেহ-মমতার আবেগে উদ্বেলিত হয় ও দুঃখ-কষ্টে পড়িলে তাহারা অতি বিমর্ষ, মৃয়মাণ হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু জগতের সম্মুখে দেখাইয়াছেন যে উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে, তাহারা আমোদ-আহ্লাদ করিতে জানে, সুখে দুঃখে তাহাদের স্নায়ুগুলি অত্যন্ত উত্তেজিত ও স্পন্দিত হয় এবং তাহারা সাড়া দেয়। তাই এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না যে একটা পাথরের উপর ঢিল ছুঁড়া, আর গাছের একটা অঙ্গহানি করা সমান কথা। গাছেরা হাসে, কাঁদে, ঘুমায়—ক্ষুধা লাগিলে প্রকৃতির কাছে খাবার চায়। এ বাণী আজ জগতে এক নূতন বার্ত্তা নিয়া আসিয়াছে প্রতীচ্য উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রাচ্যের কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী।

অবশ্য এ বার্ত্তা এ নব-যুগের পক্ষে নূতনই বলিতে হইবে। কিন্তু প্রাচীন মুনি-ঋষিরাও বহুদিন আগে তা স-প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তার খোঁজ খবর অনেকেই রাখে না বলিয়া হঠাৎ জগদীশচন্দ্রের বার্ত্তা শুনিয়া ও প্রত্যক্ষ দেখিয়া জগৎ আজ স্তম্ভীত। "অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ সমন্বিতাঃ"- কোন যুগে তাঁহারা এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। আবার গতিশীল পদার্থও প্রাণহীন হইতে পারে—নড়াচড়ার সহিত প্রাণের যে খুব একটা সম্পর্ক আছে তাহা নহে। নদীর জল ত চিরদিনই অস্থির, আকাশের মেঘগুলি বাতাসের সাহায্যে সর্ব্বদাই এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু তাহা হইলেও উদ্ভিদের ন্যায় ইহাদের জীবনীশক্তি নাই—ইহারা জড়, প্রাণহীন পদার্থ। চলচ্ছক্তি না থাকিলেও উদ্ভিদের প্রাণ আছে।

সাধারণতঃ গাছেরা কি খায়? বাতাসের সঙ্গে যে অম্লজান (কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস) থাকে তাহা খাইয়া গাছেরা বাঁচে। এই বায়ু গাছের জীবন। মাটির নীচ হইতে শিকড় দিয়া জল টানিয়া তাহারা পান করে। আমাদের বিশ্বাস যে রীতিমত জল-বায়ু ও আলো পাইলেই বৃক্ষ-গুল্ম লতাদি সুখী—তাহা হইলেই তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনটা বাকি থাকে না। এ ধারণা ভুল। প্রাণী মাত্রেরই আশা, আকাঙ্ক্ষা আছে; তাহাদেরও স্বাদু, পুষ্টিকর খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিবার জন্য লোভ জন্মে। ভাল জিনিষ খাইয়া নীজেদের দেহের কান্তি ও লাবণ্য বাড়াইতে, শরীর নিরাময় করিতে তাহারা সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকে। কোন কোন গাছ জলবায়ুর অভাবে দিন দিন জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কাল-সার হইতে থাকে; আবার কোন গাছ পচা-গলার মধ্যে, স্যাঁৎসেতে জায়গায়ই ভাল হয়। মোটের উপর আবশ্যকীয় পুষ্টিকর খাদ্য না পাইলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না—তাহাদের প্রাণে সব সময়েই ভাল জিনিব আস্বাদনের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়া যায়। তাই আমরা সময় সময়

দেখিতে পাই যে একটা সরু লতা সবলকায় গাছকে বেষ্টন করিয়া থাকিতে থাকিতে কেমন সুন্দর একটা প্রাণ, সজীবতা প্রাপ্ত হয়। তার কারণ এই যে সেই গাছের সু-স্বাদু রস আস্বাদন করিতে লতাটীর লোভ জন্মে এবং তিলে তিলে গাছের সমস্ত রস, জীবনীশক্তি শোষণ করিয়া সে নিজের দেহ-পুষ্টি সাধন করে। এ সবত আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই।

আবার কতকগুলি গাছ আছে তাহারা মাংসাশী। গাছ-গাছরার রসের আস্বাদনে তাহার জিহ্বার তৃপ্তি হয় না—রক্তমাংসের জন্য তাহারা লোলুপ। কাজেই, কখন বা পোকাটা, মাকরটা আসিয়া নিকটে পড়ে এই আশায় সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকে। সাধারণ চোখে দেখিয়া চিনিবার যো নাই যে কোনটা প্রাণীভূক্, আর কোনটা নিরামিষাশী। উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদৎগণ সহজেই গাছ-পালার স্বভাব-রীতি, ভাব-ভঙ্গী ধরিয়া ফেলেন এবং কোন গাছটা কি মতলব আঁটিতেছে, কোনটা কোন পোকা শিকার করিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া আছে এবং কোনটাই বা উদর-পূর্ত্তি করিয়া মনের আনন্দে স্ফূর্ত্তি, স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছে—এ সব সহজেই তাঁহাদের চোখে ধরা পড়ে। একটা পতঙ্গের অঙ্গ-সৌষ্ঠবে যে কি সৌন্দর্য্য, কমনীয়তা রহিয়াছে, সামান্য গোলাপফুলটার ফুরফুরে পাপ্ড়িগুলিতে যে কি রঙের খেলা ফুটিয়া উঠিয়াছে—কি মনোরম পারিপাট্য, নিখুঁত স্তবক-বিন্যাস—তাহা আমাদের মনে কোন প্রতিবিম্ব না ফেলিলেও, উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদগণের প্রাণে এক নূতন-কথা, চিন্তার নূতন-তরঙ্গ বহিয়া আনে। মানুষের সাধ্য কি যে তুলিকার শতবর্ণচ্ছটায় প্রকৃতির সে সজীবতা—সরসতা—কোমলতার এক তিলার্দ্ধের সমান হইতে পারে।

থাক্ সে কথা। এখন গাছের প্রকৃতি, ভাবভঙ্গী ও আহারের বিভিন্ন অবস্থার কথা কিছু বলিতেছি। গাছেরা শিকার করে। কতকগুলি গাছ দেখিতে বড়ই

সুন্দর, রঙের চাকচিক্য ও শরীরের লাবণ্য এত বেশী যে দেখিবামাত্র কীট-পতঙ্গের মনে হয় যে ইহাদের রস না জানি কত সুস্বাদু, না জানি কত মধু ইহাদের গায়ে লুকাইত আছে। তাই সে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া গাছটীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এতক্ষণ গাছটী তাহার শিকারের গতি-বিধি দেখিতেছিল; যখন দেখিল যে শিকার তাহার দিকে আসিতেছে তখন আর কথা নাই, সেও তার অস্ত্র-শস্ত্রের চালনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। গাছের পাতাগুলির আগায় আবার গোল গোল কতকগুলি পাতা, কাঁটার মত কি যেন বিস্তার করিয়া সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। গোল পাতাগুলি গোলাপীরঙের এবং এমন সুন্দর যে সেখানে যাইবার জন্য পোকাটীর মন উতলা হইয়া উঠে। সে খোলা প্রাণে যেই বড় পাতাটীর উপর দিয়া সেখানটায় পৌঁছিয়াছে অমনি সেই গোলাপী পাতাটীর কাঁটাগুলি খটাখট্ করিয়া কব্জার মত আটকাইয়া গেল। মাছি বেচারাও একেবারে অবাক্!—এদিক সেদিক ঘুরিয়া হয়রাণ। কিন্তু এ যে মাছিমারা ফাঁদ (Venus's fly-trop), আর খুলিবার নয়। তখন গাছটীর মজা দেখে কে? ধীরে ধীরে মাছিটীকে চাপিয়া তাহার শরীরের সমস্ত রক্তমাংস শোষণ করিয়া প্রাণের ক্ষুধা মিটায়। আহারান্তে আবার ফাঁদটী খুলিয়া যায় এবং পূর্ব্বের মত শিকারের আশায় চাহিয়া থাকে। এ ভাবে শিকারের খোঁজ পাইলেই গাছগুলি স্বরূপ ধারণ করে এবং তখনই এগুলিকে দেখিতে অতি সুন্দর, সজীব ও প্রফুল্ল দেখায়। এর কারণ এই যে, সে সময় স্নায়ুগুলি খুব উত্তেজিত হয়।

আবার কোন কোন শিকারি গাছের পাতায় আঠা (gum) র মত কি একটা রস থাকে! মাছি কি পোকার গায় তাহা লাগিলে আর উঠিবার নয়—টানিয়া ধরিয়া রাখে। কোন পোকা হয়ত নিশ্চিন্ত মনে গাছটীর ডালে ডালে

ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, হঠাৎ একটী পাতায় নামিতেই কি যেন একটু আঠা শরীরে লাগিল। বেচারা প্রাণপণ টানাটানি করিতে থাকে, দু' একটী অঙ্গহানিও হয়, কিন্তু তবু নিস্তার নাই। ধীরে ধীরে পাতাটী তখন গুটাইতে থাকে এবং একটী কুঁড়ির মত হয়। বন্দীর জীবন ততক্ষণে কাবু হইয়া আসে এবং সেই পেষণে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে সে প্রাণ হারায়।

কোন কোন গাছ এমন তেলতেলে ও সুস্থকায় যে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়—মনে হয় ইহারা কি সুখী। জলের ধারে, কিম্বা একটু নরম জায়গায় চক্‌চকে চার পাঁচটী পাতার উপর মৃণাল-সদৃশ কি সুন্দর দু'একটী ডাটা নড়িতে চড়িতেছে; আর তার আগায় বেগুনে রঙের এক একটী ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। হয়ত একটা মাছি তাহা দেখিয়া একটা পাতার উপর আসিয়া বসিল। পাতাটী অমনি একটু গুটিয়া যেখানটায় আঠা আছে সেখানে পোকাকে নিয়া আসিল এবং সে রসে তাহাকে ডুবাইয়া আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গেল। পরে একপ্রকার হজমী রস ( acid liquid ) নীজের শরীর হইতে বাহির করিয়া পোকাটীর কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল—কেবল অবয়বটা রহিল বাকি। এই ভাবে আহার্য্য তৈরী করিয়া সে এগুলি খাইয়া হজম করে। তামাসা করিয়া যদি আমরা সেই পাতার উপর খানিকটা বালি ফেলি তাহা হইলে সে রসে সমস্ত শরীর ছাইয়া ফেলিবে, কিন্তু আহার্য্য কি খাদ্য ভ্রমে কখনও হজমী রস দিয়া তাহা গলাইতে প্রয়াস পাইবে না। তাহা হইলে বুঝ তাহাদের ধারণা-শক্তি কতদূর প্রখর, নীজেদের দেহপুষ্টির জন্য তাহারা কিরূপ চেষ্টিত থাকে। ঠাট্টা-তামাসা, অন্যায় অত্যাচার সব অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় তাহাদের প্রাণেও লাগে, শুধু ভাষায় সে সব প্রকাশ করিতে পারে না।

মাংসাশী গাছের আর একটা নমুনা দেখ। গাছের পাতাগুলির স্বাভাবিক

মূর্ত্তি দেখিলেই শরীরে রোমাঞ্চ হয়—বিস্তার করিলে ত কথাই নাই! গোল গোল পাতাগুলি কাঁটার ন্যায় সরু সরু লাল লোমাবৃত—যেন কার্পেটের উপর সারি সারি সূঁচ দাঁড়াইয়া আছে। প্রতি লোমের মাথায় স্বচ্ছ-নিটোল একটী কুঁড়ি আছে, সূর্য্যকিরণে তাহা ঝিক্‌মিক্ করে, সেজন্য ইহাকে বলে—সন্ ডিউ (Sun dew)। পোকা-মাকড় এই স্বচ্ছ, টল্‌টলে জিনিষটী দেখিয়া এর উপর আসিলেই আর কথা নাই—সবগুলি লোম হাতের মুঠোর মত একত্র আসিয়া জড় হয় এবং রস ছড়াইয়া শিকারকে আচ্ছন্ন করিয়া তার দফা নিকাশ করে।

Bladder-wort নামে একপ্রকারের কীটপতঙ্গভূক্ গাছ আছে, সেগুলি জলে জন্মে। শীত পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জলে ডুবিয়া যায় এবং নিদাঘের প্রখর সূর্য্যকিরণ উপভোগ করিবার জন্য সে সময় উপরে ভাসিয়া উঠে। জলের উপর হেলিয়া দুলিয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়। তাহাদের থলির ভিতর একবার ঢুকিলে আর বাহির হইবার পথ থাকে না। বর্ষাকালে কই, মাগুড়, খল্‌সে প্রভৃতি মাছ যেমন 'চাই'এর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারে না, তাদের অবস্থাও তেম্‌নি।

সবচেয়ে মজার শিকার করে 'কলসী-মুখো গাছ' গুলি (Pitcher-Plant)। সচরাচর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এগুলি জন্মে—কোনটা উর্দ্ধমুখী, আবার কোনটা হয়ত একটা লতা কিম্বা ডাটার উপরে ঝুলিয়া থাকে, দেখিতে ঠিক যেন একটী থলে বা চোঙ্গ। রসে ইহাদের শরীর টস্‌টস্ করে এবং ভিতরের দিক্‌টা কাটা-ময়। পোকাগুলি অতি স্ফূর্ত্তিতে ভিতরে ঢুকিয়া যায়, কিন্তু উপরের দিকে উঠিতে হইলেই কাঁটার ঘাঁয়ে শরীর বিদ্ধ হয়। কাঁটাগুলির মুখ সব নীচের দিকে, কাজেই পলাইবার যত চেষ্টা করা যায় ততই শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া মরণের পথ সোজা করিয়া দেয়। এই ভাবে বার বার নিষ্ফল

চেষ্টা ও ছুটাছুটি করিয়া বেচারা হীনবল হইয়া পড়ে, ও রসের বেষ্টনে প্রাণ হারায়।

'কলসীমুখো গাছ' নানা শ্রেণীর দেখা যায়—কোনটার মুখে রঙ্‌চঙে আবরণ থাকে; কীট পতঙ্গ উপরে আসিয়া বসিলেই ইঁদুরের ফাঁদের মত ঢাক্‌নিটা নীচের দিকে চলিয়া যায় ও শিকার মধ্যে যাওয়া মাত্র আবার বন্ধ হইয়া যায়! সময় সময় ছোট পাখী ও ইঁদুর পর্য্যন্ত এ ফাঁদে পড়িয়া প্রাণ হারায়। সামান্য গাছ হইলেও ইহাদের শক্তি বড় কম নয়, আঁকড়াইয়া শিকার ধরিয়া রাখে। ঊর্দ্ধমুখী গাছগুলি খুব হৃষ্টপুষ্ট ও তেলতেলে দেখায় এবং অন্যান্য মাংসাশী গাছের চেয়ে বড়। আবার কোন কোন গাছের নাকি এত আকর্ষণ শক্তি যে মানুষ কি অন্যান্য যে কোন প্রাণী সম্মুখে পড়ুক না কেন, লতার বেষ্টনের ন্যায় উহাকে জড়াইয়া ধরে—প্রাণান্তেও ইহাদের হাত এড়াইবার যো নাই। এসব গাছ আফ্রিকার অরণ্যানীতে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, তাহাদের পাশ কাটিয়া যে সব জন্তু চলাফেরা করে তাদেরও অনেক সময় দুর্দ্দশার চূড়ান্ত হইয়া থাকে।

এগুলি ছাড়া এমন অনেক গাছ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যাহাদের সংস্পর্শে একটু আসিলে শরীরের ভীষণ ক্ষতি হয়। মাংসাশী কি প্রাণীভুক্ না হইলেও আত্মরক্ষার সকল উপাদান ইহাদের আছে। কোনটার গায় হাত দিলেই অগণিত কাঁটার ঘায়ে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়; কোনটার লালা কিম্বা রস লাগিলেই মাংস পঁচিয়া যায়, আবার কোনটা হয়ত॰ স্পর্শ মাত্রেই সঙ্কুচিত হইয়া মরমে মরিয়া যায়। 'হেম্‌লক্', 'নাইট্‌সেড', 'ক্যাক্‌টাস্'—এ সবের আত্মরক্ষার অস্ত্র-শস্ত্র আছে। সচরাচর মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতেই এই ক্যাক্‌টাস্ গাছগুলি হইয়া থাকে। 'ইহাদের সমস্ত শরীর কাটা-ময়, দেখিলে গা

শিহরিয়া উঠে, পাতাগুলি পর্য্যন্ত নিরস ও আনারসের পাতার ন্যায় তীক্ষ্ণ কাঁটা-ময় কিন্তু ডাঁটাটা অতি কোমল ও সরস।

এখন দেখ গাছ-গাছরার যদি প্রাণ নাই থাকিবে তবে এই সব শিকার কি ভাবে করে এবং সমস্ত কাণ্ড-কীর্ত্তন কি ভাবেই বা বুঝে। তবে শিকারী গাছ-গুলিই বেশী বুদ্ধিমান বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকেরা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে গাছের মধ্যে সর্ব্বদাই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া হইতেছে, বাহিরে যে বিদ্যুৎ থাকে তাহা গাছ ক্রমান্বয়ে নীজের শরীরের ভিতর আকর্ষণ করিয়া আনিয়া পুঞ্জীকৃত করে। যখন গাছ মরে সে বিদ্যুৎ আবার বাহিরে মিলাইয়া যায়। এই পুঞ্জীভূত বিদ্যুৎকে কোন কাজে খাটাইবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা আজকাল খুব চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গাছ হঠাৎ মরে না, কাজেই সব বিদ্যুৎ কৌশলে আটকাইবার সুবিধা নাই। আবার কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে এক সঙ্গে অনেক গুলি গাছ মরিলে যে কি ভীষণ অবস্থা হইত, বিদ্যুৎ-প্রবাহে আশেপাশের প্রাণীজগতের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। তবেই এখন দেখ, গাছের প্রাণ আছে তাহাদের সত্ত্বা নিস্তেজ, নিষ্প্রভ নয়, প্রাণীজগতের মধ্যে তাহাদেরও একটা স্থান আছে। লোভ এবং কামনারবশবর্ত্তী হইয়া তাহারাও কাজ করে—স্বোদরপূর্ত্তির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকে।

বিজ্ঞানাচার্য্য—জগদীশচন্দ্র বসু আরও যে কত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন তা' তোমরা বড় হইয়া জানিতে পারিবে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে উদ্ভিদ-জীবন-রহস্য সম্বন্ধে কত সব উন্নত গবেষণা দিন দিন বাহির হইতেছে।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ,

---

# কে বড় ?

পুতুল নিয়ে দুপুর বেলা বসে ঘরের কোণে,
আপন মনে টুনী রাণী খেলছিল দুই বোনে।
টুনীর মেয়ের সাথে হ'বে রাণীর ছেলের বিয়ে,
মায়ে মায়ে গোল বেঁধেছে নামের ব্যাপার নিয়ে।
চাঁদ রেখেছি নামটী মেয়ের উঠল টুনী হেঁকে,
বল্‌ল রাণী সূর্য্যি ছেলের নাম দিয়েছি রেখে।
আমার মেয়ে অনেক বড় তোমার ছেলের চেয়ে,
কে নিতে চায় সূর্য্যি দেখ, চন্দ্র কাছে পেয়ে ?
রাণী বলে, সূর্য্য ছেলে অনেক অনেক ভালো,
নইলে কে আর অমনতর দিত সবায় আলো ?
সূর্য্য আমার সকল দিনে সমান ভাবে থাকে ;—
চাঁদ তো আবার মাঝে মাঝে লুকিয়ে নিজে রাখে।
টুনী বলে, দিনের বেলা থাকলে আলোর রেখা
সূর্য্য তোমার আকাশ'পরে যায় যে শুধু দেখা !
চন্দ্র আমার রাত্রি বেলা অমন আঁধার মাঝে
কেমনতর আলো জ্বালি' উজল হ'য়ে রাজে !
অমন কথার জবাব দেওয়া রাণীর হ'ল দড়—
বল দেখি তোমরা সবে কে ছোট কে বড় ?

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

## কচিখুকী।

কেমন নাদুস্ নুদুস্ গোলগাল ছোট্ট খুকীটি— টুকটুকে মুখে তার ফুটফুটে হাসি—এমন সরল হাসি কেবল ঐ শিশুর মুখেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। নির্জীব পাথর কেটে তার ভিতর যে এমন জীবন্ত মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন সেই শিল্পীর নাম ভিটোরিও কারাডোসী।



## শিক্ষা।

এখানাও প্রস্তরমূর্ত্তি। শিক্ষক তাঁহার প্রিয় শিষ্যটীকে কেমন আদরে পাশে বসিয়ে লম্বা কাগজের মোড়ক খুলে তাই থেকে পড়ে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। শিক্ষকের মুখ গুরু গম্ভীর—জ্ঞান গরীষ্ঠতাই তাঁর মুখে গাম্ভীর্য্যের ছাপ এনে দিয়েছে; আর ছোট্ট ছেলেটীর আনত চোখে একাগ্রতা মাখান,—তা'র সমগ্র মুখটীতে জানবার আকাঙ্ক্ষা এবং নিবিষ্টচিত্তের ছায়া যেন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। শিল্পীর নাম—এ্যাল্‌বার্ট টফ্‌ট্‌।



# জয়-শ্রী।

ব্রঞ্জ ধাতুতে তৈরি জয়-শ্রীর এই মূর্ত্তিখানা বহু শত বৎসর পম্পী নগরের ধ্বংসস্তুপের নীচে প্রোথিত ছিল। এতকাল পরেও মূর্ত্তিখানা কেমন সুন্দর রয়েছে। মূর্ত্তির একটী পাখা ও একখানা হাত যদিও সেই ধ্বংস স্তুপের সাথে মিশে গিয়েছে তথাপি এর চোখ মুখ এবং চলন্ত ভাবটী আজো তেমনি অটুট রয়েছে।



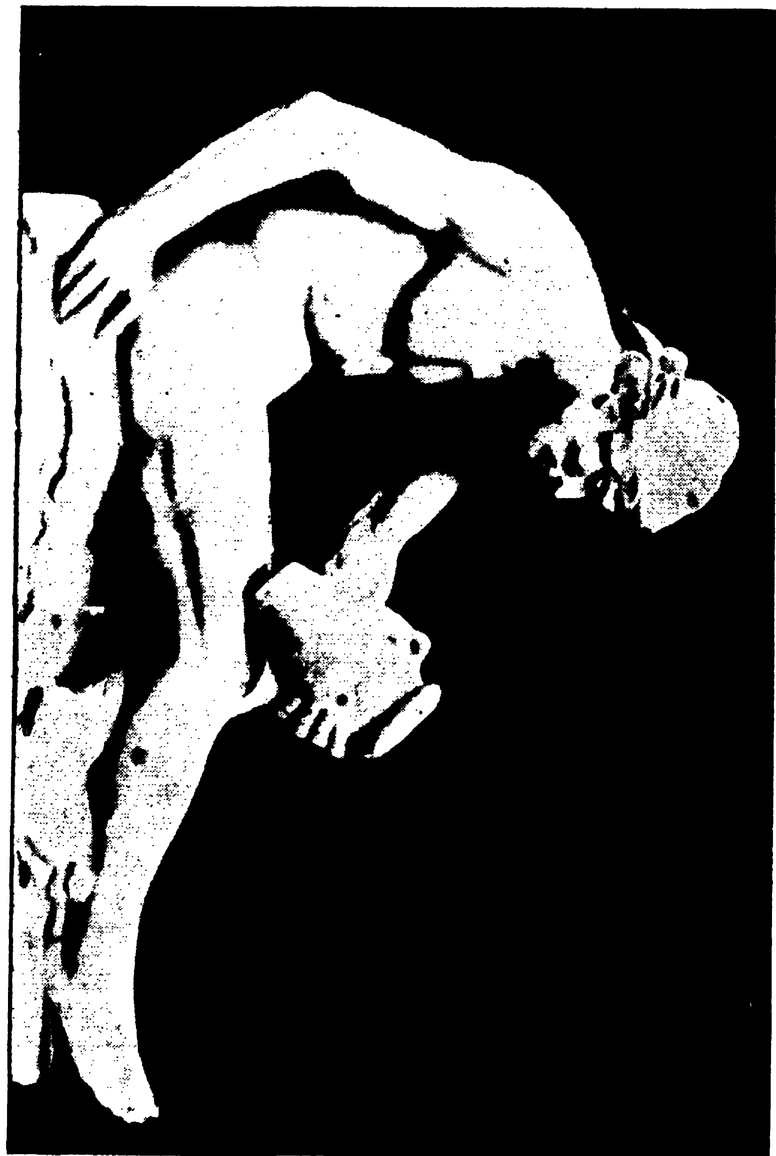
## প্রার্থনা।

এটী একটী প্রস্তর মূর্ত্তি। শিশুর মুখে সরলতা এবং নির্ভয়শীলতার ভাবটুকু কেমন ফুটে উঠেছে তাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।



## কারিকর।

এফ. ডবলু পোমেরয়ের অঙ্কিত কারিকর-মূর্ত্তিতে কারিকরের দৈহিক গঠন, তাহার মৌখিক ভাব, একাগ্রতা, তন্ময়তা ফুটিয়া মূর্ত্তিটিকে চির জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছে।

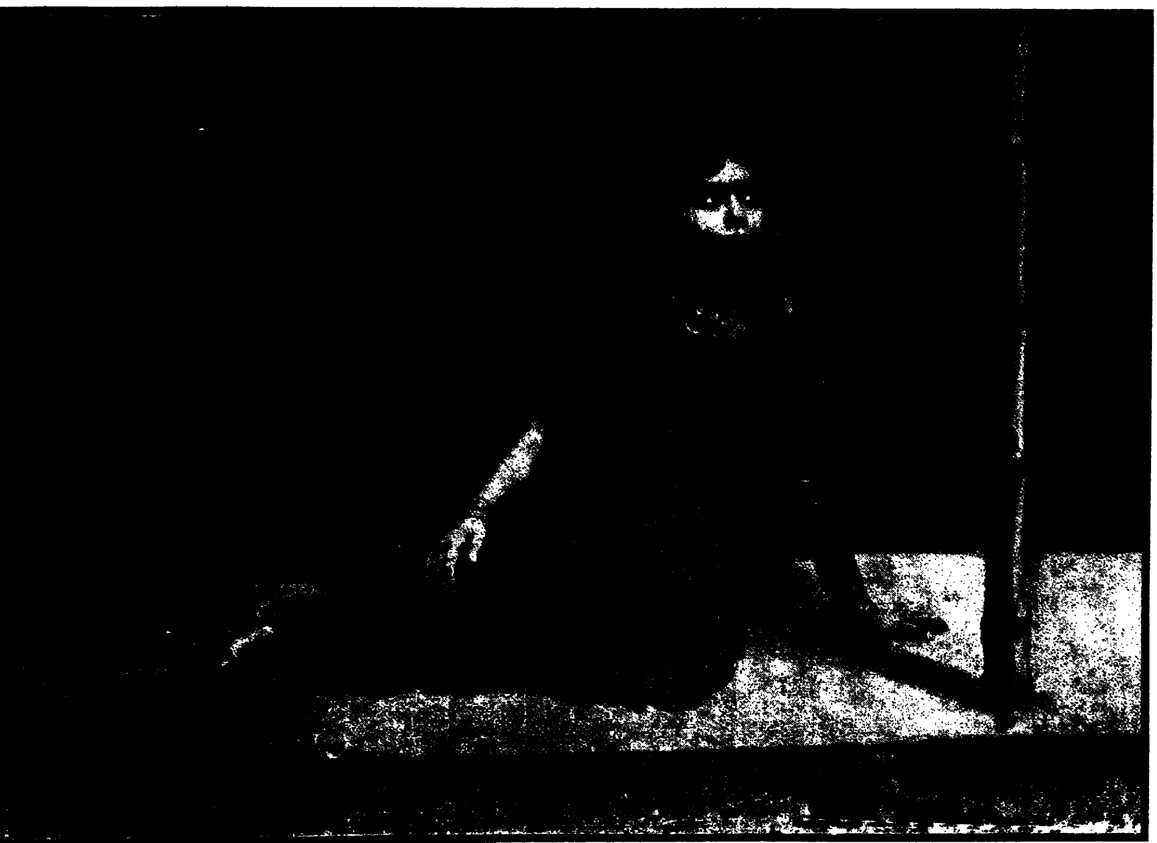


# পুলকনর্ত্তন।

পম্পীনগরের ধ্বংসাবশেষের ভিতর খুঁজে খুঁজে অনুসন্ধানকারী কি এক রত্ন আবিষ্কার করেছে—সেই আনন্দ উথ্‌লে উঠেছে তার চোখে মুখে—ফুটে উঠেছে পুলকোল্লাস তা'র নৃত্যভঙ্গিমায়।

মূর্ত্তিখানা ব্রঞ্জধাতুতে তৈরী—ভাস্করের নাম মূলিন্। বিখ্যাত লুক্‌সেম্‌বার্গের যাদুঘরে এই মূর্ত্তিখানা বর্ত্তমানে রক্ষিত আছে।





ঈশ্বর ধ্যানে

# সংগ্রাম।

একজন খেলোয়াড় একটা বিষাক্ত সাপের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। একহাতে তা'র সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সাপের গলা টিপে ধরে আছে—দংশন লোলুপ সাপকে প্রতিহত করতে তা'র কতখানি শক্তি যে ব্যয়িত হচ্ছে তা বুঝতে পারা যায় তা'র সর্ব্বদেহের মাংসপেশীর বিকাশে—তা'র একাগ্র চোখ মুখের সুদৃঢ় ভঙ্গিমায়।—ব্রঞ্জ ধাতুর এই মূর্ত্তিখানা লর্ড লেটনের তৈরী।



# মাতার আনন্দ।

প্রাইমো আগ্নিয়েটির এই ধাতুমূর্ত্তিটি বিশ্বের তাবৎ জননীদের প্রতিমূর্ত্তি। মা যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন, সন্তান আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিলে, মা-কে জড়াইলে মা যে বিশ্ব ভুলিয়া যান—মায়ের সেই বাৎসল্য রসের ভাবটিই এই মূর্ত্তিতে কেমন চাতুর্য্যের সহিত ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।



# আগুন খাকীর পড়া

পর দিন সন্ধ্যার সময় আবার ছেলেরা উপস্থিত হ'ল—আমিও নটন নিভাকে নিয়ে গিয়ে একপাশে বসলাম। বুড়ো গল্প আরম্ভ করে দিলে।

"নদীর ধারে যে একটা বড় পড়া পাড় আছে—ওই যে যার ধার দিয়ে রাস্তাটা এঁকে বেকে গিয়ে দূরে ঝুম্‌ঝুম্‌পুরের সব্জী ক্ষেতের শ্যাম শোভায় ডুব দিয়েছে; ওই খানটায় ছিল একটা শ্মশান—সে অনেক দিনের কথা, ওটাকে বল্‌তো "আগুন খাকীর পড়া।" চারিদিকে ছোট বড় গাছের জঙ্গল—মধ্যটা উঁচু– ঐখান টায় সতীদাহ হ'ত!

"সতীদাহ কি বুড়ো?"

তখনকার দিনে সধবা মেয়েরা, তাদের স্বামী মরে গেলে, স্বামীর সঙ্গে চিতার আগুনে জিয়ন্ত পুড়ে মরত;—তা'দিগকে বল্‌তো সতী। ইংরাজরা সতীদাহ বন্ধ করে দিলে। এখনও লোকে ওপথ দিয়ে সাঁঝে সকালে চলে না, একটা লোক সন্ধ্যার পর ওপথ দিয়ে যেতে গিয়ে—নাকালে পড়েছিল; সে এক গল্প।

"বল না বুড়ো বল না।"

তোমাদের ভয় করবে না?

"আমরা নাকি ভীতু?"

ভীতু নও। কিন্তু সন্ধ্যার পর কখনো ও পথ দিয়ে যেওনা।

কেন?"

বিভুকে অনেকটা পথ একলা যেতে হয়।—শিবু, করুণা, তোমরা বিভুকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তবে যেও।

"বল না—বুড়ো, গল্পটা কি ?"

বল্‌ছি। ওপাড়ায় মশাইএর পুকুরের ধারে, যেখানটায় একটা মরা আম গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে—ঐ খানটায় ছিল নিরু হালদারের বাড়ী, তার একটী মেয়ে-ছিল—যেন পারুল ফুল, কি ফুট ফুটে—হাসিমাখা যেন আমাদের নিভা মা !

নিভা একটু মুচকি হাস্‌ল, বুড়ো বল্‌তে লাগলো—তা তার ভাগ্য কিন্তু ভাল ছিলনা, একটু বড় হ'তেই বাবা মারা গেল বাড়ীতে আর কেউ নেই—মা আর মেয়ে, বড় কষ্টে তাদের দিন যায়, মা কিন্তু বড় সুশীলা ছিল, বড় শান্ত স্বভাব। আহা ! তেমন মেয়েও বিধবা হয় ! বুড়োর চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো।

বুড়ো হাত দিয়ে চোখের জল মুছে আবার বল্‌তে লাগলো—তা মেয়েটা অনেক রকমের সেলাইয়ের কাজ জান্‌তো, দিনরাত খেটে পাড়াপড়শীর ফরমাস্‌ মত কাজ করে দিয়ে যা পেত, তাতেই এক রকম করে তা'দের দিন কেটে যেত।

মেয়েটী ক্রমে বড় হ'তে লাগলো। মেয়েটীর বয়স যখন নয় বৎসর মেয়েটী সংসারের কাজ কর্ম্ম করে দিয়ে সন্ধ্যা না হ'তে হ'তেই, আমার এইখানে এসে বসতো।

"তার নাম কি ছিল ?"

তার নাম ?—তার—নাম,—তার নাম ছিল—রেণু মা।

আমি তা'কে বল্‌তাম—"হাঁরে রেণু, তুই যে গল্প শুন্‌তে এলি—তোর মায়ের কাজ কে করবে ?" সে হেসে বল্‌তো—"সব কাজ আমি করে দিয়ে এসেছি দাদা-মশাই ! মা সেলাই সেরে কাপড় কাছ্‌তে গেলেন। আমায় বলে গেলেন, তাইতে আমি এলাম।" মেয়েটী ভারী লক্ষ্মী ছিল।

ক্রমে রেণু বড় হ'ল, বিয়ে দিতে হবে, কে আর গরীবের মেয়েকে বিয়ে করবে বল ? তার মা ত ভেবেই সারা, ক্রমে ভেবে ভেবে রুগিয়ে পড়লো, সেলাইয়ের কাজ করতে পারে না,—সংসারের অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে পড়লো, রেণু মা কিছু কিছু সেলাইয়ের কাজ মায়ের নিকট শিখে ছিল, সে প্রাণপণে সেইকাজ করতে লাগ্‌লো, কিন্তু তাতে সে আর কত পারে ? মায়ের পথ্যেরই কুলান হয় না।

আমাদের দেশে দরিদ্রের সাহায্য করতে কেউ নেই। গরীবের মেয়েকে এক পয়সা না নিয়ে বিয়ে করে, গরীবের একটু দুঃখ ঘোচাবে, এমন লোক এদেশে একটীও নেই। তখনকার দিনে মেয়ের বিয়ে দেওয়া শক্ত ছিল,—ছেলের বিয়ে দেওয়া শক্ত হ'ত। এখন সব ছেলেরা যত লেখাপড়া শিখ্‌ছে—তত তাদের দর বেড়ে যাচ্ছে, কোথায় লেখা পড়া শিখে মন উন্নত হবে—সৎস্বভাবের গুণে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে,—পল্লীমার মলিন মুখখানিতে হাসি ফোটাবে ;—না, লেখাপড়া শিখে, অত্যাচারে অনাচারে পল্লীমার বুকের হাড় এক একখানি করে খসিয়ে দিচ্ছে। আবার সেই হাড় নিয়ে শকুনির ঝগড়া ! ভাইসব, তোমরা লেখা পড়া শিখে দশ জনের একজন হও। বড় হ'য়ে দেশ হ'তে লোভী দুষ্টের অত্যাচার তাড়িয়ে দেবে ; শোষকদের হাত হ'তে গরীব দুঃখীকে রক্ষা করবে ;—তবেই তোমরা বীর নামের যোগ্য হ'বে।

"পল্লী মা কে বুড়ো ?"

এই যে—যেখানে তোমাদের বাস, এমন লতায় পাতায় ঘেরা, সবুজ গাছের স্নেহ মায়ায় ভরা—এই যে দেশ,—এই তোমাদের পল্লী মা ! এখানকার গরীব দুঃখী মুটে মজুর হ'চ্ছে এই পল্লীর প্রাণ। তোমরা এই প্রাণের সাড়া পেয়েই নিত্য কত নূতন আশায় জেগে উঠ্‌ছো। বড় হ'য়ে, মায়ের ছেলে হ'য়ে, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে—এই আশায় মেতে মা তোমাদের কত আদরেই না বুকে করে

পালন কর্‌ছেন।”

বুড়োর চোখ দু'টো জলে ভরে গেল। একবার যেন শূন্য মনে দূরে আঁধারে মেশা গাছগুলোর দিকে চেয়ে—আবার বল্‌তে লাগলো।

“তারপর শুন,—রেণুর সমবয়সী শুভার বিয়ে হ'য়ে গেল—খুব ধুমধাম করে বাজনা বাদ্যি—আলো রোসনাই, কিছুরই অভাব হ'ল না। জামাইও হ'ল খাসা, রেণুর মা বিছানায় পড়ে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগলো—“আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল না।”

আমি তখন, বাবু,—কোমর বেঁধে লাগলুম। তার মাকে গিয়ে বল্‌লুম—“মা, কিছু ভেবনা। আমি তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দে'ব।

যোগেশ ও রেণুর বড় ভাব ছিল। রোজ সে রেণুকে আমার এখান হ'তে গল্প শুনে বাড়ী ফেরবার সময় বাড়ী পোঁছে দিয়ে যেত। যোগেশদের অবস্থা তত ভাল ছিল না। তার বাপ্‌কে ধরে, অনেক করে মত করালাম। এক দিন শুভ লগ্নে তাদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

“বাজনা বাদ্যি হ'য়নি ?”

না, তা ছাড়া, আর যা দরকার তা হ'য়ে ছিল।

“আর কি দরকার ?”

শাঁখের শব্দ, হুলুধ্বনি ! মায়ের মুখে হাসি ফুটলো, ক্রমে রোগ সেরে গেল। যোগেশও বেশ ছেলে ! দেখ্‌তে খুব সুন্দর—বিনয়ী। স্বভাব বেশ ভাল ছিল। যোগেশ রেণুর মত বৌ পেয়ে খুব খুসী হ'য়েছিল।

“তুমি কি করে জান্‌লে বুড়ো ?”

হাঁ, হাঁ,—আমি জানি। সে আমায় বলেছিল।

রেণুরও মুখে হাসি ধরে না। সেও খুব খুসী। আমি যদি বেঁচে থাকি নিভা-মা তোমারও ঐ রকম একটা বর করে দে'ব।”

নিভা মুচকে হেসে মুখ ফিরালে।

বুড়ো বলতে লাগলো—"কিন্তু রেণুর শাশুড়ীর মত যদি নিভার শাশুড়ী হয় ? সেইটেই আমার বেশী ভাবনা !"

"কেন ?"

শাশুড়ীটা ভারি বজ্জাৎ ছিল। রেণুকে ভারি কষ্ট দিত। তা যা'হোক দু'তিন বৎসর বেশ কেটে গেল, রেণুর বেশ ফুট ফুটে একটা ছেলে হ'ল, যোগেশ সেই সময় অসুখ হয়ে বিছানা নিলে—রেণুর কষ্ট আরো বাড়লো।

একদিন দুপুর বেলা কান্না শুনে ছুটে গিয়ে দেখি—যোগেশ মারা গেছে। "বৌমার কি হ'ল" শুনে, ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি—রেণু ছেলে কোলে করে বসে আছে—চোখ দুটী স্থির—মুখখানি ফেকাসে,—গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম ঠাণ্ডা !

লোকজন ডেকে হেঁকে বেরুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তখন বর্ষাকাল, শ্মশানে এক হাঁটু জল, কাজেই অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে উঠলাম ঐ পড়াটায়।

তোমাদের ভয় করছিলো ?

"না।"

আমিও সঙ্গে ছিলাম। মড়া নামিয়ে কাঠের চেষ্টা করা হ'চ্চে—তখন দেখি, দূরে রেণুর মা একটা মশাল হাতে করে ছুটে আসছে—মুখে কেবল—"কোথা গেলি, কোথা গেলি—রেণু, আয় আয়।" কাছে আসতেই আমরা ধরে বসালাম, কিন্তু কিছুতেই রইলো না। সেই রাতে, মশাল হাতে কোথায় চলে গেল। হায় ! হায় ! মেয়েটা পাগল হ'য়ে গেল !

আকাশ ভরা মেঘ ! ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি ; এত বৃষ্টি যে সেখানে থাকা দায় হ'ল, সকলেই পালিয়ে আস্‌তে চায়, এমন সময় একটা আলো চারিদিকের বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।—তাই দেখে, কেউ ভয়ে, কেউ ইচ্ছে করে বাড়ীর

দিকে ছুট্ দিল।

"তুমি ?"

আমি নড়লাম্ না—একলা সেইখানে একটা বাঁশ হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম।

"সে আলোটা কি ?"

সেটা উল্কামুখী শিয়াল! খানিকক্ষণ পর—আমার সাম্‌নে আলোটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো! দেখি—একটা শিয়াল! এই শিয়ালগুলো হাঁ করলে, মুখ দিয়ে আলো বেরোয়, আলো দেখে পোকা মাকড় এসে মুখে পড়লে, মুখ বুজে খেয়ে ফেলে। যাই হোক—সেই রাতে, সেই মড়া দুটাকে নিয়ে কি করি! বড় বিপদে পড়লাম, মনে মনে মধুসূদনকে ডাক্‌তে লাগলাম।

বাঁশে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি! দেখি, সেখানটা সহসা আলোতে ভরে গেল। কেন এমন হ'ল ?—চারিদিক চেয়ে দেখ্‌তে লাগলাম, দেখলাম—সেই কাছিম পিঠের মত পড়াটা ফেটে গেছে—আর তার মধ্য হ'তে আলো বেরুচ্ছে! দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটী, দুটী করে দশ বারটী মেয়ে বেরিয়ে এল!—আহা! তাদের কি রূপ!—তাদের পরনে চওড়া-লাল-পেড়ে-সাড়ী, হাতে শাঁখা, কপালে সিঁন্দুরের টিপ্, মাথায় সিঁথি ভরা সিঁন্দুর যেন জ্বল্‌ছে!

এত পদ্মফুল কোথা হ'তে এল ? লোকে ভাবতে লাগলো, তার আগে রূপসাগরে একটীও পদ্ম ছিল না, মালঞ্চী চেয়ে রূপসাগর বড়,—অত বড় পুকুর জোড়া পদ্মফুল, পাতা উড়িয়ে, বাতাসের ঢেউএর সঙ্গে যখন নাচতো, দুল্‌তো,—তখন কি শোভাই হ'ত!

বারো বৎসর ধরে ঐরকম ফুল ফুটে ছিল, তারপর একদিন সকালে যেমন পুকুর ভরা পদ্মফুল দেখে সকলে অবাক্ হ'য়েছিল সেই রকম, একদিন সকালে পুকুরের সব পদ্মফুল সহসা কোথায় চলে যেতে দেখে, সকলে অবাক্ হ'য়ে গেল।

"কোথায় গেল ?"

বল্‌ছি, একটী বড় লাল পদ্ম কেবল তখনই পুকুরের মধ্যে ফুটে, আকাশের দিকে চেয়ে ছিল।

"কেন ?"

সেকথা পরে বল্‌ছি। দিন কয়েক পর একটা সন্ন্যাসী দেখা দিল ঐ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, সেখানে সে একটা গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে ছিল তিনদিন, আমি তাঁর কাছে ধর্ম্ম কথা শুন্‌তে যেতাম,—তাঁর কাছে যা শুনেছি—তাই তোমাদের বল্‌ছি।

"তিনি কি বলেছিলেন ?"

সন্ন্যাসী খুব সাধু ছিলেন। তিনি তিন দিন পর যে কোথায় চলে গেলেন—কেউ খুঁজে পেলে না।

"তিনি কি বলেছিলেন বলনা ?"

একদিন স্বর্গের বাগানে অপ্সরীরা ঢুকে নাচতামাসা, হাসিখেলা করছিল, বাগানটা দেবরাণী শচীর। বাগানে কল্পতরুর সারি একদিকে,—আরদিকে সারি সারি পারিজাত ফুলের গাছ। কল্পতরুর মূলে মণিবাঁধান বেদি, আর পারিজাত গাছের গোড়ায় সোণার আল্‌তোলা, গাছের গোড়ায় গোড়ায় জল ঘুরে গিয়ে পড়ছে মন্দাকিনীতে—স্বর্গের গঙ্গায়, পারিজাত গাছগুলির আগাগোড়া ফুলে ভরা—সে ফুল কখনো শুকায় না, সেখানকার বাতাসও সুবাসে ভারি ;—অতি ধীরে গাছের পাতা নেড়ে, লতা দুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে,—একদিন অপ্সরীরা হাস্‌তে খেল্‌তে এসে ঢুকলো সেই বাগানে। তারা সেই বাগানের শোভা দেখে অবাক্ হ'য়ে রইল ! তখন গাছের ডালে বসে চন্দনা ডাকছিল। চন্দনার ডাক শুনে, আবার তাদের গলার সুর ফুটে উঠলো। তারা গুণ্ গুণ্ করে গাইতে

গাইতে, আঁচল ভরে পারিজাত ফুল তুলে, মণি বাঁধান বেদিতে বসে মালা গাঁথতে লেগে গেল, সে রকম একটি মালা পেলে নিভা মার খুব আমোদ হয়—নয় ?

কেমন হরেক রকমের মালা গাঁথলে, ফুলের হার ফুলের তাজ, ফুলের বালা, ফুলের সব কত কি ! অপ্সরীরা সেই সব ফুলের গয়না পরে, সোণার নুপূর বাজিয়ে গেয়ে উঠলো। সে কি মধুর সুর—শুনে পাখীরা সব থেমে গেল, ভ্রমরেরা নিজের সুর ভুলে গেল ;—সকলে নীরব হ'য়ে অপ্সরীদের গান শুনতে লাগলো।

অপ্সরীরা করলে কি ? না—তাদের মধ্যে একজনকে, যে দেখতে সব চেয়ে ভাল, তাকে শচী সাজালে, একটি পারিজাত গাছের শির ডালে, যে একটি সব চেয়ে বড় পারিজাত ফুটে ছিল, সেটিকে তুলে নিয়ে এসে, তার হাতে দিয়ে, একটা কল্প-তরুকে ইন্দ্র করে তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিলে, সে হাতে ফুল নিয়ে, বামে হেলে সেই গাছের কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়াল।

তারপর অপ্সরীরা নাচতে লাগলো—তালে তালে, কত ছন্দে, কত রঙ্গে ! তাদের গলার স্বর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে, ঝরণার মুখে জল ধারার মত উথলে উঠে, ছড়িয়ে পড়তে লাগলো সমস্ত বাগানে। মধুর সুরে বায়ু অচল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, গাছের ডালে ডালে পাখীসব এসে নীরব হ'য়ে বসে রইলো, সোণার হরিণ দল এসে সারি দিয়ে দাঁড়াল—অপ্সরীদের নাচ দেখতে ; তাদের চোখে পলক নেই ! অপ্সরীরা নাচে আর এক একবার নকল শচীর দিকে আড়চোখে চায়, আর টিপি টিপি হাসে।

এখন—হ'ল কি ? না,—ইন্দ্র বেরিয়ে ছিল মন্দাকিনীর ধারে বেড়াতে। সেই সময়ে সোণার বালির উপর দিয়ে আন্ মনে বেড়াতে বেড়াতে মন্দাকিনীর জলে সোণার আলোর খেলা দেখতে দেখতে হঠাৎ ইন্দ্রের কাণে গিয়ে পোঁছাল—অপ্সরী-দের সেই মধুর সুর। সুরের 'গুণ গুণ' রব উথলে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে

মন্দাকিনীর কুলে, ইন্দ্র আস্তে আস্তে সেইদিকে গিয়ে দেখেন—অপ্সরীদের মজার খেলা! তিনি থাকতে পারলেন না, গিয়ে দাঁড়ালেন পারিজাত গাছের তলায়—সেই নকল শচীর পাশে, দেখতে কেমন শোভা হল! শচীর ত লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল, অপ্সরীদের নাচ গানও একবারটি ক্ষণেকের জন্য থেমে গেল, কিন্তু ইন্দ্রের ইসারায় তখনি আবার নূতন সুর উথলে উঠলো—নূতন তান ল'য়ে আবার সেই রকম ভরপুর নাচ গান। জান্‌লে ভাই সব,—স্বর্গে ত কেবল আমোদ আহ্লাদ, কিন্তু সেখানেও দুঃখ আছে।

"তারপর কি হ'ল?"

এখন, শচী সে সময় বসেছিলেন মা ভবানীর পূজা করতে। তাঁর সাধ হ'ল—তাঁর নিজের হাতে তৈরী করা যে পারিজাত গাছটী, তাতে যে একটী সব চেয়ে বড় ফুল ফুটেছে, সেই ফুলটী এনে মা ভবানীর পায়ে দিয়ে পূজা শেষ করবেন।

রতিকে পাঠালেন—তাঁর বাগান হ'তে সেই ফুলটী তুলে আনতে। রতি বাগানে গিয়ে ব্যাপার দেখেই ত অবাক্। ফুল তুলতে গেলেন—কোন গাছে একটীও ফুল নেই! এসে সব কথা শচীকে বল্‌লেন। শচী তখনি পূজার আসন হ'তে উঠে, তাড়াতাড়ি রাগের ভরে এসে উপস্থিত হ'লেন বাগানে। দূর হ'তে এক অপ্সরীকে ইন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাগে যেন আগুনের মত হ'য়ে গেলেন।

অপ্সরীদের নাচ গান তখনি থেমে গেল, গাছের ডাল হ'তে পাখীরা সব উড়ে দশ দিকে পালিয়ে গেল, সোণার হরিণ সব যে যেভাবে পারলে ছুট দিল, ইন্দ্র অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন, শচী আর বাগানের ভিতর গেলেন না, সেখান হ'তেই অপ্সরীদের শাপ দিলেন—সে কি কঠোর শাপ্!

"কি শাপ দিলেন ?"

শাপ দিলেন—"তোরা যে রকম অত্যাচারী, তোরা স্বর্গে থাকবার যোগ্য নস্ ; যা—তোরা মর্ত্তের পাঁকে গিয়ে জন্মাগে—যা।" তখনি আগুনের হল্কার মত কোথায় চ'লে গেলেন।

"তারপর অপ্সরীরা কি করলে ?"

অপ্সরীরা আর কি করবে ? মাথা হেট করে চোখের জল ফেল্‌তে লাগলো, ইন্দ্র তা'দের সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লেন—"দাড়াও তোমরা—আমি আসছি।"

ইন্দ্র তখনি গিয়ে, কোথাও শচীকে খুঁজে পেলেন না। খুব বড় একটা ফোয়ারার মুখ হ'তে গলান সোণার ধারা উপরে উঠে হাজার হাজার হীরে, জহর, পান্না হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই ফোয়ারার ধারে, একটু দূরে একটা লতায় পাতায় ঘেরা কুঞ্জবন, সেই কুঞ্জবনের ভিতরে সোণার বেদীতে শুয়ে শচী কাঁদ্‌ছেন !

"কাঁদছেন কেন ?"

অভিমান ! নকল শচী নিয়ে ইন্দ্র আমোদ করছিলেন ; তাই তাঁর অভিমান।

ইন্দ্র আস্তে আস্তে বসে কোলে মাথা তুলে নিলেন ; কিন্তু শচী দেবী ইন্দ্র এসেছেন জেনেও মুখ তুলে, চোখ খুলে দেখলেন না ! অনেকক্ষণ অনেক কাকুতি মিনতির পর—তিনি উঠে বসলেন, ইন্দ্র ভয়ে ভয়েই বল্‌লেন "বেচারীদের এবার ক্ষমা কর, ওদের কোন দোষ নেই, ওরা নাচগান করছিল—আমি বেড়াতে বেড়াতে ওখানে উপস্থিত হ'য়েছিলাম মাত্র।"

শচী বল্‌লেন—"তা বেশ ! ওরা আমার গাছের ফুল তুল্‌লে কেন ? ওদের ভয় হ'লনা ? না--ওদের এখানে থাকা হ'বেনা—যাক্ চলে মর্ত্তে।"

ইন্দ্র বল্‌লেন—"তা হ'লে, ওরা কি চিরকালই মর্ত্তে থাক্‌বে ? তা হ'লে এ স্বর্গ যে সৌন্দর্য্য শূন্য হ'বে !"

শচী অভিমান ভরে বল্‌লেন—"না—ওরা ছাড়া তোমার স্বর্গে সুন্দর আর কেউ নেই!"

ইন্দ্র বল্‌লেন—"থাক্‌বেনা কেন? কিন্তু নেচে গেয়ে দেবতাদের কে আমোদ দেবে?"

শচী তখন একটু ভাব্‌লেন—ভেবে বল্‌লেন—"তবে, ওরা বার বৎসর ধরে মর্ত্তে পাপের সাজা ভোগ করবে, আর যে আবাগী তোমার পাশে সোহাগে শচী সেজে দাঁড়িয়ে ছিল—তাকে থাকতে হ'বে চিরকাল।

ইন্দ্র বল্‌লেন—"তাকি হয়? ওকি একলা মর্ত্তে পড়ে থাকবে? ওকেও ক্ষমা কর।"

শচী বল্‌লেন—"তা হ'লেও—ওকে একা মর্ত্তে অনেকদিন থাকতে হ'বে। যদি কোন কুরূপা সাঁতরে গিয়ে ওকে তু'লে এক ডুবে ডাঙ্গায় উঠতে পারে, তবে ও স্বর্গে আস্‌তে পারবে।"

ইন্দ্র বল্‌লেন—"তবে চল। ওদের এই কথা বলে বিদায় দিইগে।"

সেইদিনই সূর্য্যের শেষ রশ্মিটি ধরে অপ্সরীরা ঐ পুকুরে এসে নামলো—আর ডাঙ্গায় উঠলো না। তাদের পা মৃণাল হ'য়ে পাঁকে আটকে রইলো।

এক পুকুর পদ্মফুল! তাদের মধ্যেই ফুটলো একটি পদ্ম—সেটি লাল—সব চেয়ে বড়। তাই লোকে সকালে উঠে দেখলো—যেখানে একটিও পদ্মের পাতা ছিলনা, সেখানে শত শত পদ্ম আকাশ পানে চেয়ে ফুটে আছে। নিভা মা, গল্পটা কেমন লাগছে?

নিভা ঘাড় নেড়ে বল্‌লে—"বেশ।"

তারপর শুন—বার বৎসর ধরে, ঐ পুকুরে কাতারে কাতারে, পদ্ম ফুল ফুট্‌তে লাগলো। বার বৎসর পর একদিন সকালে সকলে দেখলে—পুকুরে আর একটিও

ফুল নেই—কোথায় গেল ? পুকুরের জল পরিষ্কার তক্ তক্ করছে ; জলে ছোট ঢেউ উঠে—চারিদিক্ ছুটাছুটি করছে ;—কেবল মধ্যে একটি বড় লাল পদ্ম শূন্যে চেয়ে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে !

পদ্মটা অনেক দিন সেখানে রইলো, একদিন এক কাল কুৎসিত মেয়েকে ঐ পুকুরের ঘাটে নাওয়াতে নিয়ে এলো—তার বিয়ে হ'বে. সে মেয়েটি ছিল ঘোষেদের বাড়ীর। ঘোষেরা খুব বড় লোক ছিল, তাদের বাড়ী ছিল ঐ পুকুরে যেতে বাঁদিকে যে একটা বকুল গাছ আছে, সেইখানে। কাল মেয়েটির কোন মতে বিয়ে হয় না, ঘোষ বুড়ো বড় বিপদে পড়লো। কাল কুৎসিতকে কে বিয়ে করতে চায় বল ? ভাগ্যে আমাদের নিভা মা কাল নয় ! তা হ'লে নিভার বাপও বিপদে পড়তো।

নিভা হেসে, ছোট হাত নেড়ে বল্লে—"যা !"

"যা" নয়—সত্যি ! তা হ'লে কিন্তু ঘোষ বুড়ো যা করেছিল, তাই করা যেত।

"কি করে ছিল ?"

সে এক পড়শীর ভাল মেয়ে দেখিয়ে বিয়ের ঠিক করে ছিল, কিন্তু তারা তলে তলে পড়শীর মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দেবার যুক্তি এঁটে ছিল, কিন্তু ভগবান্ ঘোষ বুড়োকে রক্ষা করলে। রাখে কৃষ্ণ মারে কে !

ঘোষ বুড়ো তার নাত্নীকে পাঠিয়ে দিলে ঐ পুকুরে নাওয়াতে, সেই সময়ে সন্ন্যাসী বসে ছিল ঐ পুকুরের পশ্চিম পাড়ে, আমিও সেইখানে বসেছিলাম। বিয়ের আগের দিন ঘোষ বুড়ো সন্ন্যাসীর কাছে বেড়াতে এসে ছিল, সন্ন্যাসী তার নাত্-নীকে ঐ পুকুরে নাওয়াতে বলে দিয়েছিলেন, তা না হ'লে আগে বর কনে নাওয়ান হ'ত ত মালঞ্চিতেই।

আমরা বসে আছি গাছের তলায়। দেখি, মেয়েরা কনে নাওয়াতে এল শাঁখ বাজিয়ে।

কাল মেয়েটার সঙ্গে ভাল মেয়েটাকেও পাঠিয়ে দিয়েছে গায়ে হলুদ ছুঁইয়ে! জলে নেমে কাল মেয়েটার কি খেয়াল হ'ল, সাঁতরে পুকুরের মাঝখানে যে বড় লাল পদ্মটা ফুটে আছে, তুলে আন্‌বে! ভাল মেয়েটাও সাঁতরে চল্‌লো, সকলে নিষেধ করতে লাগলো—ডাকাডাকি করতে লাগলো; তারা কিছুতেই শুন্‌লো না, কখনো কাল মেয়েটা এগিয়ে যেতে লাগলো; কখনো ভাল মেয়েটা এগিয়ে পড়তে লাগলো, দেখতে দেখতে কাল মেয়েটি হাত বাড়িয়ে ফুলটি ধরে টান দিল, অমনি ফুলটি মৃণালের সঙ্গে উপ্‌ড়ে এল, ভাল মেয়েটি তার হাত হ'তে ফুলটি কেড়ে নিতে গিয়ে, মৃণাল পায়ে জড়িয়ে পুকুরের জলে ডুবে গেল! কাল মেয়েটিও ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে ছিল, সেও ডুবে গেল! আমরা তখনি ছুটে গিয়ে পড়লাম, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কত খোঁজা খুঁজি করতে লাগলাম; কিন্তু কোথাও তাদের পাওয়া গেলনা! মেয়েরা পুকুর ধারে দাঁড়িয়ে "হাউ মাউ" করে কাঁদ্‌তে আরম্ভ করে দিলে, খুঁজতে খুঁজতে সন্ন্যাসীর হাতে এক রাশ চুল ভেসে উঠলো; চুল ধরে টেনে তুলে সন্ন্যাসী তাকে পুকুরের পাড়ে শুইয়ে দিল। কিন্তু একে! কেউ একে চিন্‌তে পারে না! এত দুজনার মধ্যে কেউ নয়! কী এর রূপ! যেন ঘুমন্ত অপ্সরী! সকলে মিলে চেতন করবার চেষ্টা করতে লাগলো; দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেমন সকালের আলো গেলে, এক একটি করে পদ্মের পাপড়ী খুলে যায়, তেমনি করে মেয়ে দুটির চোখের পাতা খুলে গেল। সাম্‌নেই তার মা দাঁড়িয়ে ছিল; তাকে দেখে ডাক্‌লে—"মা!" তখন সকলে বুঝলো—এই সেই কাল মেয়ে। কিন্তু এমন সুন্দরী হ'ল কি করে!

"সুন্দরী হ'ল কি করে!"

সন্ন্যাসী বলে ছিলেন,—পদ্ম ফুলটা ছিঁড়ে অপ্সরীকে মুক্তি দিয়েছিল বলে, অপ্সরী তাকে সুন্দরী করে দিয়ে গেল।"

"আর—সেই ভাল মেয়েটা ?"

সে আর উঠলো না ; তার বাপ মা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে গেল।

"তারপর ?"

তারপর আর কি ? সেই থেকে ঐ পুকুরটার নাম হ'ল রূপ সাগর, সেই থেকে ছেলেমেয়ে সকলকার বিয়ের সময়, ঐ পুকুরে নাইয়ে নিয়ে যাওয়া নিয়ম হ'ল, কিন্তু আর কেউ কৈ সুন্দরীত হ'ল না ! সেই যা হয়েছিল।

অনেকটা রাত হ'য়ে গেছে ; আজ এস, কাল আবার গল্প শুন। ছেলেরা সব হৈ হৈ করে বাড়ী ফিরে গেল, আমরাও বাড়ী চলে এলাম।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

# আলেকজেণ্ডারের ভারতাক্রমণ।

গ্রীস দেশের অন্তঃর্গত মাসিডনের অধিপতি মহাবীর আলেকজেণ্ডারের নাম জগৎ প্রসিদ্ধ। সেই হিন্দু রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি গ্রীসদেশে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সাহসী, পরাক্রান্ত যোদ্ধা নৃপতি জগতে বিরল ছিল। ইতিহাসে তিনি "মহাবীর আলেকজেণ্ডার" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি স্বীয় বাহুবলে বহুদেশ জয় করিয়া "মহাবীর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ এশিয়া মাইনর এবং পারশ্য দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং তুর্কিস্থান ও আফগানিস্থান অধিকার করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। সেই সময়ে ভরতবর্ষ ধনে রত্নে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া জগতে পরিচিত ছিল। বহু বৈদেশীক রাজাদের ও আক্রমণকারীদের ভারতের প্রতি তীব্র কটাক্ষ ছিল। মহাবীর আলেকজেণ্ডারও ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না।

খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের খাইবার পাস্ নামক গিরিপথ দিয়া আলেকজেণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। প্রথমত তিনি সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষ বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, এবং কোন রাজার সহিত কোন রাজার একতা বা সৌহৃদ্য ছিল না, বিপদে আপদে কেহ কাহারও সাহায্য করিত না। এই একতার অভাবেই ভারতের অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছিল। আলেকজেণ্ডার যখন পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করেন তখন পঞ্জাবে পুরু নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। আলেকজেণ্ডার ভারতে প্রবেশ করিতে কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইলেন না, কারণ বিভিন্ন খণ্ডরাজ্যের রাজাদের মধ্যে একতা ও সখ্য না থাকার দরুণ কেহই আলেকজেণ্ডারের সম্মুখীন হইয়া বাধা দিতে সাহস করিলেন না, আলেকজেণ্ডারও সানন্দে, নির্ব্বিবাদে পঞ্জাব প্রদেশে সসৈন্যে প্রবেশ করিলেন।

তক্ষশীলার রাজা ভয়ে আলেকজেণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিলেন। পুরু আলেকজেণ্ডারকে আপন রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত বা ভীত হইলেন না। তিনি একাকীই সসৈন্যে মহাবীর আলেকজেণ্ডারকে বাধা প্রদান করিলেন। পঞ্জাবের ঝেলাম নদীর তীরে পুরু ও আলেকজেণ্ডার মহা-পরাক্রমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের অন্য কোন রাজা পুরুর সাহায্যে আসিলেন না, কাজেই একাকী পুরুর পক্ষে মহাবীর আলেকজেণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করা অসম্ভব হইল। কিন্তু তথাপি পুরু প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুকাল যুদ্ধের পর পুরুর বহু সৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় পুরু আর জয়ী হইতে পারিলেন না। আলেকজেণ্ডার পুরুকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিলেন। আলেকজেণ্ডার ভারতের অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে কোন রাজার সহিত কাহারও একতা নাই, এই অবস্থায় একাকী পুরুকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে

দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পুরুর এই প্রকার অসাধারণ রাজোচিত সাহস দর্শন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। আলেকজেণ্ডার একজন জগদ্বিখ্যাত যোদ্ধা। সকল রাজাই তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন অথচ পুরু বীরের মত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন। পুরুর এই প্রকার বীরত্বে আলেকজেণ্ডার অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং বন্দী পুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার নিকট কেমন ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করেন?" পুরু বীরের মত নির্ভয়ে সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "রাজার মত ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি!" আলেকজেণ্ডার পুরুর এই বীরোচিত প্রত্যুত্তর শ্রবণে ততোধিক আশ্চর্য্য ও সুখী হইলেন।

পুরুর বীরত্বে সন্তোষ লাভ করিয়া আলেকজেণ্ডার পুরুকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং পুরুর রাজ্য আরো বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ইহার পর আলেকজেণ্ডার ভারতের আরো কতিপয় নগর আক্রমণ করিতে গমন করেন, কিন্তু সৈন্যদল পরিশ্রান্ত হওয়ায় আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। খৃঃ পূর্ব্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজেণ্ডার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি সেলুকাস্ তাঁহার ভারতের বিজিত নগর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আলেকজেণ্ডারের এই অভিযান ইতিহাসে "আলেকজেণ্ডারের ভারতাক্রমণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। আলেকজেণ্ডার এই দেশে আসিয়া যাহা যাহা দর্শন করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালক্রমে সেই বিবরণ বিনষ্ট প্রায় হইয়া যায়; ঐতিহাসিকগণ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিয়াই ভারতের ইতিহাসে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# মজার ছবি।

এ'টি একটি মজার ছবি। দোয়াত উল্‌টে গিয়ে একটা ছবি হয়ে গেছে। তোমরা যদি অংশগুলি কেটে কেটে জোড়া দিয়ে দেখ, একটি ছবি পাবে। আঁক্‌তে হবে না, তোমরা শুধু বলে দিও, সেটা কিসের ছবি! আমরা পরের মাসে ছবিটা ছাপব—আমরা সে'টা আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রেখেছি।



ছেলেমেয়েদের জাতীয় ও নৈতিক উন্নতির জন্য

# শিশুতোষ সিরিজ

সম্পাদক—

**শ্রীশিশির কুমার মিত্র, বি, এ।**

আশ্বিন ১৩২৭ হইতে প্রতি মাসে একখানি করিয়া প্রকাশিত হইতেছে।

প্রত্যেক বই-তে অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে।

মোটা এ্যান্টিকে, রং-বেরঙের কালিতে ছাপা।

সডাক বার্ষিক মূল্য ৪৲; যাণ্মাষিক মূল্য ২৲; প্রতি সংখ্যা ।৵০।

১। পৃথিবীর জন্ম
২। প্রকৃতির পরাভব
৩। কানুর কীর্ত্তি
৪। আর্য্য ও অনার্য্য
৫। আজগুবি জন্মকথা
৬। ছেলেদের বিষ্ণুপুরাণ
৭। গল্পে রামকৃষ্ণ
৮। সত্যযুগের কথা
৯। উদোলবুড়োর সাঁওতালি গল্প
১০। রামকৃষ্ণের আরো গল্প
১১। সতী
১২। উদোলবুড়োর আরো গল্প
১৩। বাপ্পাবীর
১৪। পৌরাণিক জন্মকথা
১৫। মহম্মদ মহসীন
১৬। কর্ম্মদেবী
১৭। মজার গল্প
১৮। ভীষ্ম
১৯। রামকৃষ্ণের নূতন গল্প
২০। জাতকের গল্প
২১। হামির
২২। রামকৃষ্ণের দেদার গল্প
২৩। ঠাকুরদের গল্প
২৪। ভাই ভাই
২৫। কালিদাসের আজব গল্প
২৬। ডাইনি মাসি
২৭। রাজকন্যা
১৮। চণ্ড
২৯। আজব গল্প
৩০। স্বপ্নপুরী
৩১। রাণা কুম্ভ
৩২। রাজপুত্র
৩৩। গল্পকথা
৩৪। বোকা আইভান
৩৫। সপ্তর্ষি



# আমার দেশ

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। পৌষ, ১৩৬০।

## বুদ্ধিমান

ভাগলপুরের কাছাকাছি কোন একটি হিন্দু সরাইয়ে এক সন্ধ্যাকালে তিন জন লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তিনজনের দুইজন বন্ধু, অন্যজন অপরিচিত, অন্যদিক হইতে সে আসিয়াছে। সরাইয়ে একজনের মত আহার্য্য ছিল, সরাইয়ের কর্ত্তা চিন্তিত হইয়া পড়িল, কারণ দুইক্রোশের মধ্যে আর দোকান পাট নাই যে সেখান হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া খাবার করিয়া দিবে। অতিথি তিনটিকে সেই কথা বলিল।

তিনজনেই বলিল—তার আর কি! ঐ একজনের খাবার যা আছে, তাহাই আমরা তিন ভাগ করিয়া খাইব' খন, দাও।

সরাইয়ে একটি মাত্র ঘর, সেই ঘরের মেঝেয় তিনখানি চেটাই পাতিয়া তিন অতিথি বসিয়া পরামর্শ করিল।

ঐ সামান্য খাবার যদি এখনই খাইয়া ফেলা হয় তবে সারারাত্রি ক্ষুধার

জ্বালায় পেট কাঁদিবে, তার চেয়ে এখন সকলেই পথশ্রমে শ্রান্ত ক্লান্ত, এখন কিছুক্ষণ ঘুমাইয়া লওয়া যাক, অধিক রাত্রে উঠিয়া ভোজন করিলেই হইবে।—প্রথম জন এই কথা বলিল। মনে মনে তাহার ইচ্ছা ইহারা একবার ঘুমাইলে হয়।

তাহার বন্ধু তাহার কথায় সায় দিল।

অন্যজন কি করে! মনে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হইলেও সে মুখে রাজীই হইল।

প্রথম জন 'ঘুমাইব না' ভাবিতে ভাবিতেই ঘুমাইয়া পড়িল; তাহার বন্ধু একটু গড়াইয়া লইতে গিয়া ভোঁস ভোঁস করিয়া নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল। তৃতীয় ব্যক্তি রাগে ফুলিয়া ফুঁপিয়া গোঁ হইয়া বসিয়া রহিল। যখন দেখিল, অন্য দুইজন ঘোর নিদ্রামগ্ন, তখন উঠিয়া সমস্ত খাবার খাইয়া মিছা ঘুম ঘুমাইতে লাগিল।

প্রায় মধ্য রাত্রে প্রথম ব্যক্তি জাগিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জাগাইয়া বলিল-ভাইরে একটা বড মজার স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখলুম স্বর্গ থেকে দেবদূতেরা এসে আমায় যেন স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে।

তোর ত বরাত ভালরে ভাই! দ্বিতীয় ব্যক্তি কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—আমাকে ভাই যমদূতেরা নরকে নিয়ে যাচ্ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তি যে ভিজে বেড়ালের মত এতক্ষণ পড়িয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল—এই যে তোমরা এসেছ! আঃ বাঁচলুম! আমি ভেবেছিলুম তোমায় যখন স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছে আর তোমায় যখন নরকে তখন তোমরা আর ফিরছ না। ভেবে মনের দুঃখে - খাবারটা নেহাৎ নষ্ট হয় দেখে আমি খেয়ে শুয়ে পড়লুম। যাক্, ফিরে যে আসতে পেরেছ, সেই ঢের। এখন শুয়ে পড়, রাতটুকু ত কাটিয়ে দাও, তার পর দেখা যাবে।

বলা বাহুল্য বোধহয় যে ভরা পেটে এখন তার খুবই ঘুম আসছিল।

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার।

# সাধুপিটারের কারামুক্তি

সাধু পিটার শত্রুকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া কারারুদ্ধ ছিলেন। কারাগারের লৌহ-গারদের অভ্যন্তরে তাঁহার ন্যায় সাধু ধার্ম্মিক ব্যক্তি—শৃঙ্খলদ্বারা হস্তপদে আবদ্ধ রহিয়াও অটল অচলভাবে ধ্যান পরায়ণ। ভক্তের এইরূপ নির্য্যাতনে, দেবতার আসন টলিল। দেবদূত তাঁহার কারামুক্তির জন্য আবির্ভূত হইলেন। উজ্জ্বল দীপ্তিতে কারাগৃহ আলোকিত হইল, সেই উজ্জ্বল দীপ্তি কারারক্ষকগণ সহ্য করিতে পারিলেন না—তাঁহাদের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। দেবদূত নিজ হস্তে ভক্তের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিলেন। এই চিত্রখানি ভুবন বিখ্যাত চিত্রকর র‍্যাফেলের অঙ্কিত। নিদ্রিত পিটারের মুখে ভক্তি ও ধৈর্য্যের মহান্‌ভাব পরিস্ফুট! দেবদূতের উজ্জ্বল দীপ্তি—প্রহরীগণের বিহ্বলভাব নিপুণ শিল্পীর হস্তে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

র‍্যাফেল—



# পুনরুত্থান।

র‍্যাফেলের অঙ্কিত ইহাই শেষ চিত্র। যীশুখ্রীষ্ট যে দিন সমাধিগহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন—এইটি সেই পুনরুত্থানের চিত্র। চিত্রে দেখিতে পাইতেছি, যে খ্রীষ্ট স্বর্গপথে উত্থিত হইয়াও শিষ্যদের ভুলিতে পারেন নাই। তিনি দুই হস্ত বিস্তারিত করিয়া শুভ অভয় আশীর্ব্বাদ প্রচার করিতেছেন। তাঁহার মুখ জ্যোতিঃ বিভাসিত।

—র‍্যাফেল—



# মূর্ত্তিনির্ম্মাণরত—

# মাইকেল এঞ্জেলো

জগদ্বিখ্যাত মাইকেল এঞ্জেলোর কথা তোমরা বেশ জান। তাঁহার নির্ম্মিত মূসার বিরাট মূর্ত্তিটি অদ্বিতীয়। অত বড় মূর্ত্তি পৃথিবীর মধ্যেই বড় কম দেখা যায়। চিত্রে দেখ—মাইকেল এঞ্জেলো আদর্শ প্রতিমার দিকে কেমন নিবিষ্ট মনে চাহিয়া গঠনের পরিকল্পনা করিতেছেন। তাঁহার এক হাতে হাতুড়ী—অপর হাতে বাটূলী, আর চোখের ভিতর অপলক দৃষ্টি।

—মাইকেল এঞ্জেলো—



# মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড মূর্ত্তি

ফ্লোরেন্স নগরীর এক স্থানে একটি প্রকাণ্ড মর্ম্মর প্রস্তর পড়িয়াছিল—ঐ মর্ম্মর প্রস্তর কুঁদিয়া মূর্ত্তি গড়িবার জন্য কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু পারেন নাই। মাইকেল এঞ্জেলো দানরূপে এই প্রস্তরটি প্রাপ্ত হইয়া দুই বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করিয়া ডেভিডের বিশ্ববিমোহনকারী অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। আজও এই বিচিত্র মূর্ত্তির তুলনা মেলা ভার। ফ্লোরেন্সের একটি পর্ব্বতোপরি মূর্ত্তিটি বহুদিন পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাপিত ছিল।

—মাইকেল এঞ্জেলো—



# রাস্কিণের পনরটী উপদেশ বাণী

( শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ )



ভগবান যা'কে যেমন কাজ করতে দিয়ে থাকেন—সেই কাজের উপযোগী সময়ও তিনি সে সঙ্গেই তা'কে দিয়ে থাকেন।

* * *

অন্তরের দৃঢ়তা এবং মনের দৃঢ়তা—জীবনের উন্নতিলাভ করতে হ'লে এ দু'টো জিনিসেরই নিতান্ত দরকার।

* * *

প্রত্যেকের জীবনই একটা সঙ্গীতের মত—কিন্তু প্রাণের তন্ত্রীতে ঠিকমত আঘাত দেওয়া চাই—নইলে বেসুর বেজে উঠে।

* * *

কোনো রমণীকেই তুমি রমণীয় করে তুলতে পারবে না যদি না তাকে তোমার প্রেম দিয়ে সুখী করতে পার।

* * *

প্রত্যেক ভাল কাজ এবং সৎচিন্তা মানুষের মুখে চোখে একটা অব্যক্ত সৌন্দর্য্যের ছাপ রেখে যায়।

* * *

পৃথিবীতে আমরা এমন কোন কাজ করতে আসি নি যা'তে আমাদের প্রাণ সায় দিতে চায় না।

* * *

মন্দভাবে অর্থ নষ্ট হওয়া খারাপ বটে, কিন্তু মন্দ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করা ততোধিক খারাপ,—তার চেয়ে আরো খারাপ হচ্ছে ঐ অর্থ মন্দ কাজে ব্যয় করা।

* * *

সুন্দরী রমণীর বিচরণপথ সুন্দর ফুলেতে ছাওয়া বটে কিন্তু সে ফুল আমরা দেখ্‌তে পাই তা'র চলে যাওয়ার পর—কেননা তা'র চরণপরশেই যে ফুলগুলি ফুটে ওঠে—বিনা পরশে ত সে ফুল ফোটে না।

* * * *

শিক্ষালাভ করলে আমাদের এই উপকার হয় যে আমরা সকল প্রকার সমস্যা এবং বিপদের সময় জ্ঞানী ও বড়লোকের পরামর্শ নিতে পারি।

* * * *

যে ঘোড়া চড়তে জানে না তার কাছে একটা ভাল ঘোড়া যেমন, যে চোখে দেখ্‌তে পায় না তার কাছে একখানা ভাল ছবিও ঠিক তেমনি ; একটি ভাল জিনিষ তারই কাছে মূল্যবান যে মন্দ জিনিষকে ঘৃণা করে।

* * * *

একজন ভদ্রলোকের ছেলে যদি খবরের কাগজ বিক্রী ক'রে খায়, কিম্বা দিনমজুরী করে জীবিকার্জ্জন করে তাহ'লে তা'তে নিন্দার কথা কিছু থাক্‌তে পারে না, কিন্তু যদি সে চোর হয় কিম্বা তেম্‌নি কোন হীন কাজে লিপ্ত থাকে তবে তা'তে আর লজ্জার সীমা থাকে না।

* * * *

ভাল উপন্যাস সেখানেই অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে ওঠে যেখানে উত্তেজনা দ্বারা সাধারণ জীবনযাত্রাকে অপ্রীতিকর করে তোলে এবং এমনি সব আজগবী দৃশ্যের অবতারণা করে যা আমরা বাস্তবজগতে কোনদিনই দেখ্‌তে পাব না।

* * * *

প্রভাতে যেমন দিনের আরম্ভ এবং সন্ধ্যায় শেষ তেমনি জীবনের ও প্রভাতে সুরু, সূর্য্যাস্তে অবসান। সুতরাং এই স্বল্পজীবনের প্রত্যেকটা দিন এমন কিছু ভাল কাজ করে রাখ্‌বে যা'তে পরবর্ত্তী মানব তা'র সুফল লাভ করতে পারে এবং নিজেও জ্ঞান এবং শক্তি সঞ্চয় করে নিজেকে সার্থক করে তুল্‌বে।

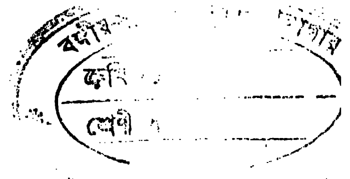
* * * *

আমরা যখনি কিছু গড়ে তুল্‌ব সেটাকে এম্‌নিভাবে গড়ে তুল্‌তে হবে যেন আমাদের পরবর্ত্তীরেরা তা দেখে গর্ব্ব অনুভব করতে পারে।

* * * *

সংসারে প্রাণের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই। যে জীবন প্রেমময়, আনন্দময় এবং যশোময় সে জীবনই প্রার্থনীয়। সেই দেশই সব চেয়ে ধনী যে দেশে যত বেশী মহৎ ও সুখী লোকের বাস।

---



# জেনে রাখ।

## বালি দিয়ে আগুন চাপা—

তোমরা দেখে থাক্‌বে বড় দালানে, ফ্যাক্টরীতে কিম্বা অফিসের বারাণ্ডায় একসারি বাল্‌তী ঝুলান থাকে এবং তাহাতে সর্ব্বদা জল ভরে রাখা হয়। যদি হঠাৎ আগুন লেগে যায় তবে তাড়াতাড়ি ঐ বাল্‌তীর জল ঢেলে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়। আজকাল কোন কোন জায়গায় দেখা যায় বাল্‌তিতে জল নেই কিন্তু বালিতে ভরা। হয়তো তোমরা প্রশ্ন করবে—জলের কাজ কি বালি দিয়ে হয়? উত্তরে বল্‌ব—কোন কোন জায়গায় হয় বই কি! কোন দালানে যদি ইলেক্‌ট্রিকের তার ছিঁড়ে গিয়ে আগুন লেগে যায় তা হ'লে সেখানে জলের চেয়ে বালিতেই উপকার হয় বেশী; ইলেক্‌ট্রিকের আগুনে জল ছিটিয়ে দিলে তা'তে করে বিদ্যুতের তেজ আরো বেড়ে যায় এবং হিতে বিপরীত কাণ্ড ঘটে, কিন্তু সেখানে যদি বালি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে বিদ্যুতের আগুন সহজেই নিভে যায়।

---

## টুপী খুলে সম্ভ্রম দেখান—

একজন সাহেব রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে—পথে একটী মেম্‌সাহেবের সাথে দেখা, অম্‌নি সাহেব মাথা থেকে টুপীখানা খুলে মেম্‌সাহেবকে অভিবাদন করলে। এই যে মাথা থেকে টুপী খুলে ফেলে সম্ভ্রম জানাবার নিয়ম—এ কেমন করে কবে থেকে হ'ল তা কি কেউ জান?

ইয়োরোপে আগেকার দিনে একদল সাহসী বীর ছিল—তা'দের নাম ছিল নাইট—Knight. তারা সর্ব্বদা লোহার বর্ম্ম পরে তীর বর্শা তরোয়াল নিয়ে চলাফেরা করত এবং বিশেষ করে মেয়েদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করাই তা'দের ধর্ম্ম ছিল। তখনকার সময়কে তাই বলা হয়ে থাকে--The days of chivalry. ঐ সময়ে শত্রুদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য নাইট্গণ লোহার মুখোস্ পরে থাকৃত! মুখোসের ভিতর শত্রু রয়েছে কি মিত্র রয়েছে বাহিরে থেকে তা জানবার উপায় ছিল না! কোনো নাইট্ কারো বাড়ীতে যদি আতিথ্য স্বীকার করতে যেত তা হ'লে সে প্রথমে বাড়ীতে ঢুকেই মুখোস্ খুলে ফেলে সবাইকে জানিয়ে দিত যে সে শত্রু নয়—সে একজন অতিথি মাত্র, একটু আশ্রয় চাইতে এসেছে, কাউকে সে খুন্ করতে আসে নি। সেই একই কারণে যদি রাস্তায় কোন পরিচিতা মহিলার সঙ্গে তা'র সাক্ষাৎ হয় এবং সে কথা বল্তে চায় তবে তা'র মুখোস্টী আর না খুলে থাকৃতে পারে না। আজকালকার সাহেবগণ মুখোসও পরে না, লোহার পোষাকও পরে না—তবু সেই নাইট্দের দেখাদেখি কি আর করবে—মেয়েদের সাম্নে তাই মুখোসের বদলে টুপীটাই খুলে ফেলে! সভ্যতার নিয়ম এমনি ভাবে কোথা থেকে কোথায় চলে এসেছে।

---

## আলোর চিম্নী

আমরা সাধারণতঃ যে সব ল্যাম্প ব্যবহার করি তা'তে একটী করে চিম্নী থাকে। এই চিম্নী না থাকলে পরিষ্কার আলো পাওয়া ত দূরের কথা—ধোঁয়ায় আমাদের ঘর কালো হয়ে যেত। কাঁচের চিম্নী থাকাটা নিতান্ত দরকার, কেননা তাতে বাইরের ঝাপ্টা বাতাস এসে আলোটাকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে

দিতে পারে না ; তা ছাড়া সল্‌তে যে জ্বলে সে আগুণ ত অক্সিজেন ছাড়া জ্বল্‌তে পারে না এবং সেই অক্সিজেন এক জায়গায় জমাট হ'য়ে থাকা চাই—আর চাই তার উপরের দিকে একভাবে একটানা গতি। যেখানটায় সল্‌তে এসে আগুনের জিহ্বা মেলে দিয়েছে ঠিক তার নীচেই একখানা পাতলা ধাতু আছে—সেখানা ছিদ্র বহুল। ঐ ছোট ছোট ছিদ্র পথে অক্সিজেন ভিতরে গিয়ে আগুণের খাদ্য জোগায়—সেই অক্সিজেন আগুণে পুড়ে গরম হাওয়া হ'য়ে চিম্‌ণীর উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এম্‌নি ভাবে নীচ দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুক্‌ছে আর উপর দিয়ে গরম হ'য়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—অবিরাম গতিতে এমনি ভাবে অক্সিজেনের আসা যাওয়া চল্‌ছে এবং তা'তে করেই চিম্‌ণীর আলো নিবাত নিষ্কম্প ভাবে জ্বলে' আলো বিকিরণ করছে। চিম্‌ণী ছাড়া দেশী ল্যাম্প যে কি ভীষণ ধোঁয়া ছাড়ে তা সকলেরই জানা আছে—ঐ ল্যাম্পে যদি চিম্‌ণী বসিয়ে দেওয়া যায় তবে কিন্তু আলো ঠিক জ্বল্‌বে না—চিম্‌ণীর ভিতর একরাশ ধোঁয়া জমে উঠ্‌বে এবং শেষ-কালে আলোটাকেই নিকাশ করে ফেল্‌বে। এর কারণ এই—চিম্‌ণীর ভিতর অক্সিজেন প্রবেশ করবার পথ তো নেই—নীচের দিক বন্ধ, উপরের দিকে ত আগুণের শিস্ উঠে অক্সিজেনকে আগেই পুড়িয়ে দিচ্ছে - সল্‌তের কাছে যে অক্সিজেন পৌঁছতেই পারছে না! আজকাল অভ্রের চিম্‌ণী বেরিয়েছে বটে কিন্তু তাতে ঠিক কাঁচের চিম্‌ণীর পরিষ্কার আলো পাওয়া যাচ্ছে না। কাঁচের চিম্‌ণীই সব চেয়ে ভাল—তবে তা'র একটা দোষ—আঘাত সে একটুও সইতে পারে না। চোট লেগেও ভাঙ্গবে না এমনি আঘাত-প্রুফ্ চিম্‌ণী কবে বের হ'বে তারই প্রতীক্ষায় আমরা পশ্চিমের দিকে চেয়ে আছি।

———

## রেইলওয়ে প্ল্যাট্ফর্ম—

প্রত্যেক রেলষ্টেশনেই দেখ্তে পাওয়া যায় প্ল্যাটফরম্ যেখানটায় গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে কোন সিড়ি নেই—মাথার দিকে খানিকটা জায়গা ঢালু হ'য়ে ক্রমশঃ সমতল হ'য়ে গিয়েছে। এটা নিশ্চয়ই সবার জানা আছে যে রেললাইনের চেয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাট্ফরম্ সব খানেই খানিকটা উঁচু হ'য়ে থাকে। উঁচু থেকে নীচুতে নাম্তে হ'লেই সিড়ির দরকার এবং এক রেইলওয়ে প্ল্যাট্ফরম্ ছাড়া আর সব খানেই আমরা সিঁড়ি বেয়েই উঠানামা করে থাকি। কিন্তু এই জায়গায় এমন বিশেষত্ব কেন? এরও একটা কারণ আছে। আগে হয়তো প্ল্যাটফরম্ থেকে নামবার জায়গায় সিড়িই থাক্ত এবং হয়তো রেলের কোন বড় সাহেব কোন এক আঁধার রাত্তিরে প্ল্যাট্ফরম্ থেকে চল্তে চল্তে কোন্খান্টায় যে সিড়ি আরম্ভ হয়েছে তা জান্তে না পেরে হুড়মুড় করে খুব একচোট ডিগ্বাজী খেয়েছিলেন! তাই থেকে নিয়ম হয়েছে—নিয়ম বলি কেন—আইন লিপিবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে যে কোন প্ল্যাট্ফর্মের শেষ সীমানায় সিড়ি থাক্তে পারবে না—সে দিক্টা ক্রমশঃ ঢালু করে সমতল ভূমির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সিড়ি না থাকার একটা সুবিধা এই—অন্ধকারে চল্তে গিয়ে কোন্ জায়গায় প্ল্যাট্র্ফম্ শেষ হয়েছে তা না জান্লেও কিছু হুড়মুড় করে কেউ ডিগবাজী খেতে সুরু করবে না—যেখানটায় ঢালু আরম্ভ হয়েছে সেখানে পা পড়লেই তা টের পাওয়া যাবে এবং প্ল্যাট্ফরমের শেষ সীমানায় আসা গেছে জেনে সমতল ভূমিতে পা ফেলবার জন্য আগে থাক্তেই হুঁসিয়ার হওয়া যাবে।

---

### বইয়ের মাথায় সোণার গিল্‌টী—

খুব মোটা এবং দামী বই খুব জমকালো রূপে বাঁধান হয় এবং তা'তে দেখা যায় পাতার বাইরের দিকে সোণার গিল্‌টী করা আছে। এরকম করা হয় যে শুধু সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্য তা নয়—এর আরো একটা উপকারীতা আছে। বই গুলি যখন সেল্‌ফে থাকে তখন ধূলা এসে বইএর উপর জম্‌তে থাকে এবং ক্রমশঃ পাতাগুলি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ঐ সোণার গিল্‌টী করা থাকাতে ধূলা পুস্তকটীকে নষ্ট করতে পারে না—বই ঝেড়ে ফেল্‌লেই ধূলা আপনি দূর হয়ে যায় এবং পুস্তকের চাক্‌চিক্য ঠিক যেমনটি ছিল তেমনি থাকে।

### চেকের মাথায় ষ্ট্যাম্প—

প্রত্যেক চেকের মাথায় ডানদিকের কোণে ডিম্বাকৃতি একখানা ষ্ট্যাম্প চিহ্ন থাকে। চেক্‌ মাত্রই ঐ রকম ষ্ট্যাম্পযুক্ত থাকবে—যদি না থাকে তবে যা'র চেক্‌ তা'র শাস্তি হবে—এই হচ্ছে আইন। ঐ ষ্ট্যাম্প দেওয়ার মানে হচ্ছে যে, যে কোম্পানী চেক্‌ দিচ্ছে তা'র কাছ থেকে রাজস্ব বা ট্যাক্স আদায় করা। চার পয়সার একখানা টিকিট লাগিয়ে দিলেও চলে কিন্তু বার বার টিকিট কিনে আনা ও লাগিয়ে দেওয়ার হাঙ্গামা থেকে বাঁচবার জন্য প্রত্যেক কোম্পানী নিজেদের নামে চেক্‌ ছাপিয়ে নেয় এবং সেই সঙ্গে ডিম্বাকৃতি এক আনার ষ্ট্যাম্পও ছাপিয়ে নেয়—অবশ্য এজন্য গভর্ণমেণ্টকে রীতিমত ট্যাক্স দিতে হয়।

——:*:০:*:——

## জেনে রাখবার মত

### টাকা আধুলির চারধারে খাঁজকাটা থাকে কেন ?—

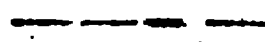
শুধু সৌন্দর্য্য বাড়াবার জন্যই টাকা আধুলি প্রভৃতি মুদ্রার চারধারে খাঁজ-কাটা থাকে এরূপ মনে করলে কিন্তু ভুল করা হবে—খাঁজকাটার অন্য উদ্দেশ্য

আছে—সেটা হচ্ছে দুষ্ট লোকের দুষ্টবুদ্ধিকে জব্দ করা। প্রাচীনকালে যে সকল মুদ্রা তৈরি হ'ত সে গুলির চারধার কিন্তু মসৃণ থাকৃত। যারা চোর এবং সয়তানী বুদ্ধিতে ওস্তাদ তা'রা করত কি—ঐ মূদ্রার চারপাশ থেকে—সেটা সোণারই হোক কিম্বা রূপারই হোক্ মূল্যবান ধাতু হলেই তার চারপাশ থেকে কিছু কিছু করে কেটে নিয়ে যেত। এমনি ভাবে নানা জনের হাত ঘুরে ক্রমশ মুদ্রাগুলি আকারে ছোট এবং ওজনে হালকা হয়ে অবশেষে একেবারে অচল হয়ে যেত—সে মূদ্রা আর কেউ নিতে চাইত না। এই জাল জুয়াচুরীর হাত থেকে মূল্যবান মূদ্রাকে মুক্ত করবার জন্য যে নূতন উপায় উদ্ভাবন করা হ'ল সে-ই হচ্ছে মূদ্রার চারধারে খাঁজকেটে দেওয়া। সোণারূপা প্রভৃতি মূল্যবান মূদ্রার চারপাশে এমনি ভাবে খাঁজকেটে দেওয়ার পর থেকেই দেখা গেল ও ভাবে চুরী করা একদম বন্ধ হয়ে গেছে! আজকাল যদি কেউ সে ভাবে মূদ্রা-টীকে কাট্‌তে যায় তা হ'লে অনায়াসেই ধরা পড়ে যাবে,—তাই সে রকম চেষ্টা এখন আর কেউ করতে সাহস পায় না। মূল্যবান ধাতুছাড়া তামা কিম্বা ব্রঞ্জের মূদ্রা কেউ কোনদিন এমনভাবে কেটে চুরী করতে যায় না, তাই সেগুলির চার-ধার পালিশই রাখা হয়।

## কোটের হাতে বোতাম থাকে কেন?—

আজকাল আমরা যে কোট ব্যবহার করে থাকি তার হাতায় দুটো থেকে চারটে করে বোতাম আঁটা থাকে। অথচ ঐ বোতামের কোন আবশ্যকতা আমরা দেখতে পাই না। প্রশ্ন হ'তে পারে—ওটা যখন অনাবশ্যক, তখন বোতামগুলি কেন লাগান হয়? এর জবাব এই—ওটা একটা ফ্যাসান! আজ কাল ও একটা ফ্যাসানেই দাঁড়িয়েছে বটে কিন্তু আসলে এটা একটা ফ্যাসান ছিল না। কোট জিনিষটা বিলাতের আমদানী। বিলাতে যখন প্রথম কোটের

প্রচলন হয় তখন ধনীলোকেরাই খুব দামী দামী কোট তৈরী করে গায়ে দিতেন, এবং সে গুলির হাত খুব লম্বা থাকৃত—তাতে অনেক জরী জহরতের কাজ করা ও থাকৃত। তাঁরা যখন টেবিলে খেতে বসতেন তখন প্লেট থেকে ঝোল চর্চ্চড়ী কাঁটা চামচ দিয়ে তুলতে যাবার সময় সেই কোটের লম্বা হাতায় ঝোলের দাগ লেগে মূল্যবান জরীর কাজ একদম নষ্ট হয়ে যেত। তাই দেখে দরজীরা কোটের হাতায় বোতাম লাগিয়ে দিল, বাবুরা খাবার সময় কোটের হাত গুটিয়ে সেই বোতামে এঁটে রাখতে লাগলেন। ক্রমে যতই দিন যেতে লাগ্ল—ধনী দরিদ্র সবাই কোট গায় দিতে আরম্ভ করল—কোটের হাতাও ছোট হয়ে গেল... জরীর কাজ ও ক্রমশঃ উঠে গেল কিন্তু বোতাম যে লেগেছিল সে লেগেই রইল! আজকাল কোটের হাতায় যে বোতাম থাকে সেটা শুধু ফ্যাসানের জন্য নয়—একটু সৌন্দর্য্যও তা'তে বাড়ে বটে।



## ইটের একদিকে খানিকটা গর্ত্ত থাকে কেন?—

এই যে চারিদিকে এত দালান কোঠা, ইমারত আমরা দেখ্তে পাচ্ছি—এসব তৈরি হয়েছে এক একটী ছোট ছোট ইটের দ্বারা। এই ছোট ছোট ইট-গুলি একদিকে সমান ও অপরদিকে মধ্যভাগে খানিকটা জায়গা গর্ত্তকরা থাকে—সেই গর্ত্তের ভিতর যে কোম্পানী ইট তৈরি করেছে তার নাম খোদাই করা থাকে। প্রশ্ন হ'তে পারে ইটের দুদিকেই কেন সমান হয় না, কিম্বা দুদিকেই কেন গর্ত্ত থাকে না? এর ও একটা কারণ আছে। তোমরা সবাই হয়তো দেখে থাকৃবে—রাজমিস্ত্রীরা যখন দালান প্রস্তুত করে তখন একখানা ইটের উপর খানিকটা চূণ সূরকী মাখান মশলা ঢেলে দিয়ে তার উপর আর একখানা ইট চাপিয়ে দেয়। এমনিভাবে এক একখানা ছোট ছোট ইট মিলেকত বড় বড়

ইমারত তৈরি করে ফেলে! রাজমিস্ত্রীরা সেই যে চূণ সূরকীর মশলা ইটের উপর ঢেলে দেয়—লক্ষ্য করে দেখলেই দেখতে পাবে ইটের গর্ত্তের দিকটা উপরের দিকে রেখে সেই গর্ত্তের ভিতরেই সেই গুলি ঢেলে দিয়ে সমান করে তার উপর আর একখানা ইট চাপা দেয়। এতে করে এই লাভ হয় যে সেই মশলা নীচের ইটের গর্ত্তে শুকিয়ে উপরের ইটখানাকে জোরে আঁকড়ে ধরে এবং এমনিভাবে আগাগোড়া দেয়াল খানাই খুব মজবুত হয়ে উঠে।

শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ।

---

# বুদ্ধির খেলা।

এক দেশের এক রাজার ছেলে আর সেই দেশের মন্ত্রীর ছেলের পরম বন্ধুত্ব ছিল। দুইজনে একসঙ্গে আহার, একসঙ্গে ভ্রমণ, একসঙ্গে শয়ন,—কেহ কাহাকেও একদণ্ড না দেখিলে ত্রিভুবন যেন অন্ধকার দেখিত।

একদিন—শীতকাল—দুইবন্ধু বেড়াইতে বেড়াইতে এক বিজনবনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে বনের ভিতর সূর্য্য প্রবেশ করে না। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বন, আর সেই বনের ভিতর দিয়া দুইবন্ধু যাইতে যাইতে একটী বহুকালের পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। সে পুষ্করিণী কোন যুগের—বুদ্ধদেবের আমলের কি মহম্মদের আমলের কেহ জানে না। শেওলায় তাহার উপর ভরিয়া গিয়াছে—আর সেই শেওলার উপর বড় বড় গাছ জন্মাইয়াছে। পুকুরের যে জল দেখা যাইতেছে তাহা ঘন কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত, দেখিতে কবিরাজী পাঁচনের মত। পুকুরটী

দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন —"বন্ধু, এই পৌষ মাসের রাত্রে কেহ কি এই পুকুরের ভিতর গলা অবধি ডুবাইয়া সমস্ত রাত্রি থাকিতে পারে?" মন্ত্রীপুত্র বলিলেন, "পারে বই কি, তুমি না পার আমি হয় ত পারি।" খেয়াল বশতঃ রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি পার? বেশ! আজই তাহার পরীক্ষা হইবে। যদি পার তাহলে আমি আমার রাজত্বের অর্দ্ধেক ভাগ তোমাকে দিব।" মন্ত্রীপুত্রের মনেও খেয়াল জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "বেশ তো, পেটে খেলেই পিঠে সয়। তবে আজই পরীক্ষা হউক।"

সেই রাত্র পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। মন্ত্রীপুত্র প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আর রাজপুত্র তো পৌষ মাসের শীতে নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না—তাই তিনি পাহারার জন্য লোকজন নিযুক্ত করিলেন। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মন্ত্রীপুত্র পুকুরের ভিতর নামিলেন এবং রাজপুত্র তাঁহার লোকজনকে সাবধানে পাহারা দিবার জন্য উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। সেই দুর্দ্দান্ত শীতের ভিতর মন্ত্রীপুত্র আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত বাক্যালাপে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেম; শীতে তাঁহার বুক গুরু গুরু করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সমস্ত দেশের শীত যেন তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অপমানের ভয়ে সে সকল তিনি অম্লান বদনে সহ্য করিতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই রাজপুত্র সেই স্থানে দর্শন দিলেন। সমস্তক্ষণ তিনি মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন যে, হয়ত মন্ত্রীপুত্র এতক্ষণ গৃহে চলিয়া গিয়াছেন। হয়ত বা শীতে তাঁহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণীর তীরে আসিয়া যখন তিনি মন্ত্রীপুত্রকে জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় জীবিত দেখিলেন, তখন তাঁহার উৎসাহ নিবিয়া গেল। প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে মন্ত্রীপুত্র জল মধ্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন

তখন তাহাদের উত্তর তাঁহার মনঃপূত হইল না। ভগ্নকণ্ঠে তিনি প্রহরীদিগকে বলিলেন—নিশ্চয় তোরা ঘুমাইয়াছিস্ অথবা শীতে কোথাও চলিয়া গিয়াছিলি। কিন্তু প্রহরীগণ যখন কাতরস্বরে বলিল, "না হুজুর আমরা সমস্ত রাত্রি এখানে পাহারা দিয়াছি। তখন রাজপুত্র বলিলেন, "তবে বল দেখি শীতে তোরা কেমন করিয়া এখানে থাকিলি ? আর কি করিয়াই বা বন্ধু সমস্ত রাত্রি জলে কাটাইতে পারিল ?" প্রহরীগণ উত্তর করিল, "হুজুর, রাত্রিতে যখন শীত অত্যন্ত বেশী বোধ হইল তখন এই পুকুরের পাড়ে আগুণ করিয়া আমরা শীত কাটাইয়াছি। আর ইনি সমস্ত রাত্রি আমাদের সহিত গল্প করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছেন।" রাজপুত্র অপার সমুদ্রে যেন কুল কিনারা খুঁজিয়া পাইলেন, তিনি হো, হো, করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বন্ধু তোমারই হার। তুমি যদিও জলের ভিতর ছিলে কিন্তু আগুণের দিকে তাকাইয়া শীত নিবারণ করিয়াছ। এ বাজী আমারই জিত। মন্ত্রীপুত্র কত বাদ প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু রাজপুত্র তাহাতে কর্ণপাত করিতে চাহিলেন না। শেষে অনেক জেদাজেদির পর অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় স্থির হইল যে,সদ্‌বিচারক কনৌজের রাজার কাছে উভয়েই বিচারপ্রার্থী হইবেন এবং তাঁহার বিচার অনুসারে জয় পরাজয় স্থির হইবে।

( ২ )

কনৌজপতি সভাসদগণ সহিত রাজ কার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময় দুই বন্ধু বিচার প্রার্থী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। কনৌজ তাঁহাদের পরিচয় পাইয়া সসম্মানে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন কিন্তু কি করিয়া যে বিচার কার্য্য সমাধা করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তিন দিন পরে মত প্রকাশ করিবেন এই কথা বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন এবং নিজ শয়ন কক্ষে গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। কিন্তু কোন কুল কিনারা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এই রাজার এক বিদুষী ও বুদ্ধিমতী কন্যা ছিল। রাজকন্যা পিতাকে যথাসময়ে আহার করিতে না আসিতে দেখিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পিতার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে চিন্তাসাগরে মগ্ন দেখিয়া বলিলেন "কিসের এত চিন্তা যে কন্যার আগমনটুকু পর্য্যন্ত জানিতে পারিলে না ? কি হইয়াছে তোমার বাবা ?" রাজা বলিলেন—"মা আমি বড়ই বিপদগ্রস্থ।" এই বলিয়া তিনি রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের সমস্ত ঘটনা রাজপুত্রীকে বলিলেন। রাজকন্যা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "এর জন্য ভাবনা কি ? এ বিচার ভার আমিই লইলাম। তুমি দুই বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও, আমি সেই সময় তাঁহাদের বিচার করিয়া দিব।

( ৩ )

কনৌজ রাজের নিমন্ত্রণ অনুসারে দুইবন্ধু আহারার্থ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় রাজকন্যা মন্ত্রীপুত্রকে ডাকিয়া একটী উপদেশ দিয়া দিলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, নানা বিধ মিষ্টান্নের আয়োজন হইয়াছে এবং সুবর্ণ রেকাবীতে সুশোভিত ভাবে সেই সকল সজ্জিত রহিয়াছে। মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যার উপদেশ অনুসারে যে রেকাবীর পাশেই জলের গেলাস ছিল সেইটীতে উপবেশন করিলেন। রাজপুত্র তখন অন্যটীর উপর উপবেশন করিলে দুইজনেই আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত খাদ্যই মিষ্টরসযুক্ত ; সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই রাজপুত্র জলপান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার রেকাবীর পাশে, জল দিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি বন্ধুর নিকট জলের গেলাস চাহিলেন, কিন্তু মন্ত্রীপুত্র রাজকন্যার উপদেশ মত তাঁহাকে মাত্র গেলাসটী দেখাইলেন। দুই তিন বার জল চাহিয়া না পাইয়া রাজপুত্র ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "তুমি কি রকম লোক! আমি বার বার জল চাহিতেছি আর তুমি বার বার গেলাস দেখাইতেছ! জল দেখাইলেই আমার তৃষ্ণা যাইবে না কি ?"

দ্রুতপদে রাজকন্যা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আগুণ দেখিলে যদি শীত যায় তবে জল দেখিলে তৃষ্ণা নিশ্চয়ই যাইবে।" তিনি বুঝিলেন বিচারে তাঁহার পরাজয় হইয়াছে। আহার শেষ করিয়া রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে বলিলেন "বন্ধু আমি সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিতেছি। তোমার উপর আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি তজ্জন্য আমি সম্পূর্ণ লাঞ্ছিত, আর এই রাজকন্যার বুদ্ধি কৌশলে ও বিচার প্রণালীতে আমাকে সম্পূর্ণ রূপে মুগ্ধ করি য়াছে। আমি রাজা হইলে আমার রাজত্বের অৰ্দ্ধেক আমি তোমাকে প্রদান করিব। কিন্তু বন্ধু তুমি আমার এক উপকার কর, এই প্রখর বুদ্ধিশালিনী রাজ পুত্রীর সহিত আমার যাহাতে বিবাহ হয় তাহার এক উপায় উদ্ভাবন কর।

মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রের কথায় পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টার ফলে রাজকন্যার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল।

শ্রীবিশ্বাবসু রায় চৌধুরী।

# শতপদীর দেশে।

ঐ যে পোকাটী সর্ সর্ করে কোথায় চলে গেল, উহা আমাদের কি উপকারে আসে, ঈশ্বর উহাকে সৃষ্টি করলেন কি প্রয়োজনে—এরূপ প্রশ্ন কি কখনও তোমাদের মনে উদিত হয় নি? এই নিয়ে খানিক আলোচনা করা যাক্।

যদি একটী ছেলের সুমুখে একটা কদাকার সরীসৃপ আনা যায়, তা'হলে সে নিশ্চয় ভয়ে তিড়ং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠ্‌বে। ছোট ছেলেদের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্—এমন অনেক 'বড়লোক'ও আছেন যাঁরা ঐ রকম হাড়গোড় ভাঙ্গা জানোয়ার দেখলে না শিউরে থাকতে পারেন না—তাদের বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি আমরা একটু ভেবে দেখি তা'হলে ঐ বেচারী

পোকাদের মেরে ফেলবার কোনই কারণ দেখতে পাই না। এরা আমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট কিছু করে না। পৃথিবীতে কোন জীবই বৃথা সৃষ্ট হয় নি। প্রত্যেকেই কোন না কোন রকমে উপকার করছে। এই ধর কেঁচো—সে ত অতি সামান্য প্রাণী। অথচ ইহারা মানবজাতির কত মহৎ উপকার সাধন করছে। কেঁচো যদি না থাকত তা'হলে জমি উর্ব্বরা হত না। কারণ এই কেঁচোই মাটি ফেলে জমি উর্ব্বরা করে। তাই কেঁচো বিনা পৃথিবীতে শস্য জন্মাত কিনা সন্দেহ। পৃথিবীময় দুর্ভিক্ষের হাহাকার রব পড়ে যেত।

পোকা মাকড়ও এইরূপ। এ দেশের শতপদীরা ( Centipede ) বাগানের অনিষ্টকর পোকামাকড় খেয়ে ফেলে। ইহাতে জমির ক্ষতি হবার ভয় কমে যায়। এই সকল শতপদীর চোখ৷ নেই। ( Antinnae ) এদের চোখের কাজ করে! তার সাহায্যে এরা চলবার পথ খুঁজে নেয়, আর খাদ্য দ্রব্য চিনতে পারে। এরা মাংসাশী। এদের পা থাকে অনেক জোড়া করে।

দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক রকম শতপদী দেখিতে পাওয়া যায়। তারা বড় বিষাক্ত। এদের দেহ বার ইঞ্চি লম্বা; দেখলেই ভয় হয়। এদের কামড়ে মানুষ একেবারে মারা না গেলেও যন্ত্রণায় কাবু হয়ে পড়ে। এরা বিছানা কাপড় জুতো প্রভৃতিতে লুকিয়ে থাকে, আর যখন কেহ সেখানে যায় অমনি কামড়ে দেয়। এত বিষাক্ত হ'লেও এরা মনিবের অনেক ক্ষতিকর জিনিসের সংখ্যা কমিয়ে দেয়।

শতপদীরা যে কি না খায় তা বলা শক্ত। কারণ এ পৃথিবীতে এদের অভক্ষ্য জিনিস বোধ হয় কিছুই নেই! শুনা যায় এরা নিজেদের চেয়েও বড় বড় টিক্‌টিকি ফলার করে ফেলে। লণ্ডনের পশুশালায় একটী শতপদী রক্ষিত আছে, সে ইঁদুর খেয়ে প্রাণধারণ করছে।

এইবার একটু মাকড়সাদের সঙ্গে পরিচয় করা যাক্। তোমরা সকলেই এই জীব বিশেষটীকে দেখেছ, অনেকে ভয়ও পেয়েছ বোধ হয়। সত্যি এদের দেখলে গা 'ঘিন্ ঘিন্' করে। কোন দেশের লোকেরা নাকি এদের পুষে ঠ্যাংএ দড়ি বেঁধে বেড়াতে বাহির হয়। মাকড়সা জাল বুনতে যে খুব ওস্তাদ তাত সকলেরই জানা আছে। ওদের জাল বোনার কৌশলটা একটু দেখলে হয় না?

মাকড়সাদের দেহের নীচের ভাগে সচরাচর ছয়টী করে (Spinneret) আছে। এদের প্রত্যেকটাতেই প্রায় এককোটী করে বুনিবার নল থাকে। এর মুখ থেকে সিল্কের মত সরু সূতো বের হয়। এই সূতোই হল মাকড়সার জাল তৈরি করবার প্রধান উপাদান। মাকড়সার জাল সিল্কের মত পাতলা কিন্তু তা'হলে কি হয়—আকারের অনুপাতে ইহা ইস্পাতের চেয়েও শক্ত। একবার এইরূপ একটী মাকড়সার জালে একটা ইঁদুর আটকে পড়েছিল। মাকড়সা ইহাকে ছাড়ল না। অনেক কৌশলে তাকে জালে জড়িয়ে মাটী থেকে চার ইঞ্চি উঁচুতে তুলেছিল। অনেক মাকড়সার জালে পাখীও ধরা পড়ে! পাখীর খোঁজ পেলে এরা তাকে ছোঁ মারতে ছাড়ে না। তারপর তার বুক চিরে রক্ত খায়। স্ত্রী-মাকড়সারা পুরুষদের চেয়ে আকারে ছোট। জাল বোনা হয়ে যাবার পরই তারা তাদের স্বামীকে খেয়ে ফেলে।

ইয়োরোপে এক প্রকার জলের মাকড়সা আছে। এরা অতি আশ্চর্য্য-জনক। অন্য পশুর ন্যায় এরা নিঃশ্বাস নেয় অথচ জন্মই হল এই জলে। অন্য জন্তু স্থলে যেমন অবলীলাক্রমে বেড়ায় এরা জলেই তেমন যথেচ্ছ-বিচরণ করে। মাঝে মাঝে এরা ডুব মারে আর তখন জলে বুদ্বুদ উঠতে থাকে। এর থেকে বোঝা যায় যে এই মাকড়সাদের শরীরে যে লম্বা লম্বা লোম থাকে, পাছে তা জলে ভিজে যায় এই ভয়ে এরা জলের ভেতর বাতাস সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

প্রকৃতির রাজ্যে ঐ রকম কতশত ছোটখাট জীবজন্তু রাজত্ব করছে তার ইয়ত্তা নেই। কোথায় কোন্ ঝোপ্ জঙ্গলের মধ্যে কত রঙ্ বেরঙের জীব নিজেদের মধ্যে সংসার পেতে পরম সুখে বাস করছে—কে তার খবর নেবে?

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

---

# নাদিরশাহ

হিন্দু রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে মুসলমান রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ বহু বৈদেশিক আক্রমণকারী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। শান্তিপ্রিয় ইংরাজ রাজত্বে কোনও আক্রমণকারী ভারতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরাজের শাসন শৃঙ্খলা ও শান্তিরক্ষার গুণে এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ নিরাপদে সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংরাজ রাজ্য গ্রহণের পূর্ব্বে অনেকবার ভারতবর্ষ লুণ্ঠিত ও আক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সেই সকল আক্রমণে ভারতবর্ষের যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা শুনিলে দুঃখের অবধি থাকে না, ভারতের ইতিহাস আজিও বিষাদ হৃদয়ে সেই সকল করুণ অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করিয়া মানব হৃদয়ে শোকানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেয়। ইতিহাস প্রসিদ্ধ কোন আক্রমণকারীই ভারতের কম অনিষ্ট করে নাই, তন্মধ্যে নাদিরশাহের আক্রমণই অধিকতর হৃদয় বিদারক শোচনীয় ঘটনা। নাদিরশাহের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলেই ভারতের মোগল রাজ-লক্ষ্মী চিরদিনের তরে অন্তঃহৃতা হইয়াছেন।

মোগল রাজত্বের অবসান কালে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখন মহম্মদশা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন।

ইতিহাসে কথিত আছে নাদিরশাহ বাল্যকালে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে মেষ চরাইতেন। পরে স্বীয় অধ্যবসায় ও বীরত্ব বলে অনেক চেষ্টার পর পারস্য-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পর লুণ্ঠন ও পররাজ্য আক্রমণই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছিল। তিনি প্রথমতঃ কাবুল ও কান্দাহার জয় করেন। পরে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধন রত্নের কথা শ্রবণ করিয়া ভারতের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে ভারতবর্ষ ধন রত্নে সমৃদ্ধিশালী ছিল, ধনলুলোপ নাদিরশাহ দুর্দ্দমনীয় ঐশ্বর্য্য-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার মানসে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন; সর্ব্ব প্রথম তিনি পঞ্জাব প্রদেশে পদার্পণ করেন এবং লাহোর বিধ্বস্ত করিয়া ক্রমশঃ রাজধানী দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হন। দিল্লীর নিকটে কারণাল নামক স্থানে সম্রাট মহম্মদশাহ সৈন্য সামন্তসহ নাদিরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কারণাল নামক স্থানে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হইল, দিল্লীর সম্রাট মহম্মদশাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। নাদিরশাহ মহম্মদশাহকে লইয়া দিল্লীতে আগমন করেন। মহম্মদশাহ নাদিরশাহের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তিনি দিল্লীতে প্রথমত বেশ শান্তভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে হঠাৎ দিল্লী নগরীতে নাদিরের মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল। ফলে নগরবাসীরা উৎসাহিত হইয়া নাদিরশাহের সৈন্যগণের প্রাণনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই সংবাদ নাদিরের কর্ণে পৌঁছিলে নাদির ক্রোধান্ধ হইয়া সৈন্যদিগকে নির্দ্দয়ভাবে নরহত্যা করিতে আদেশ করিলেন। নাদিরের আদেশ পাইবা মাত্র সৈন্যগণ অতিশয় নৃশংস ভাবে নরহত্যা করিতে লাগিল, নগরবাসীরা ভয়ে যে যেখানে পারিল পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল, আর যাহারা নাদিরের নির্দ্দয় সৈন্যগণের সম্মুখে পড়িল তাহারা সকলেই প্রাণ হারাইল। এই প্রকারে একদিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত

নরহত্যা চলিল, দিল্লীর রাজপথ সমূহ নরশোণিতে প্লাবিত হইল, তারপর লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। রাজ কোষাগার সর্ব্বাগ্রে লুণ্ঠিত হইল। ধনশালী লোকদিগের ধন রত্নাদি অপহৃত হইল। সৈন্যগণ রাজধানীর সুদৃশ্য প্রাসাদাবলীকে অগ্নি সংযোগে ভস্মিভূত করিয়া দিল। নাদিরশাহ স্বচক্ষে এই সকল পৈশাচিক কাণ্ড দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছিলেন, দিল্লী নগরী একেবারে শ্মশানে পরিণত হইল। অবশেষে মহম্মদশাহ নাদিরের নিকট কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, ক্রমে নাদিরের ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল এবং সৈন্যগণকে আদেশ দিয়া ধ্বংস লীলার অবসান করিলেন। তখন সম্রাট মহম্মদশাহের রাজমুকুটে বিখ্যাত কোহিনুর রত্ন শোভা পাইতেছিল, নাদিরের তাহা দেখিয়া বড় লোভ হইল, উহা গ্রহণ করিবার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিলেন। মহম্মদশার সহিত নাদির সন্ধি সংস্থাপন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমরা আজ বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, আমাদের দেশে পাগড়ী বদল করাই বন্ধুতার নিদর্শন, আসুন আমরা পাগড়ী বদল করি।" মহম্মদশা বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁহার মুকুট নাদিরের শিরে পরাইয়া দিলেন, নাদির মুকুট মহম্মদশার মস্তকে পরাইয়া দিলেন। এই সময় ভারতরত্ন কোহিনুর মণি নাদিরের হস্তগত হইল, অবশেষে লুণ্ঠিত অতুল ধনরত্ন মণিমাণিক্য এবং সাজাহানের বড় আদরের ভারতরত্ন "ময়ুর সিংহাসন" নাদিরশাহ গ্রহণ করিয়া সোণার ভারতকে শ্মশানে পরিণত করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কত টাকা যে নাদিরশাহ লুঠিয়া নিয়াছিলেন এবং কত লোক হত্যা করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা যায় না। কোহিনুর রত্নের সঙ্গে সঙ্গে মোগল প্রতিভা অন্তর্হিত হইল। মহম্মদশা পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

# "হেঁড়েগোদা।"

হেঁড়ে আর গোদা দুই ভাই। হেঁড়ের মাথাটী বড়,—গোদার শরীরটী বড়। বদ্‌মাইশি বুদ্ধিতে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক সে দেশে মেলা ভার ছিল। তারা যে কত রকম আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য, অদ্ভুত আর উৎকট উপায়ে পয়সা রোজগার করত তার ঠিকানা নেই। তাদের একটী মজার কাণ্ড বলি শোন :—

হেঁড়ে আর গোদা যে দেশে থাক্‌ত সে দেশে একবার দুর্ভিক্ষ হ'ল। কেউ খেতে পাচ্ছে না। বড় লোকেরা অনেক টাকা খরচ করে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে। গরীবদের ত দুঃখের শেষ নাই। অনেকে মরতে লাগ্‌ল। ক্রমে সব দেশ ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করলে।

এই সব দেখে গোদা হেঁড়েকে বল্লে, "দাদা, চল আমরাও বেরিয়ে পড়ি। অন্য রাজ্যে গিয়ে রোজগারের ফন্দি দেখা যাক্‌। এখানে ত এই অবস্থা।"

হেঁড়ে বল্লে, "হাঁ, হাঁ, তাই চল্—এখানে কিছুর আশা নেই।" পরদিন দুজনে বেরিয়ে পড়্‌ল।

২।

যেতে যেতে তারা আর এক রাজার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সে দেশের রাজা এক অদ্ভুত লোক। সর্ব্বদা কেবল নিজের কাপড় চোপড় নিয়েই ব্যস্ত। যত টাকা সব নিজের সাজপোষাকেই খরচ করেন। রাজ্যের সৈন্যদের দেখাশুনা, আমোদপ্রমোদ করা—এসব কিছুতেই মন নেই। কেবল সাজ আর পোষাক! দিনের প্রত্যেক ঘণ্টার জন্যে তাঁর একটী কাপড় আর একটী জামা নির্দ্দিষ্ট ছিল। লোকে অন্য সব রাজাদের কথা বল্‌তে গেলে বলে—"তিনি সভা ক'রে বসেছেন।"

আর এ রাজার কথা বল্‌তে গেলে লোকে বল্‌ত, "তিনি নিজের জামা কাপড়ের ওপর বসে রয়েছেন।" রাজা জামাকাপড় এত ভাল বাস্‌তেন !

দরবারে রোজ নতুন নতুন লোক দেশবিদেশ থেকে আসে। একদিন হেঁড়ে আর গোদা গিয়ে সভায় দেখা দিলে। ভেতরে ভেতরে অবশ্য তাদের এক অতি অদ্ভুত মত্‌লব ছিল। তাদের অপরূপ মূর্ত্তি দেখে সভার লোকেরা আর একটু হ'লেই হেসে ফেলেছিল। যদিও রাজা তাঁর ঘরে সাজ সজ্জা নিয়ে ব্যস্ত, তাহ'লেও প্রধান মন্ত্রী ব'সে রয়েছেন—তাঁর সাম্‌নে ওরকম ধৃষ্টতাপ্রকাশ করতে কেউ সাহস পেলে না।

প্রধান মন্ত্রী হেঁড়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা এখানে কিজন্যে এসেছ ?"

হেঁড়ে অভিবাদন করে বল্লে, "আজ্ঞে, আম্‌রা তাঁতে কাপড় বুনি। সে বড় অদ্ভুত কাপড়। আপনিই কি এখানকার রাজামশাই ?" যদিও রাজার সিংহাসন খালি পড়ে ছিল।

মন্ত্রী বল্লেন, "না, আমি রাজা নই। রাজাকে খবর পাঠাচ্ছি। তোমরা ওখানে একটু বস।"

একজন কর্ম্মচারী মন্ত্রীর হুকুমে রাজাকে খবর দিতে ছুট্‌ল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা এসে সিংহাসনে বস্‌লেন। কর্ম্মচারীর মুখে অদ্ভুত কাপড় বোন্‌বার কথা শুনে তাঁর মনে বড় কৌতূহল হ'য়েছিল। তিনি হেঁড়ে আর গোদাকে কাছে ডাক্‌লেন।

হেঁড়ে আর গোদা সসম্মানে রাজাকে অভিবাদন করলে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাপড় বোন ?"

হেঁড়ে বল্লে, "আজ্ঞা হাঁ, মহারাজ। আম্‌রা দুজন ভাই।"

রাজা বল্লেন, "তোমরা কোনরকম অদ্ভুত কাপড় বোন, বলেছ নাকি ?"

হেঁড়ে বল্লে, "মহারাজ, আম্‌রা তাঁতে এমন কাপড় বুনি যে, রাজ্যে যে লোক যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছে, সে যদি সে পদের অনুপযুক্ত অথবা বাজে লোক হয় তা'হলে সে এই কাপড় দেখ্‌তে পা'বে না, ছুঁলেও টের পাবে না।"

রাজার ত তাক্‌লেগে গেল। সে রাজ্যের প্রত্যেকেরই বুদ্ধি ছিল একটু মোটা। রাজা ভাব্‌লেন—এ নিশ্চয়ই এক অদ্ভুত কাপড়। একখানা এরকম কাপড় যদি আমার থাকে, তাহ'লে আর আমার ভাব্‌না কি? আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত তা সহজেই ধরে ফেল্‌তে পারব। আর কে কাজের লোক, কে বাজে লোক, তাও ধর্‌তে পারব। শীগ্‌গিরই এ রকম কাপড় বুন্‌তে দেওয়া দর্‌কার।

অম্‌নি ছুতোর ডাকিয়ে খুব মজবুত তাঁত তৈরী করান হ'ল। অনেক টাকা খরচ ক'রে ভাল ভাল সিল্ক সূতো, সাচ্চা জরি সব আনান হ'ল। হেঁড়ে আর গোদাকে একটা বড় আর ভাল ঘরে তাঁত সূতো ইত্যাদি দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'ল।

৩।

হেঁড়ে আর গোদা, দুজনে কতই কাজ করছে এরকম ভাব দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা কিছুই কর্‌ছিল না। ভাল ভাল জরি, সিল্ক সব নিজেদের থলিতে পুরে তারা রাত্তির অব্‌ধি ঘট্‌ ঘট্‌ শব্দ ক'রে খালি তাঁত চালাতে লাগ্‌ল।

একদিন রাজার ইচ্ছে হ'ল, তাঁতীরা কি রকম কাপড় বুন্‌ছে সেটা জেনে আসেন। কিন্তু তাঁর মনে পড়ে গেল যে, যে যার পদের অনুপযুক্ত অথবা বাজে লোক, সে কাপড় দেখ্‌তে পাবে না। তিনি যদি দেখ্‌তে না পান!—কি সর্ব্বনাশ! কাজ নেই নিজে গিয়ে, আর একজনকে পাঠানই ভাল। প্রধান মন্ত্রীকে পাঠানই তিনি স্থির কর্‌লেন, কারণ তিনি জান্‌তেন যে বৃদ্ধ মন্ত্রী কোন মতেই

বাজে লোক নয়, আর তার চেয়ে নিজের পদের উপযুক্ত কেউ নাই। তিনি বিচক্ষণ, কাপড় দেখ্‌তেও পার্‌বেন ভাল ক'রে।

প্রধান মন্ত্রীকে ডাকিয়ে বল্লেন, "তাঁতীরা কি রকম কাপড় বুন্‌ছে আপনি গিয়ে একবার দেখে আসুন।"

রাজার কথা শুনে বিশ্বস্ত মন্ত্রী তাঁতীদের ঘরে চল্লেন। সেখানে হেঁড়ে আর গোদা প্রাণপণে খালি তাঁত চালাচ্ছিল। তাঁতে সূতোর লেশমাত্র নেই অথচ তাঁত অবিরাম চল্‌ছে ঘট্‌ ঘট্‌ ঘট্‌। দেখে ত মন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। মনে ভাব্‌লেন, "ব্যাপারটা কি ? তাঁতে ত একগাছিও সূতো দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। কিন্তু তিনি চেঁচা মেচি কল্লেন না।

হেঁড়ে আর গোদা অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা কর্‌লে। তাঁতের কাছে একটা ভাল জায়গায় তাঁকে বস্‌তে দিলে। কুশল জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞাসা কর্‌লে যে কাপড়টা কি রকম তাঁকে ঠেক্‌ছে। রংটা কি রকম হ'চ্ছে, জরির কাজগুলো পছন্দ সই ত ? মন্ত্রী চেয়ে চেয়ে দেখেও তাঁতে ত কাপড়ের কোন চিহ্নই আবিষ্কার করতে পার্‌লেন না! তখন তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন যে তিনি তাঁর পদের অনুপযুক্ত, আর তিনি একটা বাজে লোক তাই তিনি কাপড় দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। ভাব্‌লেন, একথা কাকেও জানান হ'বে না।—কাপড় দেখ্‌তে পাচ্ছি না, একথা এদের কাছে কিছুতেই স্বীকার করা হ'বে না।

এদিকে তাঁকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে, গোদা বল্লে, "কি মন্ত্রী মশাই! কই, কাপড় আপনার কি রকম লাগ্‌ছে তাত বল্লেন না ?"

চশ্‌মার ভেতর দিয়ে তাঁতের দিকে চাইতে চাইতে তিনি বল্লেন, "অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! এরকম পছন্দসই কাপড়, এমন সুন্দর জরির কাজ, আমি আর কোথাও দেখি নি। আমি এখুনি গিয়ে রাজাকে এই কাপড়ের কথা বল্‌ব"

হেঁড়ে বল্লে, "তাহ'লেই যথেষ্ট। সব রংগুলো দেখেছেন ত ? সব রং বোধ হয় আপনি চেনেন না। আচ্ছা, বলছি,—শুনুন।" এই বলে তাঁকে হরেক রকম রংএর নাম আর কাপড়ের ধরণ, সৌন্দর্য্য সব বলে দিলে। মন্ত্রী খুব মন দিয়ে সেই কথাগুলো শুনে নিলেন, রাজাকে যাতে ঐ কথাগুলোই বল্‌তে পারেন। যাবার সময় হেঁড়ে আর গোদা মন্ত্রীকে বলে দিলে, যেন রাজাকে বলে আরও জরি আর সিল্ক তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কারণ তাদের ওগুলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। তারপর তারা আবার খুব মনোযোগ সহকারে খালি তাঁত চালাতে লাগল।

তারপর আর এক দিন রাজা, তাঁর একজন বড় কর্ম্মচারীকে কাপড় দেখ্‌তে পাঠালেন। কতদিনে কাপড় শেষ হ'বে সেটাও জেনে আস্‌তে ব'লে দিলেন।

কর্ম্মচারী তাঁতের কাছে যেতেই তাঁর মন্ত্রীর মত দশা হ'ল। তাঁতের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়েও তিনি কোন কাপড় বা তার চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলেন না। কেবল তাঁতটাই দেখ্‌তে পেলেন।

গোদা জিজ্ঞাসা করলে, "আপনার কাপড়টা কিরকম মনে হ'চ্ছে ? মন্ত্রী মশাই ত দেখে ভালই বলে গিয়েছেন।" সঙ্গে সঙ্গে সে কাপড়ের ধরণ, রং প্রভৃতির কথা আগেকার মত বলে যেতে লাগ্‌ল।

কর্ম্মচারী ভাব্‌লেন, "নিশ্চয়ই আমার চোখ খারাপ হয়নি। আমি তা'হলে নিশ্চয়ই আমার পদের অনুপযুক্ত, আর একটা বাজে লোক। যাক্, এসব কথা আর কারও কাছে প্রকাশ কচ্ছি না।" এই ভেবে তিনি অদৃশ্য কাপড়ের খুব গুণকীর্ত্তন ক'রে বল্লেন যে, তিনি কাপড়ের রং চং, কাজ দেখে খুব খুসী হ'য়েছেন।

রাজার কাছে গিয়ে তিনি বল্লেন, "মহারাজ, তাঁতীরা যে কাপড়টা বুনছে, সেটা অত্যন্ত সুন্দর হ'চ্ছে। খুব শীগ্‌গিরই শেষ হ'বে।"

ক্রমে সারা সহরময় কেবল ঐ আশ্চর্য্য কাপড়ের কথাই হ'তে লাগল। সকলেই ভাব্‌তে লাগ্‌ল, না জানি কি সুন্দর কাপড়ই তৈরী হচ্ছে।

৪।

তারপর একদিন স্বয়ং রাজারই কাপড় দেখ্‌তে ইচ্ছে হ'ল। সভার কয়েকজন বাছাবাছা কর্ম্মচারী নিয়ে তিনি তাঁতের ঘরে চল্লেন। এই কর্ম্মচারীদের মধ্যে আমাদের মন্ত্রী মশাই আর সেই কর্ম্মচারীও ছিলেন।

এদিকে রাজার আসার খবর পেয়ে হেঁড়ে আর গোদা আগেকার চেয়ে ঢের মনোযোগ সহকারে তাঁত চালাতে লাগ্‌ল—যদিও একটী সূতাও তাঁতের ভিতর ছিল না! মন্ত্রী আর সেই কর্ম্মচারী, রাজার সঙ্গে ঘরে ঢুকেই, রাজাকে বল্লেন, "কাপড় কি রকম সুন্দর হচ্ছে, দেখুন। ওঃ, তাঁতের দিকে একবার চেয়ে দেখুন! কি সুন্দর কাজ, কি সুন্দর সিল্ক বসাইবার কায়দা—সমস্তই চমৎকার!" বলে তাঁরা শূন্য তাঁতের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন! কারণ, তাঁরা দুজন প্রত্যেকেই ভাব্‌ছিলেন যে, তিনি ছাড়া আর সকলেই বুঝি ঐ সুন্দর কাপড় দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

রাজার ত ভয় হ'য়ে গেছে। মনে মনে ভাব্‌লেন, "একি ব্যাপার! আমি ত কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছি না!—কি ভয়ানক! আমি কি তবে বাজে লোক, কিম্বা আমি রাজপদের অনুপযুক্ত! না, না,—একথা কাউকেও জানান হ'বে না।"

প্রকাশ্যে বল্লেন, "বাঃ! চমৎকার কাপড়, আমার খুব পছন্দ হয়েছে।" একটু মুচ্‌কি হেসে তিনি ভাল করে তাঁতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, যাতে না কেউ তাঁকে সন্দেহ ক'রে। তাঁর সঙ্গে যারা ছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁতের দিকে ঝুঁকে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন, যদি কিছু দেখ্‌তে পান। কিন্তু কেহই কিছু দেখ্‌তে পেলেন না। সকলেই মুখে বল্লেন, "বাঃ, কি সুন্দর কাপড়!" আর

সাম্‌নে যে বাৎসরিক উৎসব আস্‌ছে সে জন্যে কয়েকটা এ রকম সুন্দর কাপড় করিয়ে নিতে তারা রাজাকে উপদেশ দিলেন। তখন চারিদিকেই "সুন্দর," "চমৎকার", "মনোহর" ইত্যাদি কথা শোনা যেতে লাগ্‌ল। সকলের মুখেই হাসি ফুটে উঠ্‌ল। রাজা খুসী হ'য়ে হেঁড়ে আর গোদাকে অনেক পুরস্কার দিলেন, আর তাদের প্রত্যেককে একটা বড় উপাধি দিলেন।

উৎসবের দিন ক্রমে কাছে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। উৎসবের আগের দিন তারা অনেক আলো জেলে, অনেক রাত্রি অবধি তাঁত চালাতে লাগ্‌ল, সকলে যাতে জান্‌তে পারে তারা রাজার কাপড় শেষ কর্‌বার জন্যে কি রকম উঠে পড়ে লেগেছে! সকাল হ'য়ে গেল। কাপড় যেন জড়িয়ে ফেল্‌ছে এ রকম ক'রে তারা হাত গুটোতে লাগ্‌ল। হাওয়ার ওপর দিয়ে কাঁচি চালাতে লাগ্‌ল, যেন কাপড়টা কাট্‌ছে আর সূতোবিহীন সূঁচ হাওয়ার ওপর দিয়ে সেলাই করবার মত ক'রে চালাতে লাগ্‌ল। তারপর সকলকে বল্লে যে, রাজার কাপড় তৈরী হ'য়ে গেছে।

৫।

খবর শুনে রাজা তাঁর সভাসদগণকে সঙ্গে নিয়ে হেঁড়ে আর গোদার কাছে এলেন। তারা দুজনে, যেন কিছু তুলে ধরেছে এ রকম ভাবে হাত তুলে, রাজাকে বল্লে, "এই—নিন মহারাজ, আপনার কাপড়। এটা এত হাল্কা যে, এটা পর্‌লে কেউ টের পাবে না যে এটা পরে আছে। এটা এই কাপড়ের গুণ।"

সভাসদেরা সকলেই বলে উঠ্‌লেন, "সত্যই তাই।"

হেঁড়ে বল্লে, "মহারাজ যদি কাপড় ছেড়ে একটা গামছা পরেন, তাহ'লে আমরা মহারাজকে কাপড়টা পরিয়ে দি।"

এদিকে রাজাকে তখুনি উৎসব যাত্রা কর্‌তে হ'বে। উৎসব যাত্রার একজন বড় কর্ম্মচারী এসে রাজাকে বল্লে, "মহারাজ, উৎসব যাত্রা কর্‌বেন? সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

রাজা বল্লেন, "আমি প্রস্তুত। আমাকে নতুন কাপড় পরে কি রকম দেখাচ্ছে—বল দিকি?"

কর্ম্মচারী। চমৎকার, চমৎকার।

এই বলে সে এমন ভাবে নিজের হাত তুলে ধর্‌লে যেন সে রাজার কাপড়ের একটা কোণ তুলে ধ'রে পরীক্ষা কর্‌ছে।

তারপর রাজা উৎসবে যোগদান কর্‌লেন। রাস্তায় যেতে যেতে যত বাড়ী থেকে, জান্‌লা থেকে, প্রত্যেকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "বাঃ কি সুন্দর রাজার কাপড়! কি রকম সুন্দর রাজাকে মানিয়েছে।" কিন্তু রাজার পরণে গাম্‌ছাটী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। গায়ে একটী ভাল জামা ছিল। কিন্তু কেউই স্বীকার কর্‌বে না যে সে অমন সুন্দর কাপড়টী দেখ্‌তে পাচ্ছে না। কারণ ওটা প্রকাশ কর্‌লে লোকে মনে কর্‌বে যে সে বাজে লোক, আর নিজের কাজের অনুপযুক্ত। এই অদৃশ্য কাপড়ে লোকের মনে যতটা আশ্চর্য্যের উদয় হ'য়েছিল, রাজার অন্য সব দামী দামী জামা কাপড়েও লোককে ওরকম আশ্চর্য্য কর্‌তে পারে নি।

একটী ছোট ছেলে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "রাজা ত শুধু একটী গাম্‌ছা পরে রয়েছেন!" তার বাবা ছেলের কাণ মলে দিয়ে বল্লে, "শোন ছেলের কথা।" কিন্তু ছেলেটীর কথা এর মুখ থেকে ওর মুখে শোনা যেতে লাগ্‌ল।

শেষকালে সমস্ত লোক চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "রাজাত কেবল একটী গামছা পরে রয়েছেন।" রাজা বড় বিরক্ত হ'লেন, কারণ তিনি জান্‌তেন, লোকে যা বল্‌ছে তাই ঠিক্—কিন্তু ভয়ে কিছু বলেন নি।

"হাঃ! হাঃ!! হাঃ!!!—রাজা কেবল গামছা পরে রয়েছেন!"—চম্‌কে উঠে—লোকে হা করে দেখ্‌লে, দুটো তেজী ঘোড়ায় চড়ে হেঁড়ে আর গোদা ছুটে পালাচ্ছে। সকলে অবাক্‌!

শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র লাহা।

---

# পার্সিয়ুস।

পার্সিয়ুস উড়ে চল্‌ল তীরের মতন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেরিফস দ্বীপে আকাশের গায় মিলিয়ে গেল। পায়ের নীচে সুন্দর সুন্দর সহর, বড় বড় গাছ, সবুজ ক্ষেত, রূপোর পাতের মতন ঝকঝকে নদী, নীল নীল পাহাড় সমস্ত তীরের মত পিছন দিকে ছুটতে লাগল। কত দেশ দেখতে দেখতে সে পাড় হয়ে গেল, যার নামও কখনও শোনেনি। সে যাচ্ছিল উত্তর মুখে, কাজেই ক্রমশঃ ঠাণ্ডা পড়তে লাগল। সাতদিন এইরকমে যাবার পর সে সদানিশির দেশে এসে পড়ল, সেখানে কেউ কখনও সূর্য্যের আলো দেখতে পায় না, আর দেখবার মত লোকও কেউ নেই সেখানে, সব মরে গেছে, সেখানে কেবল বরফ আর বরফ।

সেখানে গিয়ে পার্সিয়ুস দেখলে সেই তিন বুড়ী বসে বসে ঝিমুচ্ছে, তাদের আগাগোড়া বরফে সাদা, আর তাদের বয়স যে কত হয়েছে তা কেউ বলতে পারে না।

পার্সিয়ুস তাদের কাছে গিয়ে খুব নরম করে বল্লে "আপনারা বুড়' হয়েছেন অনেক কিছু জানেন, আমায় গর্গনদের বাড়ীর ঠিকানাটা বলে দিন।"
এই না শুনে বুড়ীগুল খুব রেগে গেল, বলে—কে বুড়' বুড়' করে রে, আর একজন বল্লে—"মানুষ বলে বোধ হচ্ছে না ?" পার্সিয়ুস বল্লে "আমি দেবতাদের কাছ থেকে এসেছি।" তারা আরও রেগে বল্লে—এখানকার সব দেবতা নতুন, আর যা নতুন তাই খারাপ।" এই রকম তারা চ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল, পার্সিয়ুস দেখলে যে এ ত সুবিধে নয়। এখন তাদের ভারী একটা মজা ছিল। তাদের তিনজনের মোট মাট একটি দাঁত আর একটি চোখ ছিল। কাজেই একজনের কাছে যখন চোখ আর দাঁত থাকত তখন বাকী দুজন অন্ধ আর ফোগ্‌লা।

এখন পার্সিয়ুসের সঙ্গে গোলমাল শুনে সকলেই চেঁচাতে লাগল "দেখিরে এক-বার চোখটা", কেউ বলে "দেখিত একবার দাঁতটা, একেবারে ব্যাটাকে খেয়ে ফেলি।" যার কাছে চোখ ছিল সে আস্তে আস্তে চোখটা বার করে আর একজনের হাতে দেবার জন্য হাত বাড়াল, পার্সিয়ুসও অমনি আস্তে আস্তে হাতটি বাড়িয়ে দিল, আর সেই বুড়ী তার হাতকেই তার বোনের হাত ভেবে চোখটা দিয়ে দিল, কেউই কিছু বুঝতে পারল না, কেননা তখন সকলেই অন্ধ।

পার্সিয়ুস একটু সরে গিয়ে বল্লে "দেখো—আমার কাছে এখন তোমাদের চোখ, তোমরা গর্গনদের ঠিকানা বলে দেবেত দাও, নইলে আমি এখনি চোখটা সমুদ্রে ফেলে দেব।" তখন বুড়ীগুল আর কি করে, খুব খানিক গোলমাল করে শেষকালে বল্লে "তবে সেই শুকতারার মেয়েদের কাছে গিয়ে মর, তারা তোমাকে বলতে পারবে, আমরা সব ভুলে গেছি।" পার্সিয়ুস তখন চোখটা তাদের দিয়ে উড়ে চল্‌ল। তারা কিন্তু তখনি ঘুমিয়ে পড়ল, আর মরে গিয়ে তিনটে বরফের পাহাড় হয়ে সমুদ্রের উপরে ভাসতে লাগল। এখনও মাঝে মাঝে সমুদ্রের মাঝখানে

তাদের দেখা পাওয়া যায়, সূর্য্যের আলো দেখলেই তারা কাঁদতে থাকে, কেননা যা ভাল, যা সুন্দর, যা নূতন এমন জিনিষ তারা সহ্য করতে পারত না।

পার্সিয়ুস এদিকে সেই বিভীষিকার দেশ ছেড়ে দক্ষিণমুখে চল্ল। সেই বরফের দেশ থেকে দক্ষিণের চিরবসন্তের দেশে এসে পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, সূর্য্যের আলোতে তার প্রাণ আবার তাজা হয়ে উঠল। তারপর সে নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে চলতে লাগল, দিনের বেলায় সমুদ্রের পরীরা ঢেউয়ের উপর মাথা বাড়িয়ে তাকে ডাকত, তাদের সঙ্গে খেলা করতে, সমস্ত রাত্রি ধরে সে তাদের চমৎকার গান শুনতে পেত, সে কিন্তু কোথাও অপেক্ষা করল না। শেষকালে সে অনেক দূরে এক বিরাট পাহাড় দেখতে পেল, এত উঁচু যে তার মাথার উপর মেঘ জমে আছে, সে দেখেই চিন্‌ল, যে সেই এটেলাসের পাহাড়, যে এটেলাস পৃথিবী আর আকাশকে তফাৎ করে রেখেছে।

সে সেই পাহাড়ের তলায় এসে নেমে সেই শুকতারার মেয়েদের খুঁজে বেড়াতে লাগল। শেষকালে সে দূর থেকে গানের আওয়াজ শুনতে পেল, সেই আওয়াজ শুনে সেই দিকে যেতেই দেখল যে একটি গাছের চারদিকে ঠিক ভোরের শুকতারার মতই সুন্দর তিনটি মেয়ে হাত ধরাধরি করে নাচছে আর গাইছে, গাছটিতে সোণার আপেলফল থোকা থোকা ফলে রয়েছে, আর গাছের গোড়ায় একটা সোণার বিরাটকায় সাপ জড়িয়ে আছে তার পলকহীন চোখে সেই মেয়েদের দিকে তাকিয়ে তাদের গান শুনছে। পার্সিয়ুস পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল, সে সাপটার ভয়ে নয়, সেই মেয়েদের রূপ আর তাদের সেই মিষ্টি গান যেন তার মাথার মধ্যে ঢুকে তাকে অবশ করে ফেলছিল।

কিন্তু মেয়েরাও তাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেল, তারও চমক ভাঙ্গল, তারা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কি হীরাক্লিস, আমাদের গাছ লুট করতে এসেছ ?"

পার্সিয়ুস বল্‌ল "না না আমি হীরাক্লিসও নই, তোমাদের গাছও লুঠ করতে আসিনি, আমি গর্গনদের দেশে যাব, তাই ঠিকানা জানতে এসেছি।" তারাও কিছুতেই পার্সিয়ুসকে যেতে দেবেনা, তাদের কেউ সঙ্গী নেই সেখানে তারা অমন সুন্দর ছেলেটিকে তাদের কাছেই থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল, বললে যে গর্গন-দের দেশে গেলে তাকে পাথর করে দেবে, সে কিন্তু তার উত্তরে বল্‌ল যে জন্তুর মতন বাঁচার চেয়ে বীরের মত মরাও ভাল, আর দেবতারা তার সহায়, তার কিছু ক্ষতি হবে না।

তখন তারা নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌ল "যখন তুমি যাবেই ত যাও, কিন্তু আমরা ত সেখানকার ঠিকানা জানিনা, ঐ পাহাড়ের উপর আমাদের কাকা এটেলাস দৈত্য থাকেন, তিনি ঐ উঁচু থেকে পৃথিবীর সব দেশ দেখতে পান, তিনি বলতে পারেন।

তখন তারা সেই পাহাড়ের উপর দৈত্যের কাছে গেল যেখানে সে হাঁটু গেড়ে বসে মাথার উপর আকাশটাকে ধরে আছে। সে পার্সিয়ুসকে আঙ্গুল দিয়ে অচিন দ্বীপের রাস্তা বলে দিলে কিন্তু আরও বল্লে যে যতক্ষণ না সে অন্ধকারের টুপি পরে অদৃশ্য হতে পারবে ততক্ষণ সেখানে যেতে পারবে না। পার্সিয়ুস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে "সে টুপি কোথায় পাব?" তখন দৈত্য বললে—"কোন মানুষ সেখানে যেতে পারে না, তবে আমার ভাইঝিরা অমর, তারা সে টুপি এনে দিতে পারে যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে ফেরবার সময় তুমি সেই সুন্দর বিভীষিকাটি আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে যাতে আমি পাথর হয়ে যাব, এ বিষম বোঝা আর আমাকে বইতে হবে না।"

পার্সিয়ুস খুব আনন্দের সঙ্গে রাজী হল। তখন সেই মেয়েদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড় সে নেমে গেল পাতালের মধ্যে যম পুরীর মাঝখানে, আর সাতদিন বাদে সেই টুপী নিয়ে ফিরে এল যা পরলে আর মানুষকে দেখা যায় না।

পার্সিয়ুস সেই টুপি পরে সেখান থেকে রওনা হল, কিন্তু তাকে বিদায় দেবার সময় শুকতারার মেয়েরা খুব কান্নাকাটি করেছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই পার্সিয়ুস একেবারে অচিন্ দ্বীপের মাঝখানে এসে পড়ল, তখন আর তার মাটির দিকে তাকাতে সাহস হল না, সে সেই আয়নার মত চকচকে ঢালের মধ্যে ছায়া দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখতে পেল যে গর্গনরা ঘুমুচ্ছে, এক একটা যেন হাতীর মত দেখতে। দুজন গর্গনকে অতি বিশ্রী দেখতে, পার্সিয়ুসের গা বমি বমি করতে লাগল। কিন্তু একটির মুখ খানি ভারী সুন্দর, ঠিক পরীর মতন, যদিও কপালটি ভীষণ যন্ত্রণায় সদা সর্ব্বদা কোঁচকান। পার্সিয়ুস বুঝতে পারল যে সেই মেডুসা, তার তাকে মারতে মায়া হতে লাগল।

কিন্তু ঠিক এই সময় মেডুসা পাশ ফিরল, তার মাথার সাপগুল ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, বুকের মাঝখানে পেতলের নখগুল দেখা গেল, তখন আর পার্সিয়ুসের মনে কোন রকম সন্দেহ রইল না, সে উপরে থেকে বিদ্যুতের মতন পড়ে এক কোপে গলাটা কেটে ফেলল, তার পর মাথাটা সেই আথিলি দেবীর দেওয়া ছাগল ছালাটার মধ্যে বেঁধে হাওয়ায় উঠে তীরের মত ছুটে চলল।

এদিকে মেডুসার পিতলের পাখাটা অবশ হয়ে পড়ে যাবার সময় ঝনাৎ করে উঠল, আর বাকী দুজনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তারা ব্যাপারটা কি হয়েছে বুঝতে পেরেই ভয়ানক এক চীৎকার করে উঠল আর চারদিকে খুঁজতে লাগল যে এই কাণ্ড করেছে তা'র জন্য। কিন্তু পার্সিয়ুস অন্ধকারের টুপি পরে ছিল, তাকে দেখতে পেল না। শেষকালে মেডুসার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে শিকারী কুকুরের মতন তারা পার্সিয়ুসকে তাড়া করল। পার্সিয়ুসের সাহস খুবই ছিল কিন্তু যখন সেই ভীষণ রাক্ষসীরা চীৎকার করতে করতে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখলে তখন তার গায়ের রক্তও জল হয়ে যাওার মত হল কিন্তু দেবতার দেওয়া সেই খরম

জোড়ার জন্য পার্সিয়ুস বেঁচে গেল। রাক্ষসীরাও যত জোরে আসতে লাগল, তারাও তত জোরে পার্সিয়ুসকে নিয়ে চলল। শেষকালে তারা পিছিয়ে পড়তে লাগল। ক্রমশঃ অনেক দূরে আকাশের কোলে একটা কাল দাগের মত দেখা যেতে লাগল, শেষকালে একেবারেই আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল। পার্সিয়ুস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

তারপর সে এটেলাসের পাহাড়ে এল, সেখানে তার প্রতিজ্ঞা মত এটেলাসকে ছাগলের ছালাটি খুলে মেড্‌সার মুখটি দেখিয়ে দিল। আর এটেলাস তার অনন্তকাল ধরে এক বিরাট বোঝা বওয়ার ক্লান্তি থেকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মুক্তি পেল। এখনও যদি তোমরা সেখানে যাও ত দেখতে পাবে মেঘের উপর মাথা তুলে সেই দৈত্যরাজ পলকহীন চোখে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। সকাল বেলা সূর্য্যের আলোর প্রথম রেখাটি তারই মাথা ছুঁয়ে তাদের আসবার খবর জানিয়ে দিয়ে যায়, তারপর সন্ধ্যাবেলা যতক্ষণ দেখা যায় সূর্য্যদেব তার সেই বিরাট গম্ভীর, উজ্জল মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। এই লোকটি যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন শুধু পরের উপকারই করে এসেছিল।

পার্সিয়ুস তারপর তার ভাইঝিদের ধন্যবাদ দিলে আর বাড়ী ফেরবার রাস্তা জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু তারা কিছুতেই পার্সিয়ুসকে ছাড়তে চায় না। শেষকালে অনেক ওজর আপত্তির পর তারা পার্সিয়ুসকে কতকগুলি ফল দিয়ে দিল যা একদিন খেলে আর সাতদিন কিছু খেতে হয় না। তারপর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাকে বিদায় দিল।

শ্রীশুভেন্দুকুমার মিত্র।

— — -

# ইহুদী জাতির কথা।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে প্রাচীন জাতি হইতেছে ইহুদী জাতি। এই ইহুদী জাতিই পৃথিবীর আদি সভ্যজাতি, ইহাদের কাছেই আমরা প্রাচীন জগতের ইতিহাস, সাহিত্য এবং ধর্ম্মের বিষয় জানিতে পারি।

প্রাচীনকালে বাবিলন ছিল ইহুদীদের বাসস্থান। প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে এই ইহুদীজাতি অত্যন্ত দরিদ্র ছিল। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন বাসস্থান ছিল না, মেষ চরাইয়া নানাস্থানে কেবল ঘুরিয়া বেড়াইত; তখন পর্য্যন্ত তাহারা সভ্য হয় নাই।

সেই সময় বাবিলনের কাছেই একজন খুব জ্ঞানী ইহুদী বাস করিতেন, তাঁহার নাম ছিল ইব্রাহিম। ইব্রাহিম কোন দেবদেবী মানিতেন না, তিনি শুধু এক ঈশ্বরকেই ভক্তি করিতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ইহুদীরা বহু দেবদেবী বিশ্বাস করিত এবং প্রতিমা পূজা করিত। ইব্রাহিম একদিন ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া বাবিলন ত্যাগ করিয়া কিনান নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে গেল তাঁহার স্ত্রী সারা, ভাইপো লোট্, কয়েকজন দাস দাসী এবং একপাল মেষ।

কিছুদিন পর লোট্ সিদোম নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। অন্যান্য দেশের রাজারা মিলিয়া সিদোমের রাজাকে যুদ্ধে হারাইয়া বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার সময় লোট্‌কেও বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। খবর পাইয়া ইব্রাহিম ছুটিয়া আসিলেন এবং যুদ্ধ করিয়া সকল রাজাকে হারাইয়া লোটকে মুক্তি দান করিলেন।

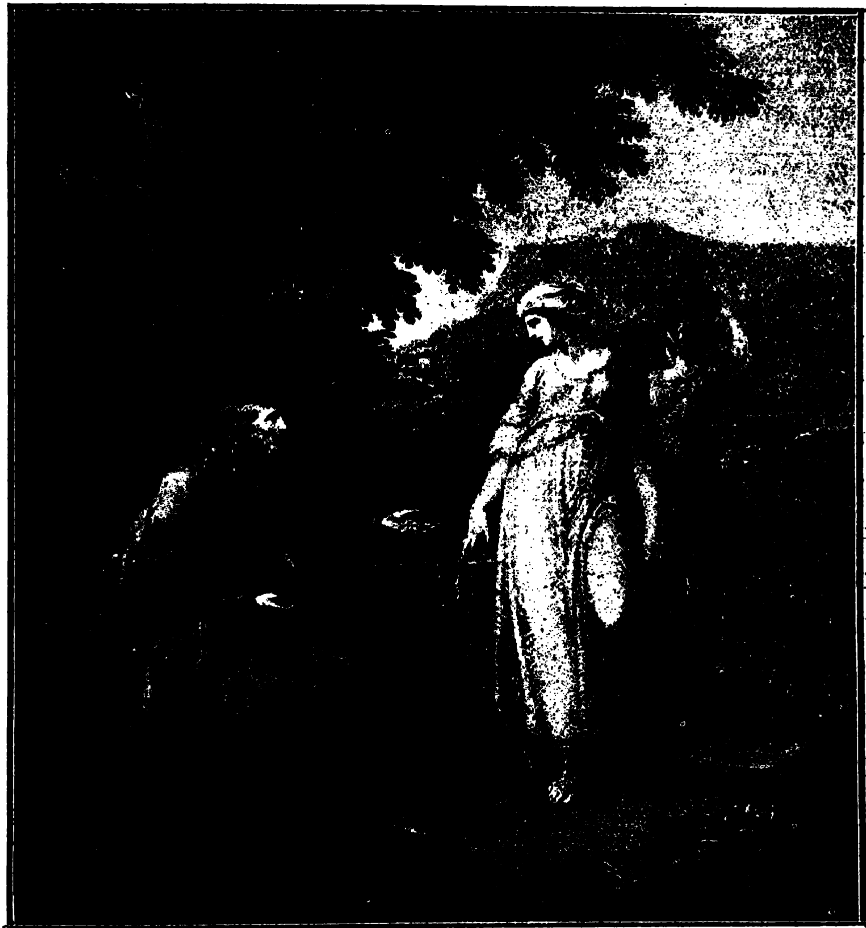


হাজিরা ও ইস্মাইলকে তুমি এই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও।

ইব্রাহিমের স্ত্রী ছিল দুইটী, সারা ও হাজিরা। এই দুইজনের দুইটী ছেলে ছিল। সারার ছেলের নাম ইস্‌হাক ও হাজিরার ছেলের নাম ইস্‌মাইল। একদিন এই দুই ছেলেতে ঝগড়া করিয়াছিল। তাহা দেখিতে পাইয়া সারা ইব্রাহিমকে বলিলেন, "হাজিরা ও ইস্‌মাইলকে তুমি এই বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দাও।" এই সময় ভগবানের আদেশও তিনি শুনিতে পাইলেন এবং হাজিরা ও ইস্‌মাইলকে বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ইব্রাহিমের বয়স তখন একশ বছরেরও বেশী। তিনি ইস্‌হাককে বিবাহ করাইয়া পুত্রবধু ঘরে আনিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পুরাতন ভৃত্যকে তাঁহার জন্মভূমিতে পাঠাইয়া সেখান হইতে একটী সুন্দরী কন্যা পছন্দ করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। ভৃত্য বাবিলনে যাইয়া উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ভৃত্য এক কূপের কাছে বিশ্রাম করিতেছে এমন সময় বিথুয়েলের কন্যা রেবেকা সেখানে জল লইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিথুয়েল ছিল ইব্রাহিমের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভৃত্য রেবেকার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঠিক করিল ইহাকেই তাহার প্রভু পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইবে। তারপর বিথুয়েলের সঙ্গে আলাপ করিয়া বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিল এবং পরদিন রেবেকাকে লইয়া কিনান ফিরিয়া গেল। ইব্রাহিম খুব জাঁকজমকের সহিত রেবেকার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দিলেন।

কালক্রমে ইস্‌হাকের দুই পুত্র হইল, বড়টীর নাম এসৌ, আর ছোটটীর নাম যেকব। এই যেকব বড় হইয়া তিনটী বিবাহ করেন এবং তাঁহার ১১টী পুত্র ও ১টী কন্যা জন্মলাভ করে। সেই ছেলেদিগের মধ্যে সকলের ছোটটীর নাম ছিল বেঞ্জামিন এবং তাহারই বড়টীর নাম ইয়ুসুফ বা যোষেফ। যেকব ইয়ুসুফকেই সকলের চেয়ে বেশী ভাল বাসিতেন, সেজন্য অন্য ভাইরা ষড়যন্ত্র করিয়া ইয়ুসুফকে



ভৃত্য রেবেকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই প্রভুপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিবে ঠিক করিল।

একদল বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলে। সেই বণিকেরা মিশরে যাইয়া পটিকর নামক একজন কর্ম্মচারীর নিকট আবার বিক্রয় করে। সেখানে তিনি কারাগারে বন্দী হন কিন্তু মিশরের রাজা ইয়ুসুফের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া সমগ্র মিশরের শাসন কর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন।

ইয়ুসুফ তাঁহার পিতা মাতা এবং ভাইদের সকলকে মিশরে লইয়া আসেন। এই রূপে মিশরে ইহুদীজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হয়। মিশরে আসিয়া জেকবের মৃত্যু হয়। জেকবের অন্য নাম ইস্‌রাইল এবং তাঁহার সন্তানগণ ইস্রায়েল নামেই পরিচিত।

ইয়ুসুফের মৃত্যুর পর যিনি মিশরের রাজা বা ফেরাও হইলেন তাঁহার নাম রামেসিস্। এই রামেসিস্ ইস্রায়েলদের খুবই ঘৃণা করিতেন। তাহাদের দিনদিন উন্নতি দেখিয়া মিশর হইতে ইহুদী জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা করিলেন যে ইহুদীদের মধ্যে যদি পুত্রসন্তান জন্মে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। রাজার আদেশে প্রহরীগণ নূতন ছেলে জন্মিলেই তাহাকে জলে ডুবাইয়া মারিতে আরম্ভ করিল। এই সময় একটী ইহুদী রমণীর একটী ছেলে হইল এবং তিন চার মাস অতি গোপনে তাহাকে লালন পালন করিয়া শেষে রাজার ভয়ে একদিন ভেলার উপর সেই শিশুটীকে ভাসাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেই ঘাটে রাজকুমারী স্নান করিতে গিয়া ঐ শিশুটীকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তুলিয়া আনিলেন এবং নাম রাখিলেন মূসা বা মোজেস্।

মূসা বড় হইয়া বুঝিতে পারিল সে মিশরী নয়—ইহুদী, এবং মিশরীরা ইহুদীদিগকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। সে একদিন এক অত্যাচারী মিশরীকে বধ করিয়া মিশরদেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। মিদিয়ান নামক দেশে যাইয়া সে বিবাহ করিয়া সুখে শান্তিতে বাস করিতেছে এমন সময় ভগবানের আদেশে



রাজকুমারী স্নানের ঘাটে শিশুটীকে কোলে তুলিয়া লইলেন

ফারাওএর কাছে যাইয়া ইস্রায়েলদের ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে হইল। অত্যাচারী ফেরাও বন্দীদিগকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী হইল না। তখন ভগবান মিশর দেশের সমস্ত জল রক্তে পরিণত করিয়া দিলেন, ভীষণ মড়ক দেখা দিল। নানাবিধ ভয়াবহ ঘটনাতেও ফেরাও ভীত হইল না দেখিয়া ভগবান প্রত্যেক পরিবারের প্রথম পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হইবে এই আদেশ প্রচার করিলেন। রাজার একটীমাত্র ছেলে ছিল—সে মারা গেল। পুত্রশোকে অধীর হইয়া ফেরাও ইস্রায়েল-দিগকে মুক্তিদান করিলেন। ইহুদীরা মিশর ত্যাগ করিয়া চলিয়াছে—হঠাৎ রাজার খেয়াল চাপিল তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন, তাই তাহাদের পিছনে আবার সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। সৈণ্যরা যাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল—লোহিত সমুদ্রের মধ্য দিয়া ইহুদীরা হাটিয়া পার হইয়া গেল কিন্তু তাহারা যেমনি পা দিয়াছে অমনি জল আসিয়া সে স্থান ভরিয়া দিয়া গিয়াছে! এইভাবে সমুদ্র পার হইয়া ইহুদী এক মরু ভূমিতে আসিয়া পড়িল। বহুদিন নানা কষ্ট ভোগ করিয়া তাহারা মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া রোফিদিম নামক স্থানে বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পর সে স্থান ত্যাগ করিয়া তাহারা সিনয় পর্ব্বতের নিকট তাঁবু গাড়িল। এই পর্ব্বতের উপর ঈশ্বর মূসাকে দশটী আদেশ ও উপদেশ দান করিলেন। ভগবান বলিলেন—'আমি মেঘে চড়িয়া সিনয় পর্ব্বতে নামিব এবং মেঘের ভিতর থাকিয়াই তোমাকে যেসকল উপদেশ দিব তুমি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবে।' মূসার হাতে ভগবান দুইখানা প্রস্তর দিলেন—তাহাতে দশটী আজ্ঞা লেখা ছিল।

সিনয় পর্ব্বতে মূসা প্রায় চল্লিশদিন ছিলেন। এই সময় ইস্রায়েলগণ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া সোণা দিয়া একটী গোবৎস নির্ম্মাণ করিল এবং তাহাকেই ঈশ্বর মনে করিয়া পূজা করিতে লাগিল। মূসা পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ পাথর দুইখানা মাটিতে



মেঘের ভিতর হইতে ভগবান মূসাকে দশটী আজ্ঞা দিতেছেন।

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন—পাথর দুইটী ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তারপর গোবৎসটীকেও চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।



ঈশ্বরকে অমান্য করার ফলে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে মূসা এক প্রকাণ্ড তাঁবু নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর ইস্রায়েলদের উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভগবান মূসাকে সেই পর্ব্বতে আবার দুই খানা পাথরে দশটী আজ্ঞা লিখিয়া দিলেন। মূসা সকলের নিকট প্রচার করিলেন আমাদের দেবতার নাম 'জিহোবা।'

ইস্রায়েলগণ সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে। সেই সময় কোর নামক একব্যক্তি আসিয়া মূসা প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের আশ্রিত সুতরাং তোমরা কেন আমাদের সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবে?' মূসা বিনীতভাবে বলিলেন—'যাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র তাহারাই কর্ত্তৃত্ব করিতে অধিকারী, তুমি যদি নিজকে তাই মনে কর তবে আমাদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না।' ঈশ্বর কূপিত হইয়া কোর এবং তাহার দলের সকলকে অগ্নিবৃষ্টি দ্বারা পুড়াইয়া মারিয়া ফেলিলেন।

ইহার পর ইস্রায়েলগণ মূসার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিলে ভগবান অসংখ্য বিষাক্ত সাপ দ্বারা সকলের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। মূসা ভগবানের নিকট সকলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এক আদেশ শুনিতে পাইলেন। ভগবান বলিলেন—একটী পিতলের সাপ নির্ম্মাণ করিয়া একটী বংশ দণ্ডে খুব উঁচু করিরা উহা টাঙ্গাইয়া রাখ—যে ঐ সাপ দেখিতে পাইবে সেই বাঁচিয়া উঠিবে। ঐ সাপ দেখিয়া বহু লোকের প্রাণ ফিরিয়া আসিল।

মোয়ার দেশের রাজার নাম ছিল বালাক। তিনি তাঁহারই রাজ্যের একজন লোককে বহু টাকার লোভ দেখাইয়া ইস্রায়েলদের অভিশাপ দিতে বলিলেন। সেই ব্যক্তির নাম ছিল বালাম। টাকার লোভে বালাম ঈশ্বর ভক্ত লোকদিগকে অভিশাপ দিতে চাহিয়াছে দেখিয়া ভগবান একজন দেবদূত পাঠাইয়া দিলেন। বালাম গাধার পিঠে চড়িয়া চলিয়াছে—গাধা দেবদূতকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল



সর্পদণ্ড হাতে মুসা

কিন্তু বালাম কিছুই দেখিতে পাইল না। সে গাধাকে নিষ্ঠুরের মত প্রহার করিতে লাগিল কিন্তু গাধা তবু এক পাও নড়ে না। শেষে গাধা মানুষের মত কথা বলিয়া ফেলিল, সে বলিল—সম্মুখে দেবদূত দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইতেছ না? তখন হঠাৎ বালাম চাহিয়া দেখিল সম্মুখে একটা জ্যোতির ভিতর দেবদূতের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে! বালাম ইস্রায়েলদের আর অভিশাপ দিতে পারিল না।

মূসার মৃত্যুর পর জসুয়া ইস্রায়েলদিগকে কিনানদেশে লইয়া গেলেন। পথে জর্দ্দন নদীর জল সেই পূর্ব্বেকার মত শুকাইয়া গেলে পর সকলেই হাটিয়া পার হইল। জসুয়া নানাদেশ অধিকার করিয়া একশত দশ বৎসর বয়সে মারা গেলেন। তাঁহার পর দিবোরা নামক এক স্ত্রীলোক সকলকে শাসন করিতে লাগিলেন। গাবিন্ নামে এক রাজার বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল। গাবিনের সেনাপতি মিসেরা পলাইয়া এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আশ্রয় লইল—সেই রমণীর নাম ছিল যায়েলা। যায়েলা রাত্রিকালে মিসেরাকে মাথায় পেরেক মারিয়া হত্যা করিল। যে সৈনিক মিসেরাকে তাড়া করিয়া আসিয়াছিল তাহাকে যায়েলা ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং যেখানে মিসেরা মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছিল সেখানে যাইয়া বলিল—এই দেখ তোমার শত্রুকে আমিই হত্যা করিয়া রাখিয়াছি।' ইহার পর ইস্রায়েলগণ বহুকাল শান্তিতে বাস করিয়াছিল।

প্রায় দুইশত বৎসর পর সামুয়েল নামে এক ব্যক্তি খুব ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ফিলিস্থানের লোকেরা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন পালোয়ান বীর ছিল—তাহার নাম গোলিয়াথ। এই গোলিয়াথ যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন।

সামুয়েল সল্ নামে এক বীরপুরুষকে কিনানদেশের রাজা করিলেন। সলের



গাধা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—বালাম দেখিল সম্মুখে দেবদূতের মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।



যায়েলা বলিল—এই দেখ তোমার শত্রুকে আমিই হত্যা করিয়া রাখিয়াছি।

মৃত্যুর পর দায়ুদ নামে এক কৃষক পুত্র রাজা হইলেন। জুডিয়া দেশে বেথলেহেম গ্রামে জেসি নামক এক কৃষক ছিলেন—তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্রের নাম দায়ুদ। ইহুদীদিগকে ফিলিস্থানীদের অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্য দায়ুদ বহুযুদ্ধ করিয়াছিলেন।

দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সোলোমন রাজা হইয়া ইহুদীদিগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে ইহুদী জাতি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। একদলের রাজধানী হইল সামারিয়া, অন্যদলের হইল জেরুজালেম। নিজেদের ভিতর কলহ মারামারি ত লাগিয়াই ছিল তাছাড়া দুইদলে ধর্ম্মমত লইয়াও ঝগড়া চলিতেছিল। এই সময় মাসিডনের রাজা মহাবীর আলেকজাণ্ডার আসিয়া জেরুজালেম অধিকার করিয়া বসিলেন। আলেকজাণ্ডারের অধীনে ইহুদীজাতি বহুকাল সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিয়াছিল।

শ্রীঅপূর্ব্ব ঘোষ।

---

# গ্রাহকগ্রাহিকাগণের প্রতি

এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গেই "আমার দেশের" তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল। তৃতীয় বর্ষের আমার দেশ তোমাদের আনন্দও দিয়াছে, কখনও কখনও একটু আধটু কষ্টও যে না দিয়াছে, তা নয়। আমার দেশ বাহির হইতে যখন একটু আধটু দেরী হইয়াছে তখন তোমরা রাগ করিয়াছ, বিরক্ত হইয়াছ, কত দুঃখ জানাইয়া পত্র দিয়াছ। তোমাদের এই দুঃখভরা চিঠিগুলির পাশাপাশি যখন তোমাদের প্রীতিপূর্ণ, আমার দেশের প্রতি স্নেহপূর্ণ পত্রগুলি রাখি, তখন আমরা খুবই বুঝিতে পারি যে তোমাদের সুপ্রিয় 'আমার দেশ' যাইতে বিলম্ব হওয়ায় তোমাদের বড়ই কষ্ট হইতেছে। ভাই বোনগুলি আমার! দেরী মাঝে মাঝে একটু আধটু হইয়াছে, সে আমাদের দোষে নয় ভাই, পাঁচজনকে লইয়া কাজ, একটু এ-দিক ওদিক হইয়া যায়ই। তার জন্য তোমাদের কাছে আমরা সকলের হইয়া মাপ চাহিতেছি। আমার দেশ অন্য সকল বিষয়েই তোমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা আমরা জানি। ভবিষ্যতে যাহাতে আরও করিতে পারি, তাহার আয়োজন করিতেছি। তোমাদের পাঁচজনের সহানুভূতি ও সর্ব্ব-মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহ পাইলে সফলতাও লাভ করিতে পারিব, মনে হইতেছে।

তোমাদের নিকট আমাদের একটি অনুরোধ আছে। চতুর্থ বর্ষে যাহারা গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নও, তাহারা যদি একখানি পোষ্টকার্ডে অনিচ্ছা জানাইয়া দাও, বড় ভাল হয়। তোমরা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছ যে ভি পি করিয়া আমরা কাগজ তোমাদের কাছে পাঠাই তাহাতে প্রত্যেক গ্রাহক পিছু আমাদের কতকগুলি পয়সা খরচ করিতে হয়। গ্রাহক ভি পি গ্রহণ করিলে ক্ষতি অবশ্য কমই হয় কিন্তু তখন লইতে অস্বীকৃত হইলে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়। তোমরা অবশ্যই তোমাদের প্রিয় আমার দেশের কর্ত্তৃপক্ষকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থ করাইতে চাহিবে না; তাই অনুরোধ যদি গ্রাহক থাকিতে তোমার ইচ্ছা না থাকে, তবে এক খানা পোষ্টকার্ডে সে কথা লিখিয়া ২০শে পৌষের মধ্যে ডাকে ফেলিয়া দিও। গ্রাহক থাক, কিছুই করিতে হইবে না, ভি পি যাইবে, সেটি গ্রহণ করিও।

তোমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া আপাততঃ বিদায় লইলাম। ইতি।

সম্পাদক।

# বিজ্ঞাপন

চতুর্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুর লিখিত ধর্ম্ম-মূলক ছোট ছোট গল্প বাহির হইবে। রায় বাহাদুর জলধব সেনের মিষ্ট করুণ হাতের মিষ্ট লেখা পড়িতে না চায়—বাঙ্গলা দেশে এমন ছেলে মেয়ে আছে কি ?

তোমাদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন মজুমদারও তোমাদের জন্য গল্প লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এ, ইঁহাদের রচনাও তোমাদের জন্য [illegible]।

শিল্পী শ্রীযুক্ত [illegible]তীশচন্দ্র সিংহ ছবি আঁকিতেছেন।

[illegible]নমত নয় কি ?

অগ্র[illegible] যে "কালীর দোয়াত" ধাঁধা বাহির হইয়াছিল, আমরা কোনও গ্রাহকে[illegible]হইতেই এখনো তাহার উত্তর পাই নাই। অগ্রহায়ণ মাসের কাগজ[illegible] বিলম্ব হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ধাঁধাটির মধ্যে যে [illegible]আছে—তাহা জানাইতে সময় পান নাই। আর এক মাস সময় বাধ্য হইয়াই [illegible]াদের দিতে হইল।

———